নারায়ণের ৭ম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী।

প

Rising Sun
LAW
Bengal

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল।

গান

(শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়)

আমার মন হারাল কোন্ স্বপনের
গোপন অভিসারে!
কোন্ রতনের জ্যোতির পাছে
ডুব্‌ল অন্ধকারে!
কোন্ অজানার দেশে
সকল চাওয়ার শেষে
উদয়-রবির আশে গেল
তিমির-সাগর পারে।

আমার তন্দ্রাহারা আঁখি
আমি অবাক্ চেয়ে থাকি
সেই নামহীনেরে ইচ্ছামত
কতই নামে ডাকি

কখন আসবে যে মন ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
বন্দী করে' সেই জনারে
হার-মানা প্রেম-হারে।

সত-সার।

[শ্রীমতী বনলতা দেবী ও শ্রীমতী বীণাপাণি দে[illegible]।]

(১)

তাঁতির ছেলে তারিণীচরণ, স্ত্রীর সহিত যেমন মধুর ব্যব[illegible] করিত, বুড়া বাপ মায়ের সহিত কিন্তু তেমন ব্যবহার করিত না। একমাত্র ছে[illegible] তারিণী যখন স্কুলে পড়িত, পিতা তখন আদর করিয়া মনের মত একটি টুক টুকে বউ ঘরে আনিয়াছিলেন। এখন সেই বউ বড় হইয়াছে, ছেলেও স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাপড়ের দোকান করিতেছে। জাত ব্যবসায়ে তারিণীর বড় লজ্জা। বৃদ্ধ পিতা কিন্তু জাত ব্যবসার উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিতেছেন। আশা ছিল তারিণীচরণ লেখা পড়া শিখিয়া দু পয়সা আনিবে, বুড়া বুড়ীর এ কষ্টের লাঘব হইবে। বুড়া তখন তাঁতের কাজ ছাড়িয়া পায়ের উপর পা দিয়া তামাক টানিতে টানিতে সুখে কাল কাটাইবে।

বুড়ার মনের কথা জানিয়া অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ হাসিলেন, তাই তার সে সাধের আশায় ছাই পড়িল। দোকান করিয়া তারিণীচরণ বেশ দু পয়সা উপায় করিতেছিল, তাহাতে বুড়া বুড়ীর কিন্তু কিছুই সাশ্রয় হইল না। তারিণীর শ্বশুরবাড়ী তারিণীর গ্রামের নিকটেই। তারিণীর বউ প্রায় বাপের বাড়ীতেই থাকে, কাজেই তারিণীও থাকে সেইখানেই। মাঝে মাঝে বউ তারিণীর বাড়ী আসে। তার বাপের অবস্থা ভাল, কাজেই এখানে আসিলে কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হয়। তারিণীর মার সঙ্গে বউয়ের বনে না। বউকে এক কথা বলিলে বউয়ের হইয়া তারিণী মাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, মা নীরবে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছেন। এমনি করিয়াই সুখের সংসারে দিনের পর দিন কাটিতে ছিল।

(২)

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। রৌদ্রে যেন মাটী ফাটিয়া যাইতেছে। বাহিরে পাখীরাও কলরব থামাইয়া যে যাহার ছায়া খুঁজিয়া লইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুরন্ত কাকের সকাল দুপুর নাই—তার অনর্থক কাকা চীৎকার রব যেন প্রখর রৌদ্রতাপকে খরতর করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত জগৎ যেন নিস্তব্ধ।

ঘরের দাওয়ায় খাঁচায় টাঙ্গান টিয়া পাখীটী হাঁ করিয়া, গা হেলাইয়া, চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। আর তারিণীর বাপ অন্য ঘরের ভিতর বসিয়া আপন মনে সূতা কাটিতেছিল। তারিণী তখন দোকানে। পাশের ঘর হইতে শ্বশুর ডাকিয়া বলিল, "বৌমা, টীয়াটাকে একটু জল দিয়ে এস মা।" তারিণীর বৌ নিত্যকালীর সেদিকে গ্রাহ্যই নাই। সঙ্গিনীদের সহিত হাসির ধুমে আপন ঘর [illegible] কাটিতেছিল। শ্বশুর বার বার ডাকিয়া বলায় বউ হাতের খেলা রাখিয়া বলিল, "কি আপদ, বুড়ো নিজে উঠে জল দিতে পারে না, তবে ও আপদ পোষে কেন? আমি ও সব পারি নে, বাপু। এমন সুন্দর বাজী এবার হাতে পড়েছিল। ঠাকুর ঝি, এবারে কিন্তু তোমাদের হারতে হত। এবারে ছক্কা—ছক্কা" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া টিয়ার জল দিতে যাইয়া বৌ চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওলো-ঠাকুর ঝি, দেখে যা, টিয়াটা কেমন দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে।" হা-হা করিয়া নিত্যকালী হাসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল।

তারিণীর মা জগৎময়ী পাশের বাড়ী ধান ভানিতে গিয়াছিল। ধান ভানিয়া বাড়ী আসিতে পথ হইতেই বধূর কথা শুনিতে পাইয়া কহিল, "বউ মা কি হ'ল—ওমা কি হ'ল?" বধূ হি-হি করিয়া হাসিতেই লাগিল। তারিণীর মা ধানের ধামা ফেলিয়া রাখিয়া খাঁচার নিকটে গেল, খোঁচা দিয়া দেখিয়া, পরে খাঁচা খুলিয়া টীয়াটা হাত দিয়া নাড়িয়া তারিণীর মা কাঁদিয়া উঠিল, "ওমা একি হল?" ঘর হইতে তারিণীর বাপ বাহির হইয়া বলিল, "আরে হল কি,—কাঁদ কেন?" তারিণীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন সব অলক্ষণে লোকও বাড়ী থাকে, মা! জল না খেয়ে গলা শুকিয়ে মারা গেছে, মা, তা কেউ একটু জলও দেয় নি।" বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল। তারিণীর বাপ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া টীয়াটার দিকে চাহিয়া বলিল, "বউমা, একটু জল আন ত, দেখি বেচে আছে কিনা।" বউ রাগিয়া গর গর করিতে করিতে ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, "তা বালাই গেছে, বাঁচা গেছে, আমার উপর এত কথা কেন বাপু? সব দোষ যেন আমারই।" তারিণীর মা কাঁদিতেই লাগিল। তারিণীর ছোট একটী ভাই ছিল। বার তের বছরের ছেলে বছর তিনেক হইল মারা গিয়াছে। তারই পোষা এই টিয়া পাখীটী। তারিণীর মার টিয়ার শোক ও ছেলের শোক এক হইয়া নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল।

(৩)

সন্ধ্যায় তারিণীচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিত্যকালী নানা ছাঁদে ঢালিয়া, নানাবিধ, করিয়া শাশুড়ী কত কথা বলিয়াছেন, বড় কষ্ট পাই ইত্যাদি কথায় কাঁন্দিয়া তারিণীর গোচর করিল, একেই ত তারিণীচরণ পিতামাতার উপর প্রসন্ন নয়, তাহার উপর মার এই অন্যায় ব্যবহারে সে একেবারে রাগিয়া অজ্ঞান হইল। জল যখন নিজে দিয়া যাইতে পারে নাই, তখন বৌকে গালি দিবার সে কে?

তারিণী দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা শুনে যাও।" মা তখন রান্না করিয়া স্বামী পুত্রের জন্য ভাত বাড়িতেছিল, বলিল, "তারিণী, ভাত খেতে আয় বাবা?"

উদ্ধত ভাবে ছেলে উত্তর করিল, "না, তুমি শুনে যাও।"

তারিণীর বাপ পিঁড়ির উপর বসিয়া পুত্রের অপেক্ষা করিতেছিল, বলিল, "যাও না, শুনেই এস, কি বলে!" তারিণীর মা বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি রে।" তারিণী গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজ থেকে আমি পৃথক হলেম। তোমার ওখানে আর খাব না।" তারিণীর মার চোখের জল তখনও শুকায় নাই, বুক ফাটা চোখের জল লইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, "কেন, বাবা"?

তারিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন নাকি আবার বলে দিতে হবে? যাও, আমার বিয়ের যা জিনিষ পত্র আছে, সে সব এখনি বের ক'রে দাও। আজ থেকে আমি পৃথক।" আর কারও কথার অপেক্ষামাত্র না করিয়া তারিণী ঘরে ঢুকিল। তারিণীর মা কাঁদিয়া বলিল, "ওরে, তারিণী অবিচার করিস্ নে বাপ, বউয়ের কথাই কি সব শুনবি, মার কথা কি কিছুই শুনবিনে? আজকের মত খেয়ে যা, কাল থেকে না হয় আর খাস্‌নে। "তারিণী ভিতর হইতে বলিল, "যাও, ঘ্যান ঘ্যান, করো না?"

অভুক্ত অবস্থায় বুড়া বুড়ী কাঁদিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে জাগিয়া তারিণীর বাপ শুনিতে পাইল, পুত্র ও পুত্রবধূর কলহাস্য, বাসনের ঝন ঝনানি। বুড়া মনে করিল গিন্নি জাগিয়া নাই ত? আমার প্রাণে সব সয়। সে যে স্ত্রীলোক।" তারিণীর মা তখন টিয়া পাখীর স্বপ্ন দেখিতেছে, আর সেই কোলের ছেলে আসিয়া যেন বলিতেছে, 'মা' এই নাও আর একটি টিয়াপাখী, আর তুমি কেঁদ না।" টিয়াপাখী মনে করিয়া তারিণীর বাপের হাতখানা তারিণীর মা বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল।

(৪)

এমনি দুঃখেই দুই বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, তারিণী স্ত্রী লইয়া বেশ সুখেই কাল হরণ করিতেছিল। ইতি মধ্যে তারিণীর একটি পুত্রও হইয়াছে। সে একপা আধপা হাটিতে পারে, দুটী একটী আধ আধ কথাও বলে।

তারিণীর পিতার অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধ এখন আর কাপড় বুনিতে পারে না, বৃদ্ধাও আর ধান ভানিয়া দুপয়সা সাশ্রয় করিতে অক্ষম। বৃদ্ধ চলৎশক্তিহীন হইয়াছে। ঘরে বসিয়া নিষ্কর্ম্মা জীবন বহন করিতে যখন একান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল, বিধাতা তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া আর একবার হাসিলেন, আর তারিণীর ছেলে হইল। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ বৃদ্ধ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বৃদ্ধের সংসার আর চলে না। তাহারা দুই জনে যে দিন অভুক্ত থাকে, তারিণীর ঘরে সে দিন মহা ধুম! এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন সেই টিয়াপাখীটি জল না পাইয়া মারা গিয়াছিল, গত বৎসরও তারিণীর মা সেই দিন সেই খাঁচার বাটীতে জল দিয়া শূন্য খাঁচা দর্শনে চোখের জল মুছিয়াছিল। আজ সেই দিন। তারিণীর মা ভাবিল, "না আর কাঁদিব না, তারিণীর ছেলের অকল্যাণ হইবে। তারিণীর পৃথক হওয়ার কথাও ধীরে ধীরে অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তারিণীর মা আসিয়া ছেলে কোলে লইল।

ছেলে তারিণীর মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "দাদু—দি-দি। তারিণীর মা সে সুন্দর মুখে চুমো খাইল।

কোথা হইতে ঝড়ের ন্যায় নিত্যকালী ছুটিয়া আসিয়া তারিণীর মার কোল হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "ডাইনি বুড়ি, শুকনো মুখে আমার ছেলে নিলে, ছেলের আমার হাড় মাস খেয়ে ফেলবে," বলিয়া ছেলে লইয়া ঘরে উঠিয়া গেল। তারিণীর মা দাঁড়াইয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল। ঘরে সেদিন একমুঠা চালও ছিল না।

(৫)

বৈকালে তারিণী বাড়ী আসিয়া দেখিল ছেলে ঘুমাইতেছে। তাহার মাথায় হাতদিয়া তারিণী আঁৎকাইয়া উঠিল। বউ নানা ছাঁদে শুকনো মুখে ডাইনি বুড়ী ঝেলে কোলে লইয়াছিল, তাই ছেলের গা গরম হইয়াছে,

এই মত সব কত কথা বলিল। ক্রমেই ছেলের গা বেশী গরম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর তারিণী ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া ভরসা দিয়া গেল বটে, কিন্তু রাত্রি গোটা বারর মধ্যেই মার কোলে শিশু চির কালের তরে শয়ন করিল। তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিল। তারিণীর চীৎকারে বুড়া বুড়ী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারিণী দৌড়িয়া আসিয়া একহাত বাপের পায়ের উপর রাখিয়া আর একহাত মায়ের পায়ে রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বল—একবার বল কি পাপে আজ আমার এই শাস্তি হ'ল?"

বৃদ্ধ অট্ট হাস্য করিয়া বলিল, "আমাকে কষ্ট দেওয়াই তোর এ শাস্তির মূল, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কিন্তু এ শাস্তি তোর ভগবানের হাত দিয়েই এসেছে তারিণী, আমার হাত দিয়ে আসেনি।

তারিণীর মা ছেলের শোকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

শমন-দূত

[দরবেশ।]

শমন-দূতের ভয় দেখায়ে
যে সব মহাশয়,
অন্তিমে সান্ত্বনা লাগি
তোমায় ভজতে কয়;
তাদের ভয়াল সঙ্গ হতে
চালাও মোরে ভিন্ন পথে,
তোমার সনে লাভের হিসাব
যেন আমার নয়।
নরক ভয়ে পাতক হতে
দূরে সরে' যাওয়া,—
তার চেয়ে যে অনেক ভাল
পাপের ভরা বওয়া।

ঘুচাও আমার সকল গরজ,
চিত্ত কর সরল সহজ,
পাপে পুণ্যে ভিতর বাহির
সমান যেন রয়।

বেদনার দান

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

জীব, এই জগতে তাহার স্থান করিয়া লইবার জন্য যে ভয়ঙ্কর মূল্য দিয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, 'এই কি প্রেমময় ভগবানের প্রেমের রাজ্য? যেখানে বড় ছোটকে, ছোট বড়কে, সবল দুর্ব্বলকে, দুর্ব্বল সবলকে, সর্ব্বদাই তাড়া করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, সেখানে প্রেমের স্থান কোথায়? জীবের ক্রমবিকাশের সমস্ত পথটাই যে একটা অফুরন্ত শ্মশানের উপর দিয়া।'

জীব আপনাকে আপনি হত্যা করিয়া এই জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এই খাওয়াখায়ি, এই মারামারি এই মৃত্যুলীলা এমনি ভয়ঙ্কর সত্য, যে, কি ভক্ত কি অভক্ত কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান কাহারও চক্ষু হইতে ইহা এড়ায় না। যে কিছুই জানে না, সেও জানে যে তাহাকে মরিতে হইবে, এবং যতদিন সে পরের ভক্ষ্য না হয়, ততদিন তাহাকে অপর জীবদেহ —তা সে শাকই হউক আর শকুনই হউক—আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিতে হইবে।

সংসার যেন ছিন্নমস্তা! সে আপন রুধির পান করিয়া আপনি নৃত্য করিতেছে এবং এইটাই আশ্চর্য্য যে, এই শ্মশানের মধ্যেও সে সুখে আছে—আপন সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর বা স্বয়ংই আপন মৃত্যুতত্ত্বরূপে দাঁড়াইয়া নিজেই যেন আনন্দিত! তাহার জন্ম লওয়ার এবং বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টার অন্ত নেই, অথচ এই বিশ্বজীবনরূপ প্রকাণ্ড পিরামিডটা যে তাহারই অসংখ্য দেহের স্তূপ, এ কথাও তার যেন মনেই থাকে না। পরকে মারিয়াই হউক আর যেমন করিয়াই হউক মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া কোন গতিকে জগতে টিঁকিয়া থাকার চেষ্টা প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান এবং ইহাই যেন তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য—অথচ মৃত্যুও অনিবার্য্য, সে আসিবেই। সমস্ত জীব-জগৎই যেন হু হু করিয়া

মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—ফুল ফলের দিকে, ফল মাটির রসের দিকে, রসপূর্ণ ফল বৃক্ষের দিকে, বৃক্ষ আবার ফুল হইতে ফলের দিকে ছুটিয়াছে'—সবই মরণ-পথের যাত্রী। জীবের নিজের দেহের বিষয়ই যদি সে ভাবিয়া দেখে তাহা হইলেও সে দেখিবে, যে, সে কত জীবকোষকে আত্মসাৎ করিয়া এমন কি তাহাদিগকে তাল পাকাইয়া লইয়া আপনার অস্তিত্বের ইমারৎ খাড়া করিয়াছে। তাহার সারাদেহময় কি বিরাট মরণ-লীলা চলিয়াছে। তাহার দেহই একটা জীবন্ত শ্মশান অথবা মৃত্যুময় জীবনলীলার ক্ষেত্র!

মানুষের সভ্যতা রাষ্ট্র সমাজ তাহার সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সমস্তই যে কেবলি এক একটা সৃষ্টির ধারা তাহা নহে।

ইহাদের সমস্ত ইতিহাসটাই এক একটা ধ্বংসের লীলা। এক একটা রাষ্ট্র বা সভ্যতা বা সাম্রাজ্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাষ্ট্র বা সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এক যুগের সাহিত্য অপর যুগের সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া জন্মিয়াছে। এক যুগের বা দেশের ললিতকলা শিল্পবাণিজ্য সমস্তই অপর যুগের বা দেশের কলা শিল্পাদিকে কখনো বা ধ্বংস করিয়া কখনো বা আত্মসাৎ করিয়া আপনার গোড়াপত্তন করিয়াছে। এক যুগের দর্শন বিজ্ঞান অপর যুগের বা দেশের দর্শন বিজ্ঞানের ধ্বংসের ফল। এইভাবে দেখিলে মানবের সমস্ত ইতিহাসই একটা ধ্বংসাত্মক সৃষ্টির খেলা মাত্র। গ্রীসের সর্ব্ববিধ ধ্বংসের উপর রোমান জগতের রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা, আবার এই গ্রিকো-রোমান জগতের শেষ আশ্রয় কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল যখন পঞ্চদশ শতাব্দিতে তুর্কের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন সেই অটোম্যান আক্রমণের ঝড়ের মুখে ইউরোপের দিকে দিকে পলায়মান গ্রিকো-রোমান বিবুধগণের কোলাহলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বীজ ছড়াইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয়ের ডিমোক্রাটিক রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাহিত্যও ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসতাণ্ডবের মধ্যে এবং ঐ ফরাসী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মূল Stoic দের State of Nature এর ধারণার মধ্য দিয়া Platoর Republic পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপে দেখিলে মানুষের যাহা কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম ধ্যান ধারণার ফল এতাবৎ পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে সমস্তই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীকে আত্মসাৎ করিয়া বা ধ্বংস করিয়া! কালের ধ্বংসশীলতার মধ্যেই তাহার সৃষ্টিশীলতা লুকাইয়া রহিয়াছে। ধ্বংসই তাহার প্রাক্‌ভাব—সৃষ্টি তাহার উত্তর ভাব মাত্র।

এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধের উপরই যেন জীব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ফল শষ্য যে জীবের খাদ্য সেই জীব আবার মাংসভোজী জীবের ভক্ষ্য। আবার সমস্ত জীব-দেহই জীবাণুর—রোগজীবাণুর ভক্ষ্য! যে জীবাণুতে দেহ গঠিত সেই জীবাণুতেই দেহের পরিসমাপ্তি! এখানে প্রেমের, স্নেহ মমতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যেন মৃতদেহের উপর স্রক্‌চন্দন দানের মত বিসদৃশ!

আমার মনে হয় যে বিশ্বের এই আপনাকে আপনি আত্মসাৎ করিয়া আপনার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে যাঁহারা স্বপুচ্ছ-ভক্ষণ-শীল সর্পের মূর্ত্তির দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠিকই করিয়াছিলেন। জানি না, হয়ত তন্ত্রের ছিন্নমস্তার পরিকল্পনাও এই কারণ হইতে এবং এইরূপে দশ মহাবিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যাই হয়ত এই বিশ্বকে এক এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া পরিকল্পিত।

ও কথা যাউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই, যে, 'মানুষের মধ্যে তাহার জীবত্ব এই সার্ব্বজৈবিক আত্মঘাতের মধ্যে দিয়া কি ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কি ভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছে, কতখানি জীবধর্ম্ম হইতে শিব ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছে!'

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যদি প্রশ্ন উঠে, যে, মানুষ যে সত্যই সভ্যতার পথে শিবত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহারই বা স্থির নিশ্চয়তা কৈ? তাহা হইলে গোল বাধিবে। কারণ মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান শিবত্ব, বা তাহার আত্মার ক্রম-বিকাশশীলতাকেই যদি প্রারম্ভেই সন্দেহ করিয়া বসে তাহা হইলে এই প্রবন্ধের অন্যান্য কথা তুলিবার আর অবসরই থাকে না। সেই জন্য আমি এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি, যে, জীবের জীবত্বের একটা স্বাভাবিক গতি আছে। তাহার অস্তিত্ব কেবল একটা স্থিতিশীল অস্তিত্ব নয়—গতিশীল অস্তিত্ব এবং এই গতি শিবত্বেরই দিকে অথবা শিবত্বকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে।

এই গতি চক্রবৎ কিম্বা সরল রৈখিক কিম্বা একসঙ্গে দুই প্রকারেই, ইহা লইয়া অধিক বাকজাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সামান্য দুচার কথা বলিয়া মূল কথার অবতারণা করিব। জীবত্বের যে একটা গতি আছে ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। হয়ত সংসারচক্র এক এক সময়ে এক একটা কেন্দ্রের

চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে অথচ পৃথিবীর ন্যায় আপন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিবার জন্য বৃহত্তর রেখা অঙ্কিত করিয়া বৃহত্তর বৃত্তে ঘুরিতেছে। অথবা হয়ত ইস্ক্রুপের পেচের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগতই উপরের দিকে উঠিতেছে। সেই বৃত্তগতি আপাততঃ সম্মুখগতি মাত্র বলিয়া ধরিয়া লইলেই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

জীবের এবং সেই সঙ্গে মানুষের জীবনের গতিশীলতা বিশেষতঃ উন্নতিশীলতা সম্বন্ধে তখনই সন্দেহ উপস্থিত হয় যখন আমাদের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ রাখি। চলন্ত যানে চড়িয়া যদি আমাদের দৃষ্টি ক্রমাগত কোন বহুদূরস্থিত বস্তুর উপর নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে আমরা যে চলিতেছি সে বিষয়ে উপলব্ধি আমাদের প্রায় হয় না বলিলেই চলে। আমাদের গতির বিষয়ে সচেতন হইতে হইলে নিকটস্থ স্থির বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন এবং বিশেষতঃ আমরা যে পথ অতিক্রম করিয়াছি সেই পথটার কথা স্মরণ করার প্রয়োজন।

জীবের ক্রমবিকাশতত্ত্ব আলোচনা করিলে এক-কোটী জীব হইতে বহু-কোটী জীবের বিকাশ যেমন একটা জীবনের গতিশীলতার প্রমাণ বলিয়া ধরিতে পারা যায় তেমনি অধঃস্তন অদণ্ডী-জীব (molusca) হইতে মেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী জীব হইতে পূর্ণমস্তিষ্কবান মানবের ক্রমবিকাশও এই জীবনগতিরই একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া ধরিতে পারি। তাহার পর প্রাগৈতিহাসিক মানব হইতে ঐতিহাসিক মানবের দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের মধ্যে যে মহা-ব্যবধান ঘটিয়াছে তাহাও কি এই গতিশীল প্রাণের অদ্ভুত বিকাশ নয়?

অপিচ এই জীবদেহের সমত্ব ও সাধর্ম্ম্য homogeniety হইতে বিষম ও বহুজাতীয় heterogeneous হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার একমাত্র স্থূল স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে সূক্ষ্মানুভূতিময় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ ইহাও সেই বহুত্বাভিমুখী প্রাণশক্তির সদাগতিত্বেরই পরিচয় নহে কি?

জীবের প্রাণশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে একটা অপূর্ব্ব বস্তুর বিকাশ দেখা যায় সেটাই বা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। simple (সহজ) প্রাণ যতই complexityর (জটিলতা) দিকে যাইতেছে ততই দেখিতে পাই মন নামক একটী অপূর্ব্ব পদার্থ সেই প্রাণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছে।

প্রাণের সঙ্গে মনের বিকাশও গতিশীল। সেও simple হইতে

complexityর দিকে ছুটিয়াছে। আত্মরক্ষার সহজ চেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া সুখোম্বেষণের বহুমুখী চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আপনাকে ছাড়াইয়া পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টার অভিব্যক্তির আলোচনা করিলে প্রাণের সঙ্গে মনের গতিশীলতা সুস্পষ্টভাবে ধরিতে পারা যায়।

কিন্তু এই গতিশীলতার পরিমাণ কোনো প্রকার গণিতশাস্ত্রের নিয়মের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ধরা দেয় নাই এবং ধরা দিবার কোনো লক্ষণও এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। কারণ এই গতি একসঙ্গে সৃষ্টিশীল ও স্থিতিশীল। এই সৃষ্টির শক্তি ও বৃদ্ধির শক্তি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা বলিবার জো নাই; অথচ দেখিতে পাইতেছি, প্রাণশক্তি ক্রমাগত নানা আকারে ও বর্দ্ধিত বেগে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই জন্য ফরাশী দার্শনিক Burgson এই প্রাণের ক্রমবিকাশকে creative evolution বা সৃষ্টিশীল ক্রমবিকাশ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। যাহা ছিল না তাহাই হইতেছে অথচ তাহারই মধ্যে সেই পুরাতনও রহিয়া যাইতেছে, -ইহাই এই প্রাণশক্তির গতিশীলতার প্রকৃতি।

বিশ্বচিত্তের ক্রমবিকাশের মধ্যেও এই সৃষ্টিশীলতার সহিত স্থিতিশীলতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই আছে। আদিম মানব মনের মধ্যে যে সমস্ত দোষগুণ ছিল, সেই সমস্তই সভ্য মানব মনের মধ্যে নূতন আকারে—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে রহিয়া গিয়াছে।

তার পর মানবের মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাজ ও ইতিহাসের ক্রমবিকাশও এই সৃষ্টিশীল গতির অপূর্ব্ব নিদর্শন। আদিম মানব সমাজ যে ভাবে গঠিত চালিত ও শাসিত হইত তাহার সহিত বর্ত্তমান মানবের সমাজের আকৃতি প্রকৃতির তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় মানব-মনের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে তাহার সমাজ যুগে যুগে কত না অপূর্ব্ব আকারে দেখা দিয়াছে। অথচ প্রত্যেক পরবর্ত্তী অবস্থার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আপনাকে সম্পূর্ণ লোপ না করিয়াও লুপ্ত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন হিন্দু আধুনিক হিন্দুর মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে অথচ সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করিয়াও পূর্ণভাবে রহিয়াছে। তেমনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমানের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে আত্মলোপ করিতে পারে নাই, পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান।

বাহ্য জগতের অস্তিত্ব দেশে এবং কালে, সেই জন্য সমস্ত বস্তুই এক সঙ্গে স্থিতিশীল ও গতিশীল। প্রাণের অস্তিত্বও এইরূপ দ্ব্যাত্মক—সেও একসঙ্গে

স্থিতিশীল ও গতিশীল। দেশের দিক হইতে সে স্থিতিশীল ও কালের দিক হইতে সে গতিশীল।

প্রাণের এই গতিশীল দিকটার মধ্যেই তাহার সৃষ্টিশীলতা ও মরণ-শীলতা এক সঙ্গেই বর্ত্তমান। কিন্তু আমরা যখনই প্রাণের কথা ভাবিতে বসি তখনি তাহার মাত্র একটা দিকই আমাদের চক্ষে ঠেকে, এবং সে দিকটা হইতেছে বিশেষ ভাবে তাহার মরণশীলতা। অথচ প্রাণ ত' কেবল মাত্র মরণশীল নয়—সে যে এক সঙ্গে সৃষ্টিশীল স্থিতিশীল ও মরণশীল। বলিতে গেলে এই তিনটীই তাহার প্রকৃতি, নহিলে সে প্রাণই নয়। ইহার একটাকে বাদ দিলে প্রাণের প্রাণত্বই থাকে কি না সন্দেহ।

ত্রিভুজের একটা ভুজ বাদ দিলে যেমন তাহা আর ত্রিভুজের কোনো গুণই দেখাইতে পারে না, তেমনি এই তিনগুণের সমবায়েই জীবন, নহিলে সে অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু জীবন নাম আর তার দেওয়া চলে না।

আমি এই প্রবন্ধে ভগবানের বিশ্বতত্ত্বের মঙ্গলময়ত্বের ওকালতি করিতে বসি নাই। জীবের অনন্ত জীবন হইলে ভাল হইত কি মন্দ হইত, তাহা লইয়া অলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিশ্বতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করিতে হইলে নির্ভয়ে সমস্ত সত্যটাকে মুখামুখি করিয়া দেখিয়া লওয়ার প্রয়োজন। সত্য যে সব সময় সুন্দর হইবে বা মনোরম হইবে এরূপ সত্যবদ্ধ হইয়া সে আপনাকে প্রকাশিত করিতে আসে না। এবং বিশ্বের সমস্ত সত্যানুসন্ধীই জানেন, যে, সত্যকে নির্ভয়ে মুখামুখী দেখা এবং স্বীকার করাই আত্মার পক্ষে মঙ্গলের।

প্রাণ বস্তুটা একান্তই ত্রিগুণাত্মক, সে হয়, সে থাকে এবং সে যায়। যখন সৃষ্টির দিক হইতে দেখি তখন দেখি, সে ক্রমাগতই হইতে হইতেই চলিয়াছে।

> চির জীবন হ'তে হতেই চলা
> আমার মাঝে শুধুই 'হওয়ার' মেলা।
> এ মেলা যে কেবল বেড়ে চলে,
> নূতন এসে জোটে দলে দলে।
> ....
> পল-অনুপল-বাঁধন-বাধা-হারা,
> আমার 'সময়' কেবল হওয়ার ধারা।

নাইক' অতীত, নাইরে অনাগত,
হওয়া শুধু বর্ত্তমানের স্রোত।
(চিরন্তনী। ১ অঙ্ক—২ গর্ভাঙ্ক।)

আবার যখন 'লয়ের' দিক হইতে দেখি, তখন অনুভব হয়, সমস্ত জগৎই একটা অফুরন্ত 'ঝড়ে-পড়ার' কাঁদুনিতে ভরা। যেখানে মনে হইতেছে সৃষ্টি হইতেছে, সেইখানেই দেখিতে পাই যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যাহা ছিল তাহা মরিয়াছে। সেই মৃতদেহের উপর, শবের উপর, যে দাঁড়াইয়া আছে সেও মরণধর্ম্মী! তাহার ক্ষণিক নৃত্য ক্ষণিকে স্থিতি তাহার পদতলস্থ শবকে ভুলাইতে পারে না! এই ভাবে ক্রমাগত অতীতগামী কালের দিক হইতে জগৎকে একটা মহাশ্মশান ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তখন সমস্ত বর্ত্তমান, সমস্ত ভবিষ্যৎ অতীতের ছায়ালোকে মিলাইয়া যায়, তখন জগতের সমস্ত শোভা গন্ধ আনন্দ লুপ্ত হইয়া একটা বিরাট কুয়াশার ছায়া আসিয়া পড়ে এবং তাহার উপর জাগিয়া উঠে হিমের গান।—

ছায়ালোক মেঘে ঢাকা—
আলোকও আঁধারে মাখা;
'কোথা প্রাণ?'—'কোথা প্রাণ?'
হাহাকার জাগে একা!
(চিরন্তনী। ৬ষ্ঠ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

কিন্তু এইরূপে দুই দিক হইতে দেখিলে এই বিশ্ব প্রধানতঃ দ্বিরূপীর মতই মনে হইবে। কিন্তু মানবের ত' কেবল দুইটী মাত্র চক্ষু নয়—তাহার আরও একটী চক্ষু আছে। সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্মুখে যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে তাহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্মুখে যে মূর্ত্তি দেখা দেয় তাহাই তাহার পরমরূপ। কারণ সেই চক্ষুতে জগতের বহুরূপ, সরলরূপটীও পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে ইহার অচলরূপটী প্রতিভাত হয়। যে অচপল জ্যোতিতে এই সমস্ত সচলত্ব, এই চিরন্তনী লীলা-নাটক প্রকাশিত হয়, সেই অচপল জ্যোতির দিক হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রাতিভাসিক বিশ্বমূর্ত্তির যাহা তৃতীয় পাদ, তাহাই ইহার পরম অস্তিত্ব এবং সেই তৃতীয় পাদই—সেই অচল পরম পদই ইহার প্রাতিভাসিক ক্ষণিক অস্তিত্বরূপে

জগতে প্রতীয়মান। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে করুন, প্রদীপটী জলিতেছে। এখন আমরা বলিতে পারি, (১) ঐ আলোক একটী ধারাবাহিক সৃষ্টির মালা। (২) আবার ইহাও বলিতে পারি, যে, উহা একটি ধারাবাহিক মৃত্যুর মালা কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে তৈলটুকু পুড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। (৩) আবার যদি ইচ্ছা করি ত বলিতে পারি, এই দুই দৃষ্টিতে লয়কে ধরিয়া শিখাটুকু একটী অখণ্ড অস্তিত্ব লইয়া আছে। শিখার অস্তিত্বের বা স্থিতির মধ্যে ঐ তৈলের লয় এবং আলোকের সৃষ্টি। আলোক আপনাকে এবং সেই সঙ্গে জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে ঐ ধারাবাহিক লয় ও সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া।

এই বিশ্বের স্থিতি এবং প্রকাশও এই উপমায় বলিতে পারি ত্রিগুণাত্মক। সে এক সঙ্গে সৃষ্টি লয় ও স্থিতি। অথবা তাহার স্থিতি এবং প্রকাশ,—সৃষ্টিলয়াত্মক। আপনাকে এবং সেই সঙ্গে অপরকে প্রকাশ করিতে হইলেই আপনাকে ধ্বংসের মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিতেই হইবে, ইহাই যেন প্রকাশের একমাত্র নিয়ম।

এ নিয়ম কেন হইল, কে করিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু ইহাই ইহার স্বরূপ। অথচ এই পরম সত্যই সব চাইতে গুপ্ত—'গুহাহিতং'। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'ত্রিপাদস্য দিবি'। ইহার অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বের ত্রিপাদই গুপ্ত,—একপাদ মাত্র প্রকাশিত। অথচ এই প্রকাশমান একপাদের মধ্যেও সেই বিষ্ণোঃ পরমং সেই অচ্যুতের তৃতীয় পদ অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই অচলং প্রতিষ্ঠং যে পদ তাহাই বিশ্বে ক্ষণিক স্থিতিরূপে প্রকাশিত।

কিন্তু এমনি আমাদের মনের গঠন, যে, ঐ লয়টার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। কেন যে পড়ে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পড়ে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই মৃত্যুর আঘাত হইতে যে সব উপরি লাভ হইয়া থাকে তাহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধি। প্রথম লাভটা এই, যে, এই মৃত্যু হইতেই নবীন জন্ম। দ্বিতীয় লাভটা আরও সূক্ষ্ম ধরণের অথচ মহান। এই মৃত্যুর ভয় ও আঘাত হইতে যে ধারাবাহিক বেদনা জাগে তাহাই জীবের চৈতন্যের একটা কারণ। ক্রমাগত সুখের মধ্যে শান্তির মধ্যে থাকিলে দেখা যায় আত্মা যেন ঘুমাইয়া পড়েন। সেই কারণেই তাহার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে জাগাইয়া এবং সদা চঞ্চল করিয়া রাখিবার জন্যই যেন এই মৃত্যুরূপ ধ্বংসরূপ প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন। তাই বোধ হয় প্রাণ আপনাকে জাগাইয়া রাখিবার

জন্য আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ক্রমাগতই বেদনার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে যেন প্রতি মুহূর্ত্তের লয়ের ব্যথাকে সৃষ্টির সুখে পরিণত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রচণ্ডগতির কারণই হইতেছে ঐ মৃত্যুর বেদনার তাড়না। প্রতি মুহূর্ত্তের শবের উপর দিয়া এই প্রকাশময়ী শিবাদেবী নাচিয়া চলিয়াছেন। এবং তাঁহার এই প্রচণ্ড চাঞ্চল্যই তাঁহার প্রকাশের কারণ,—চিন্ময়ীত্বের নিদর্শন।

ঋগ্বেদের সৃষ্টি সূক্তে (অঘমর্ষণ সূক্তে) ঋষি বলিতেছেন, "ঋতং চ সত্যং চাভিদ্ধাত্যপাসোধ্যজায়তঃ" প্রজ্বলিত তপঃ হইতে ঋত এবং সত্য জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ জগতের বিধিও শৃঙ্খলার আবির্ভাবের কারণই হইতেছে প্রজ্বলিত তপঃ। সেই আদিম তপঃ বা তাপই পরবর্ত্তী সমস্ত খণ্ড বা অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে। এই তাপ বা heatই জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং লয়-তত্ত্বের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশ তত্ত্বরূপে রহিয়া গিয়াছে।

মনুও বলিয়াছেন, যে, আদিতে সমস্তই তমোভূত হইয়া সমস্তই অপ্রতর্ক্য এবং অতীন্দ্রিয় অবস্থায় ছিল। তারপর সেই আদিম তপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দিবা ও রাত্রি আলোক ও রাত্রির বিভাগ দেখা দেয়। মনু স্বয়ংও সুদুশ্চর তপস্যার দ্বারা দশজন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির পত্তন করিয়াছিলেন। অতএব সৃষ্টির আদি তত্ত্বই হইতেছে তপঃ বা তাপ। সেই আদিম তাপরূপ বেদনা হইতেই জগতের প্রকাশ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখিতে পাই, ব্রহ্মা আপনাকে অশ্বরূপে পরিকল্পনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে বলি দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মৃত্যুর বেদনাই ব্রহ্মের জগৎরূপ প্রকাশের উপায় হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই একটা বিকীরণশীলতায় radio activityর দ্বারাই অর্থাৎ তপের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা যেন স্বপ্রকাশক সূর্য্যস্বরূপ; তাঁহার প্রকাশ যতই স্ফুটতর হয় ততই তাঁহার প্রকাশিত জগৎও আপনাকে প্রকাশ করে। বিশ্বের আত্ম-প্রকাশের অন্য উপায় বিশ্বাত্মা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যাত্মক প্রকাশ কি বাস্তবিকই মৃত্যুরই লীলা, অনস্তিত্বেরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র? মোটেই নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টা। ইহাই তাহার দীপ-শিখার ন্যায় অস্তিত্ব, ইহাই জগতের প্রকাশাত্মক সদাচঞ্চল অস্তিত্ব। এই

চঞ্চলত্ব, এই তপাত্মক প্রকাশই তাহার চির অস্তিত্বের দ্যোতক, নহিলে তমোময় অপ্রকাশের মধ্যে যদি জগৎকে পড়িয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে তাহার বিষয় অস্তি নাস্তি কিছুই বলা যাইতে পারিত না।

কিন্তু চাঞ্চল্যাত্মক প্রকাশকে লাভ করিবার জন্য জগৎকে বিশেষতঃ জীব জগৎকে যে দাম দিতে হইয়াছে তাহার বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে—"এত বেদনা সহ্য করিয়া, এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া জীবের কতটুকু লাভ হইয়াছে? তুমি দার্শনিক, তুমি হয়ত বলিবে এমনি করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া আগুণে পুড়াইয়া আত্মা এই জগৎকে তাঁহার বাসের ও প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন।' কিন্তু আমার মন যে তাহাতে শান্ত হয় না। আমার যাহা কোটী কোটী যুগে কোটী কোটী জন্মে হারাইতে হইয়াছে তাহার সমস্তই যে আজ স্মৃতিতে জমা হইয়া বসিয়া আছে—আমি যে সেই সব-হারাণ ধনদের কিছুতেই পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ভোলানাথ হইয়া বসিতে পারিতেছি না। তুমি নিষ্ঠুর জ্ঞানী, তোমার পক্ষে সুখও একটা ক্ষণিকের অনুভূতি মাত্র দুঃখও তাই, কিন্তু আমার পক্ষে যে তাহা নয়, মোটেই নয়। আমার যে অশ্রু থামে না। আমি যে আমার ভ্রূণ জন্ম হইতে, এককোষী অবস্থা হইতে এই সভ্য নরজন্ম পর্য্যন্ত যাহা কিছু হারাইয়াছি যাহা কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, সেই সমস্ত হারাণ বস্তুর চাপে আমার প্রাণ যে ফাট ফাট হইয়া উঠিয়াছে! এই যে সেদিন জ্ঞানী এবং সভ্য মানুষ তাহার আদিম পশুত্বের পূর্ণলীলা দেখাইয়া ৭ বৎসর ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের গলা কাটাকাটী করিল, ইহা হইতে তাহার কতটুকু লাভ হইল? যে লাভ, যেটুকু জ্ঞান সে ইহা হইতে লাভ করিল তাহা তাহার লোকসানের হিসাবে কত অকিঞ্চিৎকর! আর শুধু জ্ঞান লইয়া কি ধুইয়া খাইব যদি সে আমার প্রাণের কান্না না একটুও থামাইতে পারে? কি হইবে দর্শন লইয়া, কি হইবে বিজ্ঞান লইয়া কি হইবে ধর্ম্ম লইয়া যদি না সে মানুষের সেই আদিম ক্ষুধা সেই ভালবাসার ক্ষুধা মিটাইতে পারে?"

জ্ঞানী একথার কি উত্তর দিবেন জানি না, কিন্তু সকলকেই ইহার একটা না একটা উত্তর দিতেই হইবে। জীবনের মধ্যে এই অনাদি প্রশ্নের উত্তর না দিলে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের বোঝা পড়া করা হয় না। তাই এ প্রশ্নের যাহা উত্তর আমি আমার মনকে দিয়াছি তাহাই এখানে দিতেছি।

জ্ঞানী হয়ত বলিবেন, যে, 'এই দুঃখ একটা মায়া একটা অনাদি মিথ্যা।

জগতের সুখও মিথ্যা দুঃখও মিথ্যা, এই দুঃখের হাত হইতে যদি মুক্তি চাও ত' জগতের ক্ষণিকের সুখকেও বিসর্জ্জন দাও। তাহা হইলেই এই অনাদি ক্রন্দন থামিবে; কারণ দুঃখ হইতেছে সুখের অপর পীঠ। মিলনের সুখকে লইতে হইলেই বিরহের দুঃখকে লইতে হইবে, আলো লইতে হইলে অন্ধকারকে লইতে হইবে, নহিলে আলোর অনুভূতি বা সুখের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু এ উত্তরে প্রাণের কান্না থামে কি? এ যেন কতকটা আব্দারে ছেলের মত উত্তর। শিশু বলিল "আমার এই চাই, কেবল এইটাই চাই, আর কিছু চাই না,—ইহা যদি না দাও ত' আমি কাঁদিব।" মা তাহাকে বলিলেন, "ইহা যদি লও ত', এই আর একটিকেও লইতে হইবে; পুতুল যদি লও, ত' সেটা হারাইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার দুঃখকেও লইতে হইবে।" শিশু যদি অমনি মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া উত্তর দিতে পারে, "যাও তবে আমি কিছুই চাই না, তোমার সুখও চাই না দুঃখও চাই না, তাহা হইলে সে পাকা ছেলে হইবে, জ্ঞানী আখ্যা পাইবে।

এ রকম পাকা শিশু জগতে অনেকই দেখা দিয়াছেন। সেই সব বৃদ্ধ শিশুদের পায়ে প্রণাম করিয়া আমি আমার বক্তব্যটাও বলিতেছি।

আমি বলিতে চাই, ওগো আমার চিরক্রন্দনশীল প্রাণ, তোমার এই ক্রন্দনই অক্ষয় হোক। কারণ এই ক্রন্দনই, এই ব্যথা সহিবার ক্ষমতাই তোমার ভালবাসার কারণ, তোমার স্নেহশীলতার লক্ষণ, তোমার অনুভূতিময় আত্মার প্রকাশ। ফুল যে সুন্দর, তাহার একমাত্র কারণ এই, যে, সে ফুটিয়া দুদিনের তরে সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া তারপর ঝরিয়া যায়। চিরদিনের তরে রহিবার জন্য আসিলে কোনো বস্তুরই মূল্য থাকে না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার এই ক্ষণিকের অস্তিত্বের ফলেই আমাদের হারাণধনগুলি অন্তরের মধ্যে স্থান পায়, প্রেমের মধ্যে ভালবাসার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়। সেগুলিকে ক্ষণিক চৈতন্যের জগৎ হইতে চিরচৈতন্যের জগতে, আত্মার জগতে, স্থান দিবার জন্য এই মৃত্যুর আঘাত, লয়ের ব্যথার প্রয়োজন।

এই এমন সুজলা সুফল শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি—এমন দেশে এমন রূপ রস শব্দ গন্ধের দেশে জন্মিয়া আমরা প্রকৃতির আদুরে ছেলের মত দেশ মাতৃকাকে যে ভুলিয়া বসিয়া আছি, এই ব্যাপার হইতেই কি প্রমাণ হয় না, যে, অতি আদরে আত্মা ঘুমাইয়া পড়েন? আর যে সব দেশে প্রকৃতির উপর জোর জারী করিয়া মারপিট করিয়া ছেলেদের বাঁচিতে হয়, তাহাদের দেশপ্রীতির

বষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে কি বুঝিতে পারি না, যে, যাহারা চিরজীবন ক্ষণিকের গান গাহিয়া—

"যা ফুরায় দেরে ফুরাতে '
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নেক' কুড়াতে"

(রবীন্দ্র—ক্ষণিকের গান)

এই রকম কথা বলিয়া গায়ে হাওয়া দিয়া বেড়াইতে চায় তাহারা সত্য সত্যই মরণের দিকে ছুটে ? মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা মৃত্যুং তীর্ত্বা অমৃতং অশ্নুতে—মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অমৃত পান করে তাহারাই অমৃতকে পায়, অন্যে নহে। এই যে মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের জন্য যুদ্ধ, ইহাই ত' আত্মার গৌরব, ইহাই ত চিরজাগ্রত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের জন্য প্রাণের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধই নানা আকারে পাপের সহিত পুণ্যের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, দানবের সহিত দেবতার যুদ্ধের আকারে দেখা দিয়া আত্মাকে জাগ্রত করিতেছে। এমন কি ইহাও বলিতে পারি, যে, এই যুদ্ধই আত্মাকে জানাইয়া দিতেছে, যে, সে আছে। নহিলে যদি তিনি চিরদিন সাগর মাঝে ঘুমাইয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বের কি গৌরব থাকিত? যদি থাকিতেই হয় তাহা হইলে সদাজাগ্রত সদাঅস্তিত্বের মহানন্দে থাকাই প্রয়োজন এবং এই আনন্দেই জগৎ আছে, ক্ষণিকের সুখ দুঃখের মধ্যে, লাভ লোকসানের মধ্যে, সমস্তকে অতিক্রম করিয়াই সে আছে এবং সেই থাকাই তাহার গৌরবময় মহান অস্তিত্ব। এইখানেই তাহার জয়, এইখানে দাঁড়াইয়া সে চিৎকার করিয়া বলিতে পারে।—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

এই যে আমি তাঁহাকেই জানিয়াছি যাঁহাকে জানিলে যাঁহাকে অন্তরের মধ্যে আপনার আত্মার মধ্যে স্বীকার করিলে, অমৃতত্বকে পাওয়া যায়। যিনি ছাড়া চলিবার আর পথই নাই, সেই পথেই ত' চিরদিন চলিতেছি, অতএব আমিও অমৃতের পুত্র, আমি ও অভয়-পথের পথিক।'

জীব না জানিয়াও এই পথেই চলিয়াছে কিন্তু তবু সে কাঁদে। কেন কাঁদে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি, যে, এই ক্রন্দন তাহার অনন্ত চৈতন্যের ক্ষণিকের বিকাশ। সে কাঁদে অথচ সেই ক্রন্দনকেই চিরতরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। তাই তাহার Sweetest songs are those that tell of sadest thought; কারণ তাহার চিরক্রন্দনই চিদানন্দময় তাই চিরানন্দময়।

যদি তাহাকে বলা যায়, যে, "ওগো আর তুমি ভালবাসিও না, আর কিছুকে, আর কাহাকেও বুকের মধ্যে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও না, তাহা হইলেই তুমি শান্তিতে থাকিবে,"—সে কথা সে কিছুতেই শুনিবে না। কারণ সে কি আপনাকে হারাইতে চাহিবে? কিছুতেই নয়।

প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে করিতে জীবের বিশেষতঃ মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় সচেতন, তাহার প্রাণ সদা চঞ্চল, তাহার দেহ রোগপ্রবণ তাহার চিত্ত দুঃখপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এখন যদি তাহাকে বলা যায়, 'ওহে আবার গণ্ডারের মত তোমার সমস্ত দেহ মনকে মোটা চামড়ায় ঢাকিয়া দিতেছি, তোমার আর রোগ ভোগ শোক দুঃখ থাকিবে না," তবে সে কি সেই আদিম এবং সহজ সুস্থ পশুত্বকে ফিরাইয়া লইতে চাহিবে? কিছুতেই নয়। সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া বলিবে, "না—না—না, কিছুতেই নয়। তার চাইতে আমায় যত পার আঘাত কর; আমি সহ্য করিতে রাজী আছি।" সে তখন কবি রবির ভাষায় বলিবে—

> "তোমার হাতের বেদনার দান
> এড়ায়ে চাহি না মুকতি,
> দু'খ হবে মোর মাথার মাণিক
> সাথে যদি দাও ভকতি।

এই ভক্তি, এই স্নেহ, এই প্রেমেই জীবের জীবত্বের দুঃখের পরম লাভ। এই অস্তিত্ব-সাগর মন্থন করিয়া অমৃতের সহিত বিষও যদি উঠে তবু সাগরমন্থন চাই—নীলকণ্ঠও যদি হইতে হয় তবু অমৃতকে চাই।

মানবের আত্মা যে দুঃখকেই ভালবাসে, দুঃখকেই ভক্তি করে ইহার প্রমাণ,—তাহার ধর্ম্ম তাহার সাহিত্য তাহার বিজ্ঞান, তাহার সমাজ তাহার রাষ্ট্র তাহার সমস্তই। জগতে যে যত man of sorrows সেই তত ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র। ধর্ম্মের জন্য যিনি যত বেদনা সহিয়াছেন

তিনি ততটাই ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য। জ্ঞানের জন্য যিনি যতটা সহিয়াছেন তিনিই ততখানি জ্ঞানী এবং ততখানি ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। ললিত-কলার জন্য যিনি যতখানি দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন তিনি ততখানি ভালবাসার বস্তু। রাষ্ট্র বল, সমাজ বল, সবতাতেই দেখিতে পাই মানুষ দুঃখীরই সম্মান করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেই ভালবাসিয়া আসিয়াছে। সত্য মিথ্যাতে পরিণত হইতেছে, এ শতাব্দির জ্ঞান অপর শতাব্দির কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতেছে, তবু মানুষ দুঃখের সম্মান করিতে ভুলিতেছে না—মানুষের এই বেদনাময় প্রেমের গতি ঠিক সমান ভাবেই রহিয়া যাইতেছে। এই যে আত্মার জয় ইহাই মানুষের সাহিত্য, ললিত কলা, ধর্ম্ম, জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে ভেরী বাজাইয়া চলিয়াছে।

পিরামীড প্রস্তুত করিতে, অজন্তার গুহা খুঁড়িতে, তাজমহলের পাথর কাটিয়া বহিয়া আনিতে কত লোক প্রাণ দিয়াছে, আগুণে পুড়িয়া রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে তাহার সংবাদটাই কি কেবল বড় হইবে?—আর এই মানবের চিরন্তন আনন্দের আত্মবিকাশ তাহাই ভুলিয়া বসিব? ব্যাধি জরা মৃত্যু না থাকিলে যদি রাজার ছেলে বনে না যায় তাহা হইলে আসুক শত সহস্রবার ব্যাধি জরা মৃত্যু, আসুক জন্ম হইতে জন্মান্তরের দুঃখময় অস্তিত্ব, আমি ঐ একটী মাত্র সর্ব্বত্যাগী প্রেমময় মানুষকে পাইবার জন্য লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিব। আমি একটীমাত্র ক্রুশবিদ্ধ মহাদুঃখিকে দেখিবার জন্য লক্ষ ফারিসীর ইঁট পাটকেল ঝাঁটা লাথি ইন্‌কুইজিসান সেন্‌ট্‌ বার্থলোমিউ ওয়াটালু ভার্ডুন সহ্য করিব। আমি একটীবার গীতা শুনিবার জন্য সহস্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন দুঃশাসনের হাতে প্রাণ দিব; তবু ইঁট পাটকেলের জড় অচেতনত্ব, সুখদুঃখহীন অস্তিত্বকে ফিরিয়া চাহিতে পারিব না। আমি বৃক্ষত্ব হইতে পশুত্ব লাভ করিতে গিয়া যাহা হারাইয়াছি, পশু মানব হইবার জন্য যে দুঃখকে বরণ করিয়াছে পশু-মানব হইতে মহামানব হইতে চলিয়া যে দুঃখ সহ্য করিতেছি তাহার বিনিময়ে যে অবস্থায় আসিদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রত্যর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ সেই অচেতনাবস্থা, অন্ধকার অবস্থা, অস্তিনাস্তিহীন অবস্থা পাইতে চাহিব না।

একখানা মেঘদূতের জন্য শত কালিদাসের অশ্রুজলে জগতের রামগিরী গায়ে ঝরণার মত নামুক, একখানা ডিভাইনা কমেডিয়ার জন্য শত ডাণ্টে সহস্রবার ফ্লোরেন্‌স হইতে নির্ব্বাসিত হউক, লক্ষবার পার্গেটরীর অনন্ত দুঃখের মধ্য

দিয়া কাঁদিয়া ছুটুক, একটীমাত্র রাখালের জন্য সহস্র গোপিকা কোটী বৎসর বৃন্দাবনের ধুলায় গড়াগড়ি যাক, তবু এই সব কাঁদুনির বিনিময়ে অশ্রুহীন দেবত্ব চাহি না,—মানুষ তাহা চাহিবে না, চাহিতে পারে না।

যদি কোন কালেও কোনো যুগেও বিশ্বরাজ্যে স্বর্গরাজ্য না আসে তবু "তোমার রাজ্য আসুক" বলিয়া মানুষ কাঁদিবে, কিন্তু যদি কখনো স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিয়া অশ্রুহীন সুখরাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে ত' অমনি মানুষ তাহা হইতে দুঃখের ফল খাইয়া সেই দুঃখহীন অশ্রুহীন সুখস্বর্গভূমি হইতে বিদায় লইবে—তাহার প্রিয়ার সহিত এক ভ্রমে এক পাপে ডুবিবে", তাহার প্রিয়তমার জন্যই সে চিরদুঃখ চির মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে। ইহাই তাহার প্রেমের গৌরব, ইহাই তাহার চিরচঞ্চল অস্তিত্ব।

মানুষ তাহার এই অনুভূতিময় দেহ পাইয়াছে বেদনা হইতে,—প্রতি-নিয়ত সেই দেহ সহস্র প্রকার রোগবীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তবু সে ইহার বিনিময়ে কুম্ভীরের 'কাঁটামারা অঙ্গ' চাহেনা, গণ্ডারের মত সুস্থ সবল সর্ব্বংসহ দেহ চায় না। চিরদিন নব নব বেদনা সহিয়া সহিয়া তাহার মন কত না সুখের কল্পনা করিতে শিখিয়াছে, কত না সাহিত্য স্থাপত্য সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়া কত না নব নব অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে; সেই সংবেদনশীল মনের বিনিময়ে সে গাছের মত "দিবি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" হইয়া থাকিতে পারিবে না। সে চির দিন ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া তাহার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া আপনারই ভাঙ্গা গড়াকে অনুভব করিতে করিতে চলিতে চায়। ইহাই তাহার দেহের প্রাণের মনের তাহার সমস্ত অস্তিত্বেরই একমাত্র কামনা।

জীবের সমস্ত অস্তিত্বই ভাঙ্গা গড়া। প্রত্যেক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের মধ্যে যে আনবিক ক্রিয়া ঘটে তাহাতে দেহের কোষ সমষ্টির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফলে কিছু না কিছু ক্ষতি প্রতিনিয়তই ঘটিয়াছে। আবার প্রতিনিয়তই সেই ক্ষতি সে পূরণ করিয়া লইতেছে। এই ভাঙ্গাগড়া লইয়া তাহার দৈহিক অস্তিত্ব। এই ভাঙ্গাগড়া এত দ্রুত যে সাত বৎসরের মধ্যে ত তাহার সমস্ত দেহটাই বদলাইয়া নবকলেবরে পরিণত হয়।

তাহার মনের মধ্যেও সেই প্রকার ভাঙ্গা গড়া প্রতিনিয়তই চলিতেছে। সেই জন্য শৈশবের সঙ্গে যৌবনের মনের অনেক পার্থক্য আবার যৌবনের মনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের মনেরও অনেক পার্থক্য। কৈশোরের

মনের যে সমস্ত গুণ ছিল সেই সমস্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া তবে সে যৌবনের মনের গুণগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে এবং সেইরূপে সে যৌবনের মানসিক গুণগুলিকে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বার্দ্ধক্যের বহুদর্শী মনকে লাভ করিতে পায়।

ঠিক এই ভাবে মানুষের নিজহাতে গড়া সমাজ এবং রাষ্ট্র ও শৈশব কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিটী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। যে সময় জাতীয় ইতিহাসে কাব্য ও ললিতকলার আবির্ভাব হয় তখন জাতীয় দেহ মনের যে অবস্থা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা থাকে না। যখন দেহ আর মন প্রকৃতি ও আবেষ্টনীর সঙ্গে সহজে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হয় তখনি বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া সুখে ও সহজে জগতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। আবার ঠিক সেই সময়েই জগতের আপনার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইবার জন্য দর্শনাদি জ্ঞানশাস্ত্রের ও আবির্ভাব ঘটে। গ্রীকদের আমল হইতে এপর্য্যন্ত চিরদিনই তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি গত হিসাবেও এই নিয়ম খাটে, জাতিগত হিসাবেও তাই; এবং বিশ্বমানব হিসাবেও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা প্রথমে কবি এবং কলাবিৎ, এবং তার পর বীর। হোমর হইতে আরম্ভ করিয়া পিণ্ডার পর্য্যন্ত কবির যুগ, ফিডিয়াস প্রভৃতি কলাবিতের যুগ। তারপর সক্রেটিস প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকের যুগ, তারপর আরিষ্টটল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের যুগ।

রোমকেরা প্রথমে বীর, তারপর কবি, তারপর দার্শনিক এবং তারপর সাম্রাজ্যের বিলাসিতা রক্ষার্থ পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক।

ইংরেজ ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতি বর্ত্তমান সমস্ত সভ্য জাতিরই জাতীয় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির মধ্যেও এই রকম একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই।

আবার সমগ্র জগতের বিকাশের মধ্যেও এই নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাই। আদিম paganic পেগানিক যুগকে জগতের কৈশোর বলিতে পারি, তারপর গ্রীক রোমক ও খৃষ্টীয় মধ্যযুগকে বীরত্ব ও কাব্যকলার যুগ বলিতে পারি। তারপর আসিয়াছে দর্শনের ও বিজ্ঞানের যুগ। ইহাকে জগতের বার্দ্ধক্যের যুগ বলা এক হিসাবে অসমীচিন নয়। এই যুগে মানবের দেহ যেমন প্রকৃতি ও আবেষ্টনীর দ্বারা আঘাতের পর আঘাত পাইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে এই জগৎটাকে বাসোপযোগী করিয়া লইতেছে—তেমনি সামাজিক

রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত দার্শনিক মতবাদ, সৃষ্টি করিয়া আপনার সহিত অন্তর ও বাহ্য জগতের সঙ্গে নিত্য নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে, স্থাপিত করিতেছে।

এই মানবের অন্তর্বাহ্যজগতের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে কত সমাজ, কত রাষ্ট্র, কত সাম্রাজ্য, কত দর্শন বিজ্ঞান তরঙ্গের মত উঠিয়া লয় পাইয়াছে তাহার ঠিক নাই। তথাপি এই ভাঙ্গাগড়ার আর শেষই হইল না। হইবে কিনা তাহার ঠিকানা নাই এবং আমার মনে হয়, না হওয়াই এই বিশ্বতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

বিশ্বের আত্মার স্বরূপই বোধ হয় রথিত্ব। সে তাহার রথকে ক্রমাগতই চালাইবে। সে যেন—

"ঘর কইনু বাহির' বাহির কইনু ঘর"

এই বলিয়া এই বিশ্বপথে বাহির হইয়াছে। তাহার রথচক্র তলে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র সমস্তই পথরূপে পড়িয়া থাকিবে এবং সে তাহারই উপর দিয়া তাহার বিরাট রথ চালাইবে। কোন্ সময় কাহারা আসিয়া তাহার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতেছে, কত ব্যক্তিগত দুঃখ মরণ কত সমাজ ও রাষ্ট্রগত উত্থান পতন তাহাকে ঠেলিতেছে সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই—তাহার দৃষ্টি কেবল চলার দিকে, গতির দিকে। কত মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ, কত বামন, কত রাম কত বুদ্ধ তাহাকে ঠেলিতেছেন তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, সে কেবল বলিতেছে—

আগে চল্ আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।

অথচ এই চলা এমন অদ্ভুৎ, যাহারা এক যুগে ঠেলিয়া আছে পরবর্ত্তী যুগে দেখি তাহারাও রথের উপর আশ্রয় পাইয়াছে। যাহারা পরে আসিতেছে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমেত বিশ্বরথকে ঠেলিয়া দিয়া, পরবর্ত্তীদের জন্য ঐ রথেই চড়িয়া বসিতেছে। অদ্ভুৎ এই রথ এবং অদ্ভুৎ এই পথ এবং অদ্ভুৎ এই চির-পথিক আত্মা। এই অদ্ভুৎ রথ-যাত্রা দেখিয়াই কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা করে

সে ফুল, না ফুটিতে, পড়িল ধরনীতে
যে নদী মরু পথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা। (রবীন্দ্র)

এই কথা যদিও কবির কতকটা অন্তর্বেদনার সান্ত্বনার অভিব্যক্তি তথাপি ইহাই সত্য কারণ বেদনাময় অস্তিত্বই জীব-চৈতন্যের স্বরূপ-লক্ষণ।

তবে কি পথই পথের শেষ? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অক্ষম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্যক্তি-মানবই বল আর বিশ্ব-মানবই বল কেহই এ জগতে পথিকতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ভাবে প্রকাশ করিয়া যান নাই। হয়ত এক একটী ব্যক্তি-মানবের জীবন দেখিয়া মনে হয় পথের বুঝি শেষ হইল। কিন্তু তারপরই দেখা যায় তিনিই শেষ নন, আরও আছে। তিনি আসিয়া পথের শেষ করিয়া যান নাই নূতন পথের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন মাত্র। নূতন নূতন ভাব জাগিয়া মানবাত্মার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেই পথ খুলবার সময় একটা মারামারি লাগে বটে, কিন্তু সেইটাই সেই মারামারিটাই হইতেছে পুনর্গঠনের কাল। সেই মৃত্যুলীলার মধ্য দিয়া মানবাত্মা নবকলেবর ধারণ করিয়া নূতন শৈশব লইয়া ছুটেন। ইহাই তাঁহার চিরন্তনী লীলা। যুগে যুগে এমনি ভাবে তিনি মরণের মধ্য দিয়া জীবনকে নূতন ভাবে পাইতেছেন অথচ সমস্ত অতীতকে লইয়া চির পুরাতন হইয়াও নিত্য-নূতন হইতেছেন। কাল ইহার পরিমাপক নহে, দেশ এই গতির প্রতিবন্ধক নহে—ইহা দেশ কালাতীত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ গতিমাত্র।

এই গতিকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রতিনিয়ত জানিতেছেন, প্রতি-নিয়ত জাগিয়া আছেন। ইহাই আত্মার আত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বাতত্ত্বেরও পরতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব বোধ। এই আত্মতত্ত্ববোধের জন্য বিশ্বের প্রয়োজন এবং সেই বিশ্ববোধের জন্য আঘাতের, তা সে আঘাত সুখেরই হউক আর দুঃখের হউক, প্রয়োজন। অন্য প্রয়োজন অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্য আনয়ন করা বা অন্য কোনোরূপ মহান উদ্দেশ্য মানবজীবনের আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বিশ্ব জগতে টিঁকিয়া থাকিয়া আপনাকে নিত্যনব উপায়ে অনুভব করার যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা তাহার প্রতি কার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক নবভাবের অভিব্যক্তিতে, নব ধর্ম্মের প্রচারে, নব জ্ঞানলাভের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্য নিকটে আসিতেছে কি না এখনো বলিতে পারি না, কিন্তু এই সকলের মধ্যে যে আত্মার আত্মবোধ প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এইটুকুই মাত্র জোর করিয়া বলিতে পারি

জানি কিম্বা নাই বা জানি,
তবু তোমার মাঝেই আছি

মানি কিম্বা নাই বা মানি,
মরাও মরি, বাঁচাও বাঁচি।
এই আলো, এই যে আঁধার,
এই যে খোলা, এই যে বাঁধার
লক্ষ পাকে, বিশ্ব ধাধার
মধ্যে অনায়াসে নাচি,—
অনায়াসের হাতটি ধরি
তাইতে অনায়াসে আছি।
পেলাম কিম্বা নেই বা পেলাম
সে সব হিসাব নাইবা নিলাম।
আছি বলেই থেকে গেলাম,
তাহার অধিক নাইকো যাচি।
যেটুকু দেছো আঁজল পূরে,
তাতেই পরাণ ভরিয়াছি।
(চিরন্তনী। ১ম অঙ্ক)

বিশ্বসন্ন্যাসী।

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কোন মদে আজ পাগল করে মাতাল বাতাসে,
হুঙ্কারে তার কাঁপছে ধরা আকুল তরাসে,
ফুৎকারে ওই পথের ধূলা উড়িয়ে কে চলে,
কোন্ কথা সে শুক্‌নো পাতার মরমরে বলে ?
দুপুর রোদে ফুল্‌কি আগুন পড়ছে ঠিকরি',
বকুল-ডালে কোকিল কালো রইবে কি করি ?
কাঁচা পাতার আড়াল খোঁজে আজ কে বনেতে,
একই ছায়ায় হরিণ ঘুমায় বাঘের সনেতে ;

দেবদারু আর ঝাউয়ের বনে বাতাস মেতেছে।
প্রান্তরে আজ কম্প দিয়ে পাগল জেগেছে।
কচি পাতা ঝাঁউরে গেল আগুন্ পরশে
মুকুল কলি থাক্‌বে কি আর তেমন সরসে?
একি হল তাণ্ডবে আজ এ কোন্ নাচনা,
বুকের মাঝে তুফান তোলে চৈতের বাজনা;
যোগী ভোলার ভাঙল কি যোগ আজকে দাহনে,
ডম্বরু যে বজ্রভাকে জাগায় বাহনে;
ধুতরা ফুলের মঞ্জরী কে কর্ণে পরাল,
ছাই নিয়ে কে ভোলানাথের অঙ্গে বুলাল?
আজ প্রমথ হাড়ের মালা কণ্ঠে ধরেছে,
কটির শোভা কেউটে সাপের হার যে পরেছে!
বদ্ধজটা এলিয়ে প'ল ব্যাকুল বাতাসে
ললাট হ'তে আগুন খসে সকল আকাশে!
বাঘাম্বর রয় কি না রয় এমনি কাঁপনি
অম্বরে আজ সম্বরে লাজ কে ওই আপনি?
পাহাড় কাঁপে পায়ের দাপে তুফান সাগরে,
রুদ্রলীলায় মাত্‌ল কে আজ বালির সায়রে?
নয়ন ঝরায় আগুন কণা 'শয়াল' নাচনে
নৃত্যপরা জাগ্‌ল ধরা আজ্‌কে গাজনে।
কণ্ঠে ও কার নীলের রেখা, সিন্ধু মথিয়া
ধরার অমঙ্গলে ভরা গরল ভখিয়া।
নীলের দিনে সাধুর মুখে কি গান শুনালে
গাজন গাছের ঘূর্ণীপাকে বিশ্ব ঘুরালে!
কাঁপিয়ে ধরা ত্রিশূল তোলে আজ কি ত্রিশূলী,
অভয় দিতে দাঁড়ায় যোগী সংহার তুলি?
রুদ্র তেজে বিরাট হয়ে দুর্জ্জয় বেশে,
নিখিল-বিশ্ব-সন্ন্যাসী আজ জাগ্‌ল কি শেষে?

———

ধর্ম্মের বনীয়াদ।

[শ্রীসত্যবালা দেবী।]

ধর্ম্মভাব ভারতীয় উপাদানে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট বস্তু এ কথা বিস্মৃত হয়ে আমাদের কোনও দিকেই অগ্রসর হবার উপায় নেই। মেয়েদের তোলবার বেলায়ও এই একই কথা। ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে কাজ না করলে কোনও কাজই হবে না। কোনও রূপেই,—আঘাত দিয়েই বল—আকর্ষণ করেই বল—কোনুরূপেই সমাজের ভিতর থেকে আমরা সাড়া পাব না। আন্দোলনের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করা চাই-ই।

অথচ এ কথাটা আবার মিথ্যাও বটে। এই ধর্ম্মেরই নামে হিন্দুজাতি বারবার রকম বেরকমের এত ভুল করেচে যে তার গুণোগার সমাজ এখনও চুকিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। ঐ যে সমাজের আনাচে কানাচে এখনও কত আবর্জ্জনা! কত কিম্ভুতকিমাকার সম্প্রদায় আচার ব্যবহার যার ভিতর হতে সত্যই বীভৎস রস যেন টুপিয়ে পড়চে। সমাজ এখনও তাদের সত্য বলে বরদাস্ত করে নিতে পারে নি! সে যদি শোনে আমাদের এই নূতনের ঢেউ ধর্ম্মের আর একটা ঢেউ ছাড়া বিশেষ কিছু নয়, তখন তার পাশ কাটিয়ে দাঁড়ানটাই মনঃপূত হবে, সোজা হবে। হয়ত সে তাই-ই করে বসবে। তবুও কিন্তু আমাদের মনে রাখা চাই বিনা ধর্ম্ম আন্দোলনে আমরা কাজ করতে পার্ব্ব না। বিনা ধর্ম্ম ভাব সাহায্যে আমরা জাতির চিত্ত আকর্ষণ করতে পারব না। ধর্ম্মাচরণ হাতে হাতে সাথে সাথে না দেখাতে পারলে সমাজেরও পাষাণ মন গলবে না। এই ত হয়েচে মুস্কিল। ধর্ম্ম না নিলেও চলবে না আবার ধর্ম্ম নিলে তাল সামলানও দায় হবে।

ব্যাপারটা কি? উপায়টাই বা কি?—ব্যাপারটা হচ্চে গোড়ায় গলদ, তার উপায়টা একেবারে সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা আর স্বভাবের অপূর্ণতা-প্রবণত্ব (the law of persistences) এই দুটোর মূলোচ্ছেদের পূর্ব্বেই আমরা যদি কাজে নেমে পড়তে ধেয়ে আসি ত সে আমাদের গোড়ায় গলদ করা হয়। ততক্ষণ যে আমাদের কাজের হাতিয়ার ঝোঁক, শক্তি নয়। আত্মশক্তির স্ফুরণ অনিবার্য্যবেগে যাকে নামিয়ে না

এনেছে সে উত্তেজনার ষ্টিমে দীর্ণমান বয়লারের মত হয় ফেটে পড়ব নয় ছুটে পড়বো গোছ কি করি কি করি করতে থাকে।

কিন্তু হায় কর্ম্মযোগের এ জীবনটা ঠিক জাহাজ নয়। কম্পাস যন্ত্রটা এরই ঠিক একটা কামরায় নেই। তাকে দেখে পথ ঠিক করে নিতে হলে দেখবার মতটা হয়ে উঠতে হয়, সে দেখা দেবার মত হয়ে বসে নেই। এই জন্যই বলচি উপায়—সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা—এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

বুঝতে পাচ্ছি এমন লোক আছেন যাঁরা এতক্ষণে আমায় বেশ্ একটা ধমক্ দেবার জন্য মুখ কণ্ডুয়নে অস্থির হয়ে উঠেছেন—ভাঁজচেন এর পাল্টা জবাব।

তাঁরা যা বলবেন তা জানি। তাঁরা বলবেন—পূর্ণতা অপূর্ণতা persistence resistance এ সবের ধুয়া ধরে তোমার মত দারুব্রহ্ম গোছ হলেই হয়েচে আর কি? যুগান্ত ধরে বসে বসে ওই কর, আর কাজ পড়ে থাক। ও সব চলবে না। কাজ চাই—নেমে পড়। এমন ধমকের উত্তরে হাঁসি ছাড়া আর জবাব নেই। কেন না কাজের জন্য সাধনায় যে নেমেচে—মন প্রস্তুত করবার অন্তর্যুদ্ধ যার আরম্ভ হয়ে গেছে, সেও ত বসে নেই। কাজের চেষ্টায় বার বার নেমে বার বার প্রতিহত ব্যক্তির চেয়ে বস্তুতঃ সেইই ত এগিয়ে যাচ্চে। তারপর দেশের ভাবের, জীবন ধারার মোড় ফেরবার বেলায় দু'দশ বছর মাত্র লাগবে, দৃঢ় স্থির, এতবড় বুকের পাটায় প্রোগ্রাম ভেঁধে ফেলতে পার—এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বারাজ্য তাও অসম্ভব হয় না; আর আপনার মনের—স্বভাবের মোড় ফেরাবার বেলায় সময়ের অঙ্কটা অনন্তকালের দিকেই বা পড়ে কেন? সমস্ত দেশকে নেড়ে দেবার যার উৎসাহ আপনাকে একটু ভাল করে নেড়ে নিতে ভেঙে গড়ে নিতে তার আর কদিন?

তাই বলচি কর্ম্মীদের সত্যটাকে আগে স্পষ্ট করে বুঝে নিতেই হবে—সময় নষ্ট হচ্চে এ ধমকে অস্থির হলে চলবে না। অতীতে বারে বারে যত ভুল হয়েচে সে এইখানে। সে শক্তবনীয়াদের উপর না গাঁথার ভুল—ইমারত ঠিকই গাঁথা হয়েছিল।

আমাদের লক্ষ্মীর মন্দিরের নক্সা (Plan) ঠিকই আছে। নির্ম্মাণ কৌশলও আমাদের যথেষ্ট শেখা আছে। কেবল এই জলোদেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত করে ভিত্‌টা আমরা ঠিক্ গাড়তে পারি না। মাটীর তলাতেই জল

চুঁয়ে চক্ষের আড়ালে যে সব ভূমিস্যাৎ হবার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হয়ে যায়,— উপায় সেইখানেই করতে হবে।

তারি নাম, যা বলতে চাচ্চি—সত্যকে একেবারে স্পষ্ট করে বোঝা।

তবে, এইখানে একটা কথা আছে। যে সত্য ভারতের সাধনা তার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাধনাগত সত্যের মিল নেই। আমরা তবে কাকে বুঝব? জগৎকে ছেঁটে দিয়ে ভারতকে না ভারতকে উপহাস করে জগৎকে? অর্থাৎ পথে বাহির হওয়া অভ্যাস নাই, অথচ যখনি ঐ সম্মুখে বিস্তৃত পথের পানে চাই মনে কেমন একটা কোন অজ্ঞাত পরিণামী লক্ষ্যের আভাষ জেগে মনটাকে এত উদাস করে দেয়, যে, কিছু ভাল লাগে না! দুয়ার জানালা রুদ্ধ করে ঐ পথটাকে দৃষ্টিপথ থেকে মুছে ফেলতে হবে না এই অভ্যাসের বশ অবাধ্য আমিটাকে অন্ধ বধির করে দিয়ে তার মস্তিষ্ক যন্ত্রটাকে অবধি আঘাতে বিপর্য্যস্ত করে যেমন অভ্যাসের বশ ছিলাম তেমনি শোচনীয় ভাবে পথের বশ হতে হবে! যেন হয় অভ্যাস নয় পথ, মাঝে আর কেউ নেই।

কিন্তু সত্যই কি তাই? তাতো নয়! পথ আর অভ্যাসের মাঝখানে একটা যে আমি আছে,—যে অভ্যাসের মধ্য হতে আপনার খোরাক সংগ্রহ করে এতদিন গোঙাচ্ছিল। আজ পথের পানে চেয়ে সে কি একটা অদূরবর্ত্তী প্রাচুর্য্যের সন্ধান পেয়েছে। কেবল তার এইটুকু বোঝা কুলিয়ে উঠচে না, যে, পথে বাহির হলে ঘরে বসার অভ্যাস মরে যায় না, একটা বাহির হওয়া রূপ নূতন অভ্যাস আয়ত্ব হয় মাত্র।

ঠিক একই কথা নয় কি? সত্যকে বুঝতে গেলে বিশ্বের সত্য ভারতের সত্য কি? যেমন একই বল নিয়ে সিংহ হতে শশক পর্য্যন্ত চলাফেরা করে তেমনি একই সত্যের উপরই ত বিশ্বের সকলের জীবন প্রতিষ্ঠান! হতে পারে ঐ বলের প্রকাশের মত সত্যের প্রকাশের তারতম্য আছে। হয় ভারত নয় বিশ্ব দু'য়ের মধ্যে একের সত্য অধিক পরিস্ফুট অথবা উন্নত ধরনের।

আবার এদিকেও আমাদের উপায় সত্যকে স্পষ্ট করে বোঝা। বুঝলেই গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং আমরা কলহের এলাকার মধ্যে নেই। আমরা নিরাপদ। গ্রহণ করতে ত চাইচি না।

এখন ভারতের সত্যই বা কোন স্তর পর্য্যন্ত পৌছেচে—বিশ্বেরই বা কোন অবধি পৌছেচে। পরমার্থ বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারত। তার সত্য অতীন্দ্রিয় লোককে স্পর্শ করেছে। জড় সত্তা ও ব্যবহারিক তত্ত্ব এদের প্রাধান্যকে ছাপিয়ে

চলে গেছে তার মনের প্রাধান্ত! সে আধ্যাত্মিক। স্থূল চর্ম্মচক্ষে যতটা দেখা যায় ও আহার বিহারাদিচ্ছলে যতটা আমরা নিজেদের প্রকাশিত করি হিন্দুর সীমা তার চেয়ে অনেক বেশী দূর। ভারতের বিশিষ্টা সভ্যতা মানুষকে এমন কিছু সত্তায় পরিণত করে যে মানুষ চক্ষু মনেরও অগোচর—সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় এক রহস্যলোক মধ্যে আপনাকে অনুভব করত: এক অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদনে আপনাকে ধন্য করছে। আহার বিহার তার যথেষ্ট নয়, তার চাই সংযম। পুষ্টিই যে তাহার শেষ লক্ষ্য নয়—সে যে চায় ব্যাপ্তি। জীবন ও জগতটা ভোগ করেই সে ক্ষান্ত হতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগতের কারণকেও ভোগ করব, এতদূর হচ্চে তার আশা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই-ই।

বস্তুতঃ জিনিষটা কি? জিনিষটা মানুষের একটা বিরাট রূপান্তর। হঠাৎ কল্পনা বলে মনে হয় কিন্তু তা নয়—ঠিক কল্পনা নয়। এ রূপান্তর অতীন্দ্রিয় রূপান্তর, তাই বুঝতে একটু দেরী লাগে। অনেক দিন পর্য্যন্ত আলোআঁধারেই থাকতে হয়। বিশ্ব কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবে নি যে ইন্দ্রিয় এবং তার সাধ্য উভয়ের উপাসনা ছেড়ে আরো এগোতে হবে। হঠাৎ ভারতের মনের কথা তার কানে ঢুকলে কথাটা তার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হওয়াই চাই। আমাদের অনুপযোগী নয় এই জন্য, যে, আমরা যে পুরুষানুক্রমে এই সত্য নিয়ে মেতে আছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানটাই এমন একটু কায়দা করে পাতা হয় যে তার মধ্যে কত কি ভঙ্গী থাকে; সব ভঙ্গীই কারণকে স্মরণ করিয়ে দেবার সহায়ক।

বিশ্বের সত্য হচ্চে যে শক্তির অন্ধ জড়বেগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলেচে সেই পর্য্যন্ত সচেতন হওয়া। ভারতের সত্য সেই জড়বেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এমন একজন কেউ নিশ্চয়ই আছে,—কারণ এ বেগ শুধু ত বেগ নয় এই বিপুল বেগ বিস্ময়-কর সমারোহ ত উন্মত্তবৎ হয়ে উঠচে না, এর মূলে ত রয়েচে অটুট শৃঙ্খলা। অনন্তকাল অসীম ব্যাপ্তি অথচ কি স্থির অচপল প্রকাশ!—ক্রমে মিলিয়ে যাচ্চে না—সব একই ভাবে দীপ্যমান। যিনি এই সমস্তের অতীত, যিনি এই সমস্তের নিয়ন্তা, তাঁর মধ্যে সচেতন হওয়া ভারতের সত্য। অন্ধজড়বেগে প্রকৃতির শক্তির হাতে আমরাও চলেছি—বিশ্ব চলেচে, আমরাও বাদ যাইনি! যেতেও পারি না। আমাদের বিশিষ্ট উপলব্ধি এই, যে, ওই যে অন্ধজড় বেগ ওর নিয়ন্তা যিনি তাঁরও ত নিয়ন্ত্রিত আমাদের মধ্যে আছে। শক্তির যতটা চালনা তাতেও সচেতন হব, আবার শক্তিকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন তাঁর যে শৃঙ্খলা তাতেও সচেতন হব

সুতরাং ধর্ম্মের বনীয়াদে গাঁথা মানে ঐ বিরাট রূপান্তরের বনীয়াদে গাঁথা। আমাদের অতীন্দ্রিয়াভিমুখিনী চেতনা যা জানাচ্ছে, যা জাগাচ্ছে আগে সেটা পরিপূর্ণ হোক। আমরা সচেতন হয়ে উঠি বিশ্বের ও আমাদের সমস্তটার মধ্যে। তারপর ঐ নিয়ন্তা আমাদের মধ্যে এসে বসবেন। তখনই আমরা বলতে পারব—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

বিনিময়

[শ্রীহেমলতা দেবী।]

এই যে জগৎ
আপনি এসে
পরায় গলে
আনন্দ ডোর,
এই বাঁধনে
সাধন আমার
করবে চির—
আনন্দ ভোর!
চিরদিনের
মায়ার ফাঁসি
সুধায় মেখে
উঠবে ভাসি
ভুবন ভরি
মোহন বাঁশী
বাজবে হিয়ার
আনন্দে মোর।

জগত বঁধুর
পরিণয়ে
এই রাগিণী
নিত্য বাজে
অমর সুধার
বিনিময়ে
নিত্য শোভায়
চিত্ত সাজে
প্রণয় নিবিড়
আলিঙ্গনে
বাঁধল হিয়ায়
সঙ্গোপনে
জীবন বঁধুর
এই মিলনে
বিশ্বে ঘনায়
আনন্দ ঘোর।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।]

(৫)

কল্যাণবরেষু,

ছিঃ ঠাকুর পো, তুমি এত বে-রসিক তা'ত জানতুম না। এ সময়টা দুনিয়ায় আর বেড়াবার যায়গা তুমি খুঁজে পেলেনা—রাজপুতনার মরুভূমি ছাড়া? উজ্জয়নীতে গেলেও এক রকম চলত। কিন্তু বাংলায় জল-বায়ুই ঐ সময় তোমার দেহের ও মনের উপর আশ্চর্য্য কাজ করত বলেই আমার বিশ্বাস। চণ্ডীদাসের দেশই হচ্চে এখন তোমার বেড়াবার উপযুক্ত স্থান।

লাহোরের শুকনো হাওয়ায় সত্যিই তোমার অবনতি ঘটেচে, নইলে, যার কথা শুনতে তুমি এতটা ব্যাকুল তাকে পাহাড়ী মেয়ে বলে অভিহিত করতে না। কশিয়ং পাহাড়ের দেশ সেত সকলেই জানে—কিন্তু সে যে মেঘ মালার দেশ সেই কথাটাই তোমার আগে মনে পড়া উচিত ছিল।

এখন একটা সুখবর আছে, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মেঘমালার দেশের সেই মেয়েটি বাপ মায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে হাজির হয়েচে। মেয়ের বাপ এসে অবধি রোজই দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করচেন মেয়ে দেখাবার দরবার নিয়ে।

আমি বর্দ্ধমান হতে কনককে নিয়ে এলুম এবং কাল বিকেলে খোকার সঙ্গে আমরা দু বোন তাঁদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সদর দরজার সামনে আমাদের গাড়ী দাঁড়াতেই মেয়ের মা এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে গেলেন। বেশ ভাল লোকটি। তোমার সম্বন্ধে আমাদের সংসার সম্বন্ধে অনেক কথাই হল।

কনকের কিন্তু এ সব মোটেই ভাল লাগছিল না। তার দৃষ্টি ছিল কেবল এদিকে ওদিকে মেয়েটির সন্ধানে!

একটি সাত আট বছরের মেয়ে এসে তার মার কাছে চুপি চুপি কি যেন বল্লে। তোমার হবু শাশুড়ীটি আমাদের একটিবার অন্য ঘরে যেতে অনুরোধ

করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলুম আসন পাতা খাবার যায়গা তৈরি। গৃহকর্ত্রী আমাদের বল্লেন, একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে। দু'চার বার আপত্তি জানিয়ে শেষটায় আমরা বসে পড়তে বাধ্য হলুম।

এমনই সময় তাকে ঘরে ঢুকতে দেখ্‌লুম একখানা খাবারের রেকাবী হাতে নিয়ে। সত্যিই সে মেঘমালার দেশের মেয়ে। মেঘের কোল হতে নেমে এসেচে একেবারে বিদ্যুৎ বরণ নিয়ে, অথচ স্থির ধীর, মোটেও চঞ্চল নয়। নামটি তার নীহার।

কনক তাকে টেনে নিয়ে তার সঙ্গে খেতে বসালে, আমি তাই তাকে ভালকরে দেখবার সুযোগ পেলুম। মুখচোখ তার একেবারে নিখুঁত। পরণে ছিল একখানা আসমানি রংএর শাড়ী, সাদা সিধে গোছের একটা ব্লাউজ গায়ে আর তার পিঠের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে পড়েছিল একরাশ ঘনকালো লম্বা চুল। চোখের দৃষ্টি বেশ শান্ত আর হাসিটুকু বড়ই মধুর।

তোমার আগের চিঠিতে ইতিহাস লিখে পাঠিয়ে ছিলে বলে মনে করোনা যে, পাল্টা তোমায় নভেল লিখে পাঠাচ্ছি। যতটুকু লিখেছি, তাত সত্যিই— লিখে বুঝাবার মত ভাষা যদি আমার অধিকারে থাকত, তা হলে তার চেহারাটা তোমায় বুঝাবার এই ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় পেতে না। কলমের দাগই তুলি দিয়ে আকার মত একখানা সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলত।

আমাদের জলযোগ শেষ হলে নীহার মায়ের আদেশে কনককে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। আমি কিনা তোমাদের সংসারের গিন্নী। তাই মেয়ের মার সঙ্গে সাংসারিক কথাই কইতে লাগলুম। প্রসঙ্গ ক্রমে তোমার কথাও উঠল। মেয়ের মা তোমার চেহারা কেমন, রোগা নাকি তুমি, এই সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি ঠিক ঠিক সব উত্তর দিতে লাগলুম—এমন কি তুমি যে পেটে ক্ষিধে নিয়ে, রসনায় লোভ রেখেও চেয়ে খেতে জান না, সে-টাও তাকে জানিয়ে দিলুম।

পাঁচটার পর আমরা বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। কনকের মুখে আর নীহারের প্রশংসা ধরে না—সমস্তটা রাস্তা সে বকতে লাগল। তার মতে এই মেয়ে ছাড়া, তোমার বউ হবার উপযুক্ত মেয়ে কোথাও পাওয়া যাবে না।

এত গেল মেয়ে দেখবার পালা। এর পরই কিন্তু তাদের তরফ হতে ছেলে দেখবার তাগিদ পড়বে। আমি সেই জন্যই বার বার করে তোমাকে এখানে আসতে লিখচি।

তারা তোমায় দেখতে চান, একথা শুনে নিশ্চিন্তই তুমি বিদ্রোহী হবে না; কারণ, আমাদের মত তাদেরও ও আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক।

এ ছাড়াও ছুটিতে তোমার এখানে আসা খুবই দরকার। বিশেষ কাজ আছে—চিঠিতে লিখে তা বোঝান যাবে না। তোমার এখানে থাকা চাই এবং আমার ফরমাস নিয়ে এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করা চাই। বাড়ীতে ত আর দ্বিতীয় লোকটি নেই - কাজেই নিজের বিয়ের অনেক কাজ তোমাকেই করে নিতে হবে; নইলে একা আমি পারব কেন?

এতদিন ভাই তুমি সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোর ভিতরই ছিলে। যখন যা বলেচি, না করে থাকতে পারিনি—এমন কি তুমি নিজে যা করতে চেয়েছে, তাও একবার আমার মুখ দিয়ে বার করিয়ে নিয়ে তবে করেচ। তুমি কি শুধু আমার দেবর স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর মাত্র? কেবল তা হলেই কি তোমায় এমন করে ভাল বাসতে পারতুম।

তুমি ত আমায় কেবল ভ্রাতৃবধূরূপেই দেখনি। মায়ের স্নেহ ভগ্নীর ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি সব দাবী করে নিয়ে তুমি যে আমায় একেবারে নিঃস্ব প্রায় করে ফেলেচ। আজও বিকেলে ইস্কুল হতে ফিরে এসে খোকা যখন খাবার চাইলে, খেতে ভাল লাগচে বলে যখন আরও দিতে বল্লে—তখনও অন্যমনে বলে ফেলেছিলুম—"সব তোকে দোব, কাকাবাবু খাবেনা?" পেছন হতে মিনি বলে উঠল—"কাঁকাবাবু লাহোরে হাঁ করে বসে আছেন মা তুমি এখান হতেই তাঁর মুখে তুলে দাও!" খোকা আর মিনি দুজনাই হেসে উঠল—আমিও তাতে যোগ দিলুম।

এত সব আজ তোমায় কেন লিখচি, বলতে পারিনে—যা এসে পড়ল তাই-ই লিখে ফেল্লুম। ছুটিতে এখানেই এসো।

আসবার সময় বর্দ্ধমান হতে নরেশকে নিয়ে এসো—কনককে আমি ততদিন ছেড়ে দিচ্ছিনে। তোমার দাদার কাছে যে চিঠি লিখেচ, তা দেখলুম জবাব হয়ত এই ডাকেই পাবে। আমরা ভাল আছি। কেমন লাগচে? লাহোরের নতুন কিছু সঙ্গে এনো। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
বৌদি

(৬)

ভাই নরেশ!

তোমরা সবাই মিলে আমার চারটে দিকই ঋণজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেচ।

এখন কলকাতায় বসে বউদি জাল গুটাবেন আর আমি সটান তার কাছে গিয়ে হাজির হব। আত্মসমর্পণে আমার কোন দিনই অমত ছিলনা—বিশেষ তোমাদের মত লোকের কাছে—যাদের আইনে একমাত্র শাস্তিই হচ্চে স্নেহ বর্ষণ।

একদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মেয়েরা আমাদের কি দিতে পারে? জবাব স্বরূপ তুমি যা লিখেছিলে মামুলী বলে আমি মোটেও তা সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু মানুষ যে সময় সময় অতি পুরাতন, একেবারে জানা—যা, তার জনই ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তাই পেলেই পরম তৃপ্তি লাভ করে—সে-টা আমার জানা ছিল না। নতুনের মাঝে যে একটা মাদকতা আছে, তাতেই মত্ত হয়ে এমন বহু পুরাতন অথচ, চিরনবীন যা, চিরদিনই মানুষ যা পেয়ে আনন্দ লাভ করে তাও তুচ্ছ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। তাইত অশিক্ষিতা বলে অবজ্ঞা ভরে মেয়েদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার কোন মূল্যই একদিন দিতে চেয়েছিলুম না। কিন্তু কাল বউদির চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলুম আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিরাট একটা দৈন্য যা এতদিন কেবল হা-হা করছিল, তা হচ্চে ওই সব উপেক্ষা করবারই ফলে। মেয়েদের কাছেই ওই জিনিষগুলি পাওয়া যায়—এবং তা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে।

তুমি আমার চিঠিতে এ কথাগুলো পড়ে নিশ্চিতই খুব বিস্মিত হয়েচ এত শিগ্‌গীর আমার মত বদলাতে দেখে। আমার এ মানসিক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েচে বৌদি আর কনক তাদের অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান জানিয়ে।

কিন্তু মনে করো না যে এতেই তৃপ্ত হয়ে তোমার সমাজের নিয়ম মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবো বরং দ্বিগুণ বিক্রমে আমি তাকে আঘাত করব—কারণ, আমার বিশ্বাস যে, সমাজ যদি পীড়ন না করত, তা' হলে আমাদের দেশের নারীকুল তাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ফেলে, তাদের অন্তরের অমৃতরাশি বিলিয়ে দিতে পারত, যাতে করে অভিশপ্ত মৃতপ্রায় এই জাতি বুকভরা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠত।

তুমি একবার লিখেছিলে, সমাজকে গালি দেওয়া বৃথা; কারণ, সমাজ গড়ে উঠেচে আমাদেরই নিয়ে। তোমার মত হচ্চে, সমাজের অধিক সংখ্যক লোক যখন পরিবর্ত্তন আবশ্যকীয় মনে করবে, সমাজের আচার নিয়ম তখন আপনা হতেই বদলে যাবে। যতদিন তা না হচ্চে, ততদিন আমাদের চুপটি করে বসেই থাকতে হবে—জাতির অনিবার্য্য শক্তিক্ষয় নির্ব্বিকার ভাবে দেখতে হবে।

কখন কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে এই বিরাট জন-সঙ্ঘ শিক্ষিত হবে, কুসংস্কার

দূর করে, মিথ্যা অবিশ্বাস ঘুচিয়ে কবে সে আপনাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, তারই অপেক্ষায় বুকের ব্যাথা আমরা বুকেই পুষে রাখব। অত ধৈর্য্য আমার নেই—সেই জন্যই ত আমি তোমাকে বলতুম, তোমরা যাকে মহৎ কাজ বল, আমাকে দিয়ে তা হবে না। তাইত আমি দূরে সরেছিলুম তোমাদের কর্ম্মকোলাহলের সম্পূর্ণ বাইরে। তুমিই ইচ্ছে করে না করালেও —টেনে নিয়ে এসেচে আমায় কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের একেবারে কাছে। সে যখন আমায় আকর্ষণ করচে তার অদম্য শক্তির জোরে তখন তুমি বলচ আমায় সামলিয়ে নিতে, নিজেকে সংযত করতে। একি তোমার পরিহাস বন্ধু? বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করব বলে যে দম্ভ করেছিলুম তা যে কত মিথ্যা, তাই প্রমাণ করবার এ প্রচেষ্টা?

এক রকম লোক আছে, যাদের মায়ের অঞ্চলের নিধি বলা হয়ে থাকে। আমরা বেশির ভাগ লোকই এই দলভুক্ত হয়ে পড়েচি। দুঃখ দৈন্য যত প্রবলতর হয়ে উঠচে, ততই জোরে আমরা অতীতের কঙ্কাল জড়িয়ে ধরচি। দেখবার প্রবৃত্তি নেই, বুঝবারও শক্তি নেই যে সে কঙ্কালে ঘুণ ধরেচে—তার আর শক্তি নেই যে সে আমাদের রক্ষা করে। ওই কঙ্কালে মেদ-মজ্জার সঞ্চারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে নতুন উদ্যম চাই, তা আমাদের নেই —নতুন কিছুই আমরা সইতে পারিনে। পারিনে বলেই ত এই সেদিনও কেশবচন্দ্র, রামমোহনকে পৃথক করে দিলুম—বিবেকানন্দের মুক্তির বাণী গ্রহণ করতে পারলুম না।

মেয়েদের বন্ধন-রজ্জু শিথিল করে দিতে বল্লেই আমরা বাসন মাজবার লোক পাব না আশঙ্কা করে চেঁচিয়ে উঠি। সংসারে সব চাইতে বড় কাজই হচ্চে ওই ঐ বাসন মলা! শিক্ষিতা হয়ে মেয়েরা যদি সংসারের আয় বাড়াতে অক্ষম হয়, তা হলে বাসন তাদেরও বাধ্য হয়েই মলতে হবে—বি-এ পাশ করে ছেলেরা যেমন কুড়িটাকা মাইনের চাকরী করে।

যাঁরা একটু বেশি বিজ্ঞতার ভাণ করেন, ভবিষ্যৎকে যাঁরা স্পষ্ট করে নাকি দেখে ফেলেচেন—তাঁরা আগে সফ্রেগিষ্ট শেষে বলশেভিষ্টদের নজীর দেখিয়ে বলবেন, স্বাধীনতা পেলে আর্য্যনারীরাও শেষটায় ওই দলের ধ্বংসবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

ইউরোপের সামাজিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠচে সন্দেহ নেই—কিন্তু সেটাকে ভয়ের চোখে তারাই দেখচে, যারা সমাজকে মানুষের চাইতেও বড় বলে মনে

করে। মানুষকে যারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে চায় তাদের চিত্ত কিন্তু আশায় আনন্দে নেচে উঠচে স্বাধিকার স্থাপনের এই প্রচেষ্টা দেখে। হাঁটতে গেলে শিশু বার বার আছাড় খাবে এই আশঙ্কা মনে পোষণ করে তাকে পঙ্গু করে রাখব, না চলবার শক্তি লাভ করলে সে পাহাড়ও অতিক্রম করতে পারবে তাই উপলব্ধি করে তাকে চলতে শেখাব ?

নূতন করে গড়তে হলে পুরাতনকে প্রয়োজন মত ভাঙতেই হবে। বৈদিক যুগ হতে সুরু করে ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়েই আমাদের এই জাতি গড়ে উঠেচে। আমাদের মাঝে যা কিছু অসত্য, যত রকম ভুল ভ্রান্তি সব এমনি করে বিদূরিত হয়েচে। সনাতন বলে যা কিছু আমরা পেয়েচি, তা হচ্চে এই ভাঙা গড়ারই ফল স্বরূপ। এ জাতি ভাঙা গড়ায় যদি চিরদিনই ভয় পেয়ে আসত, তা হলে কি দুনিয়ায় কিছুতেই টিকে থাকতে পারত ?

যে দিন হতে আমরা শক্তি হারিয়েচি, সে দিন হতেই আমরা নিজেদের বার বার করে বুঝিয়েচি আমাদের আর কিছুই করবার নেই—পূর্ব্ব পুরুষেরাই ত সব করে গিয়েছিল। তাদের পুণ্যের জোরে আমরা যে কেবল বেঁচে থাকব তা নয়; সেই সঞ্চিত পুণ্যের অংশ পেতে বিশ্বের সকলেই কাঙালের মত আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমরা কাঙালের চাইতেও অসহায় হয়ে পড়েচি। দুনিয়াকে দেবার মত আমাদের অনেক কিছু থাকতে পারে, এ কথা আমি অস্বীকার করতে চাইনে, হয়ত অনেক কিছুই আছে। সব জাতিরই কিছু কিছু থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেই দাতার পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে আমাদের নিতেও হবে অনেক। আর সে সব প্রত্যাখ্যান করলে আমাদের পূর্ণরূপটি কখনো ফুটে উঠবে না, সমগ্র বিশ্ব যা দেখে আমাদের কাছে এসে ভিড় জমাবে।

বাইরের কথা অনেক কিছুই বল্লুম—জানিনা তুমি এতে সায় দেবে কি না। বউদি আর কনক মিলে কর্শিয়ং এর সেই মেয়েটি দেখে এসেচেন। তার যে বর্ণনা আমায় পাঠিয়েচে তাতে বোঝা গেল তারা এই সম্বন্ধটাই স্থির করে ফেলবেন। আমারও যে অমত আছে, তা নয়।

এখনো কিন্তু বুঝতে পারচিনে, বিয়েটা উচিত হচ্চে কি না। এত তাড়াতাড়ি না করলেও চলত বোধ হয়। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

মোহিত

(৭)

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। রাজপুতনা ভ্রমণ এবার স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। বড়দিনের ছুটিতে এখানেই আসিবে। তোমার ভ্রাতৃবধূ তোমাকে এখানে আসিবার জন্য লিখিতে আমায় বার বার অনুরোধ করিতেছেন। তুমি না আসিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।

অতি অল্প বয়সেই তুমি মাতৃহারা হইয়াছ। তদবধি মাতার ন্যায় স্নেহে তিনি তোমাকে পালন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। অপর সংসারের কার্য্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একাকিনী বধূমাতার পক্ষে সকলদিকে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমি অগৌণে তোমার বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় তুমি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়া উপার্জ্জন-সক্ষম হইয়াছ। অতএব বিবাহ না করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ তোমার থাকিতে পারে না। তথাপি এ বিষয়ে তোমার মতামত লওয়া আমি আবশ্যক মনে করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট তোমার সম্মতি আছে জানিয়া আমিও পাত্রীও প্রায় স্থির করিয়াছি। মেয়েটি সুশ্রী, বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা। মেয়ের পিতা কর্শিয়ংএ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতি সজ্জন এবং অমায়িক ব্যাক্তি। সম্প্রতি দুইমাসের বিদায় লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শুভকার্য্য সম্পন্ন হলেই কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, আগামী মাঘ মাসেই শুভকার্য্য সম্পাদন করি। ঐ সময় তোমাকে কলেজ হইতে কিছুদিনের বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। বড় দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিলে এ সম্বন্ধে এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

তোমাদের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া কিছুকাল আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইব মনে করিয়াছি। এতদিন যাবত সংসারের বোঝা বহন করিয়াই আসিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমাকে অব্যাহতি দাও যাহাতে আমি পরলোকের চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া সুখে কাল অতিবাহিত কর এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধানে সক্ষম হও। অত্র মঙ্গল। পত্রোত্তরে তোমার কুশল সংবাদ লিখিবা। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভবনাথ রায়।

পুঃ -খোকা ও মিনির দুইখানি পত্র এইসঙ্গে পাঠাইলাম।

শ্রীশ্রীচরণেষু—

কাকাবাবু, আপনি কবে আসবেন। আমাদের জিব্‌নাষ্টিক মাষ্টার মশাই গল্প করেচেন, পাঞ্জাবের কোথায় নাকি খুব ভাল হকি-ষ্টিক পাওয়া যায়। আপনি আসবার সময় আমার জন্যে খুব ভাল দেখে তিন খানা নিয়ে আসবেন। আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে—শিগ্‌গীরই প্রমোসন হবে। ইতি

প্রণত—

খোকা

কাকাবাবু,

আমি এবার ইস্কুলে অনেক বই প্রাইজ পেয়েছি। আমাদের বাড়ীতে একজন নতুন লোক এয়েছেন—তিনি হচ্ছেন মাসীমা। আরও অনেকে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, মা বলেচেন, আমাদের কাকীমা হবেন। এমন তিনি সুন্দর! আপনি যে দিন আসবেন, সে দিন আমরা ষ্টেশনে যাব—দাদা বাবু নিয়ে যাবেন বলেচেন।

মিনি

অন্যমনে

(শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

সাঁঝের আঁধার নাম্‌ল নদীর পারে
তোমার চোখের পাতার ধারে ধারে
বিষাদ কেন ঘিরল এসে বালা?

শঙ্খ কাঁশর বাজ্‌ল দেবালয়ে
বাদুড় পাখা নাড়ায় তরু চয়ে
গাঁথা তোমার হয় নি কি গো মালা?

সোণার রেণু কখন গেছে উড়ে
পশ্চিম নভে বিদায় বেণুর সুরে
দিন যে তাহার গেয়েছে শেষ গান

জোনাক তাদের ক্ষুদ্র পাখা মেলে
ঝোপে ঝাড়ে বেড়ায় আলো জেলে
নদীর বুকে উঠ্‌ছে নিশার তান।

গোষ্ঠ হ'তে বৎস ধেনুর দলে
আপন ঘরে কখন গেছে চলে'
তুলসী বাতি কখন হ'ল জ্বালা
লক্ষ তারা উঠ্‌ল একে একে
হাটের লোকে কতই ডেকে হেঁকে
ফিরল ঘরে নিয়ে বেসাতি-ডালা

ঝিঁঝিঁর দলে কখন গেছে মেতে
শিবার দলে কখন গলা গেঁথে
দিয়েছে যে এক পহরের ডাক
ঝোপ ছাড়ায়ে বেড়ার ধারে ধারে
এদিক সেদিক পুকুর পারে পারে
ছড়িয়ে গেছে জোনাকিদের ঝাঁক।

শিশুর দলে চোখের পাতা ভারী
রাজ কন্যার সকল দুঃখ ছাড়ি'
ঘুমিয়ে গেছে দৈত্যপুরীর মাঝে,
মৃদঙ্গ আর হরিধ্বনি দূরে
মিশিয়ে গেছে নীরবতার সুরে
গভীর নিশি সাজন গহন সাজে।

সারাটা দিন কেমনে গেছে বালা
কিসের ছলে হয়নি গাঁথা মালা
এম্‌নি কি গো ছিলে অন্যমনে
ছিলে যদি এখন একা একা
আঁখির তটে নিয়ে বিষাদে-লেখা
সারা নিশা কাটাও শূন্য সনে।

দেশের কথা।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

দেশের দুর্দ্দশার একটী মূল কারণ টাকার দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু টাকার শক্তি হ্রাস বা দ্রুত অবনতি। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট ঝক্‌মকে বন্দুকের সঙ্গীনে নয়, চক্‌চকে টাকায়। সুতরাং ইংরেজের টাকা অচল হ'লেই তার বন্দুকের সঙ্গীনে মরচে পড়িবে। কি কি কারণে টাকার দ্রুত অবনতি সম্ভব, তাহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় একটী অধ্যায় স্মরণ করিতে বলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস আমাদের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব যখন দিল্লীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তখন বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের গৌরবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের অখণ্ড প্রতাপ। গঙ্গাবক্ষে দেশ বিদেশের বাণিজ্যসম্ভার বহন করিয়া সহস্র সহস্র তরণী ভাসমান ছিল। নবাবের শক্তির মূলে ছিল জগৎ শেঠদের ঐশ্বর্য্য। দিল্লীর বাদ্‌শা, নবাব ও জগৎশেঠদের তুল্য সম্মান করিতেন। শেঠদের ঐশ্বর্য্য জগৎবিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদে বাৎসরিক রাজস্ব সংগৃহীত হইবার পর এককোটী বিশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করা হইত এবং সমুদয় অর্থ শেঠেরা 'হুণ্ডি' পাঠাইয়া দিল্লীর কুঠি হইতে পরিশোধ করিতেন। শেঠদের কুঠী বাঙলার ও ভারতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল। মুর্শিদাবাদে নবাব বহু অর্থ শেঠদের নিকট ঋণ করিতেন ও শেঠদের পরামর্শ ব্যতীত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন না। ইংরেজ ফরাসী ও আর্ম্মেনীয় বণিকগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা শেঠদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতেন। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা সেই পলাশী ও গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সিরাজ ও মীর কাশেমের শক্তি ইংরেজ কর্ত্তৃক নির্ম্মূলিত হয় নাই, বরং সে ষড়যন্ত্র ও ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে জগৎশেঠদের যে শক্তি ছিল সেই শক্তিকে কৌশলে ইংরাজ করতলগত করে ও অবশেষে বিধ্বস্ত করে। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন কালে শেঠদের দুই কোটী মুদ্রা লুঠিয়া লইলেও শেঠেরা পূর্ব্বের মত এক কোটি টাকার 'হুণ্ডি' পাঠান বন্ধ করেন নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন, যে, শেঠদের

যেন দুই আঁটী খড় চুরি গিয়াছিল! এ হেন শক্তি পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের পদানত হয়; ইহা অসম্ভব। মীরকাশেম শেঠদের ইংরেজের জাল হইতে মুক্ত করিতে শেষ চেষ্টা করেন। মীরকাশেম মহারাজ নন্দকুমারের বুদ্ধিবলের সহিত শেঠদের অর্থবল "মণিকাঞ্চন" যোগ করিতে সমর্থ হইলে বাঙলায় ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা আকাশ কুসুমবৎ বিলুপ্ত হইত। যাঁহারা কলিকাতায় টাঁকশাল বা mint স্থাপন ও মুর্শিদাবাদ হইতে রাজস্ব বিভাগ কলিকাতায় আনয়ন করা এবং তাহার ফলে শেঠদের শক্তি নির্ম্মলিত হওয়ার ইতিহাস জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাৎকালিক কলিকাতার গবর্ণর ভ্যানসিটার্টের (Vansitart) চিঠি পত্রাদি ও অন্যান্য State Papers পাঠ করিতে পারেন। জগৎ শেঠদের ইতিহাস শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" কীর্ত্তিত আছে।

স্বভাবতঃ টাকার মূল্য বা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি দেশের উৎপন্ন শস্যের ও শিল্পের অল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে এবং বিদেশজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে ধার্য্য হয়। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ টাকার শক্তিকে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে ও কমিতে দেওয়া। যেমন বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা রাজধর্ম্ম, তেমনই করভার হইতে প্রজারক্ষণও রাজার ধর্ম্ম। যে দেশে রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক, সেই দেশে প্রজা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রাজাও দুর্ব্বল, প্রজা সবল হইলে রাজাও সবল হয়। আমাদের দেশে রাজা ও প্রজার স্বার্থ ঠিক এক নয়, তাই যত অর্থের দুর্ভিক্ষ তত অন্নের দুর্ভিক্ষ; অর্থের স্বচ্ছলতার অভাব ও তারই ফলে যে অন্ন বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা, ইহা অনেক পরিমাণে সত্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, ভারতবর্ষ বৃটীশ সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ (Province) মাত্র—ইহার রাজধানী কলিকাতাও নয়, দিল্লীও নয়, লণ্ডন। রাজার দৃষ্টি কোন পথে—দিল্লীর পথে কি লণ্ডনের পথে—তাহা সহজেই অনুমেয়! রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারতে নাই বলিয়া আমাদের আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব।

তাই ইংরেজের দেশ হইতে বস্ত্র আসে আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে, আমাদের বিলাসীতা সৌখীনতার সকল আসবাব-সামগ্রী সাত সমুদ্র পার হইয়া আসে, আর আসে ইউরোপীয় Services, অর্থাৎ আমাদের দেশ-রক্ষা করিতে বড় লাট হইতে আরম্ভ করিয়া গোরা সিপাহী পর্য্যন্ত,—যাঁহারা

প্রজা রক্ষার দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আইনের জাল বিস্তার করেন এবং সীমান্তে আতসবাজী দেখাইয়া রুষ আফগান, সিংহ ব্যাঘ্র হইতে পাহাড়িয়া মামুদ মুষিক পর্য্যন্ত শত্রুদলকে সন্ত্রস্ত ভয়চকিত করিয়া দেশরক্ষাকল্পে দেশের রাজস্বের তুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করেন।

দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা যতই Statistics দেখান না কেন, সচ্ছলতা দেশে আছে কিনা, তাহা দেশের জনসাধারণের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট যদি না বুঝি, ঐ সব মোটা মোটা হিসাবের খাতা পত্র দেখিয়া কি বুঝিতে পারিব? বাঙলার কৃষক যখন তাহার কৃষিক্ষেত্রে সোণা ফলাইয়া তাহা রক্ষা করিতেছে, দেশের উন্নত অবস্থা তখনই দেখিব,—না যখন ব্যাধি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া সহরের কলকারখানায় কয়লার ময়লা মাখিয়া, সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানের দুইটা টাকার জন্য স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য লালায়িত হইয়া ধর্ম্মঘট করিতেছে? দেশের উন্নত অবস্থার এই কি ছবি?

এযে সভ্যতার সংঘর্ষ; ভারত কি এই সভ্যতা গ্রহণ করিবে? বাস্তবিক, সভ্যতা, শিক্ষা, শাসন সবেরই আজ জাতিবিচার করিবার, আচরণীয় কি অনাচরণীয়, এ বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। টাকা 'বয়কট্' করিবার প্রয়োজন হয় না টাকার শক্তি না থাকিলে টাকা আপনা আপনি অচল হয়। টাকার শক্তি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; দেশের জনসাধারণের টাকা গড়িবার শক্তি আছে। আমরা বৃটীশ-শাসন, হিন্দু-শাসন বুঝি না; বৃটীশ-শাসন থাক বা যাক, হিন্দু-শাসন হউক বা না হউক, আমরা বুঝি সুশাসন গ্রহণ করা ও কুশাসন বর্জ্জন করা, আমরা যে 'স্বরাজ' চাই, সে 'স্বরাজ' বাঙলার বা ভারতের স্বরাজ নয়, সে স্বরাজ সর্ব্বদেশে সকল মানুষের 'স্বরাজ' (Freedom of man); পৃথিবীর সকল জাতিকে সেই 'স্বরাজ' পাইতে হইবে—সে স্বরাজ কেহ বাহির হইতে দিবে না—প্রত্যেকের অন্তরের সাধনার বলেই সেই 'স্বরাজ' ফুটিবে। অন্তরে মুক্ত মানুষের সমাজ রাষ্ট্র দেশ সবই মুক্ত।

দীপলক্ষ্মীর আবাহন।

(শ্রীমতীরাণী নিরুপমা দেবী।)

হে দেবী রহস্যময়ী তব গূঢ় মায়াজাল একবার ছিঁড়ে দাও ক্ষণেক তরে
তোমার তপন হতে একটি কণক শিখা আমার এ নয়নে ছোঁয়াও,
মাটির মানুষ তোর অবোধ এ ছেলেমেয়ে পীড়ত তাপিত কাঁদে বেদনা ভরে
তোমার এ মহিমার ধূলার এ মলিনতা আলোর জ্যোতিতে রেঙ্গে দাও!

জ্যোতির মুকুল অয়ি লক্ষ তপন জ্বালা লক্ষ বিজলী খেলা মুকুট শিরে
চিরধ্রুবা চিরশুভা মাগো তুই অপরূপা ওগো নভোলীলাময়ী দেবী
অজ্ঞানের জড়িমায় কামনা কলুষ কালো ঘনঘোর তমসায় রেখেছে ঘিরে
তোর দেওয়া জ্ঞানালোকে ওগো মহাজ্ঞানময়ী একবার তুয়া জ্ঞানে সেবি।

একি তোর মায়াজাল কেন এ জীবন লীলা একি শুধু পরিহাস হে নটরাণী?
এই গড়া এই রাখা এই ভাঙ্গা পুনঃ পুনঃ অর্থ কিছুই এর নাই!
আমরা অবোধ শিশু আমরণ নত শিরে আমোঘ বিধান তোর বহিতে জানি
কেঁদে হেসে ভালবেসে দুর্ব্বলের অধিকারে জানি শুধু করিতে বড়াই!

তোমার তপের জ্যোতি ভাগ্যধেয়ানরতা জ্বলিতেছে দুলিতেছে গগন কোলে
সুখদুখ হাসি ব্যথা ইহকাল পরকাল নিমেষে নিমেষে গড়ি নব
আমরা বিমূঢ় শিশু খেলার ঘুঁটির মত আলো আঁধারের ঘরে পড়ি যে ঢলে
কুহেলি কুয়াসা মাখা অন্ধ তিমির ঢাকা ভাগ্যখেলার ঘরে তব!

এই কি জীবন দেবী? বুদ্বুদের মত শুধু দিন দুই ভয়ে ভয়ে শিহরি কায়া
ফুলে উঠে ফেঁপে উঠে তখনি ফাটিয়া যাওয়া এরি নাম মানব জীবন
ধ্যান ধারণায় গড়া মনের স্বরগে রচা ভাব স্বপনের একি মোহন ছায়া
এত হীন, এত ম্লান, এত ছোট এত দীন নহে দেবী নহে তা কখন!

কি যে তোর ছায়ারূপ ধ্যানে তা দেখা মা আজ একবার কায়া দিতে প্রয়াস করি
এ নারী জীবন যেন কাঁদিয়া কাঁদায়ে শুধু একেবারে বিফল না হয়
জীবন থাকিতে দেবী ও তোর মানসরূপে এ হৃদয়ে একবার স্বরগ ধরি
মানব জীবনে ওমা কত যে ধরিতে পারে দিই তারি গূঢ় পরিচয়!

ওগো প্রেমশতদলনিবাসিনী চিরশোভা, ওগো জগতের জ্যোতিঃ কমলাসন
মোদের নয়ন হতে মোহের এ আবরণ ক্ষণেকের তরে খুলে নাও
সৃষ্টিপ্রেমের ঐ অতল বারিধি হতে দাও মা তাপিত প্রাণে করুণা কণা
তোমার ও রূপজ্যোতি তোমার শ্রীমুখভাতি এ আঁধারে বারেক দেখাও !

পথহারা ভারতের চিরজাগ্রৎ ধ্রুবজ্যোতি জ্বলিতেছে ঐ তোর মুকুটমণি
মোদের জীবনঢাকা ঘন তমসার পথে চাই মাগো চাই ওরি আলো
দীপ্তি লভিয়া যেন দীপ্ত করি এ প্রাণে অপরূপ রতনের অরূপ খণি
মানব জীবন ঘন গহন বনের মাঝে জ্বালো দেবী সে প্রদীপ জ্বালো !

মোহন আঙ্গুল দিয়ে মোহিনী পরশ তোর একবার ছুঁয়ে দেখ প্রাণের কোণে
জড়তা অবশ প্রাণে বিজলী শিখার মত ঝরে কি না ঝরে আলোরাশি
পরশ পাথরে তোর কত কি যে সোনা হ'ল তবে সেকি জাগাবে না আমার মনে
অরুণচরণশায়ী স্বর্ণপরাগঢাকা কণক-কমল-প্রেম-হাসি ?

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নানারূপ গুজবের মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম তাহা এই :—হাঁসপাতালে থাকিবার সময় সত্যেনের মনে হয় যে যখন কাশরোগে ভুগিতেছি তখন ত অল্পদিনের মধ্যে মরিতেই হইবে ; বৃথা না মরিয়া নরেনকে মারিয়া মরিলেই ত বেশ হয়। কানাইলাল সে কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পিস্তল লইয়া হাঁসপাতালে আসে। পেটের যন্ত্রণা শুধু ডাক্তারকে ঠকাইবার জন্য ভাণ মাত্র। তাহার পর সত্যেন নরেনকে বলিয়া পাঠায় যে জেলের কষ্ট আর তাহার সহ্য হইতেছে না ; সেও নরেনের মত সরকারী সাক্ষী হইতে চায় ; সুতরাং পুলীসের কাছে কি কি বলিতে হইবে তাহা যদি দুজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করে তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সত্যেনের ছলনায় ভুলিয়া নরেন

তাহাই বিশ্বাস করিল এবং একজন ইউরোপীয় প্রহরী সঙ্গে লইয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটা গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাঁসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাঁসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাঁসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাঁসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে নরেন কোথায় পলাইয়াছে তাহা যদি সে বলিয়া না দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার ডেপুটী জেলার, আসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার সবাই সদলবলে হাঁসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝখানে কানাই এর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ, লাঠি সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন এই পিস্তল আসিল কোথা হইতে? কয়েদীরা গুজব রটাইল, যে বাহির হইতে আমাদের জন্য যে সমস্ত খাবারের টিন বা কাঁঠাল আসিত, তাহার মধ্যে ভরিয়া কেহ পিস্তল পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। কানাইলাল বলিল ক্ষুদিরামের ভূত আসিয়া তাহাকে পিস্তল দিয়া গিয়াছে। প্রেততত্ত্ব-

বিদ্‌দের এক আধখানা বই পড়িয়াছি, কিন্তু ভূতকে পিস্তল দিয়া যাইতে কোথাও দেখি নাই, আর আমাদের স্বদেশী ভূতেরা গৃহস্থের বাড়ীতে ইট পাটখেল ফেলে; খুব জোর কচুপাতায় মুড়িয়া এক আধটা খারাপ জিনিষ ছুঁড়িয়া মারে; সুতরাং পিস্তলের ব্যাপারে ভূতের থিওরিটা একেবারে অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কাঁটাল বা ঘিয়ের টিনও ডাক্তার সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া দিতেন, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া দুই দুইটা রিভলভার আসা তত সুবিধার কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, অফিম, সিগারেট সবই যখন যাইতে পারে, তখন সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়াও ত বিচিত্র নহে!

যাক্ সে কথা। তাহা লইয়া এখন মাথা ঘামাইয়া আর কোন ফল নাই। কিন্তু নরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অদৃষ্ট পুড়িল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সশস্ত্র সিপাহি শান্ত্রী লইয়া ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন আর একে একে আমাদের সকলের তল্লাসী লইয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর ব্যারাকের তল্লাসী আরম্ভ হইল। বিছানার মধ্যে বা এদিক ওদিকে দশ বিশটা টাকা লুকান ছিল। তল্লাসীর সময় প্রহরীরা তাহা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া লইল। আমাদের কাছে ত কিছুই পাওয়া গেল না কিন্তু ইন্সপেক্টর জেনেরাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় পুলিসের কর্ম্মচারীতে জেল ভরিয়া গেল। আরও রিভলভার জেলের মধ্যে লুকান আছে কি না, পুকুরের মধ্যে দুই একটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণা চলিতে লাগিল। আমাদের বড় আশা হইয়াছিল যে রিভলভার অনুসন্ধান করিবার জন্য যদি জেলখানার পুকুরের জল ছেঁচিয়া ফেলে, তাহা হইলে, এক আধদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। অধিকন্তু ইন্সপেক্টর জেনেরাল আসিয়া আবার আমাদের পৃথক পৃথক কুঠরীর (cell) মধ্যে বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া গেলেন। ডিগ্রী খালি করিয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন—"মশায়, এতই যদি আপনাদের মনে ছিল, ত জেলের বাইরে কাজটা করলেই ত হতো। দেখছি ত আপনারা একেবারে মরিয়া; তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন?"

আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে এ কার্য্যের সহিত আমাদের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, হাঁ, তা বুঝতেই পারচি। যাই হোক, আপনাদের যা হবার তা ত হবে; এখন আমার দফা রফা হয়ে গেল!"

এক সপ্তাহের মধ্যেই ৪৪ ডিগ্রী হইতে সমস্ত কয়েদী অন্যান্য জেলে চালান করিয়া আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হইল। জেল যে কাহাকে বলে এতদিনে তাহা বুঝিলাম।

পুরাতন সুপারিনটেনডেণ্টের উপর নরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার পড়িল; তাঁহার জায়গায় নূতন সুপারিনটেনডেণ্ট আসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। পুরাতন জেলার ও ডাক্তার বদলী হইয়া গেলেন। আমাদের হাঁসপাতাল যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। অসুখ হইলে কুঠরীর মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহারও সহিত আর কাহারও কথা কহিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন কুঠরীর মধ্যে খাও, দাও, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। জেলের অন্যান্য অংশ হইতেও কোন লোক ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকিতে চাইত না।

ক্রমে দেশী প্রহরীর পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রি কালে দুইদল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরেও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ লইয়াছিল যে আমরা বোধ হয় জেল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিব!

প্রথম দুইটী কুঠরীতে কানাই ও সত্যেন আবদ্ধ থাকিত। আমরা পাঁচ সাত দিন অন্তর এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে বদলী হইতাম। যখন কানাই বা সত্যেনের কাছাকাছি কোন কুঠরীতে আসিতাম তখন রাত্রিকালে চুপি চুপি তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। দিনের বেলা কাহারও সহিত কথা কহিবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে আধঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পাইতাম; কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা হইত না।

সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কি যন্ত্রণা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। একদিন সুপারিনটেনডেণ্টে সাহেবের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলাম। তিনি দুঃখের সহিত

জানাইলেন যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর তাঁহার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম কানাইলালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময় প্রহরীও বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে কানাই লালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি; অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে—আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন। প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে চিত্ত বৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত!

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা! কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।

কিছুদিন কুঠরীতে বদ্ধ থাকিবার পরে আলিপুরের জজের আদালতে আমাদের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু খোলা হাওয়া খাইয়া ও লোকজনের মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণগুলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুই একজন ভিন্ন মোকর্দ্দমার খরচ জোগাইবার পয়সা কাহারও নাই; সুতরাং অরবিন্দ বাবুর সাহায্যের জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল তাহা হইতেই উকিল ব্যারিষ্টারদের অল্পস্বল্প খরচ দেওয়া হইতে লাগিল। যাঁহাদের অল্প দক্ষিণায় পোষাইল না তাঁহারা দুই চারিদিন পরেই সরিয়া পড়িলেন; শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

হাইকোর্ট ছাড়িয়া আলিপুরে মোকর্দ্দমা চালাইতে আসায় ব্যারিষ্টারদের অনেক অসুবিধা; সুতরাং মোকর্দ্দমা যাহাতে হাইকোর্টে যায় সে জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ হাইকোর্টে গেলে বিচারের ভার জুরির উপর পড়িত। বারীন্দ্রের বিলাতে জন্ম; সে একজন পুরাদস্তুর European British-born subjeet; সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে বিলাতী সাহেবের অধিকার চায় কি না তখন সে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল—না। কাজে কাজেই আলিপুরের জজের কাছেই আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিচারের কে খবর রাখে, আমরা হট্টগোল লইয়াই ব্যস্ত! আদালত খোলার আরও একটা মস্ত সুবিধা এই যে দুপুর বেলা জল খাবার পাওয়া যায়। জেলের ডাল ভাত খাইয়া খাইয়া প্রাণ পুরুষ যেরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে অনন্তকাল যদি এই মোকর্দ্দমা চলিত, তবুও জল খাবারটুকুর খাতিরে তিনি ঐ ব্যবস্থায় রাজী হইয়া পড়িতেন।!

কোর্টে আসিবার ও যাইবার সময় আমাদের হাতকড়ার ভিতর দিয়া শিকল বাঁধা থাকিত। দুপুর বেলা শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গেলে সেই হাতকড়া পরান অবস্থায় পুলীস আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না; কেননা "ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।" যাহার মান নাই তাহার আবার মানহানি কি? কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা

বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন।

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত; আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল, ব্যারিষ্টারের জেরা, পুলীস কর্ম্মচারীদের ছুটাছুটি সবই যেন একটা বিরাট তামাসা! আমাদের হাস্য কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিষ্টারেরা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দ বাবুকে অনুরোধ করিতেন "ছেলেদের একটু থামতে বলুন।" অরবিন্দ বাবু নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ব্যারিষ্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে; ছেলেদের উপর তাঁহার কোনও হাত নাই।

বিচার সংক্রান্ত সব স্মৃতিটাই প্রায় ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে আছে ইন্সপেক্টর শ্যামশূল আলমের কথা। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল। মিষ্ট কথায় কিরূপে কাজ গোছাইতে হয় তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন; তাই ছেলেরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিত—"ওগো সরকারের শ্যাম তুমি, আমাদের শূল। তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু, তুমি দেখবে চোখে সরসে ফুল!" আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পর সরকার বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি করিয়া দেন, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাকে সে পদ-গৌরব অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত আবদর রহমন সাহেবের কথাও মনে পড়ে, কেননা আমাদের জল খাবার জোগাইবার ভার তাঁহার উপর ছিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত তিনিই ছিলেন পুলীশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একমাত্র ভদ্রলোক। আমাদের সম্ভবতঃ দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার মুখে যে করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিত তাহা আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিন্তু এ সমস্ত বাহিরের কথা আমাদের খুব বেশী আন্দোলিত করিত না। আমাদের মধ্যে তখন অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাই তখন আমাদের কাছে মোকর্দ্দমার দৈনন্দিন ঘটনা অপেক্ষা ঢের বেশী সত্য।

আমরা না দামড়া

(গান)

[শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ]

নূতন সাজে সেজেছি আজ
নূতন সভ্য আমরা।
ইঙ্গ-বঙ্গ হাম্বা রবে
যেন শৃঙ্গবিহীন দামড়া।

সস্ত্রীক চতুষ্পদে হাঁটি,
অসভ্যতার জাবর কাটি,
সার করেছি নূতন গোয়াল
শ্বশুর বাড়ীর কামরা।

Independence—দুর্ব্বা খেতে
মনে বড় ইচ্ছা হয়,
কিন্তু ছুটে যেতে গোঠে
মাঠে বড় লাঠির ভয়,
অধীনতার দড়ী ছিঁড়ে,
পালিয়ে একদিন ঠেকেছি রে,
পৃষ্ঠে পাঁচন-বাড়ী, গলায়
বেধেছিল আমড়া।

Rolled goldএর দড়ী ফুঁড়ে
নাক হইতে কাণ অবধি,
কি আরামে বচ্ছি ঘানি,
তৈরী কচ্ছি তেলের নদী ;
কবি বলে "শুধুই কি তাই?
—অধিক বলা বাহুল্য ভাই!—
তোদের ত্বক্ যে Compulsory
জুতো তৈরীর চামড়া।"

সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব

(নক্সা)

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।]

নিখিল বাবু বসন্তপুরের জমিদার। জমিদারী খুব বেশী না থাকিলেও সম্মানটা তাহার অনুপাতে খুব বেশীই ছিল। কারণ, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রেশম কুঠীর সাহেবেরা এবং রেলের গার্ড সাহেব প্রভৃতি গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণ প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত। তিনি এইরূপে কুঠিয়াল সাহেব ও রেলের গার্ড সাহেবের সিঁড়ি বাহিয়া অনেকটা উঁচুতেও উঠিয়াছিলেন। সাহেবদের কাছে তাঁহার একটা খুব বড় রকমের প্রত্যাশা ছিল যে, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া দিল্লীর দোকান হইতে একটা ভাল রকমের লাড্ডু আনিয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নিখিল বাবুর রসনা আজি পর্য্যন্ত "সে রসে বঞ্চিত।" নিখিল বাবু আজি পর্য্যন্ত নিরুপাধি!

নিখিল বাবু খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পাছে দারিদ্র্যকে সম্মান করা হয় এই জন্য তিনি গরীব-দুঃখীকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। বহু গরীব ছাত্র, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা, অন্ধ খঞ্জ ভিখারী কখনও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাইতে পারে নাই। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহার কোন সদ্ব্যয় ছিল না।

তাঁহার বাড়ীতে কুকুর-প্রতিপালনে যাহা খরচ হইত, আমাদের দেশের বড় বড় জমিদারের সংসারে তাহার সিকি ভাগও খরচ হয় না। এই কুকুর ছিল দুই রকম। কতকগুলির লেজ ছিল, কতকগুলির ছিল না। যাহাদের লেজ ছিল, তাহাদিগকে সকলে কুকুর বলিয়াই ভাবিত; আর যাহাদের লেজ ছিল না, তাহাদিগকে সকলে বলিত সারমেয়। কুকুরগুলিকে তিনি লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখিতেন, আর সারমেয়গুলি সোণার ফ্রেমে আটকানো ঠুলি চোখে পরিয়া, সোণার শিকলে বাঁধা থাকিত।

নিখিল বাবু কথায় কথায় আইনের দোহাই দিতেন। এক একটি আইনের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেন যে, বড় বড় উকিল-ব্যারিষ্টারকে তাক্ লাগাইয়া দিতেন। তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন

—এ যুগ, আইনের যুগ। এ যুগে যিনি আইন বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন, তিনিই জীবনে উন্নতি করিতে পারিবেন। তাই তিনি আইনের সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতে আদৌ আলস্য বোধ করিতেন না।

২

বসন্তপুরের জমিদার-বাটীতে প্রতি বৎসরেই মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে নিখিল বাবুর পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে এবারের পূজার ভার নিখিল বাবুর উপর। পূজা এবারে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে নিখিল বাবু একাগ্রমনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। নিকটে কতকগুলি সারমেয় বসিয়া তাঁহার পদলেহন ও চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় তাঁহার পুত্র শচীন্দ্র তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"হাঁ বাবা, এবার পূজোয় কি রকম কি হবে?"

'তাই ত ভাবছি। যে রকম দিন কাল, তা'তে পূজোটা বাদ দেওয়াই ভাল। বরং পৌষ মাসের কোন একটা ব্যাপারে সে খরচটা করা যুক্তি-সঙ্গত।"

বিষন্ন চিত্তে শচীন্দ্র বলিল—

"তা কি হয় বাবা? বছরের এই দিনটাই ত আমাদের দিন। দুর্গাপূজো কি উঠিয়ে দেওয়া চলে?"

নিখিল বাবু পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"ওরে বাবা, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে সকল কাজ কর্‌তে হবে। দেশটা বাঙ্গলা, কাল ত বুঝতেই পাচ্চিস, আর পাত্র—আমরা জমিদার। দুর্গাপূজো আমাদের এখন না করাই ভাল।"

"তা'তে দোষ কি?"

নিখিল বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"পূজোটা রাজসিক—বুঝলি—পূজোটা রাজসিক।"

"দুর্গাপূজো ত চিরকালই রাজসিক। তা'তে হ'ল কি? না বাবা, পূজো বাদ দেওয়া হবে না।"

"ছেলেমানুষী করিস্‌নে শচীন, একটু ভেবে দেখ,—বুঝতে পারবি। ও সব মারামারি কাটাকাটি পূজোর মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

পিতার সহিত তর্কে পাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, এই ভাবিয়া শচীন্দ্র ক্ষুন্ন

মনে তথা হইতে চলিয়া গেল। নিখিল বাবু পুত্রের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন। প্রায় সকলেই তাঁহার কথাতে সায় দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি, মহামহোপাধ্যায় মশায়, কি করা যায়?"

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় একটি কৌটা হইতে নস্য লইয়া নাসিকার উদর-পূর্ত্তি করিতেছিলেন। বদ্ধ-নাস অবস্থায় উত্তর দিলেন—

"জগদম্বার অর্চ্চনাটা যখন সম্বচ্ছরই হ'য়ে থাকে, তখন এবারে বন্ধ দেওয়াটা সুগত হয় না। পূজোটা রাজসিক আকারে না করে' সাত্ত্বিক ত হ'তে পারে। বা আবার ব্রহ্মময়ী।"

"মা আমার ব্রহ্মময়ী" নিখিল বাবু বলিলেন—"বাঃ বেড়ে বলেছেন পণ্ডিত মশায়, মা আমার ব্রহ্মময়ী। তবে ত মাকে নিরাকারেও পূজো করতে পারা যায়? কিন্তু তার চাইতে সাত্ত্বিক ভাবটাই যেন আমাদের পক্ষে বেশী খাপ খায়। আচ্ছা সাত্ত্বিক পূজোয় কি রকম কি হবে?"

পণ্ডিত মহাশয় নস্যভরা নাসিকা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন—

"পূজোর উপকরণের কোনো অগ্গই বাদ যাবে না। কেবল রক্ত চন্দন বাদ দিয়ে শ্বেত চন্দন আলতে হবে।"

নিখিল বাবু সম্মতি সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—

"তা ঠিকই। রক্ত-চন্দনটাতে বেশ একটু উত্তেজনার ভাব আসে বটে। আচ্ছা, আর আর?"

"আর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমিও আপানার সগেগ সগেগই আছি।"

৩

নিখিল বাবু সাত্ত্বিক দুর্গোৎসবে সম্মত। প্রতিমা গড়িবার জন্য গোয়াড়ী হইতে কারিগর আসিয়াছে। নিখিল বাবুর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। নিখিল বাবু চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ওহে ও কারিগর!—শুনছ? ওহে ও! কথা শুন্‌তে পাচ্ছনা?—কালা নাকি? ওহে! তুমি ত ভারী ইয়ে দেখচি। ওহে ও কারিগর!"

অনতি বিলম্বেই কারিগর তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে উত্তর করিল—

"আজ্ঞে, বাবু!"

"কোথায় গেছ্‌লে?—হাঁ দেখ কারিগর, তোমাকে দুটো কথা বল্‌তে আমি এসেছি। তোমরা অবিশ্যি বড় জায়গার বড় কারিগর। কিন্তু শোন। দেখ—এই দুটো পুতুলকে খুলে ফেলে দাও।"

কারিগর বিনীত ভাবে বলিল—

"কেন হুজুর, কোন-কিছু খুঁৎ হ'য়েছে নাকি?"

"না, বিশেষ কিছু খুঁৎ নয়। রাজসিক পূজোতে ওসব লাগে কিন্তু আমার এটা সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব কি না? বুঝলে?

"তা'ত বুঝলাম বাবু, কিন্তু এ রকমটা আর কখনো তৈরী করিনি।"

"করনি শিখ। আর দেখ—এই পাখীটাকেও খুলে ফেল। ফেলে, আমি যা, যা, বলি,—কর।"

"আজ্ঞা করুন।"

নিখিল বাবু প্রতিমার সম্মুখস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া কারিগরকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, দুখানা বাকারী নাও। নিয়ে এক একখানা বাকারীর দুই মুখ জুড়ে বেশ গোল গোল চাকার মত কর। তারপর একটা বাঁশের ডগার খানিকটা কেটে ঐ দুটোর সঙ্গে যোগ করে দাও। আর, বুঝলে—এই—

"আজ্ঞে হুজুর, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া নিখিল বাবু পকেট হইতে পেন্সিল ও কাগজ বাহির করিয়া জিনিষটা কি এবং কিরূপ হইবে, তাহার একটি নক্সা আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন—

এটা বেশ রং করে' ঐ পাখীটার যায়গায় বসিয়ে দিও।"

"যে এজ্ঞে।"

"আর দেখ কারিগর, তোমাদের একটা বড় ভুল হ'য়ে যায়, ঐ গণেশটা তৈরী করতে। গণেশটা বড়ই unnatural—বুঝলে?—বড়ই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তা'তে না হয় পশু, না হয় মানুষ, না হয় দেবতা। ওটাকে একটু স্বাভাবিক কোরো। আর দেখ, আমি ওবেলা আবার এসে যা যা করতে হয়, সব বুঝিয়ে দিব। তুমি এখন এবেলা এইগুলো সেরে ফেল।"

কারিগর নম্রভাবে বলিল—

"আজ্ঞে ওবেলা আমাকে বারেয়ারীর প্রতিমা খানা 'দোমেটে' করতে হবে।"

"বারোয়ারী !"

"আজ্ঞে হাঁ।"

,'কোথায় ?"

"আজ্ঞে, গ্রামেই।"

৪

অপরাহ্ন। নিখিল বাবুর বৈঠকখানায় তাঁহার পার্ষদগণ এক একটি চায়ের পেয়ালায় "সুবোধ বালকের" মত "মনোনিবেশ" করিয়াছেন এবং "যাহা পাইতেছেন, তাহাই খাইতেছেন।" আর, গ্রামের বারো জন ইয়ার মিলিয়া যে বারো-ইয়ারীর ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নানা ভঙ্গীতে তাল ফেরতা গানের মত তাহারই আলোচনা হইতেছে। নিখিলেশ্বর বাবু জনৈক পার্ষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই বারো জন ইয়ার কে কে বল্‌তে পার, মনোরঞ্জন বাবু ?"

কেহই ইহার যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। দেখা গেল—পার্ষদেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটু আড়নয়নে চাহিলেন মাত্র। অবশ্য এই নয়ন ভঙ্গিমা নিখিল বাবুর অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবু একটু তাল সামলাইয়া বলিলেন—

"ঐ সব ওপাড়ার চাষাদের ছেলেরা হবে বোধ হয়।"

"চাষাদের ছেলে বলছেন কেন, মনোরঞ্জন বাবু।" বলিতে বলিতে শচীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল। মনোরঞ্জন বাবু শচীন্দ্রকে দেখিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। শচীন্দ্র বলিতে লাগিল—

"হাঁ মনোরঞ্জন বাবু, অবিনাশ আপনার ছেলে না ? নিজেকে চাষা বলে বেমালুম পরিচয় দিয়ে দিলেন ?"

অবিনাশ শচীন্দ্রের বাল্যবন্ধু। সে বারোয়ারীর প্রতিমার কাছে সকল সময়েই উপস্থিত থাকিত।

বারোয়ারী পূজার প্রতি পুত্র শচীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নিখিল বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে শচীন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ শচীন, তুমি বুদ্ধিমান। কালেজে পড়ছ। ভেবে দেখ—বারো জন লোক একত্র হওয়াটা ভয়ঙ্কর বে আইনী! unlawful assemblyর সেই

ধারাটা দেখাব কি?—যাক্,তুমি যেন ও সব বারোয়ারী টারোয়ারীর মধ্যে যেও না। বারো জন লোক এক মত হ'লে, তাদের উপর Conspiracyর charge আনা যেতে পারে, তা জান?"

শচীন্দ্র বিনীতভাবে বলিল—

"অত আইন-কানুন জানিনে বাবা! তবে যারা বারোয়ারী পূজো করে, তাদের ত কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য—মায়ের পূজো আর তার সঙ্গে একটু আনন্দ করা।"

নিখিল বাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—

শোন, তোমাকে আমি 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুটো উদ্দেশ্যই যে খারাপ, তা' আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমতঃ, দেখ, দুর্গাপূজোটাই মারামারি কাটাকাটির পূজো; শান্তিভঙ্গ ও রক্তপাত কথায় কথায়। আর আনন্দ করা?—শুনছি নাকি কার যাত্রা আসছে। তা'তে 'পালা' হবে—রাবণ বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, আর দধিচীর অস্থিদান। যাত্রা হ'লে হাজার হাজার লোক এক জায়গায় জড় হবে। আর ঐ 'পালা'গুলো কি শান্তিপূর্ণ? যাত্রার দলের সৈন্যেরা ত যুদ্ধ করেই, অধিকন্তু বক্তৃতায় এতই উত্তেজনা এনে দেয় যে, জুড়িরা পর্য্যন্ত আপনা-আপনির ভিতর যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। যদি জীবনে উন্নতি কর্‌তে চাও—ও সবের মধ্যে যেয়ো না। এবার বি, এ পাস কর্‌তে পারলেই তোমাকে আমি ডেপুটী করে দিব।' যাও, আমাদের প্রতিমাখানা একবার দেখগে। সাত্ত্বিক ভাবে দুর্গোৎসব করা যায় কি না, একবার দেখে এস। এতে শক্তিপূজোও হবে, অথচ কোন রকম উত্তেজনা আসবে না।"

শচীন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ্যাদিকল্প। নিখিল বাবুর অন্তঃপুরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্রের মাতা নিখিল বাবুকে বলিতেছেন—

"তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল, বল দেখি? বাড়ীতে দুর্গোৎসব। মা আমাদের দুর্গতি দেখে বছর বছর দয়া করে' এসে থাকেন। তাঁকে অপমান করে' বসলে?"

নিখিল বাবু সসঙ্কোচে বলিলেন—

অপমানটা আবার কোথায় হ'ল?"

কুপিতা ফণিনীর মত শচীন্দ্রের মাতা শির উত্তোলন করিয়া উত্তর দিলেন—

"হ'ল না? দুর্গোৎসব করতে বসেছ। অথচ, প্রতিমা দেখে সকলের উত্তেজনা আসবে বলে' সিংহ-অসুরকে তুলে ফেলে দিয়েছ। আবার শুনলুম—ময়ূরটিকে তুলে দিয়ে কার্ত্তিককে বাইসাইকেলের উপরে বসিয়েছ, কার্ত্তিকের হাতের ধনু-শর ফেলে দিয়েছ।

"বুঝলে,—ও সব অস্ত্র শস্ত্র না থাকাই ভাল।"

"তবে তার ডান হাতে একটা চুরুট দিয়ে দাওগে না কেন? বাঁ হাতখানা ত সাইকেল ধরেই আছে। ছিঃ!"

নিখিল বাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন। শচীন্দ্রের মাতা বলিতে লাগিলেন—

"মায়ের দশ হাতের অস্ত্রগুলোও ফেলে দিয়েছ,—তাও শুনেছি, একটা কাজ করলে না কেন? তাঁর এক এক হাতে এক এক রঙের উল, কুর্শী, কাঁটা, কার্পেট দিলে না কেন? কেমন?"

এইবারে নিখিল বাবু ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

"দেখ, আমি সাত্ত্বিক ভাবে পূজোটা করতে গিয়েছিলাম কি না, তাইতে—"

"ও সব ভিরকুটী আমি শুন্‌তে চাই না। পূজোর যাতে কোন রকম অঙ্গহানি না হয়, তাই কর। তুমি যেমন কতকগুলো কুকুর আর বাঁদর নিয়ে দিনরাত কাটাও; আর তাদের পরামর্শ মত চল, আমি ত আর তা পারিনে। আমার ঘর সংসার ছেলে মেয়ে আছে। মায়ের ইচ্ছার উপরে তাদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। দেখো, পূজোর যেন কোন রকমে ত্রুটি ক'রে আমার শচীনের অমঙ্গল ডেকে এনো না।"

বলিতে বলিতে শচীন্দ্রের মাতার নয়ন-কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু উভয় গণ্ড দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র দুই বিন্দু অশ্রু, প্রবল বন্যার শক্তিতে নিখিল বাবুর আইন-কানুন সমুদায়ই ভাসাইয়া দিল। নিখিল বাবু সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন—

"কিন্তু আজ ষষ্ঠী। হঠাৎ প্রতিমা পাই কোথায়?"

শচীন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে নীরবে বসিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"বারোয়ারীর সেই প্রতিমাখানা?"

নিখিল বাবু বলিলেন—

"তারা দেবে কেন?"

শচীন্দ্রের মাতা হাসিয়া শান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"বারোয়ারী নয় গো। তোমাদের পরামর্শ শুনে, আর তোমার প্রতিমা-তৈরীর রকম বুঝে আমিই সেই প্রতিমাখানি তৈরী করিয়েছি। অনেকেই জানে বারোয়ারী। কিন্তু তা নয়।"

জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।]

জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ দলের এই সব যুক্তি, প্রতিবাদ ও তার আনুসঙ্গিক ভুল ভ্রান্তি খণ্ডন করাই যথেষ্ট নয়; জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমরা কি বুঝি, ভারতে জাতীয় শিক্ষা কোন্ মূল তত্ত্ব (principle) ধরে কি রূপ নেবে, কাজেই বা তা কেমনটি হয়ে গড়ে উঠবে বা কোন্ উপায় অবলম্বনে জীবনের কোন্ মোড়টুকু ফেরালে তা সার্থক হবে তাই আমাদের বুঝে স্থির করতে হবে। এইখানেই প্রকৃত বাধা বিপত্তির আরম্ভ—একাজ এইখানেই কঠিন, কারণ শুধু শিক্ষায়ই নয়, আমাদের সমস্ত জীবন-ধারায় (cultural life) বহুকাল থেকে আমরা জাতীয় ভাব ও প্রেরণা হারিয়ে বসে আছি। এ পর্য্যন্ত শুধু শিক্ষায়ই নয়, সকল বিষয়েই আমাদের তেমন স্পষ্টভাবে গভীর ও যথাযথ ভাবে তলিয়ে দেখা বা ভাবা হয় নাই, যাতে আমরা সে হারাণ জাতীয় প্রেরণা ফিরে পেতে পারি এবং সেই কারণেই এ সবের অপরিহার্য্য মূল ভিত্তিই হোক অথবা শাখা প্রশাখাই হোক, কোন দিকেই মতের একটা স্পষ্ট ঐক্য বা অনৈক্য কিছুই ফুটে ওঠে নি। আমরা এ বিষয়ে খুব খানিকটা ভাবের ঢেউ, একটা অস্পষ্ট অপরিণত ধারণা আর সেই ভাবের অনুযায়ী উত্তেজনা নিয়েই তুষ্ট; আর তাকে রূপ দিতে গিয়ে বুদ্ধি-জীবী আমাদের চিরকেলে বুদ্ধির পুরাণ ছাঁচ, আমাদের অভ্যাস ও খেয়ালের বশে হাতের কাছে যা' পেয়েছি তাই দিয়েই গড়তে গেছি। তাই তার কোন স্থায়ী ও

প্রত্যক্ষ সফলতা তো হয়ই নি, বরঞ্চ হয়েছে যথা সম্ভব গণ্ডগোল ও ব্যর্থতা। প্রথমতঃ আমাদের বোঝা দরকার জাতি-আত্মা, জাতি-প্রকৃতি, জাতির স্বভাব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কিসের সার্থকতা চায়, সেইটি বুঝে এই শিক্ষা-সমস্যার সকল দিকের সহিত সামঞ্জস্য রেখে তার প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই অনুসন্ধানে সফল-কাম হ'লে আমরা বর্ত্তমান মিথ্যা অন্তঃসার-শূন্য কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে একটা কিছু ব্যর্থ অসার এলেমেলো জিনিস বা একটা নতুন মিথ্যা কৃত্রিমতা না গড়ে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত জীব ও সৃজনাধার ভাবী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলতে পারি।

শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বহুকালের সযত্নপুষ্ট ভ্রান্তি ও কদর্থ আছে, প্রথমে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ, মূল লক্ষ্য ও স্বরূপটি তা থেকে পৃথক করে নিতে হবে। কারণ তা' হ'লেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনা পাকা হয় এবং আমরা কথাটির প্রকৃত অর্থের ধারণা করে কার্য্যতঃ ফুটিয়ে তুলতে পারি। প্রকৃত শিক্ষা কি, প্রকৃত শিক্ষা কি হওয়া উচিত, তা যদি একবার স্থির হয়, তা হলে জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ নির্দ্ধারণ অতিশয় সহজ হয়ে আসে। আমাদের গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করতে গেলে সত্য ও জীবন্ত শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ তিনটি জিনিসের উল্লেখ করতে হয়,—প্রথম মানুষ, অর্থাৎ তার অসাধারণত্ব ও সাধারণত্ব নিয়ে ব্যক্তিত্বের ভূমিতে মানুষ, দ্বিতীয়তঃ জাতি এবং সর্ব্বশেষ বিশ্বমানব। এক মাত্র তাই সত্য ও জীবন্ত শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে তার সকল অন্তর্নিহিত বৃত্তি ফুটিয়ে তুলে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছে দেয়—যে শিক্ষা তার সঙ্গে তার জাতির জীবন মন ও আত্মার সম্বন্ধকে নিবিড় করে তোলে এবং শুধু তাই নয়, যে বিশ্বমানবের জীবন মন ও আত্মার সে একটি অঙ্গমাত্র—তার জাতিও যার অভিন্ন অঙ্গ হয়েও ভিন্ন, তারই সমগ্র স্বরূপের সঙ্গে সেই ব্যষ্টির নিবিড় নাড়ীর যোগ জাগিয়ে তোলে। আমাদের শিক্ষা ঠিক কি রকম হবে এবং জাতীয় শিক্ষার দ্বারা আমরা কিই বা সাধন করবো তা এই ভাবে মূল তত্ত্বের বৃহৎ ও সমগ্র দর্শনের ফলেই গড়ে উঠবে। জাতির দৃষ্টির এই সমগ্রতা—জাতির ভিত্তির এই বিশালতা আজ কাল অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতেই বেশী দরকার। কারণ এই জীবনের সন্ধিক্ষণে নতুন ভাগ্য গঠনের দিনে এ জাতিকে তার সমস্ত জীবন প্রেরণা ও শক্তিধারাকে—তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্মাকে খুঁজে বের করে গড়ে তুলতে সার্থকতার পথে নিয়োগ করতে হবে এবং এই পথে ভারতের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে ভারত তার হারাণ ধন ফিরে পেয়ে মানব-জাতি পরিবারের মধ্যে নিজের অধিকার ও পদ গ্রহণ করবে।

মানুষ ও তার জীবন, জাতি ও তাঁর জীবন, বিশ্বমানব এবং সেই মহামানবের জীবন সম্বন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ সম্ভব, সেই পার্থক্যগুলি অবলম্বন করে শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের আদর্শ ও চেষ্টা একান্তই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। ভারতেরও নিজস্ব একটি আদর্শ একটী জীবন-স্বপ্ন আছে, শিক্ষার মূলে সেই জাতিগত সত্য সেই চির জীবনের সুখস্বপ্ন রয়েছে কি না, আমাদের সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ তাহাই আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জাতীয় করে তুলবে। ভারত মানুষকে কখনও এ ভাবে দেখে না যেন মানুষ একটি চেতন দেহ—সে জড় প্রকৃতির গড়া যন্ত্রে কতকগুলি প্রাণ-তরঙ্গের বাসনাই যেন খেলছে, যেন সে একটি অহং চেতনা, একটি মন ও বিবেক বুদ্ধি, অথবা মানব নামধেয় পশু—যেন পশু জাতির অন্তর্গত মানব, আবার সেই পশু মানবের মাঝে ভারতবাসী বলে এক জীব সুশিক্ষিত মন ও বিবেক বুদ্ধির নিয়ন্ত্রিত্বে যেন তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন তারই ব্যক্তিগত ও জাতিগত অহংকারের পরিপুষ্টি ও বাসনা ক্ষুধা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্যই ব্যয় করতে হবে। ভারত কখনও মানুষকে বিচার-শক্তিতে শক্তিমান পশু বলে গ্রহণ করে নাই; মানুষকে জড় প্রকৃতির মনোময় সন্তান বলে—চিন্তা ভাব ও ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত জড় সত্ত্বা বলে দেখে নাই, সেইজন্য ভারত মানুষের শিক্ষাকেও কখনও কেবলমাত্র মনো বৃত্তির অনুশীলন বলে গ্রহণ করতে পারে নাই, ভারতের ধারা তা নয় যাতে মানবকে একটি রাজনীতিক সামাজিক ও অর্থনীতিক জীব বলে ধরে নিতে পারে; এইরূপ ভাবে বা ধারায় মানুষকে দেখলেই তার শিক্ষাকে সেই শিক্ষা বলে মনে হয়, যে শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিপুণ সুশিক্ষিত ও অর্থকরী পুরজন-রূপে গঠন করে। এ সকলই বহুমুখী মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দিক (aspects); ভারত এগুলিকেও তার বিশাল আদর্শের অন্তর্গত করে উচ্চ আসনই দিয়েছে; কিন্তু এগুলি বাহিরের জিনিস,—মন, জীবন ও কর্ম্ম যন্ত্রের অঙ্গ বা অভিব্যক্তি মাত্র, মানবের প্রকৃত স্বরূপও তো নয়ই, সমগ্র স্বরূপও নয়।

ভারত চিরদিনই দেখেছে—প্রতি মানবের মাঝে তার ব্যক্তিত্বের আধারে একটি প্রস্ফুট আত্মাকে মন ও দেহ কোষে আবৃত সেই ভাগবত সত্ত্বারই অংশ রূপে, প্রকৃতির জড় মাঝে অনন্ত বিশ্বময় আত্মসত্ত্বার একটি জ্ঞানময় স্ফুরণ

রূপে, ভারত মানবের আধারে পৃথক পৃথক রূপে অনুশীলন করেছে মন, বুদ্ধি, নীতির মানুষকে, শক্তি কর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যরসের মানুষকে, এমন কি প্রাণ ও জড় দেহ-তরঙ্গের সুখ-পতঙ্গ মানুষকেও সে অবহেলা করে নাই; কিন্তু ভারতের চক্ষে এ সকলি আত্মারই শক্তি, এদেরই মধ্যে সে দেখে আত্মারই স্ফুরণ; ইহাদেরই পরিপোষণে তারই পুষ্টি; কিন্তু সে সমগ্র অখণ্ড আত্মধন কেবল এইগুলিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় নাই, কারণ অনুশীলনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মানুষকে যে এ সকলের অনেক বড় এক আত্মময় সত্তা বলে পাওয়া যায়; এই আত্মস্বরূপে অধিরোহনেরই বলে ভারত যে মানবের পূর্ণ অভিব্যক্তি—তার চরম ভাগবত্তা—তার পরমার্থ—তার সর্ব্বোচ্চ পুরুষার্থ পেয়েছে। ব্যক্তিকে যেমন, তেমনি ভারত কোন বিশেষ জাতিকেও সে চক্ষে দেখে নাই, যাতে শুধু জাতীয় অহংকারের সেবায় উৎসর্গিত—জীবন সংগ্রামে সশস্ত্র ব্যূহবদ্ধ রাষ্ট্রচক্র বলে প্রতিভাত হয়। অহংকারের সে লৌহ বর্ম্মে সে মুখসে সে ছদ্মবেশে জাতি পুরুষকে বন্ধনে ক্ষুণ্ণ করে মাত্র; ভারত জাতির মধ্যে দেখেছে—দেশবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্ঘ-আত্মা রূপে; সেই সঙ্ঘ-আত্মাই আপন প্রকৃতি, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম বিকাশ করে তার বুদ্ধি, নীতি শিল্পকলার রসজ্ঞানে, তার শক্তি সমাজ ও রাজনীতিক ধারায় ও জীবনে তাকে রূপ দিয়েছে। তেমনি আমাদের মহামানবত্বের আদর্শও ভারতের ধারার অনুযায়ী হওয়া উচিত—অর্থাৎ ভারতের সেই সনাতন সত্যদর্শনেরই অনুযায়ী যাতে সে মানব জাতির মধ্যে তার জীবনে ও মনে চিরদিন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণামে অনন্তকেই অভিব্যক্ত হতে দেখেছিল। মূল ভাবটি হবে আধ্যাত্মময়।—সংঘর্ষ ও সমবেদনা এ দুইয়ের ভিতর দিয়েই ভারতের দেশ-আত্মার সেই অখণ্ড একত্বের অভিমুখী গতি পাওয়া যায়। সে গতির মধ্যে ভারতের অন্তর্গত বহু জাতির বাঞ্ছিত বহু ভঙ্গিম বিচিত্রতাও হারায় না অথচ অভিজ্ঞতা ক্রমশঃই বেড়ে চলে; সে গতির মাঝে ব্যষ্টির শক্তির অনুশীলন ও ক্রম-পরিণতি এবং দেবত্বের অভিমুখী ব্যষ্টির চলা—এই সবটুকুতে জাতি-আত্মার পূর্ণত্বের অনুসন্ধানই ফুটে ওঠে; তবে ব্যষ্টির গতি জাতি-পরিণতিকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে চলে না, সমষ্টি-জীবনের সুরে সুর বেঁধেই ব্যষ্টির গান বাজে। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে, যে, এই কি ব্যষ্টি বা জাতিপুরুষের প্রকৃত পরিচয়? কিন্তু এই দর্শন এই বিবরণ একবার সত্য বলে ধরে নিলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে তাই প্রকৃত শিক্ষা, যাতে দেহ মন ও আত্মার অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যষ্টি ও জাতি গড়ে

তোলে। এই মূল ভিত্তি এই মুখ্য ও নিয়ামক আদর্শের উপরই জাতীয় শিক্ষার সৌধ রচনা। এ সেই শিক্ষা, যার মূল লক্ষ্য হবে—ব্যষ্টিতে তার আত্মার সহস্রমুখী শক্তি ও সম্ভাবনার প্রকাশ, জাতিতে তার আত্মার ও ধর্ম্মের রক্ষা বলবিধান ও পুষ্টি এবং ব্যষ্টি ও জাতি এই দুইয়েরই মহামানবের শক্তিতে জীবনে আত্মার অধিরোহণ। এ সেই শিক্ষা—যা মানুষের আত্মার—অন্তঃপুরুষের বোধন ও পরিণতির এই যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, তা' কখন হারায় না!

আর্য্য

প্রলয় রূপ

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ।)

তব জটাজূট
আজিকার মেঘেরঙ্গে হেরি পরিস্ফুট।
একি তব কণ্ঠ শোভী নাগনেত্র শিখা
মুহুর্মুহু আঁকিদেয় বিদ্যুতের রেখা
সকল আকাশে? ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।
সংক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস সম উন্মাদ পবন
দিগ্বিদিকে ছুটে যায় তুলি হাহাকার,
উদ্দাম তাণ্ডবে একি গঙ্গাবারিধার
জটাটুটি' লুটি' পড়ে সারা বিশ্বময়।
জলদে ডম্বরু ধ্বনি ঘোষিছে প্রলয়।
অনন্ত অরূপ
সসীমে অসীম একি মিলায়েছ রূপ!
দূর অতিদূর হ'তে পরাণের পাশে
তোমার প্রলয় রূপ আপনা প্রকাশে

পতিতার সিদ্ধি।

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫

এখন তাহাকে চারুই বলিব। তা সে 'বালা'ই হোক কি 'শীলা'ই হোক। অন্ধকারে অন্ধকারেই চারু রাখুকে লইয়া চলিল, অন্ধকারে অন্ধকারেই তাহাকে উপরে তুলিল;—সে যেন আজি আলোক দেখিতে ভয় পাইতেছে অথবা অন্ধকারে আলোকে দেখিতেছে। রাখু কিন্তু আর অন্ধকার পছন্দ করিতেছে না। বহুক্ষণ কোন কিছু দেখিতে না পাইয়া সে যেন দৃষ্টিহীন হইবার মত হইয়াছে। সে মনে করিতেছিল—তামাক আনিতে না বলিয়া ঝিটাকে এখন চারুর একটা আলো আনিতে বলা উচিত ছিল।

যাই হোক প্রথমে চারুর হাত, পরে চারুর কাঁধ ধরিয়া সে উপরে উঠিল। বারান্দায় পা দিতেই সে দেখিতে পাইল, একটা ঘরের ভিতরের দীপ্ত আলোকে বাড়ীর উপরের অনেকটা স্থান যথেষ্ট আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়া তাহার বোধ হইল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও দেখিতে ঠিক নূতনের মত। আর একটু দেখিতেই সে বুঝিল, বাড়ী শুধু নূতন নয়, সুন্দরও বটে। বাঁকুড়ার পল্লীবাসী,—শুধু ঐটুকু অনুভূতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার সে পূর্ব্বোক্ত ঘরেই স্থান পাইবে মনে করিল। সেইটে মনে করাই তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু একমাত্র সেই ঘরটাতেই আলো ছিল। ঘরটা ছিল তাহার উঠিবার পথের ডান দিকে। চারু কিন্তু তাহাকে সেদিকে লইয়া গেল না। বাম দিকের বারান্দায় চলিতে অনুরোধ করিল। ইচ্ছাটা সেরূপ না থাকিলেও রাখু তাহার অনুসরণ করিল। একটা অন্ধকারময় ঘরের দ্বারের কাছে তাহাকে লইয়া চারু বলিল—

"এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।"

বলিয়াই দু' একপদ চলিতেই সে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখুর চক্ষু তাহার অনুসরণ করিল। একটু পরেই

সে দেখিল, সম্মুখের সেই আলোকিত ঘরের দ্বার-মুখে কালো জল ভেদ করা পদ্মের মত কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য চারুর মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে মুখের শুধু সে একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাইল। একখানি ছোট মুখে যেন পল্লবে ঢাকা একাংশ—তথাপি রাখুর হঠাৎ চিত্তটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভয়,—রাখু মনে মনে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিল। তাহার মনে হইল, একটু সাহসের সহিত বাহিরের ঝড়ে ঝাপ দেওয়াই তাহার উচিত ছিল। তাহা হইলে এতক্ষণ সে বাসায় পৌছিতে পারিত।

কিন্তু এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, ঝড়ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাখুর বস্ত্র অনেকটা সিক্ত হইয়াছিল, তাহার গাও শীত শীত করিতেছিল, তথাপি চারুর ফিরিবার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অতি শীঘ্র চারুর ফিরিবারই সে প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আর যে বাহির হইতে চাহেনা। রাখু তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বৃষ্টির উচ্ছ্বাস খাইতেছিল। তাহার কাপড় চাদর এবারে ভালরূপই ভিজিল, বস্ত্রপ্রান্ত হইতে জল পড়িতে লাগিল এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির ছিল, এইবারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

সেখানে তাহার দেহের কম্পনটা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু চিত্তটা তাহার সহসা বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে নারায়ণ স্মরণ করিতে গিয়া বুঝিল, সে সায়ং সন্ধ্যা করিতে ভুলিয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে অদৃষ্ট দোষে আজ সে পড়িয়াছে, সেখানে আহ্নিকের সরঞ্জাম—মনে করাও বে-আদবী; আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে গায়ত্রী জপিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা অনামিকার গোটা দুই পর্ব্ব অতিক্রম করিল মাত্র। সেইখানে সে তাহাকে লুকাইয়া নিশ্চিন্তের মত বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার মন চারুর সেই এখনো না দেখা ঘরখানি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার একটি ক্ষুদ্র পল্লী, একখানি একটি ছোট 'মেটে' বাড়ীর সম্মুখে রাখুকে দাঁড় করাইয়া যখন তাহার মন তাহার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রুর প্রতিষ্ঠা করিতেছিল, তখন ঘরের বাহির হইতে ঝিয়ের কথা এক অল্পপলে চারুর বাড়ীর সেই আঁধার-ভরা ঘরে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

"কই গো ঠাকুর মশায় কোথায় আপনি ?"

"এই যে ঘরের মধ্যে আছি।"

বলিয়াই রাখু আবার জপ কার্য্য আরম্ভ করিল। একহাতে একটা পিলসুজ, অন্যহাতে একটা ধুচুনীর ভিতরে দীপ লইয়া ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া একটা কোণে, বাতাসে না নিবিয়া যায়, পিলসুজটি বসাইয়া তাহার উপরে প্রদীপটী বসাইল। সেটা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, তথাপি তাহারই আলোকে রাখু দেখিল—ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে আসবাব পত্র কিছুই নাই; এমন কি বসিতে হইলে মেঝে ভিন্ন সেখানে একখানা ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত ছিল না। ঘরের সেরূপ অবস্থা দেখিয়া রাখু একটু বিরক্তি বোধ করিল! সেই বিকাল হইতে দাঁড়াইয়া সে এতই ক্লান্ত হইয়াছিল যে, আর তাহার না বসিলে চলে না। ঈষৎ বিরক্তির সহিতই সে বলিল—

"মেঝেতেই বসব না কি?"

ঝি বলিয়া উঠিল—

"না না, তাকি হয়? দিদিমণি আপনার বিশ্রামের সব আয়োজন করে আনছেন।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই চারু একটা গালিচা লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ঝিকে বলিল—

"ঘরটায় ঝাঁটা দিয়েছিস কি?"

"দেবো কখন, এইতো সবে ঘরে ঢুকলুম।"

বলিয়াই ঝি ঝাঁটা আনিতে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু বারবার যাতায়াত এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। জলের ছাটে বারান্দা সব ভাসিয়া যাইতেছিল। দ্বার হইতে বাহির হইয়াই দেবতাকে আর এক প্রস্থ গালি দিয়া ঝি আবার ভিতরে আসিল। অগত্যা চারু হাত দিয়া কতকটা স্থান যথাসম্ভব পরিষ্কার করিল, এবং গালিচা পাতিয়া রাখুকে একখানা গরদের কাপড় দেখাইয়া বলিল—

"এইখানা পরে' ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল। এ কাপড়ের আজও কোন ব্যবহার হয়নি।"

ঝি বলিল—

"একটা বালিশ আনলে না?"

"কোথায় বালিশ? থাকলে আর আনতুম না?"

"কোথায় বালিশ কি গো!"

তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া চারু রাখুকে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে আবার অনুরোধ করিল। তথাপি তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল—

"আমি মিছে বলি নাই। কাপড় আমি আমার মাসীর জন্য আনিয়েছিলুম।"

"তবে আমাকে দিচ্ছ কেন?"

"তাহার ভাগ্যে থাকে—আবার আনিয়ে দিব।"

আসল কথা—ঘৃণার জন্য রাখু কাপড় লইতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল না। চারুকে দেখিয়া বিস্ময়মগ্নতাই তাহার দাঁড়াইয়া থাকার কারণ। আলোটা ভাল জ্বলিতেছিল না, তাহার উপর পোড়া ঝি মাঝে পড়িয়া আলোর পথটা একেবারেই রোধ করিয়াছে। তথাপি সে দেখিল, মেয়েটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া তাহার মূর্ত্তির এ পরিবর্ত্তন হইল, প্রদীপের সেই ক্ষীণ আলোকে সে বুঝিতে পারিতেছিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাখু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া সেইটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। দ্বিতীয়বারের অনুরোধে চমক ভাঙ্গিতেই সে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে গালিচার উপর বসিয়া পড়িল।

"আঃ! বাঁচলুম। তিন ঘণ্টার ভিতরে একটী বারের জন্যও বসতে পাই নি। চারু, তোমার কল্যাণ হোক।"

"কল্যাণ হবে?"

এত ভক্তি যার, ভগবান নিশ্চয়ই তার কল্যাণ করেন—এইটুকু মাত্র বুঝিয়াই রাখু আশীর্ব্বাদের কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছিল। চারুর প্রশ্নে কিন্তু সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবে, সেটা সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার এমন বাড়ীতে বাস, এমন পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন নরম গালিচা—যাহা সে এর পূর্ব্বে কখনও চক্ষে দেখে নাই—তাহার পরিধানের জন্য যে এমন একখানা ভাল গরদের ধুতী একদণ্ডে বাহির করিয়া আনিল, উপরে ঝি, নীচে চাকর, ঐ তো নাকে একটা অতি আশ্চর্য্য কি সূর্য্যালোকে ভরা কচুপাতের মাথার জলবিন্দুটার মত জ্বল জ্বল করিতেছে;—এ সমস্তের মালিক যে, তার আবার নূতন কল্যাণ কি হইবে? সত্য সত্যই রাখু উত্তর দিতে নিজেকে অশক্ত বোধ করিল। সে ক্লান্তিবশে আকাশ-বালিশে যেন ঠেস দিয়া হেলিয়া পড়িল।

চারু আর তাহাকে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিল—

"ব্যবহারের বালিশ আনতে ভরসা করছি না।"

"তোমার ব্যবহার?"

চারুর কথার অর্থ না বুঝিয়া বোকা বামুন তাহাকে এমন একটা প্রশ্ন করিল যে, তৎক্ষণৎ একটা জবাব দেওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে যেন কথাটা শুনিতে পাইল না। বারবিলাসিনীর ঘরের উপাধান, নিশ্চিত সে কেমন করিয়া বলিবে যে, একমাত্র সেই তাহা ব্যবহার করিয়াছে। অন্য একটা কাজের অছিলায় দ্বোরের কাছে গেল। দেখিল—ঝি চৌকাটে দাঁড়াইয়া হাতটা বারান্দায় বাহির করিয়া ঝাঁপ্‌টার তীব্রতার পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়া চারু তাহাকে বলিল—

"মরবার তোর যদি এতই ভয়, তা হ'লে তুই যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। ওঁর সেবা আমিই করব এখন।"

ঝি বাস্তবিক ঝড়ের ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল না। সে পূর্ব্বে দিদিমণির অনেক লীলা দেখিয়াছে, আর সে জানে—এইরূপ দিদিমণি-জাতীয়া নারীর লোকভেদে লীলাভেদ। ইহারা বাবুর সম্মুখে বাবুয়ানী দেখায়, পণ্ডিত প্রভুর কাছে পণ্ডিতার পরিচয় দেয়, এদিকে আবার বৈষ্ণব প্রভু পাইলে নাকে তিলক ও হাতে মালা দিয়া বৈষ্ণবী হয়,—মদ মাংসের নামেই তখন তাহাদের বমনেচ্ছা আসে। সুতরাং দিদিমণির এও একটা লীলা বুঝিয়া সে কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল। দেখিতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না। একটা ভিখারীর মত বামুনকে সে এমন যত্ন দেখাইতেছে কেন? সে অনুমান করিতেছিল—এই ছোট ময়লা কাপড় পরা ভিখারীবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক, নইলে দিদিমণির তাহার সেবায় এত আগ্রহ কেন? এটাও সে জানে—কলিকাতায় ঐ বামুনের মত বেশ করা এমন অনেক মহাজন আছে, যাহারা দিদিমণির পোষাক-পরা গাড়ী চড়া বাবুর মত দশ বিশ জনকে বাজারে কিনিতে বেচিতে পারে। ঝি বুঝিল, এ বামুনটাও সেইরূপ এক আধটা মহাজনেরই মত ধনী হইবে। তবে ব্রাহ্মণ বোধ হয়, এই প্রথম বারাঙ্গনার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখনও নিষ্ঠা ছাড়িতে পারে নাই, তাই দিদিমণিও নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বালিশ না থাকার রহস্যটাও সে বুঝিয়া লইল। পাঁচজনের ব্যবহারের বালিস দিদিমণি ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করিতে দিবে না। একটা বালিশের সন্ধান তাহার জানা ছিল। সেটা

চারু একদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে কিন্তু সেটাকে আজও পর্য্যন্ত ব্যবহার করে নাই। সুতরাং চারুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া সে চৌকাটে পা দিতেই ঝি তাহাকে চুপি চুপি বালিশের কথাটা শুনাইয়া দিল। চারু বলিল—

"সেটা নিয়ে আয় দিকি?"

উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

একটু পরেই চারু ফিরিল। এক হাতে তার একটা পিতলের 'মেছ্‌লী' অন্যহাতে ঘটী, সে দুটা আনিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া রাখু উঠিয়া বসিল এবং বলিল—

"ঘটী তুমি আমার হাতে দাও, আমি বারন্দা থেকে পা ধু'য়ে আসি।"

"বাইরে যাবার উপায় নেই" বলিয়া চারু তাহার পাদুটো মেছলী'র উপর তুলিয়া অতি সন্তর্পণে ধুইতে বসিয়া গেল।

চারুর মুখে কথা নাই। রাখুরও মুখে কথা নাই। একজন মাথা হেঁট করিয়া, আর একজন তাহার মুখখানা দেখিবার জন্য তীব্র অভিলাষে মাথা তুলিয়া। প্রদীপটা যেন ঝড়ের ভয়ে ঘরের কোণে মুখে লুকাইয়া সন্তর্পণে অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। সে আলো-আঁধারে রাখুর দৃষ্টির কোনও মূল্য রহিল না। সে বুঝিতে পারে নাই—চতুরা বারাঙ্গনা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে মুখ দেখিতে দিতেছে না। প্রদীপটাকে পিছন করিয়া এমন ভাবে সে বসিয়াছে যে, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা আপাততঃ রাখুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অগত্যা মুখ দেখার চেষ্টা ছাড়িয়া সে আপনার পায়ের দিকেই চাহিল। দেখিল—চারু এইবার একটি ধপ ধপে কাপড়ের মত কি দিয়া তাহার পা মুছাইতেছে। বস্তুটা তোয়ালে। রাখু ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তোয়ালে দেখে নাই। সে এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ পাইতেছিল না। তোয়ালেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়া সে দেখিল—চারুর হাতে কোন অলঙ্কার নাই। তৎপরিবর্ত্তে দুই হাতে দুটি গোল শাঁখা। আর বাম হস্তে শাঁখার পার্শ্বে স্ত্রীলোকের আয়তী-চিহ্ন 'নোয়া'।

দেখিয়া রাখু বিস্মিত হইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর সীমন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষীণ দীপশিখা তাহার দৃষ্টি হইতে সিন্দুর-বিন্দু

লুকাইতে পারিল না। দৃষ্টিটাকে নামাইয়া আবার তাহার হাতের উপর আনিতে রাখু দেখিল, চারু একখানি ডলডলে কস্তাপেড়ে সাড়ী পরিয়াছে।

"চারু!"

মুখ না তুলিয়াই চারু উত্তর দিল—

"উঁ।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"বল।"

"তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি,—তোমার কি স্বামী আছে?"

"এসে বলছি।"

বলিয়া ঘটী, মেছ্‌লী, তোয়ালে তুলিয়া চারু যেন সর্ব্ব দেহটা এক পাকে ঘুরাইয়া উঠিয়া গেল। দীপটা কি-জানি-কেন এই সময় হঠাৎ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাখু দেখিল—পিঠের স্থানভ্রষ্ট কাপড়ের পার্শ্ব দিয়া একরাশ মুক্ত কেশ শ্রাবণ ঘন মেঘের মত যেন তড়িদ্দণ্ডে বাঁধিয়া উড়িতেছে। চারু চলিয়া গেল, দীপটা নিবিয়া গেল!

অন্ধকারে পা গুটাইয়া হাতের পাতায় ভর দিয়া গালিচার উপর হেলান দিতে রাখু বলিয়া উঠিল—

"দুমুঠো আতপ চাল আর কাঁঠালী কলা মাত্র যার দিনের উপার্জ্জন, হা ভগবান, তাকে তুমি এ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখালে কেন?"

এইবারে অন্ধকারটা রাখুর ভাল লাগিল। সে মনে মনে বলিল—"থাক্ প্রদীপ তুই নিবে'। তোর জ্বলবার প্রয়োজন চলে' গেছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। স্বপ্ন ঘুমের জিনিস, তাকে খোলা চোখে দেখে পাগল হ'তে যাই কেন?"

কেশের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে রাখু সত্য সত্যই চারুর পৃষ্ঠদেশটা কতকগুলো বিদ্যুৎ-রেখার মত দেখিয়াছিল। বাস্তবিক চারুর যদি ঐরূপই বর্ণ হয়, আর সেই বর্ণের যোগ্যতার ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়া হয়, তাহা হইলে চারুর মত সুন্দরীর ঘরে সেই দুর্দ্দান্ত ঝড়ে আশ্রয় লইয়া সে নিশ্চয় আজ আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছে।

রাখু চক্ষু মুদিল, কিন্তু তারা দু'টা তার চক্ষুপলককে ভিতর হইতে বিঁধিতে লাগিল। তাহারা অন্ধকারের উপর অন্ধকারের চাপে পড়িয়া শুষ্ক হইতে চাহিল না। বিপন্নের মত আবার সে চোখ মেলিল। চাহিতেই দেখিল—

সম্মুখের ঘর হইতে একটা আলোর ছায়া-মাখানো রশ্মি তাহার কাপড় চাদরের উপর পড়িয়া যেন কাঁদিতেছে। সেটা দেখা তাহার সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি সে দুটাকে তুলিয়া বাড়ীর বারান্দায় নিক্ষেপ করিতে গেল। সেই দুটার অপরাধেই তো রাখু আজ চারুর অমন আলোকিত ঘরে স্থান পাইল না! তাহার ঘরে যদিও একটা প্রদীপ আসিল, তা সেটাও তাহাকে দরিদ্র বুঝিয়া পলকের জন্য একটা রহস্যের হাসি ছড়াইয়া নিবিয়া গিয়াছে।

দুর্দ্দশার অভিমান অন্ধকারকে তাহার আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিজের দেহটাকেই যখন সে দেখিতে পাইতেছে না, মনটা পর্য্যন্ত যখন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, জাতটা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তার দারিদ্র্যের প্রবল সাক্ষী কাপড় চাদর দু'টাই কেবল তাহার মুখের পানে চাহিয়া কপট কান্নার রহস্য করিবে কেন?

ফেলিবার পূর্ব্বে কাপড়খানা নাকের কাছে আনিতে সে দেখিল, চারুর পাতা আঁচলে বসিবার ফলে তাহার বস্ত্রে গন্ধমাখা হইয়া গিয়াছে। বাসার সমস্ত লোকের টিট্‌কারী খাইবার জন্য এ কাপড় পরিয়া সে কিরূপে বাসায় ফিরিবে? আসুক অন্ধকার, ঘনতম অন্ধকার। সে তাহার পল্লীজীবন হইতে চারুর দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একবার নিমেষের চিন্তায় ভ্রমণ করিয়া আসিল। দেখিল,—কতকাল হইতে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া করিয়া আজ যেন হঠাৎ সে ঝুপ করিয়া সাত হাত অন্ধকারের নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার চোখে এইবার জল আসিল। দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া কাপড় চাদর বারান্দার এক ধারে যেমন সে রক্ষা করিতে গেল, অমনি প্রবল বাতাসে গোটাকয়েক তীক্ষ্ণ জলবিন্দু তাহার ভিজা চোখের উপর আঘাত করিল। অন্ধের মত তখন সে দেহটাকে যে কোন এক দিকে নিক্ষেপ করিয়া গালিচার উপরে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ তাহার আগেই অবসন্ন হইয়াছিল, এখন তাহার চিন্তাগুলা পর্য্যন্ত অবসাদ-গ্রস্ত হইল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া তালে-তালে-আগত ঝড়ের ঘুম পাড়ানো গান অবিলম্বেই তাহার বহিঃসংজ্ঞা বিলুপ্ত করিল।

পায়ের উপর এক সুকোমল স্পর্শ কতকগুলা জালা-ভরা অনুভূতির ভিতর দিয়া রাখুকে আবার জাগ্রতের দেশে টানিয়া আনিল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল—ঘরে বেশ আলো জ্বলিতেছে কিন্তু প্রদীপকে আড়াল করিয়া পায়ের কাছে কে বসিয়া।

"কে, চারু ?"

"বড় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছ বলে' ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করি নি।"

জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার গালিচার উপরে রাখা মাথা ঘুমের ঘোরে কেমন করিয়া একটি ছোট বালিশের উপর উঠিয়াছে। চারু তাহ'লে তো দুটি হাত দিয়া তাহার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়াছে. তার পর তাহার সেই ঘুমকে আশ্রয় করিয়াই চারু আবার চুরি করিয়া তাহার পদসেবা করিয়াছে! করিয়াছে নিশ্চয়, নইলে ঘরের ভিতর এত স্থান থাকিতে চারু তাহার পা দুটির পার্শ্বেই বসিয়া থাকিবে কেন?

ঘুমটার উপর বিরক্ত হইয়াই যেন রাখু উঠিয়া বসিল। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উঠিতেই রাখু এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিল এ মুখ দেখার আগ্রহ তাহার না রাখাই ভাল ছিল। কেন না দেখা মাত্র বাহিরের সেই প্রচণ্ড ঝড়ে কতকগুলো রন্ধ্রের আর্ত্তনাদ তাহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। চারুর মুখশ্রী তাহার সৌন্দর্য্যের গান কোন স্বরে গাহিয়াছিল, জানি না। রাখুর দৃষ্টি কিন্তু তাহা দেখা মাত্র তাল মান হারাইয়া স্থির হইয়া গেল।

চারু সেটা বুঝিতে পারিল;—বুঝিয়া প্রথমটা যেন একটু শঙ্কিত হইল। কিন্তু বারবিলাসিনীর অভ্যাসসিদ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় যখন সে বুঝিল, রাখুর সে মুগ্ধের চাহনিতে কোন ভয় নাই, তখন সে নিজের চিরাভ্যস্ত মদালস চাহনির ভারে রাখুর দৃষ্টিকে মেঝের দিকে নামাইয়া অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। এইবার সে কোণ হইতে প্রদীপের আধারটাকে গালিচার কাছে লইয়া আসিল। তারপর আর একবার মেছ্‌লী ও জলপূর্ণ ঘটিটা রাখুর নিকটে আনিয়া বলিল—

"নাও, এইবার হাত মুখ ধু'য়ে ফেল।

নীরবে হেঁট মাথায় রাখু তাহার আদেশ পালন করিল। তাহার দেওয়া আর একটা নূতন তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিল।

চারু সেগুলা খানিকটা দূরে রাখিয়া একটা গড়গড়া লইয়া আবার রাখুর কাছে আসিল।

"তামাক সাজা আছে, টিকে ধরিয়ে দিই ?"

রাখু গড়গড়াটার দিকে একবার সন্দেহ-দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র। চারু তাহার কথার আর অপেক্ষা না করিয়া দীপটাকে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করিল এবং টিকে ধরাইতে ধরাইতে বলিল—

"গড়গড়া নতুন, নল কল্কে নতুন, গঙ্গাজলে গড়গড়া ভরে' এখনো পর্য্যন্ত কারো ব্যবহার না করা তামাক সেজে এনেছি। এতেও কি তোমার আপত্তি আছে ?"

"কোন আপত্তি নেই, চারু!"

"কেবল বালিশটে একদিন মাত্র ব্যবহার করেছি। মনে করেছিলুম, তাও দোব না কিন্তু তোমার শোবার কষ্ট দেখতে পারলুম না।"

"তুমি ভালই করেছ। আমি কিন্তু এমনি অবাধে ঘুমিয়েছি, কখন যে তুমি বালিশ এনে আমার মাথায় দিয়েছ—বুঝতে পারি নি।"

"দেখি তোমার মাথাটা গাল্‌চের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাত দিয়ে তাই বালিশের উপর তুলে' দিয়েচি।"

বলিয়াই চারু কলিকাটাকে গড়গড়ার উপরে বসাইয়া নলটা রাখুর হাতের কাছে রাখিল।

রাখু নলটা হাতে করিতে একবার গড়গড়ার পানে চাহিল। তার পর গালিচা, বালিশ, পরিধেয় গরদ সমস্তগুলা এক নিমিষে দেখিয়া লইল। সর্ব্বশেষে বালিশটায় হেলান দিয়া নলটা মুখে দিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর মুখের পানে চাহিল। চারু অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"তারপর ?"

কতকাল যেন সে তামাক খায় নাই, এমনি আগ্রহে সে গড়গড়া টানিতে বসিয়া গেল। চারুর প্রশ্নে প্রথমে সে কোনই উত্তর দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই তামাক টানিতে লাগিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আমার কথা শুনতে পেলে কি ?"

"পেয়েচি, কি বলতে চাও, বুঝেচি।"

"কি করব ?"

"কি বলব ?"

"আমি তো সাহস করে' এখানে আপনার খাবার কথা মুখে আনতে পারি না।"

'তুমি' ছাড়িয়া আবার চারু 'আপনি' ধরিল। বার কয়েক অন্যমনস্কের মত টান দিয়া রাখু সেটাকে গালিচার উপরে রাখিল। চারু দেখিয়াই বলিল—

"তামাক খান। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করব না।"

চারু তাহাকে পীড়াপীড়ি না করুক, ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র ভীষণ প্রজ্জলিত ক্ষুধা রাখুকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। চারুর কথা তাহাকে দ্বিগুণ বেগে জ্বালাইয়া তুলিল। তাহার আবাল্যের সংস্কার কিছুতেই চারুর আতিথ্য গ্রহণে সম্মতি দিতেছিল না। আপদ্ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পতিতার ঘরে সে যে আশ্রয় লইতে সাহস করিয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সে কথাও সে কাহারও কাছে কস্মিন্ কালেও প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার যে ব্যবসা, কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্তের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা—লোকে ঘৃণাক্ষরে চারুর ঘরে তাহার রাত্রিবাস জানিতে পারিলে আর কেহ তাহাকে করিতে দিবে না। সেই সকল পরিবারের মেয়েরা নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার সঙ্গে আলাপাদি করে, এমন কি একমাত্র তাহার সঙ্গে ঠাকুর-ঘরে কত সময় একা একা কাটাইয়া দেয়। তাহার এ দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, কোন বাড়ীর গৃহিণী তো আর কন্যা-পুত্রবধূদের তাহার নিকটে রাখিতে সাহসী হইবে না।

এতক্ষণ রাখু মুগ্ধ ভাবেই তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিল। এই খাবার কথাটা তুলিতেই তাহার যেন চৈতন্য ফিরিল। এইবারে সর্ব্বপ্রথম তাহার বোধ হইল, ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া বাসায় চলিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া চারুর মোহাকর্ষণে তাহার ঘরে আশ্রয় লইয়া সে বড় দুঃসাহসিকের কাজ করিয়াছে।

তথাপি সে চারুর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়াছিল—চারু তাহাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিবে। এখন বুঝিল—এ পতিতা তাহাকে নিষ্ঠাবান বুঝিয়া, সামান্য দু'একটা অনাচমনীয় মিষ্টান্নও দিতে সাহসী হইতেছে না।

রাখু এক একবার নলটা মুখে দিয়া টানে, আবার গালিচার উপরে রাখে। আবার টানে—আবার রাখে। কি যে সে উত্তর দিবে, বুঝিতে পারিতেছে না। চারু নীরবে মাথাটা নীচু করিয়া তাহার সুমুখে বসিয়া। এবারে রাখু সে অবনত মুখের পানেও চাহিতে সাহসী হইতেছে না। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল, রাখু তামাকের শেষ ধুমাটি পর্য্যন্ত টানিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আর তাহার কথা না কহিলে চলে না। সে এইবারে প্রসঙ্গের ছলে জিজ্ঞাসা করিল—

"রাত কত?"

"দশটা অনেক্ষণ বেজে গেছে।"

"ঝড় কি থামবে না?"

"এখনও তো থামেনি বরং বেড়েছে।"

ঘরের চারিদিক বন্ধ বলিয়া রাখু ঝড়ের প্রকোপটা এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়া যে শব্দ আসিতেছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছে—ঝড় নিতান্ত সামান্য নয়। সে শুধু কথায় চারুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার ঘরে কে আছে?"

"ঝি।"

"বাবু আসতে পারেন নি?"

"আসতে পারবে না, চাকর দিয়ে বলে' পাঠিয়েছে। হঠাৎ জ্বর হয়েছে।"

"কখন সে এসেছিল?"

"আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।"

"আমাকে কি সে দেখে গেছে?"

"আমি তাকে ডেকে দেখিয়েছি। আমি একা আছি মনে করে' বাবু আমাকে আগলাবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিল।"

একটু শঙ্কিতভাবে রাখু বলিল—

"সে তো তাহ'লে বাবুকে গিয়ে বলবে!"

"তা' বলবে বৈ কি। তাকে তো ফিরে যাবার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

"তা হলে?"

"তা হ'লে কি বলুন?"

"এখন কি যাওয়া যায় না?"

"ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চান কি?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। সত্য সত্যই তাহার ভয় হইল। তাহার থাকার কথা শুনিয়া যদি চারুর বাবু সেখানে আসিয়া তাহার অপমান করে কিম্বা তাহাকে বাড়ী হইতে সে দুর্য্যোগে বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তো সেই ঝড় জলেই তাহাকে নিজের পথ দেখিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া একটা স্ত্রীলোকের কাছে সে ভয় পাইবার কথা কেমন করিয়া বলিবে? খানিকটা চুপ রহিয়া সে বলিল—

"না ভয় পাব কেন?"

"তাই বলুন, আপনি আছেন এই সাহসে তাকে চলে' যেতে বলেছি। নইলে একমাত্র ঝিকে আশ্রয় করে' এই দুর্য্যোগের রাতে এত বড় বাড়ীতে থাকতে পারব কেন?"

"কেন, তোমার মাসী?"

"সে আমার ওপর রাগ করে' শ্রীক্ষেত্রে গেছে।"

বলিয়াই পাছে রাখু তাহার মাসীর সম্বন্ধে আরও দু' পাঁচটা প্রশ্ন করে সে কথা ফিরাইয়া বলিল—

"তা' যা হোক, আপনাকে ঘরে ধরে এনে দেখছি—আমি বড়ই গর্হিত কাজ করেছি।"

"আমার যাবার কথা শুনে তুমি কি আক্ষেপ করছ?"

"আক্ষেপ করবার আমার কিছু নেই। আপনার যদি যাবার কোন উপায় থাকতো, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।"

কথাটা রাখুর মনে আঘাত করিল। বুঝিল, সে যে তাহার ঘরে জলগ্রহণ করিতে এত সঙ্কোচ দেখাইবে, এটা সে পতিতা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে বোধ হয় এত আগ্রহ করিয়া তাহাকে সে ঘরে আনিত না। বামুনের ছেলে এবার বিষম সমস্যায় পড়িল। তাহার সেবা রাখুকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে বেশ করিয়া দেখিল—এ বয়স পর্য্যন্ত এক মা ছাড়া আর কারো কাছে সে এ রকম যত্ন পায় নাই। যত্ন?—তাহার মায়ের মৃত্যুর পর একমাত্র অনাদরই তার নিত্য প্রাপ্য বস্তু ছিল। সংসারের কত দিক হইতে কত ভাবে যে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া সে যদি সেগুলাকে এক পার্শ্বে রাখে, আর এই হঠাৎ-চোখে-পড়া হীন বেশ্যার দু'দণ্ডের স্নেহ ও যত্ন অপর পার্শ্বে রাখিয়া দুইটা ব্যবহারের তুলনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রসাদ মুখে দিলেও বুঝি রাখুর ব্রাহ্মণত্ব তাহার গলার ত্রিদণ্ড সূতার বাঁধন ছিঁড়িয়া তাহাকে পতিত করিয়া পলাইতে পারে না। তাহার উপর ব্রাহ্মণের যে একায়ত্ত উপজীবিকা যাজন কার্য্য আগে হিন্দু সমাজে এক অতি সম্মানের বস্তু ছিল, কলিকাতায় আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝিয়াছে, এখানে সে কাজের সামান্য মাত্রও সম্মান নাই। বড় লোকের ঘরের একটা খানসামার মর্য্যাদাতেও তার অধিকার নাই। আর ব্রাহ্মণত্বের সম্মান? আজই তো বড় লোকের বাড়ীর দ্বারদেশ হইতে সে তাহা ঘাড়ের বোঝাস্বরূপ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সামান্য একটু জল মুখে দিয়া চাক্ষুর ক্ষোভ দূর করিলে কি এমন

মূল্যবান সম্পত্তি চিরজীবনের মত তাহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, রাখু সেটা বুঝিতে পারিল না। কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একটু জল খাইবে,—রাখু মনে স্থির করিল। কিন্তু—তথাপি সঙ্কোচ—খাবার কথা বলিতে রাখুর মুখ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এক বলিতে সে আর বলিল—

"যদি সত্য বলতে হয়, তা হ'লে বলি তোমার এখানে আমি পরম সুখে আছি। তবে কি না, এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই করা হয় নাই। সেই জন্যই যাবার ইচ্ছা করছিলুম।"

"আমি তা' জানি! সেই জন্য আমি আহ্নিকের আয়োজন করে রেখেছি। ঐ দেখ।"

বাস্তবিকই রাখু দেখিল—ঘরের এক পার্শ্বে পাতা একখানা আসন, আর তাহার সম্মুখে একটা কোশা! পতিতার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখিয়া সে অবাক্ হইল। সে আবার চারুর মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

চারু কিন্তু অন্য রকম বুঝিল। সে মনে করিল—বুঝি তাহার উপর ঘৃণায় রাখু তাহার আনীত পূজা-পাত্র ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহার মনে এবার ক্রোধের উদয় হইল। তখন পতিতার অভ্যাস সিদ্ধ বক্রোক্তিতে কথায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল –

"কি হে অধ্যাপক ঠাকুর, আমার ছোঁয়া গঙ্গাজলও ছুঁলে জাত যায় নাকি? অত নিষ্ঠে যখন তোমার তখন বেশ্যার দোরে এসে ধর্ণা দিয়েছিলে কেন?"

তাহার ক্রোধ হইয়াছে বুঝিয়া রাখু বড়ই দুঃখিত হইল। সত্যই তো, পতিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কোনও অপরাধ করে নাই। অপরাধ যদি হইয়া থাকে তো সে রাখুর নিজের। সে তাহার ঘরে না আসিলেই তো পারিত। দীনভাবে তখন সে বলিল—

"না চারু, আমি সেজন্য তোমার মুখের পানে চাই নি। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে অবাক্ হ'য়ে তোমার পানে চেয়েছিলুম।"

"আহ্নিক করুন।"

রাখু পূজার আসনে বসিল। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সে চক্ষু মুদিয়া বহু চেষ্টায় বারদশেক গায়ত্রী জপিয়া লইল। আসল কথা চারুর মুখের তীব্র কথা শুনিবার পর হইতেই তাহার প্রাণটা কেমন হু হু করিয়া উঠিয়াছে। জপ করিতে বসিয়া সে চারুকে দেখিতে দু' একবার মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা করিল।

সাহস হইল না। তাহার বাড়ীর দ্বারের প্রথম দর্শন হইতে ক্ষণেক পূর্ব্বের তাহার ভ্রুকুটি-রঞ্জিত মুখ দেখা পর্য্যন্ত রাখু তিনবার চারুকে তিন রকম দেখিয়াছে। এবার দেখিলে আবার যদি সে মুখ আর এক রকম নূতন হইয়া যায়। আর সে মধুর মায়াবিনীর নূতন রূপ দেখিতে রাখুর সাহস হইল না। সে গায়ত্রী জপের পর গঙ্গাজলে হাত দিয়া চক্ষু মুদিয়া চারুর রাগ-রাঙ্গা মুখখানি ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান শেষে সে দেখিল, তাহার সম্মুখের কোশার গঙ্গাজল হাত বাহিয়া তাহার চোখে উঠিয়া আঁখি-প্রান্ত দিয়া অশ্রু মূর্ত্তিতে ঝরিতেছে।

পাছে চারু দেখিতে পায়, শশব্যস্তে রাখু দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখে—চারু নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল—গালিচার অপর প্রান্তে আর একটি সুন্দর চিত্রিত আসন, তাহার সম্মুখে নানাজাতীয়—সে জীবনে কখন দেখেও নাই—ফলমূল মিষ্টান্ন ভরা অতি সুন্দর শ্বেতপাথরের থালা; আসন পার্শ্বে সেইরূপই শ্বেত বরণের ঢাকনী দেওয়া শ্বেতবরণের গেলাস, আর গেলাসের পার্শ্বে একটি রূপার ডিবে।

দেখিবামাত্র রাখু সমস্তই বুঝিল। এইবারে বর্ষার উচ্ছ্বাসে তাহার চোখে জল আসিল, হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আজীবন অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ যুবক আজ সর্ব্বপ্রথম মমতার স্নিগ্ধতলে আশ্রয় পাইয়াছে। চিরদরিদ্র রাখুর বোধ হইল—চারুর ক্রোধ সংক্ষুব্ধ বাণীর মধুরতা উপভোগের জন্য দেবতারা তার মুখের কাছে সে সময় অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারুর অতিথি হইবার জন্য রাখু তড়িৎ-প্রেরিতের মত আসন ছাড়িয়া উঠিল। এই বেশ্যা-রূপিণী দেবকন্যার দয়ায় মাথাইয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব উজ্জ্বলতর করিবার সে সংকল্প করিল। রাখু আপনাকে আরও দৃঢ় সংকল্প করিবার জন্য নিজেকেই শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"আজ আমার নিরর্থক দম্ভভরা বামনাইকে এই নারীর করুণাঞ্চলে মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিব।"

কিন্তু হায়, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বিধান করিয়া চারু বুঝি দারুণ অভিমানে উঠিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাজিরা *

[প্রসাদ.]

সম্মুখে আঁধার ঘন, সবে সন্ধ্যা, পড়ে' সারা রাতি,
সম্মুখে ভীষণ বন, দুর্গম—দুর্গম পথ অতি।
এ পথে চলিতে হবে, হে যাত্রী, হাজির;
দূর হ'তে বলে যাত্রী—"হাজির, হাজির।"

এক, দুই, তিন, চার, দশ, বিশ, এক শ,' হাজার,
অযুত, নিযুত, কোটি,—বাকী কে রহিল তবে আর?
"সকলেই বাকী গুরু, একমাত্র আমি,
এখনও পথে তারা ঘুরিতেছে স্বামি!"

এক তুমি, দুই তুমি, দশ, বিশ, এক শ,' হাজার,
লক্ষ তুমি, কোটি তুমি - বাকী কে রহিল তবে আর?
এবারে চলিতে হবে, হে যাত্রী, হাজির!
"পদতলে নতশির, হাজির হাজির।"

একা তোমা যেতে হবে এ অরণ্যে সোজা পথ দিয়ে,
যেতে হবে অন্ধকারে আলোকের স্থর বেঁধে নিয়ে;
সম্মুখে রাখিবে দৃষ্টি ফিরিবে না আর,
পশ্চাৎ পশ্চাতে রবে—পথ ক্ষুরধার।

বুদ্ধি তুমি, গতি তুমি, স্থিতি তুমি, রতি তুমি, প্রাণ,
এ অরণ্যে এক তুমি—দাতা তুমি, দেয় তুমি, দান,
নদী তুমি, স্রোত তুমি, পার তুমি, তীর,
পান্থ তুমি, পথ তুমি।—কোথা তুমি ধীর!

• • • •

এস প্রিয়, এস সখা, রম্য কুঞ্জে বিপুল আলোকে,
হে আনন্দঘন মূর্ত্তি, বক্ষে আজ বাঁধিব তোমাকে
দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ মোর, গণ্ডে বহে ধারা,
দেখিতে না পাই—হেথা আসিতেছে কারা?

"কই কা'রা? কোথা কা'রা? পদপ্রান্তে দেখ তুমি স্বামি,
আঁধারের বন ভেঙ্গে একমাত্র আসিয়াছি আমি।"
এক নও, পশ্চাতে চাহিয়া দেখ বীর,
কোটি কণ্ঠে কারা বলে "হাজির হাজির।"

সুখের ঘর গড়া।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।)

দশম পরিচ্ছেদ

প্রবল-প্রতাপ মহামহিম রতন রায় তখন তাঁহার খাস্ কামরায় বা দেয়ানি খাস মহালের আরাম কক্ষে বিশাল ফরাশের উপর একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ায় একপাশ হইয়া বিপুল ভুঁড়িটাকে বামদিকে ঢালিয়া দিয়া মুদিত নয়নে আলবোলার নল মুখে দিয়া তাম্রকুট ধূমে "রাজা হওয়ার খেয়াল রচনা করিতেছিলেন। খাস্ মোসাহেব গেঁড়া সরকার অদূরে একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পরম উৎসাহে পুরাণো একটা বাঙ্গালা খপরের কাগজ হইতে সংবাদ সহযোগে কর্ত্তার সেই ফেনার গোলকটী ফুঁ দিয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছিল। খপরের কাগজটীতে ইংরাজি নববর্ষের উপাধি তালিকা ছিল। গেঁড়া তাহা হইতে বাছিয়া দুইটী ভাগ্যবান সরকারী প্রসাদভোগীর নাম করিল। একজন হইতেছেন চিংড়েঘাটার পত্তনীদার গজেন্দ্র গঞ্জন টহলদার, দ্বিতীয়টী হইতেছেন, বকৃশীডাঙ্গার ইচ্ছারঞ্জন পাকড়াশী। গজেন্দ্রগঞ্জন রাজা-বাহাদুর হইয়াছে; আর ইচ্ছারঞ্জন রাওবাহাদুর তো পূর্ব্ব বছরে হইয়াই ছিলেন, এ বছর নাকি "এ-ছি-ও-ছি-" উপাধি পাইলেন!

রতন। এ ছিঃ ও ছিঃ কি হে? এমন টাইটেল্ তো শুনিনি?

গেঁড়া। আজ্ঞে কর্ত্তা এটা নাকি নতুন তৈরি হয়েছে যারা 'ছিয়াই' বা 'কে ছিঃ এ ছাই' পাবার মত বড়দরের নয়, মাঝারি রকমের জমীদার তাদের জন্যে এটা তৈরি হয়েছে—ছোটলাট নাকি ভারত ছেক্রেটারীকে লিখে পাঠান এমন সব জমীদার আছেন যাঁদের আয়ের চেয়ে দেনা বেশী, আর দেনার চেয়ে দান বেশী তাদের মর্য্যাদা মাসিক উপাধি দেওয়া উচিৎ—তাই এইটে নতুন হয়েছে—

রতন। ওর মানে কি?

গেঁড়া। তা কর্ত্তা ইংরিজি তো তত জানিনি বল্‌তে পারিনি; তর্কসিদ্ধান্তর ভাগ্নে পঞ্চুকে মানে জিজ্ঞেস করলাম তা সে ভেবে বল্লে মানে হচ্চে সব গুণবান সমান, এও ছিঃ ও-ও-ছিঃ

রতন। ছোকরা তো খুব ফাজিল বটে—

গেঁড়া। খ্যাপা কর্ত্তা খ্যাপা—যেমনি মামা তেমনি ভাগ্নে; খনার 'বচন তো মিথ্যে নয় নরানং মাতুল ক্রমঃ—তর্কসিদ্ধান্তটী ভিজে বেরাল—খ্যাপা বল্‌লে ভুল হয়—কর্ত্তার তো অবিদিত নেই—

এমন সময় মহেশ ও জীবন ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া ফরাশের এক পাশে বসিল। কথা পাড়িবার সুযোগ আপনা হ'তে আসিয়াছে দেখিয়া মহেশ গেঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিল—

ম। তর্ক সিদ্ধান্ত তো? যত না পাগল তার দশগুণ—না থাক্ ভট্‌চাজ আবার দাদার নিন্দে শুনে চট্‌বে—

জীবন। চট্‌বো কেন? হক্ কথা বলবেন তার কি? দাদা আছেন দাদাই আছেন; অন্নদাতা তিনি নয় তো?—আমি তো কর্ত্তার কাছে ভাইরএ কীর্ত্তি শুনাতে এসেছি—

রতন। কে ভট্‌চাজ যে, কি খপর? কি কীর্ত্তি দাদার?

জীবন। আজ্ঞে কর্ত্তার শরীর কেমন?

রতন। আর কেমন! ভাঁটা পড়েছে, চড়া দেখা দিচ্ছে আর কি!

গেঁ। তবে সুমুদ্দুরের জোয়ার ভাঁটা এই যা—কি বল পিসেবাবু?

রতন। দাদার কি কীর্ত্তি ভট্‌চাজ?"

জীবন। বলুন না চৌধুরী মশাই—

ম। তুমিই বল না—

রতন। কি মুস্কিল! যে হয় বল না—সোজা কথা যা বুঝি—

ম। জমীদারী চালানো এক গুখোরী ব্যাপার—মান খাতির চক্ষু লজ্জা—

রতন। কি বিপদ! চৌধুরী কি দম্ বেশী দিয়েছ নাকি? সোজা কথাটা—

ম। কথাটা এই—

রতন। দু কথায় সেরে ফ্যালো—

ম। ভোলা মুখুয্যের ভাজ দেশে এসেছেন তা তো জানেন—

রতন। হুঁ—

ম। তাঁর কীর্ত্তির কথা শুনেন নি কি?

র। সেই মোছলমানি অনাচার কাণ্ড তো?

ম। আজ্ঞে—

র। পুরোণো কাসুন্দী ঘাঁটতে বস্‌লে নাকি?

ম। এখন তিনি ভোলার মেয়ের ভাত উপলক্ষে গ্রামের বাউনদের নেমন্তন্ন করেছেন। ভট্‌চাজ্‌ বলে ‘অনাচারের বাড়ী ম্লেচ্ছ কাণ্ড সেখেনে খেয়ে কি নিষ্ঠেবান বাউনরা জাত খোয়াবে? সে কর্ত্তার নামে সকলকে নিষেধ করে—নেমন্তন্ন না নিতে—তাতে ’ভোলার ভাজ বল্লে কি,—‘জমীদারবাবু সাহেব দারগাকে বাড়ীতে এনে গরু শুয়োর খাওয়ালেন সে বাড়ীতে বাউনদের খেতে জাত যায় না তো? আর আমাদের বাড়ীতে খেলেই জাত-ধর্ম্ম যাবে?

গোঁ। আস্পর্দ্ধাটা দেখুন! মন্দিরে শুয়ে দেবতার দিকে পা করা?

রতন। হুঁ—

ম। সে যেন গেল—মেয়েমানুষের মুখের সাট নেই; কিন্তু এসমাইল ব্যাটার গুষ্টীকে ডেকে এনে নিজের বাগান বাড়ীতে ঘর তুল্‌তে জমি দেওয়া হয়েছে, ঝাড়ের বাঁশও শুন্‌ছি পাবে—এখন কথা হচ্চে একজন প্রজা যদি আর একজন বদমাইস্‌কে আশ্রয় ভরসা দেয় তা হলে তো গ্রামে তিষ্ঠানো দুষ্কর হবে! জমিদারী চালানো, তাইতো বলি সরকার গুখুরী, কাজ—দরকার হলে নিজের হাতে পায়ে নিজেকেই ছুরী বসাতে হয় আত্মীয়তা বন্ধুতা থাকে না—

জীবন। বিশেষ মেয়ে মানুষের আস্পর্দ্ধা! কর্ত্তা শুন্‌লে বিশ্বেস করবেন না—গিন্নিকে সে দিন ঘাটে শুনিয়ে বল্‌লে—‘জমীদার না কুমীর?’

রতন। হুঁ—তারপর তর্কসিদ্ধান্ত কি করেছে?

ম। বলনা ভট্‌চাজ।

জীবন। তিনি বলেছেন ঐ কথা আর কি? আপনার জনের নামে বলা, পিসেবাবু যা বল্লে, নিজের পায়ে ছুরী মারা না বল্লেও নয়—অন্নদাতা সব চেয়ে নিকট বন্ধু, তাঁর হিত নাম আগে তো? দাদা বলেন, জমীদার বাবু ম্লেচ্ছ কাণ্ড করলেন, কই তার পাত পাত্‌তে তো তোমাদের জাত যায় না? কেউ না যায় আমি তো যাবই! ওঁর মত বাউনপণ্ডিতের কাছে যদি অনাচার করে লোক ভরসা আস্‌কারা পায় তা হলে লোক আমাদের মানবে কেন? দেব-দ্বিজ আর দেশে থাকবে না দেখছি!

ম। আবার দেখুন! ছোঁড়ারও বিষ দেখা দিয়েছে!

রতন। সোজা কথা বল চৌধুরী, সোজা কথা—

ম। তারামণি আমাদের রাঁধুনী সে যাবে বঞ্জিবাড়ী রাঁধতে; ভট্‌চাজ

তার পিসিকে মানা করতে গেল, যেন যেতে না দেয়—বুড়ী কি বল্লে হে ভট্‌চাজ ?—

জীবন। ওঃ বাবা তার আবার কি গর্জ্জন ? 'যাবে না ? খুব যাবে—ফলন। চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কারুর তোয়াক্কা রাখে না।' বল্লাম চাকরী তা হলে হিঁদুর ঘরে থাক্‌বে না—তাতে উত্তর হল—"নাই থাক্‌লো, চাকরী ঢের জুটবে !"

ম। পেছনে জোর না থাক্‌লে ঐ অসহায় বুড়ীর মুখের এত জোর হয় ? সরকার কি বল ?

গেঁড়া। তাতো বটেই, পায়ের তলার বালি উপর হতে তাতে না পেলে কি অত তাতে ?

রতন। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা তোমরা এখন যাও—ওবেলা কথা হবে—চৌধুরী নবেকে কল্‌কে বদলাতে বলে যাও তো—

বাক্যব্যয় না করিয়া মহেশ ও জীবন উঠিয়া গেল। নবীন একটা প্রকাণ্ড তাওয়া দেওয়া কলকে আনিয়া গুড়গুড়ীর উপরে চাপাইয়া দিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া জীবন ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল, "কই পিসেবাবু কর্ত্তা তো তেমন খেয়াল করলেন না ?—মেজাজ্‌টা ঠিক নেই না কি ?

ম। ওইতেই হবে হে ভশচাজ্। বারুদের বস্তায় কি জ্বালানি কাঠের খোঁচা দিতে হয়। টীকের ফুল্‌কিতেই কাজ হবে, তা ছাড়া জানইতো মাথাওলা উকীলরা আর্জ্জির তিন লাইন পড়েই কেস্ চট্ করে বুঝে ফ্যালে—না কি ?

জী। হ্যাঁ তার আর ভুল কি ! রাজ্যি চালানো কি হরে নরে'র মাথার কাজ ?

ম। তাছাড়া মেজাজ অনুসারে কথা পাড়তে হয় হে। আমাদের কথাটা পাড়া হয়েছে বেটাইমে। লগ্ন মাফিক হয় নি—বাবুর মেজাজটা এখন অন্য ঝোকের ওপর আছে—এখন ঠিক খাপ খাবে না—

জী। তা হলে কখন আসবো ?

ম। বারুদ যদি শুকনো থেকে থাকে তবে কাজ হয়ে গিয়েছে না হলে ডাক্ পড়বে ব্যস্ত কি ? সে যাক্ ভোলার একটু গতিবিধি নজর কর তো ? ভাল কথা নয়—বাবা সব জিনিষে ভাগাভাগি চলে—ওতে—

জী। নজর? খুব রাখছি—সে ভয় নেই! দেবতার নৈবিদ্দিতে কি তেড়ায় মুখ দিতে ভরসা করে?

ম। অভরসাই কি ভশচাজ্! কথাই আছে আলোচাল দেখলে তেড়ার মুখ চুলকোয়—

জী। ঐ পর্য্যন্ত! চুলকোনিই সার—

ম। আচ্ছা তা হলে ওবেলা এস, আজ রাত্রিতে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর প্রসাদ ভোজন—

কাছারী বাড়ির বাহিরে আসিয়া জীবন চলিয়া গেল। মহেশ অন্দরাভিমুখে ফিরিল।

বাধা দূর হইলে গেঁড়া সরকার স্বস্তি বোধ করিল। সে আবার পুরাণো কথার জের টানিয়া আরম্ভ করিল—

"হ্যাঁ বলছিলাম কি এই যে গাজনতলার গজেন্দ্র টহলদার, আর মকসুদ-গঞ্জের ইচ্ছারঞ্জন পাকড়াশী এরা যদি রাজা হতে পারলে তা হলে আপনি হবেন না কেন? আসল কথা সরকার বাহাদুরকে একটু জানাতে হবে যে আপনি খুব একজন প্রজারঞ্জন জমীদার; নিজের নামের ঢেট্‌রা না পিটুলে কলিতে মোক্ষ নেই রায় মশাই—প্রজারা জান্‌লে কি হবে? সরকার হ'ল রাজার রাজা; তাঁকে জানাতে হবে—আজকাল কর্ত্তা বিজ্ঞাপনে পয়সাও বটে মান-খাতিরও বটে—

রতন। সেইটেরই তো পন্থা—করতে হবে—

গেঁ। সোজা পন্থা ওতো পড়ে আছেই একেবারে সরাসর বাঁধানো রাস্তা এ কি মোগলপাঠানি আমল রায় মোশাই? সরকারের চোখ কাণ জিভ সব হল মাজিষ্টর, দারগা, কমিশনর; নন্দীকে খুসী না কল্লে যেমন কৈলেসে যাওয়া যায় না—তেমনি জেলার মাজিষ্টরকে খুসি না কল্লে—

রতন। তার তো খুবই চেষ্টা করছি। আচ্ছা গাজনতলার গজপতি ব্যাটা কি এমন করেছে যে—আমি তো তবু ইস্কুল হাঁসপাতাল—

গেঁ। তিনি? তা খুব চাল্ চেলেছিল, মাজিষ্টর রাশডেল সাহেবের মেম্ বিলেত গেল যখন, তখন তার রাহাখরচ ফাষ্ট কেলাসের রাহাখরচ দিলে আবার আসবারও দিলে; তা ছাড়া ফি সিজনে দারজিলিং এর বাড়ীটা তো রাশডেল সাহেব ভোগ করছে—ইস্কুল হাঁসপাতালে আর কিচ্ছু হয় না রায় মশাই—তা না হলে গজপতি টহলদার তো বোকা আর বদমাইসের এক

শেষ! এমন দিন যায় না যে প্রজাদের চখের জলে সে তর্পন্ না করে—গাঁয়ের লোকে ধরলে হুজুর একটা ইস্কুল করে দিন, ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক, তা যেমনি রাজা তস্য মন্ত্রী তেমনি ; ওর ম্যানজার পরামর্শ দিলে ছোট লোকেরা লেখা পড়া শিখলে বড় বাড় বেড়ে ওঠে। দেশের রাজা জমীদারদের মানে না, সরকারকে পর্য্যন্ত চোথ রাঙ্গায় ? ও-সব পথে সুবিধে নেই—”

গজেন্দ্রও বুঝলেন—

রতন। কতকটা তাইতো বটে ; দেখনা চখের ওপর এস্‌মাইল ব্যাটার চোদ্দ পুরুষ ঘরামি করে আর ব্যাবুর্চ্চিগিরি করে কাটালে আজ ব্যাটা দুপাতা বই পড়ে আর কলকাতায় হোটেল খুলে একেবারে ডোন্-কেয়ারী মেজাজ ধরে বসেছে।

গেঁ। দেখছিনি কর্ত্তা ? খুব দেখছি আর ভাবছি হলো কি ? আসল কথা কি কর্ত্তা দুধ খেতে ধরলেই যে সাপের বিষ নষ্ট হবে, তা হয়না ;—ইস্কুল ফিস্‌কুল করতে যাওয়া ভুল কর্ত্তা—ও পথে সুবিধে নেই, স্কুল তুলে দেওয়াই ভাল—

র। আমিও তাই ভাবি ! ইটখোলার সেই জমিটা নিয়ে মনে পড়ে, হালদারদের সঙ্গে মামলা ? বৃন্দাবন মড়লকে সাক্ষি দিতে বল্‌লাম ব্যাটা রাজি হলো। তার ছেলে সে নাকি কালেজে পড়া ছেলে—বাপকে বল্লে মিথ্যেসাক্ষী দেবেন কি বাবা ? মড়ল বল্লে কি করি বাবা, জমীদার রাজা !—ছেলে বল্লে, “তাতে কি ? হলেই বা জমীদার তার জন্যে অধর্ম্ম করতে হবে ?”

গেঁ। বলেন কি কর্ত্তা ?

র। এ দেখেও ভবানী বাবাজীর ঝোঁক আরো স্কুল খোলা হক। যেটা আছে সেটাকে ভাল করা হক—ভ্যান্ ভ্যান্—

গেঁ। অর্থাৎ চাষা ভূষোদের ল্যাখাপড়া শিখিয়ে মাথায় তুলতে হবে !

র। বোঝ সরকার। আমার অবর্ত্তমানে জমিদারীর যা অবস্থা হবে তা দিব্য চোখে দেখছি—

গেঁ। মধুসূদন রক্ষা করুন। কর্ত্তা আছেন যাই তাই আমাদের মত পক্ষী পতঙ্গ ব্রেহৎ বটবিক্ষের ডালে আশ্রয় পেয়েছি ! এই সব গরমমেজাজের নতুন ঢং এর মনিবের পাল্লায় পড়লে—তবে তদ্দিন টিক্‌লেতো এ দেহ ! হরি যা কর।

দেওয়াল—ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল।

রতন। কটা হে ?

গেঁ। আজ্ঞে কর্ত্তা দ্বিপ্রহর বাজ্‌লো—উঠি তা হলে—

র। হ্যাঁ। ভীমেকে ডেকে দিয়ে যাও—

ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণকায় ভীমমূর্ত্তি ভীমে তাহার কাঁধে তোয়ালে ও দুহাতে দুটা দুরকম সুগন্ধি তৈলপুর্ণ বাটী লইয়া বাবুর তৈলমর্দ্দন পর্ব্ব আরম্ভ করিল। বাবু নলটা ফেলিয়া দিয়া একটা বিরাট হাই তুলিয়া চিৎ হইয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। বিপুল দোদুল্যমান লোমশ ভূড়ীটা আবেগভরে কিয়ৎক্ষণ কাঁপিয়া সাম্যলাভ করিল। ভীমচন্দ্র বাবুর গৌরবর্ণ মাংসল স্থূল পা দুখানা নিজ আবলুস্ নিন্দিত উরু উপাধানে তুলিয়া লইয়া নানাপ্রকার সশব্দ কসরৎ যোগে তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিল।

গেঁড়া সরকার চোখের সুতাবাঁধা চসমাটা খুলিয়া ছেড়া খাপে পুরিতে ব্যস্ত ছিল। রতন রায় তাহাকে বলিলেন—"ওহে সরকার, তর্কসিদ্ধান্তকে একবার আমার কাছে ওবেলা আস্‌তে বলতো—

গেঁ। যে আজ্ঞা সঙ্গে করেই না হয় আন্‌বো এখন এলে হয়। যে বদ্‌-মেজাজী বাউন, ঠাকুর দেবতাকেই বড় পৌছে! কর্ত্তামুখে উত্তরে কোনো মন্তব্য না শুনিতে পাইয়া সরকার গৃহত্যাগ করিল।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের কথা

হিতোপদেশে সেই মূষিক-সিংহের গল্পটা আজ মনে পড়ছে। ঋষি তাঁর পোষা ইঁদুরটিকে বেড়াল করলেন, বাঘ করলেন, সিংহ করলেন, কিন্তু তার তা সইল না। শেষে যে ইঁদুর সেই ইঁদুরই তাকে হ'তে হল। কেন ? কেউ বলবেন নিয়তি, কেউ বলবেন বোকামী, কেউ বলবেন দুর্ভাগ্য, কেউ বলবেন দুষ্কর্ম্ম। কিন্তু আমি বলব, ওসবের কিছুই নয়, ইঁদুরের পরম সৌভাগ্য যে সে

আবার ইঁদুর হতে পেয়েছিল। যা মিথ্যে, যা সে নয়, সে যে তা থাকতে পায়নি এ তার পক্ষে শাপ নয়, বর। মুনিবর তাকে পুনর্মূষিক করে পরম নিস্ফলতা হ'তে বাঁচিয়েছিলেন। সত্যিকার সিংহের পক্ষে মুষিক হওয়াটা যেমন দুর্ঘটনা, সত্যিকার মুষিকের পক্ষে সিংহ হওয়াও তেমনি দুর্ঘটনা। যা সহজগতি তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যে দিকেই চালাও না—তা' সে স্বর্গের দিকই হ'ক আর নরকের দিকেই হ'ক, সে গতিতে মঙ্গল নেই, স্বস্তি নেই, আনন্দ নেই।

এ কথা কেউ মানবে না, তা জানি। এই অসহজের গুরুভার ধার্ম্মিকের জগতে মানাতে যাওয়া যা, আর আমার মত বীরের পক্ষে, গন্ধমাদন তুলতে যাওয়াও তাই। বোঝাতে পারব না তা জানি, তবু বলতে হবে, কারণ সেটাও আমার স্বভাব। এতদিন ধরে বনে বাদাড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় যে সত্যকে জীবনের মধ্যে ধরতে পেরেছি, তাকে না প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি সহজের উপাসক, সহজের মন্ত্রদ্রষ্টা, সহজের ঋষি এবং সহজের কবি।

এই যে কথাটা রোদে পুড়ে, আগুনে ভাজা হয়ে, জলে গলে, শীতে জমাট হয়ে প্রাণের মধ্যে সত্য বলে ধরা দিয়েছে এ কথা আমায় বলতেই হবে, নইলে আমার অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকবে না। কেউ নিরর্থক হ'তে চায় না, পারেও না—আমিও চাই না, পারবও না।

আমার বলবার কথা কি? আমি এই বলতে চাই যে, যে ফুল গাঁদাই হবে তাকে গাঁদা না হতে দিয়ে গোলাপ করে তুলতে চেষ্টা করলে, সে ফুল গোলাপ ত' হ'তে পারেই না, কিন্তু ভাল গাঁদা হবার যে আশাটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গলেচ্ছু মানুষকে তাই আপনার অন্তরে প্রবেশ করে দেখতে হবে যে কি কারণে এবং কি হবার জন্য সে জন্মেছে। আত্মানং বিদ্ধি, এইটাই হচ্চে চরম উপদেশ। আগে আপনাকে জান যে তুমি কি হতে জন্মেছ, এবং কোন্ দিকে তোমার সহজ গতি। তার পর সেই গতিকে ঠিক করে জেনে সেই গতি যাতে বাড়ে, যাতে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট হয় তাই কর, তাহলেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে, কারণ তখনি তুমি সার্থকতার দিকে চলতে পারবে। এই স্বরূপাভিমুখী গতিতেই আনন্দ,—এবং এই গতিকে বাধা দেওয়াই দুঃখ। অন্য যত দুঃখ আছে সেগুলা এর তুলনায় দুঃখই নয়। সেগুলা সুখের অপর পীঠ। সত্যি দুঃখ হচ্চে অজ্ঞান।

আত্মার এই অবাধগতিকে বাধা দেওয়াই মানুষের পরম অজ্ঞান। সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, লোভ, অহঙ্কার এই সমস্ত বড় বড় বাধা এই অবাধগতিকে ফেনিলোচ্ছল করে তুলছে। তাই মনে হচ্ছে যে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে—নইলে অস্তিত্বই যে আনন্দের, তাতে সুখ-দুঃখ আসবে কোথা হ'তে? সুখও যেমন একটা তৈরী বস্তু, দুঃখও একটা তেমনি তৈরী জিনিষ। সে হয়ত পরমার্থতঃ কোথাও নেই, কোথাও সে কখনও ছিল না। কিন্তু হয়ত দিক্‌ভ্রমের মত কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে জগতের মধ্যে মানুষই জন্ম দিয়েছে। সে নৈলে তার চলে না, কারণ সুখ পেতে হলেই দুঃখ চাই।

বহু পূর্ব্বে একবার একজনের কাছে লিখে দিয়েছিলাম যে আমি দুঃখের লোভেই সংসার হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সুখের লোভে নয়। কিন্তু সংসারের বাইরে বেরিয়ে কেবল আনন্দকেই দেখতে পেয়েছি, দুঃখ কোথাও নেই। দুঃখ কেবল আছে মানুষের মনে। সে বাইরে কোথাও নেই এবং কেউ তাকে খুঁজে পায় না। যদি তাকে পেতে হয় ত' সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির বাইরে গিয়ে সৃষ্টি করা যায় না—তাই যা সৃষ্টির জায়গা, যাকে মানুষ সংসার বলে বা জগৎ বলে, তারই মধ্যে না ঢুকলে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যায় না বলে সংসারেই ফিরতে হ'ল। এই দুঃখকে না চিনলে না পেলে সুখকেও পাবার জো নেই এবং সুখ-দুঃখ না থাকলে এমন কি চৈতন্যই থাকে কিনা সন্দেহ—তাই আবার সেই দুঃখের লোভেই সংসারে ফিরে এলাম।

কিন্তু একথা লোককে বিশ্বাস করান কঠিন যে, যে-লোক ১৫-১৬ বৎসর গহন গিরিগুহায় স্বচ্ছল অটনের পরম সুখ অনুভব করেছে, সে কি লোভে আবার সংসারে ফিরে এল? সংসারে লোভের বস্তু কি আছে, অন্ততঃ আমার মত স্বাধীনতার সুখ যে অনুভব করেছে তার সংসারে ফিরে আসা নিশ্চয়ই বোকামী, নিশ্চয়ই অধঃপতন। অধঃপতন? তা হবে।—কিন্তু না এসেও যে আমি পারলাম না, আমার চুলের মুঠী ধরে যে নিয়ে এল। যাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দই যে বল্লে, "এই যা একলা হয়ে দেখলি তাই শেষ নয়, এর পরেও আছে।"

এর পর কি আছে? আপনাকে কুড়িয়ে গুটিয়ে আনার আনন্দের পর আপনাকে ছড়ানর আনন্দ আছে—আপনাকে পরের মধ্যে অনুভব করার আনন্দ আছে। এবং তার পরে যা আছে সে হচ্ছে পরকে আপনার মধ্যে অনুভব। এই তিনটাই হচ্ছে এই মানুষের দেহ ধারণের ত্রিবিধ আনন্দ। এর

পরে কি আছে জানিনে—কিন্তু মানুষের জীবনকে স্বীকার করে আত্মা এই ত্রিবিধ আনন্দ অনুভব না করলে বুঝতে হবে পূর্ণ আনন্দ এ জীবনে পেল না, অন্ততঃ আমি এইটুকু সত্য ধরতে পেরেছি। আমি ধরতে পেরেছি যে আনন্দই আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না। আমাকে ঠেলে নিয়ে সে একবার গুহাহিত করবে, আবার যখন তার দরকার হবে, তখনি আমায় সেই গুহা হ'তে বার করে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেবে।

জানি যে, পরের মধ্যে আপনাকে, এবং আপনার মধ্যে পরকে অনুভবের সঙ্গে জগতে যাকে দুঃখ বলে, ত্রিবিধ তাপ বলে, তাই আছে। কিন্তু আনন্দকে যখন পেতেই হবে, আনন্দই যখন আমার স্বরূপ তখন সেই আনন্দের জন্য যা আসবে তাকেই নিতে হবে। না নিয়ে যে উপায় নেই, কারণ এই সুখ আর দুঃখের, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের, পাপ এবং পুণ্যের, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের দোলায় সব রকম দ্বন্দ্বের দোলাতেই আনন্দ দুলছেন এবং সেই দুলে দুলেই আপনাকে অনুভব করছেন। মানুষের দৈনিক জীবনেও এই সত্য চির পরিস্ফুট ;—সে দিনের বেলায় নানা কাজে নানা সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে ছড়াচ্ছে, তার পর রাত্রি হলেই আপনাকে গুটিয়ে নিদ্রার মধ্যে গুহাহিত হচ্চে। এই দোলাই তার স্বরূপ। এই দোলাই সেই পরম দোলের ছায়া—যে দোলে পরমাত্মা একবার অহরাগমে বহু হয়ে বিকাশ লাভ করছেন, এবং রাত্র্যাগমে সমস্ত বহুত্ব নিজের মধ্যে লয় করে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ হচ্ছেন। আনন্দস্বরূপ আত্মার ইহাই দোললীলা। সুখ দুঃখ একা একা সত্য নয়—কেবল আনন্দের দুই পীঠ বলে দুই দিক তারই সত্যের মধ্যে সত্য।'

আমিও ত আত্মাই, আমি কি করে নিজের স্বরূপকে উল্টে দেব? আমার সব রকম সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতেই হবে। কেউ যদি বলে যে জগতে সুখ একটা মিথ্যা সৃষ্টি, আমি তা'হলে বলবো যে দুঃখও তা'হলে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা সৃষ্টি। যদি বল সুখ মানুষকে টানে; আমি বলব দুঃখও তা হ'লে মানুষকে টানে, কারণ দুঃখ ছাড়া সুখ নেই, সুখ ছাড়া দুঃখ নেই।

হয়তো কেউ এ কথা মানবে না, কিন্তু আমার কথা যে সত্য তার প্রকাণ্ড প্রমাণ এবং উদাহরণ আমি নিজে। নইলে সেই কত বৎসর আগে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে এনে হিমালয়ের গুহার মধ্যে সমাধিস্থ করে এনেছিলাম, যখন মনে হয়েছিল যে আর আমার কোনো বাসনা নেই, কোনো সুখ নেই, কোনো দুঃখ নেই, আমি কেবল আমারি আর কারু নই, ঠিক সেই সময়ই

মানুষ মানুষ করে ছুটে বেরিয়ে ছিলাম কেন? ঠিক সেই সময় মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করবার জন্য কুম্ভ মেলার হাটের মধ্যে—সেই ত্রিবেণীর মোহনায় উপস্থিত হয়েছিলাম কেন? আবার আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য, একটি নির্দ্দোষ নির্ব্বোধ মানুষকে বিবাহ করলামই বা কেন?

আমার ত' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, তবে কেন সেদিনকার সেই পরম অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছিলাম? কে বাধ্য করলে? কে আমার চিরদিনের মুক্তিলোভী প্রাণকে বন্ধনলোভী করে দিয়েছিল? কে আমার প্রাণে ঐ অত বড় একটা ভয়ঙ্কর জনসংঘের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার লোভ জন্মিয়ে দিলে? সে যদি আমার নিজেরই আনন্দ না হবে ত' কে? আপনাকে ভুলে পরকে অনুভব করার মধ্যে যে প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তা যে আমার নিজেরই আকর্ষণ নইলে কেন সেই ভুল আমার হল? সেই ভুল করা, সেই মায়াকে স্বীকার করাও আত্মার সহজ ভাব, নইলে এ ভুল হ'ত না। ভুল? আচ্ছা বেশ ভুলই, কিন্তু এ ভুল করতেই হবে, নইলে আনন্দই নেই।

আর এই ভুল করতে হবে বলেই দুঃখকে স্বীকার করতে হবে, তাই মানুষ আবায় টেনেছে, মানুষের সংসার আমায় ডেকেছে, মানুষের দুঃখ নূতন মূর্ত্তিতে আবার আমায় আকর্ষণ করেছে। দুঃখকে অনুভব কর্ত্তে আবার আমি ফিরলাম, কারণ সে যদি বা আমায় ছাড়তে চায় আমি যে তাকে ছাড়তে পারি না। ছাড়লে বুঝি আমার অস্তিত্বই থাকবে না।

তাই সব রকম দুঃখকে স্বীকার করে পাপ পূণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব রকম দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে আমি আবার এলাম কারণ আনন্দ দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে অন্ততঃ আমার কাছে নিজেকে জানাতে পারলেন না। আমি মানুষকে চাই, তা' সে যতই ছোট হোক, যতই অজ্ঞানে দুঃখে মোহে ডুবে থাক, তাকে চাই। নইলে আমার এই একাকীত্বের হাহাকার থামছে না। আমি এক তাই আমার মধ্যে অপরকে চাই বহুকে চাই সর্ব্বকে চাই। কে আমার এই পথের গুরু হবে তাকেই খুঁজতে আবার বেরুলাম। এ পথের গুরু এ দিকে নেই, কারণ এ দিক একের দিক। যে পথে আমি বহু হয়ে বিশ্ব হয়ে ক্রমাগত বিকাশ পাচ্ছি, সেই পথে সেই জগৎপথে চঞ্চলের পথে গতির পথে চলবার জন্য ফিরে এলাম। দেখি গুরু মেলে কি না, সঙ্গী মেলে কি না।

২

কেন ফিরেছি তা যতটা পারি বল্লাম, কিন্তু কি করে ফিরলাম তাও কি বলতে হবে? সে তো অতি সামান্য একটা কথা, কিন্তু সেটাও কি বলার দরকার? বেশ ভাই তাও বলছি। ঘটনা সামান্য বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ত' সামান্য নয়, তাই সে কথা বলাই উচিত।

ঘটনাটা এই,—দশ বৎসর ধরে আপনার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, অর্থাৎ যে কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিলাম তারই স্মৃতি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে কিছুতেই নিস্তার পাই নি; কৃচ্ছ্রে নয়, ব্রতে ধ্যানে নয়, সমাধিতেও নয় কারণ এ যে আমার একেবারে অন্তরের অন্তরে স্থান নিয়েছিল, আমার অস্তিত্বের পীঠে পীঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। এর হাত হতে ত্রাণ পাব কি করে? কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে তখনি নিস্তার পেলাম যখন একে সত্য বলে স্বীকার করলাম; যখন সেই ভয়কে অভয়ের মধ্যে টেনে এনে ফেল্লাম তখনি বাঁচলাম। যখন বুঝলাম যে আমি কেবল আমার নই, যাকে পর বলে তারও বটে, তখনি আমার এই ভয় হ'তে মুক্তিলাভ হল। তখন ওঁ পরতন্ত্রায় স্বাহা বলে বেরিয়ে পড়লাম। অন্তর হ'তে আবার বাইরের দিকে হারাণো পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা অতি ছোট,—একদিন সমস্ত দিন না খেয়ে দেয়ে সমাহিত হয়ে এক গাছতলায় বসে আছি, সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ তাল পাকিয়ে একটা জমাট বর্ত্তমান হয়ে বসে আছি। বহুদিনের অনাহার অনিদ্রা যখন আমার প্রাণকে প্রায় শুকিয়ে ধুনির আঙ্‌রার মত করছে, যখন সমস্ত দেহটা চিমটের মত কেবল ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ করছিল, সমস্ত জগৎটা একটা সাহারার মত চক চকে একত্বে পরিণত হয়ে ধু ধু করছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী ছোট্ট রোগা শিশু আমার অজ্ঞাতে ধুনির কাছে এসে বসেছিল। কতক্ষণ বসেছিল জানি না, কিন্তু যখন তাকে দেখতে পেলাম তখন অবজ্ঞায় তার দিকে চেয়েও চাইলাম না।—সে কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চাইলে, শেষে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ সুরে বললে "মহারাজ, ময় ভুখা হু!" মহারাজ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আওয়াজটা যে আমার কোথায় গিয়ে পৌঁছল তা জানি নে, কিন্তু হঠাৎ মনে হল যেন আমার মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। এক নিমেষে সাহারায় সিরক্কো উঠল বালি উড়ল, আঁধার হয়ে এল, সমস্ত অস্তিত্বটা হঠাৎ এমন ঝাকানি খেয়ে

উল্টে পাল্টে গেল যে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিদে? আমার ক্ষিদে পেয়েছে? তাইত, এযে বিশ্বগ্রাসী ক্ষিদে। আমি যে অগস্তের মত সারা সমুদ্রটাই এক-টানে পান করে ফেলতে পারি, আমার এমনি তেষ্টা পেয়েছে। গরুড়ের মত গ্রাম নগর গিলে ফেলতে পারি এমনি ক্ষিদে পেয়েছে!

"কিন্তু ওযে আমায় ডাকলে 'মহারাজ বলে!—মহারাজ!—আমি মহারাজ? আর একটা ছোট শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির মত একটুকরো রুটীও আমার ঝুলিতে নেই? তবে আমি কিসের মহারাজ?

আমি চট্ করে উঠে ছেলেটাকে দুহাতে জাপ্টে তুলে ছুটলাম। ছুটে ছুটে একদল সন্নাসীর আশ্রমে পৌছে ছেলেটীকে নামিয়ে বল্লাম—"ময় ভুখা হু।" তারা 'আমায় খেতে দিলে, কিন্তু সে আহার্য্য আমি ছেলেটীকে দিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলাম। সন্ন্যাসীরা কিন্তু হাসতে লাগল, বলে "মায়া—মায়া, তুম্ মায়ামে গির গিয়ে হো!" মায়ায় পড়িছি? হবে—কিন্তু ওরে—এ মায়ায় এত আনন্দ! এ ভ্রমে এত সুখ! শিশু খাচ্ছে আর তার প্রতি গ্রাসের সঙ্গে আমার অনুভব হচ্ছিল "আমি তৃপ্ত হলাম—আমি আনন্দ পেলাম—আমি বাঁচলাম।" এই কি ভ্রম? একেই আমার এত ভয়!

যাক, শিশু কতদিন বুভুক্ষিত ছিল তা জানিনে, কিন্তু সে এত খেয়ে ফেল্লে যে তার পর দিনই তার অসুখ করলে। তার সেবা করতে করতে কত দিন কেটে গেল, কিন্তু সে যত কষ্ট যত দুঃখ ভোগ করতে লাগল তভই যেন আমার মনে হল যে ঐ শিশু দেহে আমিই সব দুঃখ ভোগ করছি। তার সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমি আমাকে অনুভব করে ভয়ঙ্কর সুখের সঙ্গে মধুর ভীষণ দুঃখকে ভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, আমি এই মরণোন্মুখ শিশুর মধ্যেই বেঁচে গেলাম, এর কষ্টের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম, এর কাতর ক্রন্দনের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম।

শিশু বাঁচলে না—কিন্তু তার প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেল। আমিও ছুটে পালিয়ে এলাম—আমায় বাঁচতেই হবে। দুঃখকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিলে আমায় বাঁচতেই হবে। ওগো ভ্রম, ওরে অজ্ঞান, ওরে আমার চিরন্তন ভুল তোকে কোন এক অকাল বসন্তের দিনে আমার তৃতীয় চক্ষের আগুনে ভস্ম করেছিলাম মনে নেই। কিন্তু কে জানত যে সেই ভস্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়েই ছিল। তারপর কোন সকাল বসন্তোদয়ে সেই

ছাই হতে আবার তুই মরুর পাখী ফিংসের মত জেগে উঠেছিস্। শিশুর নবপ্রাণ আমার শুষ্ক আত্মাকে রসে রসিয়ে, ফুলে ফুটিয়ে, অশ্রুতে ভিজিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। আমি পালিয়ে এলাম। মরণাধিক মরণ-সাগর হ'তে জন্ম-মৃত্যুর কোমল দোলায়মান রসসাগরের তীরে আবার এলাম। তোমরা ভাই গালই দাও আর জটা মুকুট মুড়িয়েই দাও—আমি তবু বলব, আমি তোমাদেরই ভাই; তোমাদেরই।

৩

'বৈরাগ্য যোগ কঠিন উধ অব না করব হো।' সমস্ত সংসার গেয়ে উঠছে। আমি গাইব না।—আমিও প্রাণপণে গাইতে গাইতে কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে পালিয়ে এলাম, কিন্তু কোথায়? সেই যেখান থেকে বেরিয়ে ছিলাম, সেই আমার আদি—জন্মস্থানে। সেই যেখান হতে কোন এক বসন্ত প্রভাতে বসন্তের গৈরিক বসন ধারণ করে বেরিয়ে পড়ে মনে করেছিলাম জীবনে ফাল্গুন চৈত্রের শেষ হল, এইবার বৈশাখের প্রচণ্ড আলো ফুটে উঠবে, সেই আমার গ্রামে সেই আমার জীবনের আরম্ভ স্থানেই পৌছিলাম। যেখানে পরম মায়াবিনীর কাছে বিদ্রোহ করি সেই খানেই প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে এলাম। আমি ত' জানতাম না যে সেইদিনকার সেই বৈরাগ্যের বসনের লাল রংটার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আমার পাছু নিয়েছিল, পলাশ শিমুল কিংশুক আমার গায়ে লেগে গিয়েছিল, অশোক গোপনে গোপনে আমার প্রাণের তলাটা রাঙিয়ে রেখেছিল। পদ্ম আমার হৃদয়দহরে একেবারে শত পাপড়িতে ফুটে চুপচাপ বসেছিল! তাদের দেখেও দেখিনি, অবজ্ঞা করে অবহেলা করে কেবলি পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি; কিন্তু আজ তারা সময় পেয়ে একেবারে অন্তর হতে বেরিয়ে আমার সারা পথটা টিটকারী দিতে দিতে দুয়ো দুয়ো করতে করতে এসেছে। আমি গ্রামে ঢুকলাম, সেই রকম এক বসন্ত প্রভাতে, তেমনি এক উষার মধুর আলোকে, তেমনি এক "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পথ দিয়ে।

গ্রামে ঢুকলাম, কিন্তু হায় সবই চেনা তবু এমনি অচেনা হয়ে গেছে যে, সবাই সত্যানন্দ সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করলে, আসন দিলে তবু তাদের প্রিয়-ব্রতকে ডেকে নিলে না। সন্ন্যাসী আদর পেলে পূজা পেলে, কিন্তু তাদের বাল্যের প্রিয়ব্রত বুভুক্ষিতই থেকে গেল। গ্রামে বন্ধুদের কাছ থেকে মায়ের কাছে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম? দেখলাম মাও আমার অচেনা হয়ে

গিয়েছেন, নতুন সংসার পেতে নতুন মানুষদের নিয়ে নতুন হয়ে বসে আছেন। যে তাঁর দেহ হতে দেহ, প্রাণ হতে প্রাণ নিয়ে তাঁরই কোলে বড় হয়েছিল সে আজ তাঁর কেউ নয়। আর যাঁরা কেউ নয় তাঁরাই আজ তাঁর সব। তিনি তাদের নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছেন। আমি পরিচয় দিলাম, কিন্তু সে পরিচয় তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম বিশ্বাস হল না। মনে করলেন, কে বুঝি তাঁকে ঠকাতে এসেছে।

কিন্তু আমি ত' ঠকাতে আসিনি, তাই দু'দিন তাঁর কাছে রইলাম। তিনিও কি জানি কেন আমায় ধরে রাখলেন, কিন্তু তাতে যাঁরা আমার সেই পরিত্যক্ত বিষয় ভোগ করছিলেন, তাঁদের ভয় হল। তাঁরা শত্রুতা আরম্ভ করলেন। এবং সেই সঙ্গে সংসারের চিরন্তন সুখ আরম্ভ হল।

এতে কার দোষ দেব? কারু নয়, তাঁদেরও নয়, আমারও নয়। তবে কার? কার জানিনে, তবু এই সংসার। এবং একেই ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে—কারণ এই এর স্বরূপের এক দিক। কিন্তু আর দিকও আছে। কি? তাও বলছি।

আমার আত্মীয়েরা যখন দেখলেন যে বেটা ভক্ত বিটলে সন্ন্যাসী কিছুতেই যায় না, দুবেলা বসে ভাতের কাঁড়ী লুট্‌ছে এবং মাও যেন একটু তার দিকে ঢলে পড়বার মত হয়েছেন, তখন গালিগালাজ হ'তে লাঠি সোটা পর্য্যন্ত বেরুল। মা তখন ব্যস্ত হয়ে আমায় পাখা দিয়ে আগলাতে লাগলেন।

কিন্তু আমিও নাছোড়বন্দা—স্থানুর ন্যায় অচল হয়ে বসে, বল্লাম, "আমি কিছু চাই নে, শুধু এই বারান্দাটায় পড়ে থাকতে চাই তাও কি তোমরা দেবে না?" কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়াপড়সীরা পর্য্যন্ত এমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, মা শেষে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "বাছা, তুমি যাও। তোমায় দেখে বড্ড মায়া হচ্চে, কিন্তু মায়া হচ্চে বলে ত' তোমায় মরতে দিতে পারব না, তুমি যাও।"

আমি বল্লাম, "আমি তোমার প্রিয়ব্রত!!" মা কেঁদে বল্লেন, "আমার তা বিশ্বাস হচ্চে বাবা, কিন্তু এরা যে তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

আমি কেঁদে বল্লাম, "আমি ত' কিছু চাইনে, শুধু তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে চাই।"

মা বল্লেন, "এরা যে তা বিশ্বাস করছে না বাবা।" আমি বল্লাম, "তুমি ত' বিশ্বাস করেছ মা—তোমায় এত দিনকার এত কথা বল্লাম, যে সব কথা

কেউ জানতে পারে না জানেও না তাও বল্লাম, তবু কি তুমি আমায় ছেলে বলে মানবে না—বিশ্বাস করে কোলে স্থান দেবে না?" মা বল্লেন, "ওরা যে বলে তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মনের কথা জানতে পার। তুমি আমায় ভুলিয়ে এই বিষয় আশয় ভোগ করবার জন্য এই সব বলছ।"

হায় রে! আমার সন্ন্যাসীত্বই আমার চির বিরোধী। যে স্থান আমার সহজই ছিল, সেই স্থানই আমার পক্ষে এত অসহজ এত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ওগো লীলাময়ী, এ তোর কি লীলা গো!

যাক আমি তবুও উঠলাম না, কেবল কাতর ভাবে জানিয়ে দিলাম আমি প্রিয়ব্রত। কিন্তু কি জানি কেন কেউ সে কথা কিছুতেই মানলে না। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে আমার জটা মুড়িয়ে দিলে, গেরুয়া কেড়ে নিলে, চিমটে ভেঙ্গে দিয়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা ঘাড়ে দিয়ে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে, "চেয়ে দেখুন দেখি এ কি আপনার সেই প্রিয়ব্রত!"

মা চেয়ে চেয়ে বল্লেন—"সে ত' এত ফর্শা ছিল না—তার মুখ ত' এত চকচকে ছিল না! তার কালো কালো কোঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কপালের ঐ দাগটা ওটা যেন—"

মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমার আত্মীয়গণ আমার গলা টিপে বাড়ীর বার করে দিলেন।

আমি বাইরে এসে শুনলাম, মা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বলছেন, "ওরে তোরা ওকে কিছু বলিসনে, ও যে আমার প্রিয়র নাম নিয়ে এসেছে। ওরে তোরা মারিসনে—"

আমার প্রাণ ফেটে শব্দ উঠল "মা—মা—মা"। মাও আমার ছুটে বেরিয়ে এসে সেই আত্মীয়দের হাত ছাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে, সেই আত্মীয়দের বল্লাম, "তোমরা সব নাও—কিন্তু মাকে দাও। আমি আর কিছু চাইনে।"

আমার এই কথার উত্তরে যা শুনলাম, তা আর বলে কি করব? এই ত সংসার! এই ত সুখে-দুঃখে, ন্যায় অন্যায়ে ভরা সংসার। এই দুঃখে না পড়লে কি মাকে পেতাম, মাকে বুঝতাম। মা তাঁর ছেলের নামটুকুকেও এত ভালবাসেন যে সেই নামটুকুর জন্যে আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইলেন। তিনি বল্লেন, "চল বাবা তোমার সঙ্গে কাশী গয়া বৃন্দাবন করিগে। তুমি যেই হও, আমি তোমায় আমার প্রিয়ব্রতই বলে জানলাম।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বল্লাম, "মা, বুঝলাম তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস করনি—জটা গেরুয়াতে যেমন আমায় চিনতে দেয়নি, তেমনি এই নেড়া মাথা আর ছেঁড়া কাঁথাতেও চিনতে দিলে না। যাই হোক আবার আমি আসব, তার পর দেখব কেমন আমার মা আমায় না নেয়।"

৪

হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে যখন আমার আপনার জনেরা আমায় অমনি করে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলে তখন আমার দুঃখ হয়েছিল, কি না? এবং তোমরা আশা করবে, যে আমি বলব—

"মেরেছ কলসির কাণা
তা বলে কি প্রেম দিব না।"

না গো, না, আমি কি আর সন্ন্যাসী আছি, যে অমনি করে বলব, "হে পিতঃ এই পাপীদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে।"

যাঁরা সে কথা বলেছিলেন তাঁরা জগদ্‌গুরু। তাঁরা আমার মাথায় থাকুন। আমি সহজ মানুষ—তাই মার খেয়ে কাঁদলাম। তাই এই পরম দুঃখকে দুঃখ বলেই স্বীকার করলাম। কিন্তু তবু তাদের আশীর্ব্বাদ করতে ভুল্‌লাম না—কারণ তাদের মার-ধরের মধ্যে আমি আমার মাকে পেলাম, তাঁদেরও পেলাম এবং এই দু'য়ের মধ্যে আমাকেও পেলাম। তাতে যে আমারই পরম লাভ হল। আমায় কাঁদিয়ে তাঁরা আমায় জাগালেন—আমি যে কাঁদতে ভুলে গিয়ে বৈশাখের আকাশের মত ফাঁকা শুক্‌নো প্রকাণ্ড একটা কি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই আকাশে যে আষাঢ়ের জলদোদয়ের প্রয়োজন ছিল। তাই এই অশ্রু মেঘের সঞ্চারকে পেয়ে আমার আত্মা অন্যথা বৃত্তিচেতঃ হয়ে বেঁচে উঠল। বসন্তকে ত্যাগ করে গ্রীষ্মে এতদিন কেটেছে, এইবার বর্ষার উদয় হয়েছে। আমিও কেঁদে বেঁচেছি। আমি যে সবাইকে শুদ্ধ আপনাকে পেয়ে বেঁচেছি। তাঁদের আশীর্ব্বাদ করব না?

তার পর কি হল? যা হবার তাই হল। সংসারের এক দরজায়—স্বার্থের দরজায় প্রবেশ পেলাম না বলেই কি, অন্য দরজাতেও প্রবেশ নিষেধ হবে? আর যে সংসারকে আমি অপমান করে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম, সে যে আমায় সহজে প্রবেশ করতে দিলে না সেটা কি খুবই অন্যায় করেছে? কখনই না। আঘাতের প্রতিঘাত না পেলে যে আমার আদর পাওয়াই হত—দুঃখ পাওয়া যে

হ'ত না। তাই সেই পুনঃ প্রবেশের প্রথম ক'দিন, যে সংসারের সিংহদ্বারে আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, সে তো ঠিকই হয়েছে।

কিন্তু তার পরে আর এক দরজা দিয়ে সেই মা, সেই পরম মায়াবিনী জননী সংসার আমায় ডেকে নিলেন। কলকাতায় এক উকিল বন্ধু অবিনাশের কাছে, কিছু দিন পরে, গিয়ে উপস্থিত হতেই সে আদর করে ডেকে নিয়ে বল্লে, "আরে এ কে! প্রিয়! তুমি এই বেশে!" তোমার লোটা কম্বল গেরুয়া জটা কৈ হে?"

আমি বল্লাম, "সব কেড়ে নিয়েছে ভাই, এমন কি জায়গাটুকু পর্য্যন্ত। এখন একটু জায়গা দেবে? নইলে যে আমি উবে যাই।"

সে তো হেসেই আকুল, বল্লে, "বেঙ্ থেকে কেঁচে আবার ব্যাঙাচী হলে ভাই! সেই হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের কথাগুলো মনে আছে? তখন যে সব লম্বা লম্বা বাত্ ঝেড়েছিলে, সে সব কি হল?"

আমি বল্লাম, "সব ঝেড়ে ফেলেছি ভাই, এখন তুমি আমায় ঝেড়ে ফেল না, এইটুকু প্রার্থনা।"

বন্ধু আমার সব কথা শুনে বল্লে, "এঁ, মাও তোমায় চিনলেন না? আশ্চর্য্য!"

আমি জীব কেটে বল্লাম, "ছি ছি, ও কথা বল না, মা ঠিকই চিনেছেন। তবে সবাই মিলে তাঁকে চিনতে দিলে না যে! যাক, ও কথা আর নয়, যখন দিন পাব তখন দেখো আমার মা মাই আছেন। এখন আমার একটা ব্যবস্থা কর।"

বন্ধু অবিনাশের কাছে কিছু দিন থাকার পর, ব্যবস্থা আপনিই হল; বন্ধু তাঁর গ্রামের এক মক্কেলের এষ্টেটের ম্যানেজার করে আমায় চাপকান চোগা পরিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে যে, সম্পত্তির মালিকরা মেয়েমানুষ, এবং তাঁদের না কি সন্ন্যিসী ফকিরে ভারি ভক্তি। আমি যখন জীবনের এতটা কাল সন্ন্যিসীগিরী করিছি, তখন তাদের সঙ্গে খুব পোষাবে। কিন্তু গ্রামের আর এষ্টেটের মৃত মালিকদের নাম শুনেই আমার যেন কেমন একটা চমক লাগল। এ যেন চেনা নাম! এ যেন কবে কোথায় শুনিছি, তা যেন কিছুতেই ভাল করে সাহস করে স্মরণে আনতে পারলাম না। কেমন ভয় মিশ্রিত আশায় আমার প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি একদিনও দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে কেবলি ভাবছিলাম এ নাম কোথায় শুনিছি? আমার

সমস্ত স্মৃতিটা তালপাকিয়ে জটপাকিয়ে মনের মাথার ওপর বসেছিল—কিছু-তেই জটা ছিঁড়ে সেই স্মৃতির ধারাকে বহিয়ে আনতে পারলাম না! কিন্তু সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে ধ্বনি উঠতে লাগল—কোথায়—ওরে কোথায়?

উপাসনা (চৈত্র)

কর্ম্মের আনন্দ।

তার পর নিজেকে কর্ত্তা বলে জান: ধারণা করে নাও যে তোমার (খণ্ড) প্রকৃতিই তোমার মধ্যে কর্ত্তারূপে কাজ করছে, আর তোমার এই নিজস্ব (অন্তরতম) শক্তি বা প্রকৃতি ও (অখণ্ড) বিশ্ব-প্রকৃতিই স্বয়ং তুমি।

এই প্রকৃতি-সত্তা কেবল তোমারই নয়, তোমার অহংকারের গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধও নয়। তোমরাই প্রকৃতি সূর্য্য ও বিশ্ব চরাচর গড়েছে, পৃথিবী ও তার জীবকুলকে গড়েছে, যা' কিছু তুমি হয়েছ যা' কিছু তোমার বলে আছে যা' কিছু তোমার অন্তর সত্তা সবই সেই গড়েছে। এই প্রকৃতিই তোমার শত্রু ও মিত্র, তোমার জননী ও তোমার খাদক, তোমার প্রণয়ী ও তোমার উৎ-পীড়ক, তোমার আত্মার সহোদরা অথচ তোমার নিতান্তই পর, তোমার আনন্দ অথচ দুঃখ, তোমার পাপ অথচ পুণ্য, তোমার শক্তি অথচ দুর্ব্বলতা, সেই তোমার জ্ঞান অথচ অজ্ঞানও সেই। আবার বলতে গেলে এ সকলের কিছুই সে নয়, সে এমন এক অপূর্ব্ব বস্তু এগুলি সবই যার ছায়া ও অসম্পূর্ণ প্রতিমা। কারণ এই সকলের অতীত হয়ে সে তো আত্ম জ্ঞানেরই বিলাস, অনন্ত—শক্তি সিন্ধু অগণ্য গুণ সমষ্টি।

কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের মাঝে আছে একটি বিশেষ গতি, একটি বিশেষ প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত শক্তিতরঙ্গ। তারই অনুসরণ কর, ক্ষীণ স্রোতা নদী যেমন ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে বিপুল হয়ে সাগরে মেশে তেমনি এই ধারা তার অনন্ত মূল ও আশ্রয়ে তোমার পৌঁছে দেবে।

অতএব এইটুকু বুঝে রেখো যে এই স্থূল জড় পিণ্ডে তোমার দেহ একটি গিঁট, বিশ্ব মন সলিলে তোমার মন ও জীবন একটি ঘূর্ণীপাক মাত্র। এই জেনো যে তোমার শক্তি সকলেরই দেহচারী একই শক্তি, যে জ্ঞান কাহারও একার সম্পত্তি নয় তোমার জ্ঞান সেই জ্ঞানেরই স্ফুরণ, তোমার কর্ম্ম তোমার হাতের কাছে গড়ে গড়ে কে এগিয়ে দিচ্ছে; এই জ্ঞানে অহংকারের ভুলের বাঁধন কেটে বেরোও।

এই বাঁধন কাটা সাঙ্গ হ'লে তখন তোমার স্বরূপের সত্যে তোমার শক্তিতে মহত্ত্বে মাধুর্য্যে ও জ্ঞানে অপার মুক্ত আনন্দ লাভ করবে; অধিকন্তু এ সব সম্ভোগের মত এ সব ত্যাগেও সম আনন্দ পাবে। কারণ এ সব তো সেই পুরুষের মুখের মুখস, জগত শিল্পীর নিজরূপ গড়ার শিল্পচাতুরী।

নিজেকে সীমায় বেধে ছোট করবে কেন? যে অসি তোমায় আঘাত

করছে আর যে বাহু আলিঙ্গনে বাধছে দুইয়েতেই নিজেকে অনুভব কর, সূর্য্যের দীপ্তিতে ও ধরণীর গতি নৃত্য, বাজের ওড়ায় ও কোকিলের গানে, যা কিছু ছিল যা' আছে আর যা' কিছু প্রকাশের জন্য ব্যাকুল সব তাতেই আত্ম অনুভূতি লাভ কর। কারণ (স্বরূপতঃ) তুমি অনন্ত ও এ সকল আনন্দই তোমাতে সম্ভব।

কর্ম্মী (প্রকৃতি) কর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করে আর সে যে প্রণয়ীর জন্য কাজ করে সে প্রণয়ীর আনন্দও তার উপভোগ্য। প্রকৃতি নিজেকে তার জ্ঞান তারই শক্তিরূপে জানে; তার জ্ঞান ও জ্ঞানের সঙ্কোচ (অজ্ঞান), তার আত্মার অখণ্ডত্ব ও ভেদ, তার অসীমতা ও স্বরূপের সীমা বলে নিজেকে বোঝে। (কিন্তু শুধু তাই নয়) নিজেকে স্বরূপতঃ এ সকলি বলে জেনো আর তোমার চির প্রিয়তমের আনন্দ অন্তরে ধর।

যারা নিজেকে কর্ম্মশালা বা যন্ত্র বা তার হাতের শিল্প বলে জানে কিন্তু কর্ত্তা বা প্রকৃতিকে ঈশ বা কর্ত্তা বলে মনে করে; এও এক বিষম ভ্রান্তি। যারা এ ভুলের মাঝে পড়ে আত্মহারা হয় তারা আপন উচ্চ শুদ্ধ ও পূর্ণ কর্ম্ম পায় না।

ব্যক্তির প্রতিমায় বা রূপের বাঁধনে সসীম প্রকাশই তো যন্ত্র। ব্যক্তিত্বের ভঙ্গিমায় অনন্তের অভিব্যক্তিই কর্ত্তা, কিন্তু এ দুয়ের কোনটিই যে ঈশ, কারণ এ দুয়ের কোনটিই প্রকৃত পুরুষ—সেই পরম মানুষ নয়।

চিত্র-পরিচয়

"সনাতনী ম্যাচ বা কন্যাঘাতী বিয়ে" চিত্রশিল্পী শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আঁকা। শিল্পী স্নেহলতার মরণের কথা ব্যঙ্গের রসে এঁকেছেন, সামাজিক বাঙালী কন্যাঘাতের কি নরকে এসে দাঁড়িয়েছে, এই ছবিখানির হাসির মাঝে বেদনার ছুরি দিয়ে সেইটি এঁকে দেওয়া হয়েছে। এখানে বর হলো কেরাসিন তেলের টিন, বরের টোপর টিনের ফানেলটি; পুরুত ঠাকুর স্বয়ং যম; আগুনের হলদে লহরের সঙ্গে মেয়ের গাঁট ছড়া বেঁধেছে; সেইখানে সনাতনী ম্যাচ বাক্স পড়ে আছে। ওদিকে কন্যাকর্ত্তার ও মেয়ের মায়ের গলায় বরকর্ত্তা পণের দড়া দিয়ে চক্ষু কপালে তুলেছেন। আজ কাল দেশে অনেক শান্তিসেনা সেচ্ছাসেবক হয়েছেন, আমাদের অনুরোধ এই যে একটা ফণ্ড খুলে এই ছবি হাজার হাজার ছাপিয়ে নেওয়া হোক। আর যারা ছেলের বিয়েয় পণ নেবে তাদের সবাইকে এক একখানি করে যেন পাঠন হয়।

নাঃ সহ সঃ

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

দাম্পত্য-বন্ধনের কথা।

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

দম্পতী হইতেছে সমাজের মূল-অংশ (unit), অথবা সমাজকে যদি একটি শৃঙ্খল বলিয়া মনে করা যায় তবে দম্পতী তার হইতেছে এক একটি গ্রন্থী বা সন্ধি। এই দম্পতীও আবার দুইটি ভগ্নাংশ লইয়া এক,—পতি ও পত্নী বা পুরুষ ও নারী। এই পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ যত দৃঢ় হইবে সমাজশৃঙ্খলা, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইবে, স্বতঃসিদ্ধ রূপে দেখা যাইতেছে। পুরুষ ও নারীর বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, সমাজ তাহার দুইটি বন্দোবস্ত করিয়াছে—প্রথম, নারীর সংযোগের সুবিধা দেওয়া ; দ্বিতীয়, এক কর্ম্মে ব্রতে আদর্শে বা ধর্ম্মে উভয়কে গাঁথিয়া দেওয়া—এই দুইটি লইয়া যাহা হয় তাহারই নাম বিবাহ। প্রাণের মিল অর্থাৎ স্বাধীন ভালবাসা ও মনের মিল—এই দুইটি উপায়ও ছিল, কিন্তু সমাজ সাহস করিয়া ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই—কারণ এ দুটি বস্তু বড় খামখেয়ালী, কখন কাহার সহিত হয় কখন আবার ছুটিয়া যায় তাহার ঠিক ঠিকানা নাই, সমাজ অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া চলিতে পারে না। ব্যক্তি হইতেছে সজীব সুতরাং অনিশ্চিত ; সমাজ ব্যক্তিকে আমল দেয় নাই, খাড়া করিয়াছে একটা ধর্ম্ম (principle) এবং তাহার মধ্যে দুটি ব্যক্তিকে—পুরুষ ও নারীকে বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ত আর আকাশ বা শূন্য হইতে নামিয়া আসে না, কোথায় তাহাকে পাওয়া যায় ? সমাজ পুরুষের মধ্যেই ধর্ম্মকে পাইয়াছে, আর নারীকে করিয়া দিয়াছে তাহার সহধর্ম্মিণী। এরূপ করিবার কারণও ছিল। দম্পতীর দুই অংশ সমান হইতে পারে না— অংশ দুটি যদি জড় হইত তবে বোধ হয় কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাহারা যে

সজীব, আর সজীব হইলেই উভয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী (পুরুষ ও নারীর মধ্যে আছে যে একটা চিরবৈরী, এই sex-war এর কথা ত পাশ্চাত্য বিধান হাতে হাতে প্রমাণ করিতেছে!) তাই একজনকে উপরে আর একজনকে নীচে, একজনকে প্রভু আর একজনকে তার অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে। শারীরিক বলে নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির বলেও নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়—তাই পুরুষেরই স্থান উপরে, পুরুষই প্রভু। নারীকে ছোট পুরুষকে বড় করিয়া একজনকে আর একজনের মধ্যে মিশাইয়া লইয়া দম্পতী বস্তুটিকে দৃঢ় ও নিরেট করিয়া তোলা হইয়াছে—উভয়ে সমান বড় হইলে দম্পতী বলিয়া জিনিষ থাকে না (আমেরিকায় আজ কাল যেমন হইতেছে,) আর সমাজের শৃঙ্খলও তাহাতে শিথিল হইয়া আসে। "এই বন্দোবস্তে নারীর যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা নয়, নারীর অন্তরাত্মার কোন অপচয়ই ইহাতে ঘটে না। ইহাতে নারীর প্রাণও শুকাইয়া যায় না, মনও পঙ্গু হইয়া থাকে না। স্বাধীন স্বতন্ত্র যথেচ্ছভাবে চলিলে নারীর প্রাণ ও মন যে রস পায়, যে রকম ভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়—সেটা হইতেছে পশুজগতের কথা; কিন্তু দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যে নারীর প্রাণ ও মন যে আনন্দ পায় তাহা হইতেছে সংযমের আনন্দ অর্থাৎ তাহা হইতেছে সহজ প্রাকৃত প্রবৃত্তিকে সংহত ও সুসংযত করিয়া একটা উদারতর স্তরে উচ্চতর কেন্দ্রে উঠাইয়া ধরা। সীতার প্রেমের আনন্দ কে পাইয়াছে—ক্লিওপেত্রা না কাথেরীন? গার্গী যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল—সে জ্ঞান স্বাধীনভর্তৃকা কোন নারী পাইয়াছে?

তবে দোষ কি, ক্রটী কোথায়? দোষ দেখি এই, পুরুষের মধ্যে কি জ্ঞানে কি কর্ম্মে কি প্রেমে যত সংখ্যক যত রকম মহা-পুরুষ পাই, নারীর মধ্যে "মহা-নারী" তেমনি পাই না। কেন? পুরুষকে উচাইয়া ধরিয়াই কি নারীর বিশেষ সার্থকতা, নারীর নিজের মহিমা কিছু নাই? নারীর প্রতিভা কেবল দানে, সৃজনে নয়? আচ্ছা, সমাজের ব্যবস্থা যদি এমন হইত যেখানে নারীই পাইত প্রাধান্য, অন্ততঃ নিজত্বের পূর্ণ প্রবাহ, সেখানে সমাজের চেহারা কি রকম হইত? Sex war এর কথা ভুলিয়া যাও ধর, দম্পতী যদি হইত সমান পূর্ণ দুইটি বস্তুর সম্মীলন একীকরণ, তবে দাম্পত্যবন্ধন কি আরও শক্ত নিরেট হইয়া সমাজকে শক্ত ও নিরেট করিয়া তুলিত না? অবশ্য তার আগে চাই নারীর ও পুরুষের প্রত্যেকের স্বভাবের শুদ্ধি, চাই অন্তরাত্মার মিল, দুইটি পরিশুদ্ধ আত্মজ্ঞ সত্তার স্বেচ্ছা সম্মিলন—নতুবা শুধু প্রাণের বা মনের

মিল পাকা খাঁটি জিনিষ নয়। কিন্তু তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, দম্পতী আর সমাজের কেন্দ্র থাকে না,—কারণ তখন আর দাম্পত্য সম্বন্ধ দিয়া সমাজের বন্ধন আরম্ভ করা যায় না, ও জিনিষটি হইয়া পড়ে শেষের কথা। গোড়ার আসনে কেন্দ্র হয় ব্যক্তি, পুরুষই হউক আর নারীই হউক। প্রত্যেক পুরুষ চলে আপন অভিব্যক্তি, সার্থকতার দিকে, প্রত্যেক নারীও তাই চলে—পরে অভিব্যক্তির একটা সুরে সার্থকতার একটা টানে এক পুরুষ এক নারীর সহিত সঙ্গত হয়, তাহারাই হয় আদর্শ দম্পতী। কিন্তু ইতিমধ্যে, যতদিন আদর্শ দম্পতী সৃষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ পুরুষ নারী আপন আপন পূর্ণতা সাধন করিয়া অটুট মিলনে মিলিত হইতেছে না ততদিন কি হইবে? ফলতঃ সেটাকে আর ইতিমধ্যে বলা চলে না সেইটাই হয় সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা। কি রকম ব্যবস্থা সহজে দাঁড়ায় তাহার একটা কল্পনা আমরা করিতে পারি। গোড়ায় দাম্পত্য বন্ধন না থাকিলে, পুরুষ ও নারী যথেচ্ছ ভাবে আপন আপন পথে চলিলে, সমাজে হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, বিচ্ছৃঙ্খলতা—কারণ আদর্শ সাথী পাইবার জন্য কেহ বসিয়া থাকিতে পারে না, সকলেই সাধু হইয়া গিয়া একলা একলা শিব ও গৌরীর মত—সাধনা করিতে থাকিতে পারে না।

কিন্তু কথা হইতেছে সমাজ বন্ধনের জন্য দাম্পত্য-বন্ধন গোড়ায় দরকার কেন? দুই বা জোড়ার উপর দাঁড় না করাইয়া একের উপর কি সমাজকে দাঁড় করান যায় না? তাহাতে শুধুই কি হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, বিচ্ছৃঙ্খলতা? দম্পতীর উৎপত্তি আদৌ হইল কি ভাবে, কি রকম অবস্থায়? দম্পতীর উৎপত্তি সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্য। সমাজের আদিম অবস্থায় যখন শান্তির সুশৃঙ্খলার অভাব ছিল, প্রত্যেক মানুষকে নিজের রক্ষার ভার নিজেকে লইতে হইত তখনই গৃহের ঘরের বাস্তর সৃষ্টি—স্ত্রী সন্তানকে বুকে ধরিয়া বসিত আর পুরুষ আপন বাহু দিয়া স্ত্রীকে ঘিরিয়া রাখিত। এই রকমে দাম্পত্য জীবনের সৃষ্টি, এই রকমেই দম্পতী শ্রেণী বা গৃহসমষ্টিতে সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পরে অভ্যাস সংস্কার এই জিনিষটির উপরই রঙ্ চড়াইয়াছে, কল্পনা ইহাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটিকেই যে চিরকাল বাহাল রাখিতে হইবে এমন কি কথা আছে? এখন কি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই? সমাজ এখন এমন সুসংহত সুশাসিত সমষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, এমন পৃথক সত্তা ও জীবন পাইয়াছে যে সন্তান সন্ততির ভার একান্ত পিতামতার উপর না থাকিলেও চলে। তাই ইউরোপে state children

এর কথা উঠিয়াছে। অর্থাৎ শুধু সন্তান কেন, সন্তান পিতা-মাতা সকলেই হইতেছে সমাজের অথবা প্রত্যেকেই নিজের নিজের—রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ শিক্ষাদীক্ষা কাজকর্ম্ম বিষয়ে প্রত্যেকেরই দাবি সমাজের কাছে; সমাজের ব্যক্তি-বিশেষের কাছে নয়।

বলশেভিকদের সম্পর্কে Nationalisation of women বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। কথাটা শুনিলেই চমকাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু কথাটা যদি মোলায়েম করিয়া লই তবে উহার সদর্থ যে কিছু বাহির হয় না, তাহা নয়। Nationalisation of women অর্থ, কোন নারী কোন পুরুষের সম্পত্তি নয়—প্রত্যেক নারীই স্বাধীন স্বতন্ত্র, ইচ্ছা করিয়া যদি কোন বিশেষ পুরুষের সহবাসে থাকে তবে আলাদা কথা (অবশ্য দুই জনেরই ইহাতে সম্মতি প্রয়োজন), কিন্তু নারী যদি কাহারও হয় তবে গোটা সমাজের। এই অর্থে শুধু নারী কেন পুরুষ এবং শিশুসন্তানকে ত nationalised বলা চলে। ইহা হইতেছে প্রত্যেক সত্তার Self-determination এর কথা। এই রকম nationalisation যে খুব নূতন জিনিষ, বোলসেভিকদেরই আবিষ্কার, তাহা বলা চলে না। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতকটা এই ধরণেরই জিনিষ দেখিতে পাই না কি? সেখানে নিজস্ব ব্যক্তিগত ধন (private property) বলিয়া কিছু নাই, ভিক্ষার ঝুলিটি পর্য্যন্ত মঠের সম্পত্তি, নারীও কোন বিশেষ পুরুষের নয়, সেও সম্প্রদায়েরই—সন্তান সন্ততি যে হয় তাহারাও মাতার বা পিতার নয়, সম্প্রদায়েরই—পুরুষ সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

দাম্পত্য-বন্ধন গোত্র কুল গোষ্ঠীর আঁটঘাট একটা বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়াছে। সমাজে এই রকম এক একটি কোট একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি করিয়াছে—এক একটা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা স্বভাব রচিত হইয়াছে। এক একটি বংশ এক এক বিশেষ ছাঁচ দিয়াছে—সেই বংশে যে সন্তান সন্ততি সকলেই সেই একই ছাঁচে তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে। তাই বংশের অন্য নাম "অন্বয়" অর্থাৎ পূর্ব্বের অনুবৃত্তি বা অনুসরণ। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষ গুণ যেমন ক্রমে জোর পাইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠে, কতকগুলি দোষও তেমনি বাড়িয়া কায়েমী হইয়া পড়ে। সমাজের স্থিতির পক্ষে এ রকম বন্দোবস্ত ভাল হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গতি, সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধরণের প্রতিভার আবির্ভাবের পক্ষে তাহা সহায় নয়। দাম্পত্য-বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেলে অর্থাৎ

সেটা মুখ্য কথা না হইলে, কুলধর্ম্ম গতানুগতিক স্বভাব (tradition) চিরাভ্যস্ত সংস্কারের হাত হইতে সন্তান সন্ততিরা মুক্তি পাইলে—সমাজে বৈচিত্র নূতন সৃষ্টির পরিসর বাড়িয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা দাম্পত্যের নীড় ভাঙ্গিয়া গেলে, সন্তান সন্ততির গ্রাসাচ্ছাদন শিক্ষা-দীক্ষার অভাব নাও হইতে পারে, কিন্তু গৃহ ত কেবল হোটেলখানা নয় বা ইস্কুলও নয়, গৃহ যে স্নেহের নীড়—শিশুর হৃদয় সরস সজীব হইবে কি রকমে, কোথায়? কিন্তু নারী দাতম্প্য-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও, সন্তানকে যে ছাড়িয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই। আর কিছু না হয় এখনকার পরিবারে কর্ত্তা হইতেছে যেমন পুরুষ, তেমনি পুরুষ যদি তাহার এই স্থান হইতে বিচ্যুত হয়, তবে নারীই না হয় সে স্থান অধিকার করিবে। গৃহ গৃহই থাকিবে। দাম্পত্যবন্ধন না থাকিলে গৃহ যে থাকিবে না তাহা নয়, কিন্তু তাহা হইবে অন্য রকমের গৃহ—এক নারীরই গৃহ হউক কিম্বা একাধিক নারী ও পুরুষের বৃহত্তর গৃহ (communal) হউক।

আরও একটি কথা, দাম্পাত্য-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া কি মানুষের চিরন্তন স্বভাব নয়, মানুষ একলা স্বতন্ত্র কি থাকিতে পারে, চলিতে পারে? কিন্তু আমরা তাহা বলিতেছি না—আমরা শুধু বলিতেছিলাম এই কথা যে দাম্পত্য-বন্ধনটা শেষের জন্য রাখিয়া দিলেও, দেওয়া যাইতে পারে। আগে ব্যক্তি, ব্যক্তির উপর ব্যষ্টি হিসাবে পুরুষ ও নারীর উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি পূর্ণ গোটা বস্তু ধরিয়া প্রথমে সমাজ বাঁধা হইক। পরে ইহার মধ্যে জোড় বাঁধে, সে পরের কথা, সমাজ শৃঙ্খলার তাহাতে কিছু আসিবে যাইবে না।

বোলশেভিকেরা ইহাই করিতে চাহিতেছে। আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাই হইয়া উঠিয়াছিল। তবে বলশেভিকরা করিতে চাহিতেছে কলের মত জোর করিয়া (mechanically), মানুষকে জড়বস্তু বোধে পিষিয়া মাড়াইয়া। আর বৈষ্ণবদের মধ্যে তাহা হইয়া উঠিয়াছিল একটা প্রাণের আবেগে ভাবের উত্তেজনায়। কোনটারই পিছনে একটা সজীব সজাগ বুদ্ধি, একটা সুদৃঢ় সত্য উপলব্ধি বা উদার পরিকল্পনা ছিল না।

সমাজের এ রকম ব্যবস্থার জন্য, পূর্ণ অনন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আগে চাই খুব গভীর একটা দীক্ষা, নীরেট একটা শিক্ষা, পরিপূর্ণ একটা শুদ্ধি ও সাধনা। তৎব্যতিরেকে হইবে কেবল

বোলশেভিকী ওলট পালট, ভাঙ্গা চুরা, প্রলয় (chaos) আর না হয় "নেড়া নেড়ীর কেচ্ছা"।

নারীকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিলে চরম কি হইতে পারে জের টানিয়া আমরা তাহারই একটা চিত্র পরিকল্পনা করিতেছিলাম। খুব খারাপ ভাবে দেখিলেও পরিণাম যে কেবলই বিষময় তাহা নয়, আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার তাহাকে যতই কালো করিয়া দেখুক না কেন, তবুও সেখানে থাকিতে পারে যে আলোর রেখা এইটুকু বুঝাইতে যদি পারিয়া থাকি তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

আমি।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

সীমাবিহীন কালের মাঝে
যোজন যোজন পথে
আমি ছুটে বেড়াই
হাজার বাঁধন মোহের কাঁদন
তার মাঝারে যেগো
আমি আমায় হারাই,—
হারিয়ে মোরে আবার খুঁজি
অবুঝ হ'য়ে আবার বুঝি
এম্‌নি করেই আনন্দটী
সদা লুটে বেড়াই
অসীম আমার জীবন পথে
আমি ছুটে বেড়াই।

পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে
শীতল স্রোতস্বিনী
শুধুই নীচু পানে

নৃত্য করি সিন্ধু পানে
যায় রে শুধু ছুটে
একটী স্থরের গানে
নাইরে আমার উঁচু নীচু
নাইরে আগু নাইরে পিছু
হাজার স্থরের গাঁথা জালে
আমি আমায় হারাই
হাজার বাঁধন আলিঙ্গনি
আবার তারে তাড়াই।

কোথায় কবে স্বপ্ন দেখে
এসেছিলাম নামি'
এই ধরার পরে
উর্ণনাভের জালে আমায়
জড়িয়েছিনু আমি
মধুর মোহভরে,—
জড়িয়ে আবার খুলতে চাহি
মনের আমার ঠিক্না নাহি
হারিয়ে ফেলে আবার চাহি
পেয়ে আবার হারাই
শিশুর মতো মন-ভোলা তাই
এম্নি করেই বেড়াই।
হেথায় হ'তে আবার আমি
স্বপ্ন দেখেছি এক
ওই উর্দ্ধ লোকে
সেই পানেতে জীবন তরীর
হাল ধরেছি তাই
ও ভাই কি পুলকে ;—
যেথায় থেকে হেথায় আসি
হেথায় হ'তে ভালবাসি

ঊর্দ্ধ-লোকের অসীম গানে
চিত্ত আমার ভরাই
আমি গোপন করে' আমার আমি
এম্‌নি ছুটে বেড়াই।

নারী-মঙ্গল

(শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত)

কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং মাতৃত্ব—এই ত শক্তির অভিব্যক্তির তিনটী ধারা—শক্তি সঞ্চয়, শক্তিবিকাশ এবং শক্তিপ্রকাশের যুগ।

প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিসঞ্চয়ের যুগ (Potential accumulation) বলা যেতে পারে। কুমারী-শক্তিকে আমরা হৃদয়ে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করি, কেননা শক্তি-প্রস্রবণের অনন্ত গোমুখীধারা কুমারীত্বের ভিতর লুক্কায়িত—সে যে বর্ত্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-মোহন-ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সামান্য ক'জনকে নিয়েই তাঁর কারবার। তবে এই সময় থেকেই শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হতে থাকে। আমাদের দেশে গৌরীদানের ফল এই দাঁড়াত যে ভিত্তি ঠিক না করেই আমরা তার উপর প্রাসাদ গড়বার কল্পনা করতুম! সুখের বিষয়, সে দিন চলে যাচ্ছে। আশা করি, এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হলে তবেই কুমারী নারীত্বের তথা দেবীত্বের পথে যাত্রা ক'রবেন—নতুবা নয়। এই হচ্ছে Training period ; এই সময় আদর্শ-টিকে বেশ সুস্পষ্ট করে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, আমরা হয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প'ড়ব।'

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশের যুগ (Development) বলা যায়। এই স্তরে কুমারী নারীত্বের ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথা বিশ্বের পথে যাত্রা করেন। বিশাল বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে, ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতর, কুমারী সামান্য একটুখানি স্থান দখল ক'রবার জন্যে উপস্থিত হন। অপরিচিতাটিকে সকলেই "দেবী" হিসাবে বরণ করে ঘরে তোলেন। এই সময় থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ফুরণ। পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি

পরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে যুগযুগান্তের হারানিধিরূপে ফিরে পান। শক্তির এই আশ্চর্য্য বিকাশ তখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী দেবী একটি শক্তিময় কেন্দ্র খুঁজে পান—যখন তিনি সেই স্থির কেন্দ্রের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর লীলা-পরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান।' এই কেন্দ্রই হচ্ছে, লীলার দোসর, "পতি"—কেননা তিনি পত্নীকে পতন থেকে রক্ষা করেন; এবং দেবী নিজে পত্নী কেননা তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু "দোসরের" ভিতর যে দ্বিত্বভাব শক্তির পক্ষে তা অসহ্য; শক্তি চায় মিলন—একত্ব। মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায় উভয় কেন্দ্রের প্রাণমন আদর্শ; প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে, এক হয়ে যায়। আর দ্বিত্বভাব নেই—তখন "পতি" হয়ে যায় "স্ব—আমি"—তখন স্থিরকেন্দ্রের উপর তাঁরা স্বপ্রতিষ্ঠ। এই অবস্থা "যদস্তি হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম..."এই সরল সুন্দর মন্ত্রটির পূর্ণপরিণতি ও সার্থকতা। কুমারী-শক্তির এই প্রথম দেবীত্ব সিদ্ধি, কেননা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি "আপন হইতেও আপনার" করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সময় থেকেই "আমি" পরিধির বিস্তৃতি আরম্ভ, কেননা আর কেন্দ্রভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। অসীমের বাঁশী তার প্রাণমন আলোড়িত করে, তাকে বিশাল বিশ্বে আহ্বান করে। তখনই "বহু" হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে। এই বাসনা থেকেই সৃষ্টি। শক্তির এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতর আনাগোনা এই ত সৃষ্টিলীলারহস্য। এই তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে শক্তিপ্রকাশের যুগ (Realisation)। নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব। আজ তিনি সন্তানের ভিতর নিজেরই আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়—আজ আর শত্রুতে মিত্রতে প্রভেদ নেই—তিনি বিশ্বজননী—তোমার,আমার সকলের মা। আর সেই জন্যেই যে মুহূর্ত্তে হিন্দু সন্তানকে নিজের আত্মারই মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই পত্নী-আর পত্নী নন—তিনি তাঁরও মা। এই জন্যেই তন্ত্রের উপদেশ—রমণীকে জননীত্বে পরিণত কর, তোমার ভোগ পিপাসা মিটে যাবে।

এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা অধিকাংশই, মুখে এবং লেখায় যাই বলি না

কেন, কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নারীত্বকে পদদলিত করে, শুধু দৈহিক সম্বন্ধটাকেই বড় করে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্ম্মের মারফতে সে সব নারীর জীবন সুন্দর ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে, তাঁদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠছে সে খবরও আমরা রাখি। অন্ধ "পতি দেবতা" মোহ এ দুর্ব্বার জলতরঙ্গ বেশী দিন রোধ করতে পারবেনা। আজ নারী, হাড়ে হাড়ে ভুগে, দেবতা ও পশুর পার্থক্য বেশ করে যাচাই করে নিতে শিখছে। যেদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা সন্ধুক্ষিত হয়ে উঠবে, সেদিন হয়ত বাংলা স্তম্ভিত হবে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতেই হবে যে নারী শুধু রমণী নন—তিনি নারী এবং ভবিষ্যৎ বাংলার জননী। ভাই বাঙ্গালী, সাবধান !!

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার করেও প্রেম তৃপ্তি পায় না। অসীমের আহ্বান তাকে দূরে—আরো দূরে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখন স্বামী জগৎস্বামী-তে পরিণত হয়।

* * * *

যা অসুন্দরকে সুন্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণীতে ভরপূর করে দেয়, এবং অসামঞ্জস্যতার ভিতর যা সুসামঞ্জস্যের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমরা শ্রীনামে অভিহিত করি। নারী সেই শ্রীরূপিণী মহাশক্তি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অন্যায় চাপে, নারী আজ শ্রীভ্রষ্ট এবং আমরাও আজ শ্রীহীন—লক্ষ্মীছাড়া।

সেই সুপ্তশ্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে অন্ততঃ বাংলায় একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। সে শ্রী ফুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অন্তরে, পঙ্গুসমাজ এবং নির্ম্মম শাস্ত্রের "অচলায়তন" চুরমার করে। আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী শ্রীসম্পন্ন হয়ে এক অভিনব 'দেবজাতি' গড়ে তুলুক। সেজন্যে প্রত্যেক নরনারীকে স্বরাট এবং স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে হবে—পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। প্রবীণের দল হয়ত স্ত্রী-স্বাধীনতা শুনেই আঁৎকে উঠবেন! কিন্তু আমাদের মতে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা কিম্বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়,—স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের অন্তর দেবতার অধীনতা।

আমাদের দেশে তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কথা বলি না। আমরা জোর করে বাইরে থেকে স্বাধীনতা চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। কাজেই দু'এক জায়গায় যে কুফল ফলবে সে ত

জানা কথাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা দেবে বলে পুরুষ যে স্পর্দ্ধা করে, সেটা নিতান্তই মিথ্যা কথা—ফাঁকা চাল। স্বাধীনতা দানের বস্তু নয়—অন্তরের ভাবলব্ধ ধন। অন্ধকারের জীব অতখানি আলোর সমারোহ সহ্য করবে কি করে! প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত করতে হয়। তখন স্বাধীনতাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে হবেনা,; সে আপনি এসে তার স্বর্ণসিংহাসন বিছিয়ে নেবে।

নারী, মনে রেখো—তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্তিরই একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আত্মবিস্মৃতা এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষ্ণবী হয়েছিলে বলেই তোমার এই দুরবস্থা। শক্তিহীনা না হলে কি তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে পারতুম? তোমার পায়ে শিকল পরিয়েই আমরাও আজ আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে বাঁধা—পদদলিত। শক্তির অভাবে আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোমাদেরও মনের শিকল কেটে ফেলতে হবে। আত্মানাং বিদ্ধি, 'আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান,' বুঝবার চেষ্টা কর, অন্তর্মুখ হয়ে আপনাকে মহাশক্তির অংশ বলে জান,—তারপর এস, দু'জনে মিলে একটা মহাসৃষ্টির সূচনা করি।

তবে এস সহধর্ম্মিণি, তোমার মাহেশ্বরী শক্তি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অনুদারতা আছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে দাও, যেখানে তোমার শক্তির অবমাননা দেখবে, সেখানে তোমার তীব্র জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত করে, তোমার সহধর্ম্মীর অন্তরে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা দিয়ে বিশ্বের সমস্ত শুভকাজে তার পাশে এসে দাঁড়াও এবং তোমার বৈষ্ণবী শক্তি প্রেমে, গানে, আনন্দে বিশ্বে চিরবসন্ত আনয়ন করুক।

জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমার, তোমার ভিতর ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিত্রয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সংসাধিত হয়ে বিশ্বে এক নবযুগের সূচনা করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান্ আদর্শের অঙ্কুরটি সযতনে রোপণ করে দাও,—তুমি হয়ত দেখতে পাবে না—কিন্তু কালে সেই অঙ্কুরটি এমন এক মহামহীরুহে পরিণত হবে, যার শীতল ছায়ায় বসে বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিত্র হবে।

নারী নারী—নারী বিশ্বজননী—নারী জ্ঞানপ্রেমকর্ম্মের ত্রিবেণী—নারী-শ্রী—নারী শক্তি ও স্বাধীনতার উৎস। আমরা সেই বিশ্বাত্মিকা মায়ের জাতকে

"নরকস্য দ্বারং" বলে ঘৃণা করে এসেছি। তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছিল রুদ্ধঘর, চোরাগলি এবং পর্ব্বতের গহ্বর। সে আত্মদর্শন ছিল স্বার্থ-দুষ্ট, কাজেই ব্যর্থ, সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই "আমি"কে মহত্তর ও বৃহত্তর ভাবে পেতে তাঁরা চেষ্টা করতেন, তা হলে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু গহ্বর থেকে ফিরবার পথ তাঁরা খুঁজে পাননি, হয়ত সে চেষ্টাও তাঁদের ছিল না। এটা হচ্ছে সামঞ্জস্যের যুগ। বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে এবার নয়, এবার

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে, মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নয়—কাউকে পিছনে ফেলে নয়,—এবার চোরাগলিতে নয়,—একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে—আনন্দবাজারে।

গান।

(ভৈরবী—একতালা)

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল।)

ফুল মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কার তরে ওগো কার তরে—
মৃদু বয়ে যায় দক্ষিণ বায়
তারি কথা মোর মনে পড়ে।
ডেকে ডেকে ওঠে পাপিয়া
কি সুখ যামিনী যাপিয়া
থেকে থেকে পিক চায় অনিমিক্
থেকে থেকে কুহু কুহরে!
সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া

আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বক্ষের তলে চাপিয়া!
তুলি' তুলি' হাসে মৃদুফুলগুলি
আমারি নয়ানে চাহিয়া
সে কি আসিবে না পরিবে না মালা
দিবে নাকি মালা মোর গলে!
দিন চলে যায়—নিশি কাটে হায়
আকুল নয়নজলে
সাধের এ মালা প্রীতি-ফুল-ডালা
সবি বুঝি যায় বিফলে।

যোগ বিয়োগ।

[শ্রীরাজকিশোর রায়]

শিশু পাঠশালায় অঙ্ক শিক্ষাকালে প্রথমতঃ যোগ-বিয়োগ শিক্ষা করে তৎপরে গুণ ভাগ প্রভৃতি যোগ-বিয়োগের রূপান্তরিত গণনা শেখে। একে এক দিলেই দুই হয় আর এক হতে এক নিলেই হাতে কিছু থাকে না, হাত শূন্য হয় ইহা শেখে। অঙ্ক শাস্ত্রে এক থাকা চাই কারণ এক না থাকলে অঙ্কপাতই হবে না। কিন্তু শিশু বোঝে না এই এক কি এবং কোথা হ'তে এলো। এককে যদি স্বতঃসিদ্ধ না ধর তোমার অঙ্কপাত বা কোন গণনা হবেনা সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রে এককে ছাড়বার জোটি নাই--এককে ধরে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে এক আছে। আধ্যাত্মিক জগতে বা ধর্ম্মশাস্ত্রেও "এক" একমেবাদ্বিতীয়ং, এই এক হতেই আরম্ভ, এক অনাদি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভূ!

২। বালক যখন অঙ্ক কোসতে বসে তখন ঠিক বোঝেনা একে আর একটা একদিলেই দুই হয় কেন বা এক হতে এক নিলে হাতে কিছু থাকে না কেন। প্রথম একটি বা কি আর দ্বিতীয় একটিই বা কি স্বরূপতঃ উভয় এক কি এক নয়? বাস্তবিক দুই একই এক, তবে মনে হয় যেন দুইটি বিভিন্ন পদার্থ। গুরু মশাই শিশুর হাতে একটা পাকা আম দিয়া বলেন "বাপুহে!

বলতো কটা আম পেলে" ? শিশু অনায়াসেই বলে "একটা", একটাকে জানতে শিক্ষা কত্তে হয় না ইহা মানবের সহজ জ্ঞান। শিশু যদি আর একটা আম পায় হাস্‌তে হাস্‌তে বলে "আমার দুটো আম হয়েছে" একটার ওপর আর একটা হলেই মানুষের আমোদ আহ্লাদ ধরে না। আম পেয়ে বালকদের আমোদের কারণ যে উহা খাবে দেখাবে বা নিয়ে খেলা কর্ব্বে। কিন্তু গুরু মশাই আমটা দিয়ে যদি উহা কেড়ে নেন্ ত শিশুর হাসি তৎক্ষণাৎ কান্নায় দাঁড়ায় কারণ তার হাতে কিছুই নাই, হাত খালি। যেটি তার ছিল তা অপরের হয়েছে। গুরুমশাই যদি জিজ্ঞেস করেন বাপু হে,হাসলেই বা কেন আবার কাঁদচো কেন ? বালক কিছু সঠিক জবাব দিতে পার্ব্বে না। আঁক কসাতে ব'সে গুরুমশাই তখন যদি বলেন বাপুহে, যখন তোমার হাতে একটা আম দিলাম তখন তোমার বড় আমোদ হোল তার ওপর যখন আর একটা দিলাম তখন তোমার আমোদ ধরে না। এই একটার সঙ্গে যে একটার মিলন ঐ মিলনকে অঙ্ক শাস্ত্রে যোগ বলে আর যখন ঐ আমটি কেড়ে নেওয়া হয় তখন যে কাজ করা হয় ঐ প্রথার নাম বিয়োগ।" শিশু কিন্তু ইহার গূঢ়ার্থ বুঝ্‌তে পারুক আর না পারুক তাকে যে যুগপৎ হাসি কান্নায় পড়তে হয়েছে তা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। কিছু পেলেই আনন্দ আর কিছু গেলেই দুঃখ এটা সে কতকটা বুঝেছে।

৩। সংসারে এই যোগ বিয়োগ নিয়ে ভগবানের লীলা বা খেলা। পূর্ব্বেই বলেছি এক স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভু অনাদি কাল ধরে আছেন। একের দুই হবার ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টির সূত্রপাত! এক হ'তে দুইএর সৃষ্টিতে ইচ্ছাশক্তির আবশ্যকতা হয়েছিল তাই একে চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল আর শিশু যেমন একটা আম পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল কেন না সে উহা খাবে দেখ্‌বে বা উহা নিয়ে খেলা করবে তদ্রূপ আদি এক বা পরমাত্মার চিৎশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির উদয়ে নিজেকে নিজে দেখবার উপভোগ করবার বা খেলবার জিনিষ পেলুম এই জ্ঞানে অপার আনন্দের উদয় হয়েছিল। কাজেই তাঁতে চিদানন্দের সমাবেশ। তিনি সৎ অর্থাৎ বরাবর আছেন তাতেই এই দুই গুণের সমাবেশে তিনি সচ্চিদানন্দময় হয়ে আছেন। কেমন নয় ? ছাত্র একটার ওপর আর একটা আম পেয়ে যেমন আনন্দে নাচে ভগবান একমেবাদ্বিতীয়ং অবস্থায় থাকবার পর যখন প্রজা সৃসৃক্ষু হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন সেই থেকেই তিনি সচ্চিদানন্দ নিত্যানন্দ ঠাকুর হয়ে আছেন।

৪। বালক যখন আমটি পেয়েছিল তখন তাহার আমোদ ধরে না কারণ তাহার আমের সহিত একটা আমিত্ব সম্বন্ধ হয়েছিল। আমি আম খাব, এটা আমার আম, আমার আম নিয়ে খেলা হবে, আমি আমটাকে অপরকে দেখাব; আমার আম সবার চেয়ে ভাল ইত্যাদি—কাজেই তার আনন্দ; কিন্তু আম পেয়ে ভাবেনি আমটি খেলে ওর হাতে কিছু থাকবেনা কিম্বা কেউ কেড়ে নিলেও তার হাত শূন্য হবে, না সে খেলতে পার্ব্বে না সে দেখাতে পার্ব্বে। এই আমার আমিত্ব জ্ঞানে মানুষ কোন জিনিষ পেলে আনন্দ হয়, আমার একটা ছিল না একটা হয়েছে এই জ্ঞানে। আবার যদি আমটি কেড়ে নেওয়া যায় তখনই সে কাঁদবে, না হয় ঝগড়া কর্ব্বে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "কেন তুমি কাঁদচো" সে অমনি জবাব দেবে, আমার যে আম অপরে নিয়েছে, কেন অপরে আমার আম নেবে, কেন অপরে খেলবে কেন অপরে উহা উপভোগ কর্ব্বে। আঁক্ কসতে বসে যদি কেড়ে নেওয়াকে বিয়োগ করা বোঝান যায় সে বোঝা দূরে থাকুক কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদবে আর বোলবে আমার জিনিষ অপরের হোল কেন?

৫। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যোগ বিয়োগে ভগবানের সংসার খেলা। আর আমরা এই ধারার মধ্যে খেলছি! সে খেলা হাসি কান্নায় জড়িত। পেলেই আনন্দ হারালেই কান্না অর্থাৎ যোগে আনন্দ বিয়োগে নিরানন্দ। পাবার জন্য সদা লালায়িত। কিছু পরেই তাকে রাখতে চেষ্টা করি যেন প্রাপ্ত জিনিষটা না হারাই। প্রাপ্ত জিনিষের সহিত সংযুক্ত থাকবার বাসনা আমাদের প্রকৃতিগত কিন্তু যেখানেই সংযোগ সেইখানেই বিয়োগ যেখানে আলো সেখানেই ছায়া। ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য। একটি অপরটির কাছে পাশাপাশি প্রচ্ছন্নভাবে থাকবেই থাকবে। যখন শিশু ভূমিষ্ট হয়, মায়ের কোলে উঠে তখন তার আনন্দ ধরে না সে মাকে কামড়ে ধরে রাখতে চায় পাছে মা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তার সঙ্গে মার বিচ্ছেদ বা বিয়োগ ঘটে। মা ছাড়লেই কান্না সুরু করে, মাও নবজাত শিশুকে তাঁর শূন্য কোলে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হন, কেননা তিনি একটি দেখাবার খেলবার মাই দেবার জিনিষ পেয়েছেন। ছেলেকে মাই দিতে মার বড় আনন্দ এমন আনন্দ আর কিছুতে হয় না। মায়ে পোয়ে উভয়েই আনন্দে মেতে উঠে। কেন না উভয়ের পরস্পরের মিলন বা স্বর্গীয় যোগ সাধন ঘটেছে। আকর্ষণে ভালবাসার উৎপত্তি কারণ উহাতে যোগ সাধন হয় তাই ভগবানের নাম কৃষ্ণ তাই নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মে এত উৎসব এত আনন্দ

হয়েছিল। এই দেহরূপ নন্দালয়ে যখন বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের বা ভক্তির উদয় হয় তখন মানুষের আনন্দের সীমা থাকে না। তাই কৃষ্ণসেবক বা ব্রহ্মপরায়ণ বিশ্ব প্রেমিক হয়। প্রকৃত কৃষ্ণসেবক সকলকে আঁকড়ে ধর্ত্তে চায় কেন না তাতে আকর্ষণ বা যোগশক্তি নিত্য বিরাজিত। যেখানে আকর্ষণ সেই খানেই আবার বিকর্ষণ বা বিচ্ছেদ হয় ইহা জাগতিক নিয়ম কাজেই শ্রীকৃষ্ণ বা প্রেমের বিচ্ছেদে কান্না আসে, তাই ভক্তিমতী শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহে এত শোক এত কান্না। যাক এসব তত্ত্ব বারান্তরে বুঝাবার চেষ্টা করবার বাসনা রইলো।

৬। বালক যখন বড় হয় তখন তার সাংসারিক নিয়মে শ্রীপুত্রাদি লাভ হয় অর্থাৎ সংযোগের ধারা পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হয়। যুবা বা যুবতী যখন স্ত্রী বা স্বামী লাভ করে তখন তার আনন্দ হয় কারণ তাহাদের পরস্পরের জীবনের আদান প্রদানের যোগ সম্যক্ সাধিত হয়। যৌবনে আকর্ষণী শক্তির উদ্‌গম হয়ে ক্রমশঃ উহার পূর্ণ বিকাশ হয় তাই যৌবনে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বাল্য বিবাহে তাহার কোন বিকাশ হয় না তাই উহা বর্জ্জনীয় ও দোষের। শ্রীরাধা তাই গৌরী ষোড়শী। মানুষ যখন সেই আনন্দ-দায়িনী স্ত্রী বা স্ত্রী যখন আনন্দদায়ক স্বামী হারায় তখন কেঁদে আকুল হয়। কেন কাঁদে তার উত্তর সোজা, কেন না তার বিয়োগ ঘটেছে বিয়োগে দুঃখ পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। তার হাতে জগৎগুরুমশায় যে পাকা আমটি দিলেন তাহা কেউ কেড়ে নিয়েছে তার হাত শূন্য হয়েছে হৃদয় শূন্য হয়েছে তার দেখবার আস্বাদন কর্ব্বার বা খেলবার জিনিষটা নাই সব শূন্য হয়েছে। তাই দক্ষালয়ে গৌরীশোকে মহাদেব দিশাহারা হয়েছিলেন। নবজাত পুত্রলাভে নর-নারীর অপার আনন্দ তাই পুত্রকন্যার নাম নন্দন নন্দিনী। পুত্রকন্যা লাভের ন্যায় আনন্দ জগতে আর নাই কারণ পুত্র কন্যা আত্ম স্বরূপ "আত্মবৈপুত্র নামাসি" "আত্মনঃ জায়তে পুত্র"। আপনার স্বরূপ নিয়ে খেলবার দেখবার উপভোগ করবার জিনিষ আর কি থাকতে বা হতে পারে? ইহা আত্মা-রামের আনন্দের প্রতীক আনন্দ মাত্র। স্ত্রী বা স্বামী সেই যোগ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বা সহায়ক তাই স্ত্রী বা স্বামী নারী বা নরের এত ভালবাসার জিনিষ।

৭। যোগে সুখ, বিয়োগে দুঃখ ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ইহা বেশ বোঝে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলা হয়েছে আর যোগে সুখ তাও বলেছি। চিত্তবৃত্তি নিরোধকে কেন যোগ বা সুখ বলে তাহা বোঝবার আগে সুখ জিনিষটা কি তা বুঝবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে

বলে সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্ব পরবশং দুঃখং” যাহা আপনারই বশে থাকে অর্থাৎ যাহা আপনার বলবার হয় যার উপর আমার সর্ব্বকর্তৃত্ব থাকে তাহাতেই সুখ হয়। আর যখন তা হয় না, যা আমার অধীন নয় তাতেই দুঃখ আসে! কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সকল যখন আমার অধীনে থাকে (এসব বৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক, কাজেই ত্যাগ করবার নয় তখনই আমার সুখ হয় আর উহাদের বিক্ষিপ্ততাতে বা বিচ্ছেদে বা বিয়োগে দুঃখ হয়। যদি কোন প্রথা অবলম্বন কর্লে মানুষ আপনার উক্ত বৃত্তিগুলিকে আপনার মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারে সেই প্রথাকে যোগ বলে। এই যোগ সাধনেই আত্মানন্দ বা সুখ, কেননা উহাদের উপর আমার সর্ব্বকর্তৃত্ব থাকে। আর বৃত্তিগুলি যখন পরাধীন হয় অর্থাৎ বিষয়পঞ্চকে বশীভূত হয় তখনই আমার দুঃখ হয়। আর বিষয়পঞ্চকের বিকর্ষণীশক্তি বড় বেশী, উহাদের আপনার কর্ব্বার শক্তি নাই। উহাদিগকে যারা আপনার করবার জন্য যে পরিমাণে আঁকড়ে ধর্ত্তে চায় তারা ততদূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তাদের এ বিচ্ছেদে বা বিয়োগে বড় কষ্ট হয়। এই জন্যেই গাঁজাখোরের গাঁজা ছাড়তে, মাতালের মদ ছাড়তে, প্রথমে বড়ই কষ্ট পেতে হয়, খেতে না পেলে কেঁদেই আকুল হয়। তাই মানুষ বারবনিতার লাথি ঝাঁটা খেয়েও সর্ব্বস্বান্ত হয়েও ছাড়তে পারে না।

৮। গীতা শাস্ত্রে “সমত্বং যোগমুচ্যতে” বলা হয়েছে অর্থাৎ যোগবিয়োগের অতীত হওয়াকে সুখ দুঃখের সাম্যবস্থাকে যোগ বলা হয়েছে, কেননা তাহাতে অপার নিত্যানন্দ লাভ হয়। সে অবস্থায় যোগের আশা নাই, বিয়োগের ভয়ও নাই। যে এক বচনাতীত অবস্থা উহা জীবাত্মার কুটস্থ অবস্থা। সেই অবস্থায় যে উপনীত হতে পেরেছে তার ন্যায় আর কে সুখী হতে পারে? কারণ তার চিত্তবৃত্তিগুলি তার নিত্যবশে আছে, তাতে নিত্যযুক্ত হয়েছে তাহাতে বিচ্ছিন্ন হবার কোন কালে ভয় নাই, কাজেই সে আত্মারাম বা নিত্যানন্দময়। ইহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা। জানিনা এ অবস্থায় জীবাত্মা চিরকাল থাকতে পারে কিনা, বোধ হয় পারেনা, কারণ সংকর্ষণী শক্তির নিত্য সহচর বিকর্ষণশক্তি; এই উভয়শক্তির সাহায্যে ভগবানের জগৎ-খেলা! এখন দেখা গেল সাংখ্যশাস্ত্রের যোগশব্দের সহিত গীতোক্ত যোগশব্দের কোন বিরোধ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানেই যোগ সেই খানেই বিয়োগ যেখানে আকর্ষণ সেই খানেই বিকর্ষণ যেখানে আলোক সেই খানেই

ছায়া। তবে ইহার হাত হতে এড়াবার কি উপায় নাই? বাস্তবিক কোনও কালে নাই—তবে কতকটা নিষ্কৃতি পাবার উপায় আছে।

৯। শিশুর আম পেয়ে আনন্দ, সে চায় না তার আম অপরে কেউ নেয়। মানুষও চায় সে যা পেয়েছে, সেই জগৎগুরুদত্ত জিনিষগুলি যেন সে না হারায়। স্ত্রীপুত্রাদি পেয়ে মানুষ তা হতে বিযুক্ত হলে কেঁদে আকুল হয় কারণ তার প্রাণ খালি হয়, তার উপভোগ-করবার জিনিষ কমে যায়, বিয়োগ বা অভাবে মানুষ দুঃখে পড়ে। পূর্ব্বেই বলেছি দুঃখ অর্থ পরাধীনতা। স্ত্রীর মৃত্যুতে পুত্রকন্যার মৃত্যুতে বা কাহার কোথায় গমনে উহারা স্থান বা কালের অধীন হয়, নিজের বল কিছুই থাকেনা, তাই তার দুঃখ। চোখের আড়াল হলেই মানুষ তার প্রিয় পদার্থের জন্য কাঁদে।

১০। অঙ্কশাস্ত্রে এক হতে এক নিলেই হাতে শূন্য থাকে অর্থাৎ কিছুই থাকেনা। শূন্য অনাদি; যখন হাত শূন্য হয় তখন বলতে পারা যায় না যে একবারে কিছুই নাই; আছে বটে—তবে আছে অনাদিতে, চক্ষু অন্তরালে গেছে, কোথাও না কোথাও আছে, একেবারে ধ্বংস হয় না বা হবার যোটি নাই। অর্থাৎ অনন্তকাল বা অনাদি হতে অন্যত্র যাবার স্থান কোথায়? বালক যখন আমটি খেয়ে ফেলে তখন তার আস্বাদন করার কিছুই থাকে না তাই সে কাঁদে যাতে সেটার মত বা আর একটা পায়। বাস্তবিক কি তার আমটি ধ্বংস হয়ে গেছে, তার অস্তিত্ব নাই? না, তা জাগতিক নিয়মে হতে পারে না। আম বোলতে যা কিছু তা ঠিকই আছে, নাই তার কেবল খোসাটা। আমার হাতে একটা টাকা ছিল তাহা লইয়া অপরকে দিয়াছি আমা হতে টাকাটা বিযুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বিযুক্ত টাকা টাকাই আছে তবে আমার কাছে নেই অপরের কাছে গিয়েছে; অপরের আনন্দ হয়েছে কারণ অপরের নিকট যোগ সাধন হয়েছে। আমটি বালক খেয়েছে, তার খোসা গেছে বটে কিন্তু তার সেই আমের আমত্ব বা বীজ বজায় আছে, সে বীজ থাকায় নববৃক্ষের উৎপত্তি হবে তাতে আবার অসংখ্য আমের উৎপত্তি হবে কত লোকে কত আমোদ পাবে। জিনিষের আসা যাওয়া নিত্য। সংসারে জীবের আসা যাওয়াও নিত্য। এই আনাগোনার অপর নাম জন্ম মৃত্যু।

১১। জগতে যখন যোগ বিয়োগ আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু নিত্য ব্যাপার তবে উহা নিয়ে হাসি কান্না ঘটে কেন? এই কান্নার কারণ অবিদ্যা বা মায়া। এখন আসুন দেখা যাক গীতা শাস্ত্রের "সমত্বং যোগমুচ্যতে" বাক্যের সত্য

উপলব্ধি হতে পারে কিনা? যদি এমন কোন জ্ঞানের উদয় হয় যাতে নিত্য যোগ জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে নিত্যবৃদ্ধ হয় তবে মানুষের নিত্যসুখ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যোগের উৎপত্তি প্রথম। রসশাস্ত্রে ও যোগে আনন্দ ও সুখ; তাই আমরা বিবাহে, সমারোহে, উৎসবে, ক্রিয়াকর্ম্মে, সকলের সহিত একত্রিত হয়ে অপার আনন্দ পাই। হুলাহুলি কুলাকুলি করি। সম অবস্থায় আসিতে হলে বিয়োগ হবার আশঙ্কা নাশ কর্ত্তে হবে। বিয়োগকে যোগে পর্য্যবসিত কর্ব্বার জ্ঞান হৃদয়ে আনয়ন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। সেই জ্ঞানকে বলে অবিদ্যার নাশ সাধন বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়। ব্রহ্মজ্ঞানোদয় সুখ দুঃখ যোগ বিয়োগের কাটাকাটি—সমত্বের সমুদয়। স্ত্রীপুত্রাদি নাশে আমার ঘর শূন্য বা অন্ধকারময় হয়েছে বটে কিন্তু অন্যত্র আলোক বা আনন্দের উদয় ইহা ধ্রুব সত্য। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে সেই এক অনাদি অব্যয় পুরুষ বহু হয়ে আছেন। কেবল খোসা আলাহিদা। সেই খোসাই বিভিন্নতার কারণ। আধারের বর্ণানুসারে যেমন আধেয় জলের বর্ণের বিভিন্নতা দেখায় ইহাও তদ্রূপ। স্বরূপতঃ একই জল জলই আর কিছুই নহে। মহাসমুদ্রের যেমন স্থানভেদে কোথাও নাম হয়েছে বঙ্গসাগর চীনসাগর প্রশান্তমহাসাগর ভারতমহাসাগর কিন্তু স্বরূপতঃ একই জল মাত্র, সেই অনাদি পরমেশ্বর পাত্রভেদে নানা নামের বিষয়ীকৃত। তুমি আমি সবই এক। যদি তাই হয় তবে একের স্ত্রীপুত্রনাশে শোকাতুর হবার কি আছে? আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার পুত্র কন্যা মরেছে বটে কিন্তু ঠিক মরে না। কেবল মাত্র আমার নয়নের অগোচরে গিয়াছে মাত্র। আমার ক্রোড় হ'তে অপরের ক্রোড়ে গিয়েছে। আমার আনন্দ অপরে ভোগ কচ্ছে মাত্র। এ জ্ঞান কথায় বলা সোজা কিন্তু ইহার অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া সাধনা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। আমা হতে বিযুক্ত পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন অপরে যুক্ত হওয়ায় আমাতেই অর্থাৎ বড় আমিতেই সংযুক্ত হয়েছে। এই বৈদান্তিক জ্ঞান কি মহান্! কি সুখকর! তাহা ধারণা কর্ত্তে পারলে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন তার সাক্ষাতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শক জ্ঞানের পূর্ণ মাত্রার উদয় হয়। তখন তার মৃত পুত্রকন্যাদির জন্য শূন্য দেখতে হয়না, শোকে অভিভূত হতে হয় না। এই জ্ঞানোদয়ে তখন অপার অক্ষয় আনন্দ হয়। শোকে আর মুহ্যমান হতে হয় না। আত্মরূপী আমার তোমার কোলে স্ত্রীপুত্রাদি নিত্য বিরাজমান দেখা যায়। তখন সেই যোগ বিয়োগে কাটাকাটি

হয়, নিত্যানন্দের উপভোগ হয়। সে আনন্দধারায় তার গণ্ড ও বক্ষস্থলে গজমুক্তাহার শোভিত হয়। এই জ্ঞানোদয়ে যোগে ও বিয়োগে এই উভয় অবস্থাতেও সুখানুভূতি। এ সাধনা জগতে কোন ভগবৎ ভক্তের হয়েছে কিনা জানি না, তবে ভক্তিগ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিধুরা শ্রীরাধার এই অবস্থা ছিল। তাই এই আত্মজ্ঞানে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ সহযোগে বা শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে সদা আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাই শ্রীমতী নয়ন মুদিলেই শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ জ্বালার হাত হতে নিস্তার পেতেন, স্বজ্ঞানে অজ্ঞানে তার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সদাই ঘটত। দয়াময় কবে এ দীন জীবনে এ যোগ বিয়োগের কাটাকাটির অবস্থায় আনবেন তা তিনিই জানেন। তাঁর চরণে এই ভিক্ষা যেন জন্মজন্মান্তরেও তাঁর এই যোগবিয়োগের হাত হতে উদ্ধার করেন।

উৎস।

[শ্রীমতী আশালতা সেন।]

পাষাণের বাঁধ টুটিয়া উৎস
বাহিরিল ছুটি আবেগ ভরে
গুহার আঁধার আবরণ ভেদি
লুটিয়া পড়িল ধরণী পরে।
দূর হ'তে কার আকুল আহ্বান
নিভৃত নিলয়ে পশিয়া তার
পলকে ব্যাকুল করে দিল প্রাণ
কোন বাধা সে যে মানে না আর
তাই সে চলেছে, তাই সে ছুটেছে
তাই সে বহিছে আবেগ ভরে।
অতি দূর; বহু দূর সে যে পথ,
কভু কি পূরিবে মোর মনোরথ?
শিলায় প্রহত চরণ, কভুবা
ধুলায় মলিন সলিল তার

"যেতে হবে" শুধু, এইটুকু জানা
তার বেশী সে যে জানে না আর।
কখনো দীপ্ত অরুণ আলোকে
বক্ষ তাহার ঝলসি ওঠে
কভু বা মেঘের কালো ছায়া বুকে
গভীর দুখে সে গরজি ছুটে
কোথায় বিরাম, কোথা পরিণতি
কোথা সে বারিধি-বাঞ্ছিত তার?
কতদূর ওগো কতদূর আর,
সন্ধান তাহার কেহ কি জানে?
অজানা পথের পথিক চলেছে
তারি অজানার অসীম টানে।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

দশম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই গেঁড়া সরকার তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। তর্কসিদ্ধান্ত তখন অন্দরের বেলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া বাড়ীর এক আচার বিভ্রাটের মীমাংসা করিতেছিলেন। বাড়ীর একটা আপন হাতে পোষমানা অযত্নপালিত কুকুর তাহার ভগ্নি উমাকে ছুঁইয়া ফেলায় অবেলায় আবার স্নান করিতে উদ্যতা মেয়েটাকে তিনি শুদ্ধি ব্যবস্থা দিতেছিলেন, কিন্তু ব্যবস্থার অহিন্দুত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভগিনী বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। ভগিনী বলিতেছেন "তা দাদা কলসির জলটা তো গেল?"

ত। (হুকা টানিতে টানিতে) কেন যাবে দিদি? জল তো নারায়ণ? তা ছাড়া ওর কাঁকের কলসিতে জল। কুকুর ছুঁয়েছে তার পা—

ভ। ছোঁয়া তো গেল ?

ত। তা হলে তো পুকুরটাই গোটা অশুদ্ধ—ভেলো তো পুকরে জল খেয়েছে ?

ভ। বেশ কথা তোমার !

ত। কথা অসঙ্গত কি ?

ভ। নাইতে তো হবে ?

ত। ক্ষেপেছিস্ ? এই সন্ধ্যেবেলা রোগা মেয়েটাকে আর মারিসনি বোন্ ?

ভ। ওমা বল কি দাদা ? অশুদ্ধ নোংরা জন্তু !

ত। —বলিসনি দিদি ও কথা ! ভগবানের অংশ সব জীবে আছে। অশুদ্ধ নোংরা হয় জীব মনের পাপে—ওদের মন নেই পাপও নেই ! অশুদ্ধ নোংরা জন্তু শুধু মানুষ—আর সব শুধু নোংরা ! যে জন্তু ঝাটা লাথি, খেয়ে অনাদর পেয়েও সমস্ত রাত্রি জেগে মনিবের ঘর বাড়ী রক্ষা করে সে হল অশুদ্ধ ! নাইতেও হবে না, জলও ফেলা যাবেনা—

ভ। দাদার সব অদ্ভুৎ যুক্তি !

ত। (হাসিয়া) তাইতো লোকে তোর দাদাকে ম্লেচ্ছ পণ্ডিত বলে—(ভাগ্নিকে) যা বুড়ী মা গঙ্গাজল ছুঁয়ে কাপড় ছাড়গে যা—উমা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার মা হাঁ না কিছু বলিবার আগেই গেঁড়ে আসিয়া বাহির বাড়ী হইতে ডাক দিল সিদ্ধান্ত মশাই বাড়ী আছেন ? সিদ্ধান্ত পরিচিত স্বর শুনিয়া সাড়া দিলেন, ও বাড়ীর বাহিরে গেলেন। "কি খবর সরকার" ?

গেঁ। খবর এমন কিছুই না, বাবু একবার দেখা করতে চান্—

সি। তা হলে তো ভালই খবর, ব্যাপরটা কি সরকার ?

গেঁ। কেমন করে জানছি বলুন ?

সি। তুমি জানন৷ তাও কি হয় ? বাবুর প্রধান পারিষদ তুমি ?

গেঁ। আজ্ঞে কি করি বলুন, অন্নদাতা প্রতিপালক, যেতে, বসতে হয় বৈ কি ? পারিষদ সভাসদ আর কি বলুন।

সি। তা বটে ! কখন হাজির হতে হবে ?

গেঁ। যখন আপনার সুবিধে—এখনই তো বলেছেন—

সি। আচ্ছা তুমি এগোও—

গেঁড়া সরকার চলিয়া গেল। সিদ্ধান্ত সাত পাঁচ ভাবিয়া যাওয়াই স্থির

করিলেন। কাঁধে চাদর ফেলিয়া লাঠি হাতে তিনি জমীদার ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

বাবুর বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিলেন রতন রায় অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া আছেন। পায়ের দিকে গেঁড়া সরকার চোখে চষমা আঁটিয়া খবরের কাগজ হইতে দেশ বিদেশের বার্ত্তা পড়িয়া শুনাইতেছে। তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া গেঁড়া বলিল—"এই যে সিদ্ধান্ত মশাই আসুন—"

তর্কসিদ্ধান্তের আগমন সংবাদ শুনিয়া রতন রায় পাশ ফিরিয়া পা গুটাইয়া বসিলেন এবং নিমীলিত নেত্রদ্বয়কে ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া 'এই যে তর্কসিদ্ধান্ত মশাই আসুন'—বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্থূল বাহুদ্বয়কে অনিচ্ছাসত্ত্বে একত্র করিয়া একটা প্রণামের ভ্যাঙচানি সারিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ সুতরাং প্রণম্য, কিন্তু প্রণম্য দরিদ্র হইলে এবং প্রণামকারী ধনগর্ব্বিত হইলে সামাজিক এটিকেট্ বাঁচাইয়া চলিতে চাইলে—মর্য্যাদা জ্ঞানের অভিনয়টা ওই রকমই হয়।

তর্কসিদ্ধান্তও অভিনয়ের দ্বারা হাত বাড়াইয়া জয়স্তু বলিয়া ফরাশের এক পাশে বসিলেন।

কথোপকথন চলিল। সমানে সমানে আলাপ। উভয়েই পরস্পরকে চেনেন। মহেশ খবর পাইয়া কাজের অছিলায় ঘরে ঢুকিয়া একপাশে বসিল।

রতন রায়। তার পর তর্কসিদ্ধান্ত মশাইএর তো পায়ের ধুলো এ বাড়ীতে আর পড়ে না—একরকম—

তর্ক। লক্ষ্মীর বাড়ীতে গরীব বাউনের এক পাত-পাড়া ছাড়া তো ধূলো পড়বার সুযোগ ঘটে না

রতন। তাই বা কই ঘটে? আপনার মত ব্রাহ্মণ তো ফলারে বাউনের দলছাড়া হয়ে বসেছে—কি অছিলায় সাক্ষাৎ পাব বলুন?

তর্ক। সাক্ষাতের প্রয়োজনই বা কি? আমরা মৃণ্ময় পাত্র ধাতুপাত্র হতে যত দূরে থাকে ততই ভাল, তবে আশ্রয়ে আছি এই যথেষ্ট! সে যাক্ কিসের জন্যে ডেকেছেন শুনতে এলাম।

রতন। গাঁয়ের লোক সব কি বলে যে তর্কসিদ্ধান্ত মশাই—কোথা গরীব বাউনের জাত ধর্ম্ম রাখবেন না যাতে তাও ঘোচে তার চেষ্টা করছেন? ব্যাপারটা কি?

তর্ক। বটে না কি? কার আবার জাত ধর্ম্ম মারলাম? ফরিয়াদী কে?

ম। আপনার ভাই জীবন ভটচাজ্জিই বলে বেড়াচ্ছে—

রতন। থামো মহেশ.কথাটা আমাদের দুজনের মধ্যে বোঝা পড়া হোক্ ওঁর মুখেই সব কথা শোনা যাক্—

তর্ক। খোলসা করেই বলুন না! জমীদারীর বাঁকা চোরা কস্‌রতি ভাষা বুঝিনে চৌধুরী মশাই—বুদ্ধিশুদ্ধি ন্যায়ের কচকচি আর কূট কচালেই সারা হয়ে বসে আছে—

রতন। ভোলা মুখুয্যের মেয়ের ভাতে নাকি সশিষ্য খেতে যাবেন—?

তর্ক। গেলামই বা! নেমন্তন্ন করলে যাব না? বাউনের ছেলে ফলারে ব্যাজার—সেতো কুলক্ষণ! ধ্বংসমতি! (হাস্য) তা ছাড়া তার অপরাধ কি হল?

রতন। শোনেন নি সেই মুসলমানি কাণ্ড?

তর্ক। ওঃ ভাল কথা! ভদ্রলোকের মেয়েটীকে বিড়ম্বিত করতে আপনিও সশস্ত্রে সেজে নেমেছেন দেখছি?

র। (চোখ মেলিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) কি বলছেন ভটচাজ্জি মশাই?

গোঁ। কাকে কি বলছেন সিদ্ধান্ত মশাই?

তর্ক। (নিতান্ত বিরক্তি ভরে) সে জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে আপনি সে জন্য ব্যস্ত হবেন না! কি গ্রহ!

রতন। দেশে অনাচার হলে ধর্ম্ম কর্ম্মহানি হলে আমাকে দেখতে হয় বৈকি!

তর্ক। ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলে ধর্ম্মহানি হয় সে শাস্ত্র জানা ছিল না।

স। আসল কথাটী চাপ্‌ছেন কেন? তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলে ধর্ম্ম যায় না তা আমরা জানি কিন্তু তাত নয়—মুখুয্যে গিন্নি মুসলমানের ছোঁয়া এঁটো বাসন নিজে ধুয়ে ঘরে তুলে নিলেন এটা কি অনাচার নয়? হিন্দুয়ানী—

তর্ক। আচার তত্ত্ব এ বাড়ীতে এসে আমাকে শিখে কাজ কর্ত্তব্য করতে হবে নাকি? মন্দ না! জমীদারী সেরেস্তায় শাস্ত্রের বিধান ব্যবস্থা হয় তা জানতাম না—কি আপদ!

রতন। সিদ্ধান্ত মশাই রেগে যাচ্চেন কেন? ব্যবস্থা আপনাদেরই দেওয়া; আমরা তার মানামানিটা তদন্ত তদারক করি এই যা—এটা যে অনাচার তার ভুল আছে?

তর্ক। কিছুই অনাচার নয়, সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচার! ও নিয়ে কেন মিছি মিছি কথা কাটাকাটি! ব্যক্তি মাত্রেরই তো নিজ নিজ প্রবৃত্তি আছে? আপনি এক রকম কাজ করে ধর্ম্মাচারসঙ্গত ভাবেন, আমিও এক কাজ করে ধর্ম্মাচার সঙ্গত মনে করি—এতো রুচির কথা চৌধুরী মশাই? এই তো? না আর কিছু কথা আছে? যাদের প্রবৃত্তি হবে যাবে, যাদের হবে না তারা যাবে না? সোজা কথা।

রতন। তা বটেই তো! তা হলে জমীদার কাকে বাড়ীতে খানা খাইয়েছে, সঙ্গে বসে খেয়েছে—তার জাত কেন যায়নি—এসব সমালোচনা না করলেই পারতেন? এও তো প্রবৃত্তির কথা?

তর্ক। নিশ্চয়ই! কথা তুলি দায়ে পড়ে! যে অনাচার স্বার্থের গরজে সবাই করে সেই অনাচার পরের উপকারে কেউ করলে তার নির্য্যাতন কেন হয়? প্রজার যিনি ধন প্রাণ মান রাখবার কর্ত্তা তাঁর মুখে একথা শোভা পায় না—

ম। জমীদার বাড়ীতে সাহেব সুবোকে খানা দিতে হয়, সবাই দেয় কিন্তু জমীদার তার সঙ্গে সেই সব অখাদ্য খেয়েছেন এ কথা কোথা শুনলেন?

তর্ক। ও কথা অতিরঞ্জন হয়ে আমার জবানি এসেছে! জীবন ভটচাজ্জির এ রকম অতিরঞ্জনে বা মিথ্যাভাষণে লাভ আছে—হরকালি ভট্টচাজ্জির তাতে কোনো লাভ নেই—

রতন। বিশ্বাস কি?

তর্ক। ইচ্ছে হয় করবেন; কিছু এসে যায় না!

তর্কসিদ্ধান্তের দুঃসাহসিক কথার ভঙ্গী ও সুরে মহেশ ও গোঁড়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রতন রায় ভিতরে বেতর রকমের ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে সে ভাব ঘুণাক্ষরে জানাইলেন না।

ম। সিদ্ধান্ত মশাইএর কি মাথার ঠিক নেই—মুখের তো নেই দেখছি।

রতন। থামো মহেশ! বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, উনি কি রামা-শ্যামার মত মোসাহেবি করবেন? ও সব ভাল বাসিনে; আমিও স্পষ্ট কথা বলি—স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি। সে যাক সিদ্ধান্ত মশাই, বলছি কি পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করছে যখন ভাল হক্, মন্দ হক্ তাতে যোগ না দিলে কি ভাল দেখায়?

তর্ক। তর্কসিদ্ধান্ত ওইটে পারে নি, পার্ব্বেওনা। পাঁচ জনে মিলে

একজনের সর্ব্বনাশ করছে বলে আমাকে তাতে যোগ দিতে হবে, এ দুর্ম্মতি যেন কখনো না হয়; যখন জমীদারী চালাবো তখন না হয় হবে—তা হলে এখন উঠি।

রতন। তা হলে যাচ্চেন্ নেমন্তন্নে—

তর্ক। নিশ্চয়! তা আর বল্‌তে! একটা যদি পুণ্যি করবার সুযোগ ঘটেছে ছেড়ে দেবো?

রতন। পুন্যি? কি পুন্যি? ফলার খাওয়া?

তর্ক। হ্যাঁ এই রকম একটী আসল বাউনের মেয়ের হাতে রান্না প্রসাদ খাওয়া! পুন্যি নয়? বলেন কি?

রতন। তা হলে আপনার ভাগ্নির বিয়েতে কেউ যে খেতে যাবে না?

তর্ক। না যায় কি করছি বলুন; বাজে খরচ বেঁচে যাবে? কেমন না সরকার মশাই?

রতন। আপনারা তা হলে আমারি বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছেন?

তর্ক। ওই বিদ্যেটা হুজুর বাপের কালে শিখিনি, তবে ভায়া ওতে খুব পক্ক বটেন আমার ওইটী হল না হবেও না! আসি তবে, কল্যাণ হোক।

বাক্যব্যয় আর না করিয়া তর্ক সিদ্ধান্ত চলিয়া গেলেন। জমীদার বাবু ও তাঁর সভাষদ দুটী একেবারে নির্ব্বাক! দিনান্তে পুরা অন্ন জোটে না, ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হয় এমনি এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সাহসে যে এত বড় একটা প্রতাপশালী জমীদারকে এমন ভাবে অগ্রাহ্য করিল এ তাহারা ভাবিয়া উঠিতেই পারিল না। আর রতন রায় নগণ্যের কাছে এমন ভাবে ইতিপূর্ব্বে কখনো ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি তরঙ্গহীন বারিধির মত স্থির ও অমুদ্বেলিত থাকিলেও ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন।

মহেশ। দেখ্‌লে সরকার একবার আস্পর্দ্ধাটা!

গে। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরণের তরে! অতিবাড় বেড়না, ঝড়ে যেন ভেঙ্গনা! পরমাশ্চর্য্য বটে।

ম। ফলে, যেচে অপমান নেওয়া হলো—আমার ইচ্ছে ছিল না ওকে ডাকা হয়—যাগ্ এর একটা বিহিত হওয়া দরকার; রায় মশাই কি বলেন?

র। হুঁ। ভেবে ছিলুম কাদা ঘাঁটবো না কিন্তু—ঘাঁটতে হবে—তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগ্নির বে নাকি? (ক্রমশঃ)

আদেশ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(১)

কেমন ক'রে কাটবে আমার মস্ত বড় দিন ?
বলবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ্ !
আকুল করা সুরে ভঁরা
মনের ধাঁধাঁ লুপ্ত করা
পাইনা খুঁজে কোন পথে যাই এ বড় দুর্দ্দিন।
ব'লবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(২)

ঐ পথেরই ছায়ায় বসে কাটবে কি মোর বেলা ?
মুক্তি পথের আলোয় গিয়ে ক'রব ধূলো খেলা॥
কতক বেলা হ'লে শেষে
তোমার কোলে যাব হেসে
তখন আমি হবো কিগো চিৎ সাগরে মীন্ ?
বল্‌বে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(৩)

অনেক কথাই যায় না জানা সে সব কেন আর ?
প্রাণের কথা মনের ব্যথা দিলাম তোমায় ভার॥
আপন ঘরে মুক্তরূপে
এস তুমি চুপে চুপে
তোমার মনের গুপ্ত আদেশ শুনাও নিশিদিন।
ব'লবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ॥

(৪)

সরু মোটা দুটী আমার হৃদয় বীণার তার।
এক কালেতে বেজে গেছে দুটীতে ঝঙ্কার॥

মুক্তি আশে একটী ছুটে
একটী রাঙ্গা পায়ে লুটে
এমন ক'রে কেমন করে কাটাই বল দিন।
বলবে তুমি হেসে হেসে বাজাও বসে বীণ!

(৫)

মুক্তি, মুক্তি? মুক্তি কিহে ধ্যান ধারণায় মিলে
সাগর কুলে ঢেউ উঠেছে, সেই যে নেবে তুলে
মুক্তি কেবল বলে মুখে
রক্ত দেখে মায়ের বুকে
ঢেউয়ের মত হেসে খেলে কাটবে কি দিন দিন
তবুও তুমি ব'লবে নাকি বাজাও বসে বীণ?

(৬)

তোমার বীণার সপ্তস্বরে বাজিয়ে মোদের প্রাণ?
মুক্ত কর দৃঢ় কর শুনিয়ে তোমার গান
বাজাও বসে মিষ্টি স্বরে
ব্যপ্ত হউক বহু দূরে
'মায়ের বুকের রক্ত গায়ে লাগ্‌ছে যে দিন দিন।
এখন নাকি বল্‌লে তুমি বাজাও বসে বীণ?

(৭)

আদেশ তোমার ধরব মাথে যতই কঠোর হোক,
মাথা পেতে নেবো ত্বরা ভুল্‌ব সকল শোক;
তোমার বাঁধা নেবো হাতে
পায়ের ধুলা নেবো মাথে
কেবল তুমি কর মোরে একটী প্রদক্ষিণ্?
দেখ আমি কেমন ক'রে বাজাই বসে বীণ্॥

"ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারত।"

১।

মানবের (আর্য্যদের) আদিগেহ।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ]

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ঋগ্‌বেদের সময়ে ভারত" নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ। ঋগ্‌বেদে কথিত 'সপ্তসিন্ধু' জনপদই (ভারতের এক দেশ) যে আমাদের আদিগেহ তাহা লেখক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অধুনা আবিস্কৃত তথ্য ও ঋগ্‌বেদের সাহায্যে প্রমার্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তিনি কিরূপে প্রমাণ করিয়াছেন আমরা প্রথমে তাহাই একে একে দেখিব; ও পরে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আবার অবিনাশ বাবু তাঁহার পুস্তকের উপসংহারে আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু ভূমণ্ডলের জন্মাবধি ইহার রূপের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেইজন্য আমাদের আদি অজন্মস্থান যে কোথায় তাহা বলা কঠিন; কিন্তু 'as the region (Sapta-Sindhu) was peopled by the Aryans from time immemorial they came to regard it as their original cradle— ইহা যে কতদুর সত্য তাহাও আমরা দেখিব। পরে ইহাও আমরা দেখাইব যে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্য সকল বেদের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সত্য। চতুর্থতঃ ঋগ্‌বেদে আমাদের আদিগেহের যাহা কিছু স্মৃতি আছে, তাহা 'দেবতার' আদিগেহ, সুতরাং তাহা উপকথা ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া অবিনাশ বাবু উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহা উড়াইয়া দিবার যথাযথ কারণ দর্শাইতে পারেন নাই।

এখন আমরা দেখিব 'সপ্তসিন্ধু' যে আমাদের আদিনিবাস ভূমি তাহা অবিনাশ বাবু কেমন করিয়া প্রমাণ করিলেন।

(১) ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বলে যে পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান, বল্কপ্রদেশে, সপ্তসিন্ধু ও গান্ধারপ্রদেশের পার্শ্বে এক মহাসাগর ছিল। তখন বর্ত্তমান চীনদেশ ও

রাজপুতনা এবং আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের অনেকটাও সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। ইহা প্রায় এক লক্ষ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। আর ঋগ্ বেদেও আর্য্যদের বাসস্থানের চারিদিকে চারিটী মহাসাগরের কথা বর্ণিত আছে—পূর্ব্বমহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, পশ্চিম মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। ঋগ্ বেদে ইহাও আছে যে সরস্বতী নদী বরাবর সাগরে গিয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে এই সাগর রাজপুতানা-সাগর ছাড়া অন্য কোনও সাগর হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজপুতানা-সাগরের অবস্থান কালে আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধুতে বাস করিতেন,- আর সে অন্ততঃ এক লক্ষ বৎসর হইল। তাহা হইলে আর্য্যরা এক লক্ষ বৎসর হইতে সপ্তসিন্ধুতে বসতি করিতেছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ আর্য্যরা কোথাও আভাষ দেন নাই যে তাঁহারা অন্য স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয়তঃ যেখানে দক্ষপ্রজাপতি ও মনু বাস করিতেন সেই 'ইলা' হিমালয়ের উপর কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

(৪) চতুর্থতঃ ইন্দ্র সকল দেবতার মধ্যে প্রাচীনতম এবং তিনি সপ্তসিন্ধুতেই বৃত্রসংহার করিয়া দিলেন।

(৫) আর সরস্বতী ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী জনপদকে আর্য্যরা 'দেবনির্ম্মিত দেশ' বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই পাঁচটী প্রধান কারণ দেখাইয়া লেখক 'সপ্তসিন্ধুকে' মানবের (আর্য্যদের) আদি জন্ম ভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা এক একটী করিয়া প্রত্যেক যুক্তিটাই বিচার করিয়া দেখিব।

ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে বেদ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার এক নূতন পথ লেখক আমাদের দেখাইয়াছেন। তাহার জন্য লেখকের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা লেখকের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রথম যুক্তিটীর বিচারে প্রবৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে সপ্তসিন্ধু, গান্ধার, বল্ক (Balkh) পূর্ব্বতুর্কিস্থান ও আলটাই পর্ব্বত বেষ্টিত মঙ্গোলিয়া প্রাচীনত্বে সমান। আমাদের লেখক মহাশয়ও একবার স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্বতুর্কিস্থান, বল্ক, গান্ধার ও সপ্তসিন্ধু, এই সকল স্থান আর্য্যগণের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। পরে কিন্তু ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই; এবং সপ্তসিন্ধুকেই কেবল আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়াছেন। তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিতেছেন,—

From an examination and discussion of the above geological evidences is clearly proved the existence of the four seas, mentioned in the Rig-Veda, round about the region inhabited by the ancient Aryans, which included sapta-sindhu on the South. Bactriana and Eastern Turkistan on the North, Gandhara on the West, and the upper valley of the Ganges and the Yamuna on the East. The age of the Rig-Veda, therefore, must be as old as the existence of these four seas in ancient times. এখানে আমরা লেখকের সহিত সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু তিনি এখানে আলটাই বেষ্টিত মঙ্গোলিয়াকে আর্য্যগণ অধ্যুষিত স্থানের অন্তর্ভুক্ত করিলেন না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মঙ্গোলিয়া এই সকল স্থানের মতই প্রাচীন, আর ইহা পূর্ব্বতুর্কিস্থানের সহিত যুক্ত। যাহা হউক, আমাদের এই বিষয়টী হইতে প্রমাণ হইল ঋগবেদের ও এই স্থানগুলির প্রাচীনত্ব; কিন্তু আর্য্যদের আদি জন্মভূমি কোন স্থান তাহা এখনও প্রমাণ হইল না।

অতঃপর আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে আর্য্যদের অন্য দেশ হইতে সপ্তসিন্ধুতে আসার বিষয়ে বেদে কোনও ইঙ্গিত ও আভাষ আছে কিনা। অবিনাশ বাবু বলিয়াছেন বেদে এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আর নিজ মত সমর্থনের জন্য দুই একটী সাহেবের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবিনাশ বাবু সমস্ত বেদ পাঠ করিয়া কেন যে এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাইলেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় ইহা তাঁহার পাশ্চাত্য মোহ। কুসংস্কারাপন্ন না হইয়া শুদ্ধ ও স্বাধীন চিত্তে পাঠ করিলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন যে বেদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদ যে তাঁহাদের নিজ মনোমত অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের যাঁহারাই বেদের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই বলিয়া থাকেন। এমন কি মধ্যযুগের দেশীয় ভাষ্যকারেরাও না বুঝিয়া অনেক সময়ে যাহা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের অরবিন্দ তাঁহার 'আর্য্য'পত্রিকায় কি বলিতেছেন, পাঠক একবার দেখুন,—It is not surprising, therefore, that the most inadequate interpretation should be made which reduce this great creation of the young and splendid mind of humanity to a botched and defaced scrawl, an incoherent

hotch-potch of the absurdities of a primitive imagination perplexing what would be otherwise the quite plain, flat and common record of a naturalistic religion. The Veda became to the later scholastic and ritualistic idea of Indian priests and pundits nothing better than a book of mythology and sacrificial ceremonies while European scholars seeking in it for what was alone to them of any rational interest, the history, myths and popular religious notions of a primitive people, have done worse wrong to the Veda and, by insisting on a wholly external rendering still farther stripped it of its spiritual interest and its poetic greatness and beauty. (p. 6/8, No. 10 of vol VI, Arya). আবার Western scholars put a false and non-existent meaning in the old verses (P. 620). আর এক স্থানে দেখুন, If we read them as they are without any false translation into what we think early barbarians ought to have said and thought we shall find instead a sacred poetry sublime and powerful in its words and images (P. 621)

আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, অবিনাশ বাবু যদি মাননীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'মানবের আদিজন্মভূমি' পুস্তক খানি পড়িতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তিনি এমন ভ্রমে পতিত হইতেন না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখার সাহায্যে আমরা অবিনাশ বাবুর ভুল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব। আর তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি যেন উপরি উক্ত পুস্তকখানি আর 'মন্দার-মালা'য় প্রকাশিত এই বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখেন, দরিদ্র বঙ্গভাষায় বলিয়া যেন অবহেলা না করেন। সত্য সব ভাষাতেই আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে; সে ভাষাগত ভেদ জানে না।

ভারতীয় আর্য্যগণ সত্যই বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। আর তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস স্থানের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞও ছিলেন না। কারণ বেদ সমূহে এই বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা ঋগ্বেদে—

প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবো অধ দ্বিতা সমান্যা।

মাতুর্গর্ভে ভরামহে॥ ৮।৭২।৮ম

অর্থাৎ হে শোভনদানশীল ইন্দ্রাদি দেবগণ। তোমরা আমরা পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃব্য। আমরা সকলেই একই মাতৃভূমি প্রভব। এখন তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তথাহি—

অস্তি হি বঃ সজাত্যং বিশাদেসো দেবাশো অস্ত্যাপ্যম্॥ ২০।২৭।৮ম অর্থাৎ দুর্গাচার্য্য—হে হিংসক বিনাশক দেবগণ তোমাদিগের সহিত মনুষ্যদিগের সমান জাতিতা (তোমরাও দেবতা, তাহারাও দেবতা) ও বন্ধুত্ব আছে। তথাহি—

ইয়ং মে নাভিঃ, ইয়ং মে সধস্থং, ইমে মে দেবা অহমস্মি সর্ব্বঃ॥ ১৯।৬১।১০ম ঐ (দ্যো) আমার উৎপত্তিস্থান, ঐ আমার গোষ্ঠী স্থান, ঐখানকার দেবগণ আমারই জাতি বন্ধু. সুতরাং আমি দেবতাও বটে আবার মনুষ্যও বটে।

আবার একজন ঋষি বলিতেছেন,

দ্যোর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্নঃ মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।

উত্তনয়োশ্চম্বোর্য্যোনিরন্তঃ যত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ॥ ৩৩।১৬৪।১ম

অর্থাৎ—দ্যো আমার পিতা (পিতৃভূমি) ও জনিতা (জন্মস্থান), আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই দ্যোতে নাভি (উৎপত্তি) হইয়াছিল। এখনও সেইখানে আমাদের জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধব বিদ্যমান আছেন। তবে এই মহতী পৃথিবী (ভারতবর্ষ) আমাদের মাতা (মাতৃভূমি)। পিতা দ্যো ও মাতা পৃথিবী এই উভয়স্থানই জ্ঞান বিজ্ঞানে অত্যুন্নত। ইহারা যেন দুইটী প্রধান সেনাপতি। তবে ইহাদের মধ্যে আমাদের পিতা দ্যোহি যোনি (আদি উৎপত্তিস্থান)। উক্ত পিতার দেবলোক সকল তাহার কন্যার গর্ভে (অর্থাৎ কন্যাস্থানীয় ভুবর্লোক ও দ্যুলোকে) যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদে কোনও এক ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কাস্বীৎ আসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ?

কোন্ স্থানে আমাদের পূর্ব্বচিত্তি (পূর্ব্বকিত্তি) বা পূর্ব্বনিকেতন ছিল।

ইহার উত্তরে অন্য এক ঋষি বলিতেছেন,—

দ্যৌরাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ। অর্থাৎ—দ্যো আমাদের পূর্ব্বনিকেতন ছিল।

ইহাতেও কি কেহ বলিবেন যে আমাদের ঋষিরা তাঁহাদের আদি জন্মস্থানের বিষয় কিছু বলিয়া যান নাই। অবিনাশ বাবু কি এই সব মন্ত্রগুলি দেখিতে পান নাই? না, 'বুজরুকি' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ৩৫২ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন, The ancient abode mentioned in the Rig Veda

does not mean the original cradle of the Aryans, but only Heaven or the abode of the gods; the immigration of the Vedic Aryans under the leadership of Vishnu from that ancient home is a pure myth which has no basis to stand upon. তাহা হইলে আমি যে সকল মন্ত্র অধ্যাহৃত করিলাম তাহা সবই myth (উপকথা) ! তবে সমস্ত বেদটাই myth বলিলেই চলিত, আর ঋগ্‌বেদের সময়ের ভারতের ইতিহাস না লিখিয়া—একখানা সে যুগের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' লিখিলেই ঠিক কাজ হইত। কিন্তু একথা 'বাবা আদমের' সময় হইতেই সত্য যে বুঝিতে না পারিলেই সত্যবস্তু myth (উপকথা) হইয়া পড়ে। আমাদের অবিনাশ বাবুও সেই প্রকার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন মন্ত্রটাকে সত্য আর কোনও মন্ত্রটাকে myth বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি ও দেখাইব যে ইহা myth নহে, খাঁটি সত্য। তবে অবশ্য ক্রমে ক্রমে দ্যো ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া আসিলে ও আমরা আমাদের জ্ঞাতি পূর্ব্বপুরুষগণকে উপাস্য পদার্থে পরিণত করিলে, ইহার অনেকটা myth হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা আবার বলি যে ইহা খাঁটি সত্য। অবিনাশ বাবু সংস্কার শূন্য হইয়া দেখিলে এই উপকথার মধ্যেই সত্যের দর্শন পাইতেন।

দেবতারা পারলৌকিক কিছু নন। তাঁহারা আমাদেরই মত স্থুল শরীরধারী মানুষ ও আমাদেরই মত জন্মমৃত্যুর অধীন। তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতিবন্ধু। আর তাঁহারা এই জগতেই বাস করিতেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নাম দ্যো বা স্বর্গ বা ইলাবৃত্তবর্ষ যাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত। দ্যোর আর এক নাম 'যজ্ঞ'; কারণ এখানেই অথর্ব্ব সর্ব্বপ্রথমেই যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। স্বয়ং ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন,—যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যৎ, দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্। অর্থাৎ যে অনন্ত জলরাশি সকল প্লাবিত করিয়াছিল, সে আপন মহিমায় উৎপাদন শক্তিলাভ করিয়া, যজ্ঞ জনপদকে জন্মদান করিয়াছিল।

আবার,

আপো হ যৎ বৃহতী বিশ্বমায়ন, গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
তত্তো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

৭।১২৩।২০ম

সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলে কোনও এক জনপদ ছিল না, কেবল এক অপার অনন্ত

জলরাশি সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া ছিল। সেই অনন্ত জলরাশি যক্ষ নামক জনপদকে গর্ভে ধারণ করিলে, উহাতে অগ্নি (বা আদিমানব বিরাট) জন্মগ্রহণ করেন। বিরাটের নাম হিরণ্যগর্ভ লোকপিতা ব্রহ্মা ও অগ্নি ("মানবের অগ্নি জন্ম) ভূমি")। এই যক্ষ জনপদই পৃথিবীর চারিদিকে ক্রমে ক্রমে শত শত বংশ বিস্তার করিয়াছিল। (ঋগ্বেদ ১ ৩ ০ম্)। সেই জন্যই মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই অমৃতের পুত্র দেবগণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাঁহারা যক্ষ জনপদ হইতে পৃথিবীর চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন (৫।৬২।১০ম)। দেবতারা যে মর আর তাঁহারা যে আমাদেরই মত মানুষ তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট দিয়াছি। যদি দেবতারা মানুষ না হইয়া পারলৌকিক কিছু হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীর লোক নচিকেতা স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের রাজা যমের নিকট গিয়া কিরূপে প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা আমার ন্যায় স্থূল বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারে না। আর যমের বাড়ী যদি মৃত্যুর পর লোকে যায়, তাহা হইলে নচিকেতা যমকেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন—"হে যম! মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, কি হয়, এবিষয়ে গভীর সংশয়। কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। আমি তোমার নিকট উপদিষ্ট হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিতে চাই।" আবার যমই বা তাহার উত্তরে একথা বলিবেন কেন,—'বৎস! আমি তো ইহার কিছুই জানি না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বড় বড় দেবতারাও এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের অনুমাত্র তথ্যও জানিতে পারেন নাই। আমি কোন্ ছার?' এ আবার কি! মরিলে লোকে যমের বাড়ী যায় তবে কেন যম বলেন যে মানুষ মরিলে কোথায় যায় তাহা আমি জানি না। এ এক বিষম সমস্যা! বস্তুতঃ যমও আমাদের মত জনম মরণশীল মানুষই ছিলেন। এক সময়ে তিনি পিতৃলোকে (দ্যোতে) রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও এক সময়ে স্বর্গের রাজা ছিলেন। আর দেবতারা যদি সত্য সত্যই অমর হইবেন তাহা হইলে 'ছান্দোগ্যে' কেন থাকিবে যে, 'দেবতারা মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদের পঠন পাঠনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে কেন থাকিবে যে, 'হে মহারাজ! সেই শাকদ্বীপ (দ্যো) বাসী দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলে অকালে জরা বা অকালে মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, পরন্তু তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। আরও দেখুন একজন ভারতীয় ঋষি দেবতা ও সমস্ত মানব জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "শোন

বিশ্বজন শোন, অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি!" (রবীন্দ্র নাথের অনুবাদ) সত্যই দেবতারা অমর হইলে, ঋষি তাহাদের আহ্বান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় করিবার পথ বলিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না।

যত উপকথার আবিষ্কার তাহা মহর্ষি বেদব্যাসের তিরোধানের বহু পরে বৌদ্ধ যুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা করিয়া ছিলেন। এই সময়ে বেদের কতকগুলি মন্ত্রও যে দুষ্ট হয় নাই তাহা নহে।

আমরা আরও অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বেদের উক্ত কয়েকটি শব্দের বিষয় আলোচনা করিব। সমগ্র বেদে "পিতা" ও "মাতা", আর 'দ্যো' ও "পৃথিবী" এই কয়েকটী শব্দের ভুরি প্রয়োগ দেখিতে পাই। মধ্যযুগের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেবল প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যকার শিব্য শঙ্কর 'পিতা' শব্দের প্রকৃতার্থ জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্—অর্থাৎ 'সকলের জন্মভূমি বলিয়া উহার নাম পিতা'। প্রশ্নোপনিষদে আছে, "পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ। পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্" (১২।১৬৪।১ম)—অর্থাৎ, "যদি 'পিতা' (পিতৃভূমি) ও 'দিবের' (ত্রিদিবের) ভূমি পরিমাণ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে 'পিতা' পঞ্চপদে (বা পাঁচপোয়া) হইলে, দিং বা দ্যুলোক বার পোয়া হইবে, (অর্থাৎ 'পিতা' অপেক্ষা 'দিব' আড়াইগুণ বড়)। দিবের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পুরীষি বা জলমগ্ন"। 'পিতা' যে কোন জনপদের নাম তাহা বেশ বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে 'পিতা' কে?

একজন আর্য্যঋষি ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা। অর্থাৎ দ্যো আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি, এবং পৃথিবী মাতৃভূমি। পৃথিবী মানে এখানে ভারতবর্ষ বুঝাইতেছে। বেণতনয় মহারাজ পৃথুর নাম হইতে ভারতের নাম পৃথিবী হইয়াছে। পরে ইহা জগৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ অতি প্রাচীনকালে মহী, ভু, গো, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দ ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। এমনকি আমরা কালিদাস, রসমঞ্জরিতে ও চরণব্যূহটীকাব্যে 'পৃথিবী' ও 'পৃথ্বী' শব্দ ভারতবর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। আর "দ্যাবাপৃথিবী" 'দ্যো' ও 'পৃথিবী' মিলিয়া হইয়াছে ('মানবের আদি জন্মভূমির, চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।')

কোন্ শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা না বুঝাতে অনেক প্রকার

ভ্রমে পতিত হইতে হয় বলিয়া আমরা এতগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিলাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে 'পৃথিবী' (ভারত কিম্বা ভারতের একদেশ,) গান্ধার, পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান ও মঙ্গোলিয়া প্রাচীনত্বে সমান। (ঋগ্‌বেদের প্রথম রচনার সময়ে,) আর 'সপ্তসিন্ধুর' আর্য্যগণ বাহির 'দ্যো' হইতে আসিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে 'দ্যো' কোথায়? 'দ্যো' অবশ্যই উপরিউক্ত স্থান সমূহের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল; যে হেতু ভূ-তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আর্য্যদের এদেশে আসা সম্ভব ছিল না। আরও পূর্ব্বে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে 'দ্যো' 'যজ্ঞ', ও 'ইলা' বা ইলাবৃত একই জনপদের বিভিন্ন নাম মাত্র। এখন দেখা যাউক এই 'ইলা' বা 'ইলাবৃত বর্ষ' কোন্ স্থানে অবস্থিত।

হিন্দুরা তাঁহাদের সকল শাস্ত্রেই মেরু পর্ব্বতের (মেরুপ্রদেশ নহে) সানুদেশ ও ইলাকেই তাঁহাদের আদি নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণিতে দেখিতে পাই যে, সেই মেরুপর্ব্বতের ঊর্দ্ধ-শৃঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের বাসভবন ত্রয় বিরাজমান। এই মেরুপর্ব্বতে নানা রত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি পাওয়া যাইত এই জন্য ঋষিরা উাহকে 'কনকরত্নময়' বলিয়াছেন। আর এই মেরুপর্ব্বতের কথা আমরা গ্রীকসাহিত্যে (Meros বা মেরস্), মিসরসাহিত্যে (Meroe, or Mer, 'মেরো' অথবা 'মার'), এশি-রিয়াদের প্রাচীন পুস্তকে (Merukh or Merukha, 'মেরুখ') ও ইরাণদের 'জেন্দ-আভেষ্টায়' পাওয়া যায়। আর সকলেরই বিশ্বাস যে উহার সানুদেশে দেবতার বাস ও উহা নানাজাতীয় মণিমাণিক্যের আকরভূমি। এই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। এখন এই যে মেরুপর্ব্বত, ইহা কোথায় অবস্থিত?

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে 'মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্'। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে মেরুপর্ব্বত। অতএব আমরা দেখিতেছি যে মেরুপর্ব্বত 'ইলাস্থায়ী'। আর এই 'ইলাস্থায়ীর' অপভ্রংশ হইতেছে বর্ত্তমান 'আলটাই'। সুতরাং 'আলটাই' ও মেরুপর্ব্বত অভিন্ন। আর মেরুপর্ব্বতকে ঘিরিয়া আছে যে দেশ তাহাই 'ইলাবৃত' বা বর্ত্তমান 'মঙ্গোলিয়া'। আমরা মঙ্গোলিয়াকে ইলাবৃতবর্ষ বলিতেছি কেন তাহার আরও কারণ আছে। কিন্তু 'ইলা' যে হিমালয়ে কিম্বা কাশ্মিরের কোন এক স্থানে অবস্থিত তাহা অবিনাশ বাবু কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবিনাশ বাবু যদি সে কথা আমাদের

বলিয়া দেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বেদে কিন্তু এমন কোনও নিদর্শন পাই না যে 'ইলা' কাশ্মিরে। বেদে কেন—হিন্দুর কোনও শাস্ত্রে এ কথা নাই। মোট কথা, 'it is very probable if our Surmise be correct', কিম্বা 'I think' দ্বারা সত্যানুসন্ধান হয় না। সত্যকে পাইতে গেলে সাধনার আবশ্যক।

আর এক কথা—ইলাবৃত হইতেছে দেবতাদের আদি জন্ম ভূমি। ইহা বেদে বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে। অবিনাশ বাবু 'দেবতাদের আদি-গেহের' কথা উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তবে কেন যে তিনি আবার তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, 'দেবতাদের আদিগেহ' ও 'আর্য্যদের আদিজন্মভূমি' সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভিতর বেশ একটু 'খটকা' লাগিয়াছিল। কিন্তু অবিনাশ বাবু ভাল মানুষের মত তাহা স্বীকার না করিয়া মনের 'খট্কা' মনেই চাপিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। যাহাতে কাহারও সন্দেহ না থাকে, সেইজন্য আমরা কয়েকটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিলাম। যথা, ইলঃ পতির্মঘবা। ৪।৫৮।৬ম, অর্থাৎ, মঘবান্ (অর্থাৎ ইন্দ্র) ইলার পতি। (৪৫।৪০।১ম ও ৮।২।৭ম মন্ত্র দুইটীও দ্রষ্টব্য)।

মঙ্গোলিয়াই যে ইলাবৃতবর্ষ তাহার আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আপনারা এশিয়ার মানচিত্র মনে করুন। বিষ্ণুপুরাণ ২০।৮।২ শ্লোকে বলিতে-ছেন—"সেই দেব পর্ব্বত—মেরুর উত্তরদিকে মেরুপ্রদেশে (North Pole) অবস্থিত। ঐ মেরুপ্রদেশ সমগ্র দ্বীপ ও নববর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত, একারণ তথায় সর্ব্বদাই দিন ও সর্ব্বদাই রাত্রি হইয়া থাকে।" এখন নববর্ষ—কি কি?

১। উত্তর কুরু বর্ষ— } ত্রিদিব বা দ্বিব
২। হিরণ্ময় বর্ষ— }
৩। রম্যক বর্ষ— }
৪। ইলাবৃত বর্ষ (বেদী, যজ্ঞ বা দ্যো)
৫। হবি বর্ষ—
৬। কিম্পুরুষ বর্ষ—
৭। ভারত বর্ষ—

৮। ভদ্রাশ্ব বর্ষ—

৯। কেতুমাল বর্ষ—

এই নয়টি বর্ষ। এই নববর্ষের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ কোন্ স্থানে? বায়ুপুরাণ ৩৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলিতেছেন,—

" 'বেদী' শেষ সীম 'ইলা', উহার দক্ষিণে তিনটী বর্ষ ও উত্তরে তিনটী বর্ষ; ঐ ছয়টী বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে বেদী ইলাবৃত। উহার মধ্যে মেরু পর্ব্বত।" তবে দেখা যাইতেছে যে এসিয়ার উত্তর সীমায় মেরু প্রদেশ (North Pole), তাহার দক্ষিণে উত্তর মহাসাগর। আর এই উত্তর মহাসাগরের ঠিক দক্ষিণ ভাগে নয়টী বর্ষ এই ভাবে সংস্থিত—

মেরুপ্রদেশ—(North Pole)

উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean)

১। উত্তর করু বর্ষ }
২। হিরণ্ময় বর্ষ } ত্রিদিব বা Siberia
৩। রম্যক বর্ষ }

৪। ইলাবৃত বর্ষ বা Mongolia
(যাহার মধ্যে 'আলটাই' বা মেরু পর্ব্বত)

৫। হরিবর্ষ বা Chinese Turkistan

৬। কিম্পুরুষ বর্ষ বা Tibet

৭। ভারতবর্ষ।

৮। কেতুমাল বর্ষ বা Afghanistan, Persia and Turky

৯। ভদ্রাশ্ববর্ষ or China.

এখন বোধ হয় আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে কাশ্যপীয় (Asia) মহাজনপদের কোন্ স্থানে ইলাবৃত বর্ষ বা আর্য্যদের আদিগেহ সংস্থিত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

———

আনন্দের শিশু।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।)

অসীম আকাশ ভরিয়া
নিতেছ ভূবন লুটিয়া
পাগল অনিল ওরে,
ছুটিয়া টুটিয়া পড়েছ লোটিয়া
নিবিড় বাহুর ডোরে,
পাগল অনিল ওরে।

পাখীরা গাহে যা' গগনে
ফুলে যে স্থরভি গোপনে
সকলি নিতেছ হরি'।
করুণ করেছ বুকটী তোমার
গন্ধ ও গান ভরি'
সকলি নিতেছ হরি'।

রঙিনে শ্যামলে কোমলে
বুলালে পরশ বুলালে
কি মধুর মখামাখি!
ডুবিছ জোছনা-রূপের সাগরে
লাবণী লইছ মাখি,'
কি মধুর মাখামাখি!

ভ্রমর চকোর সহজে
লুটিতে নিপুণ এত যে
তেমন পারেনি তা'রা,
যেমন লুটিয়া ভরেছিস্ বুক্
ওরে ও পাগল পারা,
তেমন পারেনি তা'রা।

লীলায় লীলায় হেলিয়া
ফিরিস্ উধাও বহিয়া
শুধু বাঁশী শুধু খেলা,
কেবলি বাঁধন কেবলি হরণ
মধুর মিলন-মেলা;
শুধু বাঁশী শুধু খেলা।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শুধু কাজ লইয়া যাহাদের একতার বাঁধন, কাজ ফুরাইলেই তাহাদের একতাও ফুরাইয়া আসে। ধরা পড়িবার পর আমাদের কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী তাঁহারা সকলেই এক ভাবের ভাবুক নহেন। দেশের পরাধীনতা দূর হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীন হইবার পর দেশকে কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাহার পর আমরা যে ধরা পড়িলাম, তাহা কতটা আমাদের নিজেদের দোষে, কতটা ঘটনাচক্রের দোষে—তাহা লইয়াও আমাদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিত। বাহিরে কাজকর্ম্মের তাড়ায় যে সমস্ত ভেদ চাপা পড়িয়া থাকিত, ধরা পড়িবার পর তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

একদল শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়াই থাকিত; আর যাহারা বিশুদ্ধ অর্থাৎ ইউরোপীয় রাজনীতির উপাসক তাহারা ঐ দলকে ঠাট্টা করিয়া দিন কাটাইত। ঐ সময় আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র "ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকা" কথাটার সৃষ্টি করেন। ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিলে নাকি মানুষের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায় আর সে কাজের বাহির হইয়া পড়ে! ডিকের মধ্যে বসিয়া উভয় দলেরই প্রচার কার্য্য চলিত। দেবব্রত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন; হেমচন্দ্র ধার্ম্মিকদিগের নামে ছড়া ও গান বাঁধিতেন। বারীন্দ্র এককোণে দুএকটী অনুচর লইয়া কখনও বা ধর্ম্মালোচনা করিত কখনও বা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। আমি উভয় দলেরই রসাস্বাদন করিয়া ফিরিতাম।

এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দ বাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুদ্ অদ্ভুদ্ গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন; ভাত খাইবার সময় আরস্থলা, টিকটীকি ও পিঁপড়েদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দ বাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?" অরবিন্দ বাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—"আমি ত স্নান করি না।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার চুল অত চক্‌চক্ করে কি করিয়া?" অরবিন্দ বাবু বলিলেন—"সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।"

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে অরবিন্দ বাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি সাধন করে কি পেলেন?" অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি।"

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে এই অদ্ভুদ্ মানুষটীর জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা

করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। সে সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমি ছাড়া পাব।"

ফলে তাহাই হইল। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল তখন দেখা গেল সত্যসত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁশির আর দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। বাকি অনেকের পাঁচ সাত দশ বৎসর করিয়া জেল বা দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল; বলিল—"দায় থেকে বাঁচা গেল।" একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাহার একবন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—"Look, look, the man is going to be hanged and he laughs (দেখ, দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে, তবু সে হাসিতেছে)। তাহার বন্ধুটী আইরিস; সে বলিল—"Yes, I know, they all laugh at death" (হাঁ, আমি জানি; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিষ!)

১৯০৯এর মে মাসে রায় বাহির হইল। আমরা পনের ষোল জন মাত্র বাকি রহিলাম; বাকি সবাই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমরাও হাসিতে হাসিতে তাহাদের বিদায় দিলাম; কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িল। পণ্ডিত হৃষিকেশ মূর্ত্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন—"আরে কিছু নয় এ একটা দুঃস্বপ্ন।" হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিয়া বলিলেন—"কুচ্ পরোয়া নেহি; এ ভি গুজর যায়েগা" (কোন ভয় নেই; এ দিনও কেটে যাবে); বারীন্দ্র ফাঁসির হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"সেজ দা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে ফাঁসি আমার হবে না।" আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম; কিন্তু বীরের মন যে ধাতু দিয়া গঠিত হয়, আমার মন যে সে ধাতু দিয়া গঠিত নয় তাহা এইবার বেশ ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলাম। মনটা যেন নিতান্ত অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে!

উঃ! এর চেয়ে যে ফাঁসি ছিল ভাল! এ কি সাজা, ভগবান, এ কি সাজা!

ভগবান্ বলিয়া যে একজন কেহ আছেন এ বিশ্বাসটা কয়েকবৎসর ধরিয়া আমার বড় একটা ছিল না। ছেলেবেলা একবার বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধু সাজিতে বাহির হইয়াছিলাম! তখন ভগবানের উপরে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বেশ একটা ছিল। মায়াবতীর মঠে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট নিগুণ ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায় শুকাইয়া গেল! স্বামীজী বিদ্রূপ ও যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া যখন আমার ভগবানটীকে নিহত করেন্ সে দিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। এই বিশাল মায়ার সমুদ্রের মাঝখানে একাকী ডুব সাঁতার কাটিতে কাটিতে একেবারে হিমাঙ্গ হইয়া ও-পারে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উঠিতে হইবে ভাবিয়া আমার রক্ত একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছিল! নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকার নামই মুক্তি—এ তত্ত্ব আমার মাথার মধ্যে বেশী দিন রহিল না। চরম তত্ত্ব বলিয়া একটা কিছু মানুষ আপনার জ্ঞানের মধ্যে পাইয়াছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আরম্ভ করিয়া জাগ্রত অবস্থা পর্য্যন্ত সব অবস্থাগুলাই অনন্তের এক একটা দিক মাত্র; এ দুই অবস্থার উপরে ও নীচে এরূপ অনন্ত অবস্থা পড়িয়া আছে। সেই অনন্তের মধ্যে একটা কিছু সত্য আছে যাহা মানুষের জীবনে কর্ম্মরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জীবনকে ছাড়িয়া পলাইতে যাইব কেন?

কর্ম্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লেলে আসিয়া যখন আমাদের মধ্যে ভক্তি-মূলক সাধনা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তখন মহাবিজ্ঞের ন্যায় তাঁহার ভক্তিবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। সবটাই যখন সেই অনন্তের মূর্ত্তি তখন ভগবানের একরূপ ছাড়িয়া অন্যরূপ ধ্যান করিবার সার্থকতা কি? লেলে তখন শুধু এই কথাটী বলিয়াছিলেন—"যাহা বলিতেছ তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর আমার বুঝাইবার কিছু নাই; কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতেরও স্থান আছে, এ কথা ভুলিও না।"

আজ যখন বিধাতা জোর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন, তখন নিজের মধ্যে কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা

অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশ্রয় পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম; প্রাণটা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক, মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল। সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই আমাদের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এক একবার মনে হইত যেন পাগল হইয়া গেলাম। মাথার ভিতর উন্মত্ত চিন্তার তরঙ্গ যেন মাথা ফাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিবার জো নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় পাশের কুঠরীতে একটী ছেলে চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাল মান লয়ের সহিত সে গানের বড় একটা সম্বন্ধ নাই; কিন্তু সে গান শুনিয়া খুব এক চোট হো হো করিয়া হাসিয়া আর মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া যে আমার প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা বেশ মনে পড়ে। গান শুনিয়া চারিদিক হইতে ইউরোপীয় প্রহরীরা ছুটিয়া আসিল; এবং পরদিন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের বিচারে বেচারার চারদিন চালগুঁড়া সিদ্ধ (Penal diet) খাইবার ব্যবস্থা হইল।

আর একটী ছেলে একদিন দেওয়াল হইতে চুণ খসাইয়া দরজার গায়ে লিখিয়া রাখিল—Long live Kanailal!"—তাহারও চারদিন সাজা হইল।

প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত; কিন্তু দু একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা খাইত তাহাদের জন্য একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।

একজন লম্বা চৌড়া হাইলাণ্ডর প্রহরী মাঝে মাঝে আমাদের জ্বালাতন করিয়া আপনার প্রহরী জন্ম সার্থক করিত। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম "Ruffian warder"। মাঝে মাঝে সে আমাদের বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিত যে সে ও তাহার স্বজাতিরা ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের চেয়ে মিষ্টমুখ শয়তান ছিল চিফ্‌ ওয়ার্ডার স্বয়ং।

সে আবার মাঝে মাঝে ধর্ম্মের তত্ত্বকথাও আমাদের শুনাইত; এবং আশা দিত যে জীবনের বাকি কয়টা দিন সৎ হইয়া চলিলে স্বর্গে গিয়া আমরা ইংরাজের মত ব্যবহারও পাইতে পারি। হায়রে ইংরাজের স্বর্গ! জেলখানার মধ্যে গালাগালি, মারামারি সবই সহ্য হয়; কিন্তু ধর্ম্মের বক্তৃতা সহ্য করা দায়।

আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র চিত্র-বিদ্যায় বেশ নিপুণ। তিনি দেওয়ালের শ্যাওলা, চুণ, ইটের গুড়া ঘসিয়া নানারূপ রং প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে আঁকিয়া রাখিতেন। প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে ২ কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।

যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ নন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কবিতা লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতেন। একদিন এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম একজন অজ্ঞাতনামা কবি দেওয়ালের গায়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোণার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে ত বোকা পাটা
দিন রাত দেয় গালাগালি॥

আমাদের সে সময় কাজ ছিল পাট ছেঁড়া।

মাঝে মাঝে এক আধটী বেশ ভাল কবিতাও নজরে পড়িত। আমার মনের ফাঁদে কবিতা প্রায় ধরা পড়ে না; কিন্তু এই দুই ছত্র কিরূপে আটকাইয়া গিয়াছিল—

"রাধার দুটী রাঙ্গা পায়—
অনন্ত পড়েছে ধরা—
উঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা"

হায়রে মানুষের প্রাণ! জেলের কুঠরীর মধ্যে বন্ধ থাকিয়াও রাধার দুটী রাঙ্গা পায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে!

সেসন্স কোর্টে রায় বাহির হইবার পর হইতেই—হাইকোর্টে আমাদের আপিলের শুনানি চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল।

অনেকের কারাদণ্ড কমিয়া গেল, কেবল হেমচন্দ্রের ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পাছে দড়ি পাকাইয়া ফাঁসি খাই সেই ভয়ে আমাদের পাট ছিঁড়িতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই যাহারা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত, তাহারা ভিন্ন অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমরা আণ্ডামানের জাহাজের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

অসময়ে

[শ্রীমতী নলিনীবালা ঘোষ।]

আজিকে আমার সনে কি খেলা খেলিবে প্রিয়।
কাজ নাই, তুমি গুণ্ঠিত কর প্রেমের উত্তরীয়।
দীর্ণ এ হিয়া আছে শত কাজ,
কেমনে তোমায় বরিব গো আজ ?
ধূলিময় গৃহে তুলিব তোমায় কেমন করে ?
এত দিন পরে এলে যদি এত অসময় ক'রে।

সে দিন কি তুমি চাহ নাই মোরে জীবন-প্রিয় !
লাগে নাই ভাল মোর আরাধনা হে মোর বন্দনীয়।
হৃদয়ের সেই প্রেম প্রীতি ঢালা
গেঁথে রেখেছিনু শুভ্র সে মালা
অনাদরে হায় দলগুলি তার পড়েছে ঝরে ;
সৌরভ তার একটুকু নাই যাও সখা যাও ফিরে।

এখন কি করে নূতন হয়ে বাসর সাজাতে পারি
কাননে আমার কোনো ফুল নাই নিঃশেষে গেছে ঝরি'
হৃদয় হয়েছে শুষ্ক কঠিন
ভুলে কি গিয়েছ হে চির নবীন !
দাও নি মোরে তব প্রেম বারি—কতদিন বল হবে !
শুষ্ক ভূমিতে কি করিয়া সখা কুসুম ফুটিবে তবে ?

জানিতাম যদি বন্ধু আমার আবার আসিবে ফিরে
রাখিতাম তবে জীবন মোর সরস মধুর করে ;
ডাকিবার আগে বন্ধু আমায়
অর্ঘ্য আনিয়া ঢালিতাম পায়
ক্লান্তি তোমার মুছিয়া নিতাম আমার সে প্রেম দিয়া
এখন তোমায় কি দিয়া পূজিব শূন্য এ মোর হিয়া।

যদিও হে সখা! চিরদিন তুমি আমার বন্দনীয়
তবুও তোমায় শুষ্ক এ বুকে বরিতে পারি না প্রিয়!
তোমার প্রেম-সলিলে যেদিন
সিক্ত করিবে উষর কঠিন
জীবন আমার, সেদিন আবার আসিও আমার দ্বারে
অসময়ে আজ চাহি না তোমায় যাও সখা যাও ফিরে।

পতিতার সিদ্ধি।

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

অনেকক্ষণ চারুর প্রত্যাশায় বসিয়াও যখন রাখু দেখিল, সে ফিরিল না, তখন সে গালিচা হইতে উঠিল। দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, চারু সন্তর্পণে সে কবাট বন্ধ করিয়া গিয়াছে। খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ঝড়ের ভাব সে অনেকটা বুঝিতে পারিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। চারুর ঘর হইতে যে আলোটা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, রাখু সেটাকে আর দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি সে তাহার ব্যবহারে সংক্ষুব্ধ হইয়া ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে? কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সে সেই নিবিড় অন্ধকারের পানে চাহিয়া বাতাসের গর্জ্জন আর বৃষ্টির পতন শব্দ

শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই বুঝিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া চারু তাহার প্রতি পরম হিতৈষিণীর ব্যবহার দেখাইয়াছে। বাতাস যেন তাহার অকৃতজ্ঞতার উপর কুপিত হইয়া তাহার শীত-কম্পিত দেহে চারুর দয়ার আবরণ স্বরূপ সেই সুন্দর গরদখানা বার দুই তিন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। রাখু এতক্ষণ পরে বুঝিল, এ জাতিহারা কুলহারা দেহ-ব্যবসায়িনী নারী অন্ততঃ তাহার পক্ষে আজ জাতির অন্নীতা, কুলদায়িনী, আকাশ-কুসুমে রচা দেবী।

রাখু মনে মনে স্থির করিল, আহার ত করিবেই,—তাহার অন্তরালে করিবে না। চারু পাত্র-পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে, আর সে তাহার নির্দ্দেশমত দ্রব্য মুখে তুলিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে। প্রথমে সেই দুয়ারে দাঁড়াইয়াই বার তিন চার সে চারুর নাম ধরিয়া ডাকিল—উত্তর পাইল না। এক উগ্রপ্রকৃতির উৎপাত করা অস্তিত্ব ছাড়া সে-বাড়ীর কোনও স্থানে সে অন্য জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করিল না। চারু যদি একটু আগে তাহাকে দেখা না দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার ঠিক মনে হইত—এক প্রাণশূন্য বাড়ীর ভিতর, এক বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে একাকী অবস্থান করিতেছে।

যথাসম্ভব উচ্চ চীৎকারে রাখু আর একবার চারুকে ডাকিল। ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা হুঙ্কারে তাহার কথা ডুবাইয়া দিল। সে এবারে স্থির করিল, চারুর ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু সে অপরিচিত বাড়ীর অপরিচিত অন্ধকার তাহাকে ত পথ বলিয়া দিবে না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া সে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, দে'য়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই পথের কিছুদূর অগ্রসর হইল। —বুঝিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই সে সিঁড়ির মুখে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেখানে তাহার পদস্খলনের বিশেষ সম্ভাবনা। সে দেখিয়াছিল, সিঁড়ির মাথা সরু বারান্দাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আলোকের একটু সামান্য মাত্র আভাষ না পাইলে এবারে তাহার অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আকাশের কাছ হইতে একটু বিদ্যুৎ-রেখা ভিক্ষা করিল। আকাশ সদয় হইল না, কিন্তু বাতাস কি-জানি-কেন করুণার্দ্র হইয়া চারুর ঘরের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিল। সে আলোকে বেশী কিছু বুঝিবার না থাকিলেও সে এইটিমাত্র বুঝিল যে, চারুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। হয় সে এখনও জাগিয়া আছে, নয় জানালা বায়ুবশে মুক্ত হওয়ায় সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

সেইখানে সে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। যদি চারু না ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মুক্ত জানালা বন্ধ করিতে উঠিবে। জানালার কাছে আসিলেই সে তাহাকে ডাকিবে। এর অতিরিক্ত সাহস তাহার হইল না। তবে তাহার অনুমানটা ঠিক হইল। সত্য সত্যই রাখু সেই জানালার ফাঁকের ভিতর দিয়া একখানি হাতের যেন ছায়া দেখিল। সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাকিল—

"চারু!"

উত্তর আসিল না, কিন্তু জানালাটা ধীরে ধীরে একটু বেশী করিয়া খুলিয়া গেল। রাখু দেখিল, হাতখানা পার্শ্বের দিক হইতে জানালাটাকে খুলিয়া আবার অন্তর্হিত হইল। সে আর একবার একটু জোর গলায় ডাকিল—

"চারু!"

তথাপি চারুর কোনও উত্তর আসিল না। তবে সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া এমন একটু আলোকের আভাষ আসিল, যাহাতে সে দেখিল— সিঁড়ির মাথা দিয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইতে একজনের যাইবার যোগ্য একটি পথ রহিয়াছে। সেটা ধরিয়া চলিলে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না বুঝিয়া রাখু চারুর ঘর দেখিতে অগ্রসর হইল।

(৯)

সমস্ত বাড়ীটার ভিতরে একমাত্র রাখুই যেন জাগিয়া আছে। জাগিয়া আছে চোরের মত গৃহস্থের ঘর হইতে, পারে যদি, যেন তাহার সর্ব্বস্ব লুটিবার জন্য। কিছুদূর যাইতেই রাখুর মনে ওই ভাবটা জাগিয়া উঠিল। রাখু মনে মনে বলিল, তাই ত আমি এ কি করিতেছি। চারু জানে না, বাড়ীর আর কেহ কিছু জানে না। যদি কেহ হঠাৎ জাগিয়া তাহার এই চোরের গতি লক্ষ্য করে? তাহার চলিবার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাহার দুরভিসন্ধিটাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া এই অন্ধকারে কোন লুকিয়ে থাকা প্রহরী হঠাৎ একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে? তখন রাখুর কৈফিয়ৎ দিবার উপায় থাকিবে না। দিলেই বা কে সে কথা বিশ্বাস করিবে? চারুই কি করিবে? সে তাহার পরিচর্য্যার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে রাখুর এমন কিছু প্রাপ্তব্য নাই, যে জন্য তাহাকে একটা ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের দরজায় গিয়া ঘা দিতে হয়।

কথাটা মনে হইতেই রাখু আর বেশী যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। কিন্তু ফিরিবার সঙ্গেই তাহার প্রাণ হঠাৎ কি এক রকম ব্যাকুলতায় সে-রাত্রির

ঝড়ের আর্ত্তনাদ তাহার ফিরিবার গতিকে জড়াইয়া ধরিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া তখন তীব্রদৃষ্টিতে সে সেই মুক্ত জানালার দিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল, চারু যেন জানালার পার্শ্বে মুখটি আনিয়া, কার যেন সন্ধানে, দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর একবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে না ডাকিতে চারু ধীরে জানালার একটা কপাট বন্ধ করিল। রাখু আর স্থির থাকিতে পারিল না;—দ্বিতীয় জানালা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সে অন্ধকারের সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাইয়া, কই সে চারুকে ত দেখিতে পাইল না! তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, বাতাসের ভরেই জানালাটা খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইতেছে।

প্রথমে সে জানালার ভিতর দিয়া ঘরটার যতটুকু অংশ পাইল, দেখিয়া লইল। এমন সুসজ্জিত সুন্দর ঘর সে জীবনে আর কখনও দেখে নাই। দেব-পূজার কাজ করিতে সে দুই একজন বড় মানুষের ঘরে যাতায়াত করে, কিন্তু ঠাকুর ঘরটি ছাড়া তাহাদের আর কোনও ঘর দেখা আজিও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

সে ঘরের ভিতরে অরগ্যান দেখিল, সোফা দেখিল সর্ব্ব-শেষে ঘরের এক প্রান্তে সিঁড়ি-দিয়া-ওঠা একটি অতি সুন্দর পালঙ্ক দেখিল। পূর্ব্বের দু'টা সে কখনও দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও সে ভাল রকম বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পালঙ্ক সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। তবে এমন সুন্দর পালঙ্ক সে কোনও কালে দেখে নাই; সিঁড়ি দিয়া যে তাহার উপর উঠিতে হয়, কোন কালে স্বপ্নেও সে ধারণা করিতে পারে নাই।

দেখিয়া রাখু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। এত ঐশ্বর্য্য তার! আর এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তার কিনা এত বিনয়! দাসীর মত সে কি না হীন পূজারী রাখুর সেবা করিতেছে! আপনাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে রাখু এ সেবার অধিকার দাবী করিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে সে রাধুনী পূজারী বামুনগুলার গৃহস্থের মেয়েছেলেদের কাছে আদর-সম্মান দেখিয়াছে। হ'ক পতিতা, সভ্য গৃহস্থের কাছে পাওয়া সম্মানের সঙ্গে এই পতিতা নারীর নিকট প্রাপ্ত সম্মানের তুলনা করিয়া রাখু তাহার কাছে বামনাই দেখানো অতি মূর্খের কার্য্য মনে করিল। সে স্থির করিল, আর একবার দেখা হইলে এই পতিতাকে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার নৈবেদ্য

ভক্ষণ করিতে করিতে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দিবে। রাখুর যেন মনে হইল, এতদিন পরে তাহার অন্তরের কথা শুনিবার লোক মিলিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে? অমন সুন্দর পালঙ্কের উপর একমাত্র সেই সুন্দর দেহখানিই আশ্রয় লইবার অধিকারী, এইটিই রাখুর মনে লইয়াছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহুক্ষণের চেষ্টাতেও তথায় তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। তখন সেখান হইতে ঘরের যেখানটার যতদূর দেখা যায়, ক্ষুধিত তারা দু'টা দিয়া সে চারুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, ঘরের অন্যপ্রান্তে বহু স্থান ব্যাপিয়া এক সুন্দর শতরঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার উপরে এক শুভ্র চাদর। তাহার উভয় পার্শ্বে সারি দেওয়া তাকিয়া। মধ্যের একস্থানে একটি হারমোনিয়ম, বাঁয়া ও তব্‌লা। হারমোনিয়মের অন্তরালে—জানালার কবাট যতটা মুক্ত করিবার করিয়া, চক্ষু দু'টাকে গরাদের ফাঁকে যতটা পুরিবার পুরিয়া—রাখু দেখিল, চারু যেন—'যেন' কেন, তাহার নিশ্চিত বোধ হইল—চারুই মাটীর দিকে মুখ করিয়া মুক্তকেশগুচ্ছে পিঠটা ঢাকিয়া শুইয়া আছে। ক্রমে নিশ্চয়তাটা তার অধিক দূর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে বেশ বুঝিল, চারু ফরাসের উপরে নাই,—মেঝের উপরই মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে।

তাহার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তবে কি চারু কাঁদিতেছে? মনে হইতেই তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া এক সঙ্গে কতকগুলা ভাব কিছু এলোমেলো রকমে ঝড়ের প্রবাহে ছুটিয়া গেল। আর কোনও ভাব সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও একটা বিষাদ-মাখা স্মৃতি অতিদূর দেশ কাল অতিক্রম করিয়া তাহার হৃদয়ের খানিকটা স্থান এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে দখল করিয়া বসিল যে, রাখু তাহাকে মন হইতে মুছিতে গিয়া, না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বহুদিন পূর্ব্বে নিজের পর্ণকুটীরের একটা কোণে মাটীর মেঝের উপর সে একবার এইরূপ ছবি দেখিয়াছিল। ছবিখানা আজিকার মত এক নির্দ্দয় ঝঞ্ঝায় এক যুগ পূর্ব্বে কলিকাতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তার কোন্ ভাগ্যবশে করুণায় ভরা যুগের বাহুতে ভর দিয়া আজই যেন সে ঝড়ের বুক ভাঙ্গিয়া এই কোঠাবাড়ীর দোতালায় উঠিয়াছে। ছবি দুইটার তুলনা করিতে তাহার সম্পূর্ণ সাহস হইল না। না হইলেও তাহার চক্ষু সাহস করিয়া দু' ফোঁটা জলে এই উভয় চিত্রের সামঞ্জস্যকে অভিবাদন করিল।

কতকটা কারণ বুঝিবার ইচ্ছায়, কতকটা যেন নব-সঞ্জাত মমতায়, চারুকে সে তুলিবার মন করিল। কিন্তু এখন আর চারুর নাম ধরিতে তাহার সাহস হইতেছে না। উভয়ের অবস্থানে যে অনেক প্রভেদ! কিন্তু তাহাকে 'বাছা' বলাও আর সে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছে না। বলিলে চারু যদি রাগ করিয়া উত্তর না দেয়? সে ডাকিল—

"ওগো!"

প্রথমে ঈষদুচ্চস্বরে। চারু নড়িল না। ঝড়ে শব্দ আবদ্ধ হইল মনে করিয়া বেশ একটু চীৎকারের মত করিয়া আবার ডাকিল—

"ওগো, ওগো—শুনছ?"

বারান্দার ঝিলিমিলির মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝার টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু সে শুনিতে পাইল না। এবারে আর নাম না ধরিয়া সে পারিল না—

"ওগো চারু···চারু!"

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ চারুর দেহ একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু উত্তর সে দিল না। কেবল মুখটি রাখুর দিকে ফিরাইয়াই আবার সে নিশ্চল হইল। রাখুর বুকটা কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনেই বিপুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে আবার ডাকিল;—কম্পনে স্বরের ভগ্ন-জড়তায় নামটা তার ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না। কিন্তু তাহাতেই সে দেখিল, পলায়নোন্মুখ ঘুমটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য মুক্ত কেশরাশি দিয়া চারু তার চোক মুখ ঢাকিয়া দিতেছে।

রূপজ মোহ রাখুকে এক মুহূর্ত্তে সাহসী করিয়া তুলিল। হৃদয়ের প্রতি-স্পন্দন তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। সে বুঝিল চারু জাগিয়া আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, শুধু অভিমানভরে উত্তর দিতেছে না।

দেয়াল ধরিয়া রাখু অগ্রসর হইল। একটু যাইতেই তাহার হাত দোরের কবাটে ঠেকিল। বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করিতে যেমন সে কবাটে হাতের একটু চাপ দিয়াছে, অমনি প্রবল বাত্যা তাহার করাঙ্গুলির প্রান্ত বাহিয়া দোরের উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কবাট দু'টা একেবারে পূর্ণ উন্মুক্ত। একটা যেন পরীর বাসা অন্ধকারের পেটিকার মধ্যে লুকাইয়াছিল। আশ্রয়-লুব্ধ বাতাস রাখুর করাঙ্গুলিতে আবেগ জড়াইয়া তাহার ডালা খুলিয়া দিয়াছে। ঘরখানা এখন নবোঢ়া বধূর মত লজ্জাভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি একবার মাত্র মুক্ত করিয়া ঘন নীলাবগুণ্ঠনে মুহূর্ত্তের ভিতরে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আসল কথা—সন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত অন্ধকার ঝড়ের ফুৎকার অবলম্বনে ঘরের

ভিতরের আলোটাকে গ্রাস করিল। সঙ্গে সঙ্গে সভয় চমকের একটা আকস্মিক 'মোচড়ে' রাখুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। যেমন তাহার মনে হইল, আত্মহারা হইয়া এ আমি কি করিতেছিলাম, অমনি তাহার বুকের স্পন্দন সর্ব্বদেহে প্রসৃত হইয়া তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সে যদি সিঁড়ির দিকে নরদেহধারী একটা চলিষ্ণু অন্ধকারকে না দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দোরের কাছেই বসিয়া পড়িত। তাহার বোধ হইল, কে যেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আর সে দাঁড়াইল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

(১০)

ঘুম রাখুর চোখ হইতে পলাইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহাকে আবাহন করিতেও সাহস করিতেছে না। সে যেন বাত্যা-শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কাহার কথা শুনিতেছে! কে যেন মঞ্জীর-চরণা ঝড়ের পৃষ্ঠে অধীর মুখর পরশ চাপাইয়া তাহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করাইতে শয্যার পার্শ্বে আসিতেছে! তাহার চক্ষু-পলকের কপটতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাতে যেন তার একটা আলো। বাতাস সেটাকে নিবাইবার জন্য যত তরঙ্গের আঘাত করিতেছে, সেটা যেন আপনার স্নেহ আঁকড়িয়া ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

চোখ মুদিয়াই রাখু গরদ কাপড়ের খুঁটটা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে ইচ্ছা করিল, পাছে ভুলে সে চোখ মেলিয়া ফেলে। কিন্তু ঢাকিতে গিয়া সে বুঝিল, সে কাপড়খানাও তার দুর্জ্জয় অন্যমনস্কতার জন্য কোন এক সময়ে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে পাশ ফিরিয়া দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া কুকুর-কুণ্ডলীর মত পড়িয়া রহিল।

সহসা একটা চমক—জাগরণের সঙ্গে তন্দ্রার মিলন-মুখে বিরাট করুণ উপাখ্যানের শেষ নিঃশ্বাসের মত এক অব্যক্ত আক্ষেপ। সহসা একটা আলোক —স্তিমিত লোচনের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া তারার সঙ্গে আলাপ-প্রয়াসী যেন এক অতি কোমল অপাঙ্গ-লেখা। সহসা একটা স্পর্শ— সমীর বিক্ষিপ্ত পুষ্প-রাগের মত চারিদিক হইতে ঘিরিয়া-ধরা এক ব্যাকুল বেদনা ভরা স্নেহ! রাখু চোখ মেলিল—

"একি! চারু?"

"ছি ছি, এমন কাজও করে! কাপড়খানা জলে যেন ভাসছে। আর একবার ওঠো, কাপড় ছেড়ে ফেল।"

"দেখ—।"

রাখু কাপড় ভিজার কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল। চারু বাধা দিয়া বলিল—

"দেখবো এর পরে—আগে ওঠো দেখি।"

অগত্যা রাখু উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ আগে হইতেই একখানি সুন্দর শাল দিয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। বিস্ময়-মুগ্ধ, অবাক, সে চারুর মুখের পানে চাহিল দেখিল, চারু হাস্যময়ী; চেলীর মত রং করা, নানারকমের ফুল-কাটা পাড়ের আর একখানা কাপড় হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

এবারে আর সেখানে ক্ষুদ্র পিলসুজের উপর আগেকার সেই কৃপণ দীপ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাসের রাশি লইয়া একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর আলোক-পুষ্প শতদীপের বদান্যতায় ঘরটাকে ভরিয়া দিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে চারু আবার বলিল

"আর ভেবে কি করবে? ও কাপড়ে তোমাকে আমি থাকতে দেব না। তাতে তোমার জাত থাক আর যাক। কি করব, তোমার বরাত। এই আমার কাপড় প'রেই তোমাকে রাত্রিবাস করতে হবে।"

কোনও কথা না বলিয়া, গাত্র-বস্ত্রটা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া রাখু দাঁড়াইল। চারুও কোন কথা না বলিয়া কাপড়খানা তাহার হাতে দিল এবং রাখু যখন দৃষ্টি দিয়া কাপড়ের সৌন্দর্য্য আর দেহ দিয়া তাহার কোমলতা উপভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—

"দেখো, যেন এ কাপড়খানাও ভিজিয়ো না। এবারে ভিজলে তোমাকে পাছাপেড়ে শাড়ী পরতে হবে।"

"আর ভিজবে না। আমি তোমার ঘরের দোরে গিয়েছিলুম কেন, জান?"

"আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। হাসিটা রহস্যের এত ঘন স্পন্দনে মাখানো যে, তাহার প্রশ্নের অর্থ একটু গোলমেলেভাবে চারু গ্রহণ করিয়াছে, মনে করিয়া রাখু একটু অপ্রতিভ হইল। একেবারেই তখন সে বলিয়া উঠিল—

"না চারু!"

তার পর কাপড় পরিয়া ও শালখানা গায়ে আবার বেশ করিয়া জড়াইয়া গালিচায় পুনরুপবিষ্ট হইল।

চারুও ভিজা গরদখানা ঘরের একপাশে রাখিয়া গালিচার পার্শ্বে মেঝেতে বসিতে বসিতে বলিল—

"বেশ, তবে নয়।"

"তোমার দেওয়া খাবার খাব—তোমাকে বলতে গিয়েছিলুম।"

চারু আর উত্তর দিল না। শুধু দিল না নয়, রাখুর চোখের উপর শুধু মুখ-সৌন্দর্য্যটি ধরিয়া উর্দ্ধ-সন্নিবিষ্ট স্থির-দৃষ্টিতে যেন পাষাণের মত বসিয়া রহিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া রাখুও কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিতে পারিল না। যখন একটা অতি সূক্ষ্ম বেদনার সুর-ভরা দীর্ঘশ্বাসে সে তাহাকে জীবন-রাজ্যে পুনরাগত মনে করিল, তখন বলিল—

"চারু আমায় কিছু খেতে দাও।"

চারু কেবল তারা দু'টা পলকে ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

কেন যে সে ওরূপভাবে বসিয়াছে, সেটা রাখুর বুঝিতে বাকী রহিল না। খাবার কথা সে নারী যে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না, এটা তাহার মনে হইল না। তাহার পূর্ব্বাচরণে নারীহৃদয়সুলভ যে অভিমান জাগিয়াছিল, চারু মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে এতক্ষণ তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। অভিমান তার এখনও যায় নাই। আর সেই দুরন্ত অভিমানটাই জোর করিয়া তাহার ঠোঁটদুটি চাপিয়া আছে, চোক দু'টিকে পাতা দিয়া ঢাকিয়াছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া অতি সন্তর্পণে রাখু গালিচা ছাড়িয়া উঠিল, এবং সেইরূপ সন্তর্পণেই জল-যোগের জন্য আসনে উপবিষ্ট হইল। খাদ্য-পাত্র সেইরূপই রক্ষিত ছিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকার সময় চারু একটি জিনিষও স্থানান্তরিত করে নাই।

আসনে বসিয়াই হাত ধুইয়া গণ্ডুষ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর পানে ফিরিল। চারু সেই ভাবেই বসিয়া আছে, অধিকন্তু তাহার চোখের প্রান্ত দিয়া গণ্ড বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ ত শুধু অভিমান নয়! রাখু সেই অশ্রুগুলার সঙ্গে জড়ানো চারুর হৃদয়-থেকে-ফুটিয়া-ওঠা একরাশ বেদনা দেখিতে পাইল। সে বেদনা লঘু নয়, তার এতক্ষণের নিশ্চলতায় এটা সে বেশ বুঝিল, তার বেদনা মর্ম্মান্তিক।

চারুকে না ডাকিয়া আগে সে পাত্র হইতে গোটা দুই আখের টিকলী উঠাইয়া মুখে দিল। নিঃশব্দে সেগুলাকে চর্ব্বণ করিয়া ছিব্‌ড়া দু'টা মেঝেয় রাখিল। চারু যখন দেখিবে, সে দু'টা তাহার আতিথ্যগ্রহণের সাক্ষ্য হইবে।

চিত্তের অসম্ভব চঞ্চলতায় রাখুর ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। আবাল্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাহাকে পতিতার ঘরে খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করিতেছিল। আসনে বসিয়াও গণ্ডুষ করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। চারুর অভিমান দেখিবা মাত্র আবার তাহার বাম্‌নাই ও মনুষ্যত্বে দ্বন্দ্ব বাধিল। সে দ্বন্দ্বে কোনটা যে জিতিত, আসনে বসিয়াও রাখু তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইবারে সে নারীর মনের কিম্বা মর্ম্মের—কি প্রকারে উৎপন্ন অজানা বেদনাটার সাহায্য পাইয়া রাখুর মনুষ্যত্ব তাহার বাম্‌নাইকে হারাইয়া দিল।

একটা মিষ্টান্ন মুখে ভরিয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে রাখু ডাকিল—

চমক-ভাঙ্গার মত চারু চোখ মেলিল, মুখ ফিরাইল, রাখুর কার্য্য দেখিল। দেখিয়াই তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু অশ্রু তাহার যেন উর্দ্ধমুখী হইয়া চোখের কোণ হইতে বাহিরে ছুটিল।

পরক্ষণেই তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার এতটা আত্মহারা হওয়া ভাল হয় নাই। সে অমনি যথাসম্ভব সত্বর রাখুর অলক্ষ্যে চোখ মুখ মুছিয়া দাঁড়াইল।

"আমার সুমুখে এসে ব'স।"

চারু নড়িল না, তার কথায় একটা কথাও কহিল না।

"আমার কথা কি শুনতে পেলে না?"

"পেয়েছি।"

"তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"বসে' কি করবো?"

"আমার খাওয়া দেখবে।"

তবু চারু দাঁড়াইয়া রহিল। রাখু বুঝিল, আবার সে চিন্তা-সাগরে ডুবিতেছে। সে আবার ডাকিল—

"চারু!"

"চারু চারু করছ কেন? আমার নাম চারু—তোমাকে কে বললে?"

"তবে তোমার কি নাম, আমাকে বল। সেই নামে তোমাকে ডাকি।"

"কেন, যেমন 'ওগো' বলে' ডাকছিলে।"

বিস্মিতনেত্রে চারুর মুখের পানে চাহিয়া রাখু বলিল—

"তুমি জেগেছিলে?"

"ছিলুম বৈ কি।"

"তবে উত্তর দিলে না কেন?"

"দিলুম না।"

আরও কিছু যেন সে বলিতে যাইতেছিল, রাখু বাধা দিয়া বলিল—

"অমন সোনার পালঙ্ক ছেড়ে মেঝের উপর মুখ রেখে শুয়েছিলে কেন?"

"ওই রকম শোবার সখ্ হ'য়েছিল।"

"না—"

বলিয়াই রাখু 'চারু' বলিতে যাইতেছিল। বলিতে না পারায় তাহার কথা জড়াইয়া গেল।

"বেশ ত, চারুই বল।"

"নামটা বলবে না?"

"তোমার কি 'ওগো' বলতে বাধা ঠেকছে? আমি যদি তোমার বউ হতুম ঠাকুর, তাহ'লে কি বলে' ডাকতে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নামাইয়া আর একটা মিষ্টান্ন সে হাতে তুলিল। চারু দেখিল—ব্রাহ্মণ, যে খাদ্যটা আগে খাইবার সেটা না লইয়া অন্য একটায় হাত দিয়াছে। সেটা খাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে বলিল—

"ওটা পরে খেয়ো।"

"কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে খেতে হয় আমি কি জানি? খাওয়া পরের কথা, আমি এর পূর্ব্বে এ সকল জিনিষ চোখেও দেখিনি। তুমি কাছে বসে' আমাকে দেখিয়ে দাও।

"আমার কি কাছে বসা উচিত?

"উচিত অনুচিত আমি বুঝতে পারছি না; তুমি বস।"

অগত্যা চারুকে রাখুর সম্মুখে বসিতে হইল।

(১১)

চারুর নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একবার চোখ উঠাইয়া রাখু দেখিল, চারু অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

"হ্যাগা, আবার তুমি কাঁদছ?"

উত্তর দিতে গিয়া নিরুদ্ধ ক্রন্দনের উৎপীড়নে চারু এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, রাখু আত্মহারা হইবার মত কি করিবে—না বুঝিয়া বাঁ হাতে তার ডান হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"করলে কি আমাকে ছুঁয়ে ফেললে!"

"তাতে কি, তুমি এবারে কোন্ মিষ্টিটা খেতে হবে বল, আমি আবার খাচ্ছি।"

"আমি তোমাকে আর খেতে দেবো কেন?"

বলিয়াই সরাইবার জন্য চারু অন্য হাতে থালা ধরিল।

"নাও হাত ছেড়ে উঠে পড়।"

"তুমি কাঁদছ কেন, আগে বল।"

"দেখ দেখি, এই সামান্য জিনিষ, তাও আবার রাখতে হ'ল।"

তাহার হাত ছাড়িয়া রাখু বলিল—

"তা যদি বল, তাহলে বলি, আমার খিদের লেশমাত্র ছিল না। চারু, পাছে মনে কষ্ট পাও, তাই আমি এই খাবার মুখে তুলেছি।"

"উঠে পড়। এতটা যে দয়া করলে এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"দয়া আমার না তোমার চারু?"

বলিতে বলিতে রাখু দাঁড়াইল। চারু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল।

রাখু কিন্তু তাহার চক্ষু জলের কারণ-নির্ণয় না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন কাঁদছিলে, বল্লে না?"

"আর বলে' কি হবে? হাত-মুখ ধুয়ে, ডিপেয় পান আছে খেয়ে, কল্কেয় তামাক সেজে রেখেছি—ধরিয়ে দিই, টেনে শু'য়ে পড়। রাত দুপুর হ'য়েছে। একে ত অনেকবার ধরে' ভিজেছ, তার উপর রাত জেগে অসুখ করে' হিতে বিপরীত করে' বসবে। বাসায় কে আছে?"

"দেশের দু'চার জন লোক আছে।"

"আপনার জন?"

"কেউ নেই।"

"তবে অসুখ হ'লে সেবা করবে কে?"

'তা' যদি বললে তবে বলি। সেবা করবার লোক এখানেও নেই, দেশেও নেই।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নি?"

"করেছিলুম।"

"স্ত্রী কি জীবিত নেই ?"

রাখু চারুর মুখের দিকে ভিখারীর দৃষ্টিতে চাহিল। চারু ক্ষণেকের জন্ত মাথাটা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তারপর মেঝে হইতে জলপূর্ণ ঘটি তুলিতে তুলিতে বলিল—

"বুঝেছি, ঠাকরুণ তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।"

"না চারু, সে মারা গেছে।"

"নাও, হাত ধোবে এস।"

"পাঁচ বৎসর বয়সে মা হারিয়েছি, সাত বৎসর বয়সে মরেছে বাপ্।

"বিছানায় বসে' তামাক খেতে খেতে বললে চলবে না ?"

অগত্যা রাখু চুপ করিল ও চারুর ইচ্ছানুযায়ী মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া গালিচায় বসিল।

চারুও হাত ধুইয়া যথাসম্ভব সত্বর তাহার আগে হইতে সাজিয়া-রাখা একটা কলিকায় আগুন ধরাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া এইবারে সে বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিশ্চেষ্টের মত বসিল।

ক্ষণেক নীরব রহিয়া রাখু তামাক টানিতে লাগিল। চারু বলিল—

"তবে তুমি তামাক খাও,—আমি আসি।"

"আমার মনে হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত তুমি কিছু খাওনি।"

"আমার মনে হচ্ছে, আজ আমি এত খেয়েছি যে, কিছুকাল আমাকে আর খেতে হবে না।"

বলিয়াই এমন মধুর হাসিতে চারু ঘরটা ভরাইয়া দিল যে, রাখুকে সে মধুরতায় ডুবিয়া ক্ষণেকের জন্য নল ছাড়িয়া চক্ষু মুদিয়া বসিতে হইল। বসিল বটে, কিন্তু চারুর কথার অর্থ প্রণিধান করিতে তাহার একান্ত স্থূলবুদ্ধি তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না।

অথচ এ কথার একটা জবাব না দিলে চারুর কাছে তাহাকে মূর্খ সাজিতে হয়। মনে মনে উত্তর ঠিক করিয়া যখন সে চোক মেলিয়া বলিল—"তাহ'লে পাকা হর্তকী খেয়েছ বল।" তখন চারু খাবার স্থানটা পরিষ্কার করিতে উঠিয়া গিয়াছে।

"এইবারে যাচ্ছ নাকি ?"

"খিদের কথা তুলে' তুমি যে হর্তকীকে কাঁচিয়ে দিলে। ভাগ্যে জগবন্ধুর মহাপ্রসাদ জুটে গেল—গ্রহণ করতে কি নিষেধ কর ?"

এই সব জটিল কথার উত্তর দেওয়া সুবিধা হবে না বুঝিয়া রাখু বলিল—

"আমার অবস্থার কথা তোমাকে বলতুম, তবে কি না—" "নাই বা কইলে।"

"তবে একটা কথা তোমাকে বলতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

চারু থালায় হাত রাখিয়া রাখুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রাখু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

"বল্‌বো ?"

"আপনার ইচ্ছা।"

"বললে পাছে তুমি কিছু মনে কর, এইজন্য সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"তাহ'লে যে সময়ে সঙ্কোচ হবে না, সেই সময়ে বলবেন।"

"এর পরে কি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তা বলবো ?"

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। রাখু বলিতে লাগিল—

"সত্য কথা যদি বলতে হয়, যে স্নেহ আদর তুমি আজ আমাকে দেখালে, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত কারও কাছে তা' পাই নি।"

"এই কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ?"

"না, সে আলাদা কথা।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—বুঝেছি।"

"কি বল দেখি ?"

"স্নেহের প্রতিদান দিতে আমাকে পায়ে রাখতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে।"

রাখু জিভ্ কাটিয়া বলিল—

"না—না—না। চারু, আমি দীন বটি, হীন নই। তা যদি তুমি মনে কর, তাহ'লে বল, এখনি আমি—"

"নাগো ঠাকুর, তোমায় উঠতে হবে না। হীন ত তুমি নওই, তুমি দীনও নও। একটু তামাসা করবার ইচ্ছা হল, তাই করলুম। ঝড়ের রাতটা কি একেবারে নিঝুমেই কেটে যাবে গা !"

"আজকের এ আশ্রয়ের কথা—একি জীবনে ভুলতে পারব ?"

"তামাকটা যে অমনি অমনি পুড়ে' গেল।"

রাখু নলটা দু'টান টানিয়াই বলিল—

"আগেই গেছে।"

চারু এইবারে রাখুর ভুক্তাবশেষ গেলাস বাটী প্রভৃতি থালার উপর সাজাইয়া, হাত ধুইয়া আবার তামাক সাজিতে আসিল।

'মাঝখান থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই—আপনাদের দেশ কোথা?'

"বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছ?".

"শুনেছি—আর শুনেছি, সেখানে গান বাজনার খুব চর্চ্চা।"

"আগে ছিল। রাজাও ছিল, সঙ্গীতেরও আদর ছিল। এখন রাজার সঙ্গে সঙ্গে সবই এক রকম যেতে বসেছে। এখনও তবু যা আছে, দু' পাঁচ বছর পরে তারও কিছু থাকবে না।"

চারু মুখের হাসি অতি কষ্টে কল্‌কের আগুনের আলোকে ঢাকিয়া রাখুর কথা শুনিতে লাগিল। সঙ্গীতের কথায় আত্মহারা রাখু বলিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তার হাসি আসিবার কারণ—রাখুর কথার গতি ফিরানোই তার উদ্দেশ্য ছিল; সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হইয়াছে। সে এইবার কল্‌কেটা দিতে গিয়া বলিল—

"তাহ'লে ঠাকুরেরও কিছু গান বাজনার সখ আছে?"

রাখু স্মিতবিকশিত মুখে চারুর মুখের পানে চাহিল।

"বেশ, আমাকে তোমার একটু গান শুনিয়ে দাও।"

"গাইতে ভাল জানি না।"

"বাজনাটা ভাল শিখেছ?"

"ভাল শিখেছি বললে অহঙ্কার হয়, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে শিখেছি।"

"বেশ, তাই আমাকে শোনাবে?"

"কবে?"

"আজ বল আজ, কাল বল কাল, অথবা যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

রাখু কোনও উত্তর দিল না।

"কিগো, চুপ করে' রইলে কেন?"

"তাইত চারু, কাল আমি কেমন করে' থাকবো?"

"থাকতে পারবে না?"

"এই যে বললুম। আমি কতকগুলি যজমানের বাড়ীতে ঠাকুর-পূজো করি। আমাকে যেমন করেই হোক, ভোরে বাসায় পৌঁছিতেই হবে।"

"বেশ, খেয়ে দেয়ে বৈকালে?"

"বৈকালেও আসতে পারবেন না—আর আসতে পারবেন না?"

এরূপ কথায় রাখুর উত্তর দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত ছিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে উত্তরের একটি অক্ষরও বাহির হইল না।

"বেশ, শু'য়ে পড়ুন। তবে—যাবার সময় একবার দেখা করে' যেতেও কি আপত্তি আছে?"

তবু যুবক উত্তর দিতে পারিল না। তবে এবারে সে মুখ তুলিল। চারুর সূক্ষ্ম চক্ষু এইবারে বুঝিতে পারিল, উত্তর না দিতে পারায় রাখুর কোনও অপরাধ নাই। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিতেছে। দেখিয়া চারু যেন কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল। তাহার মুখটাও প্রফুল্ল হইল। হাসিতে হাসিতেই সে বলিয়া উঠিল—

"মাথা খাও, যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা না করে' যেয়ো না।"

বলিয়া রাখুকে কোনও কথার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মনোহর।

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী)

পুঁথিপত্র দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনার অন্তর মেলিয়া,
শুধু চেয়ে, আছি তারি পানে;
কতগান পশিয়াছে কাণে,
মানবের কণ্ঠ স্বরে, পাতার মর্ম্মরে,
মধুপ গুঞ্জন আর পিক কলস্বরে,
মনঃ শিলাতল বাহী অন্তর ধারায়
সুগভীর যে রাগিনী প্রবাহিয়া যায়,
আর কোথা তারে এক ঠাঁই
শুনিতে সুযোগ নাহি পাই।

সুখে দুঃখে আলো ছায়া মাঝে,
একসাথে নিয়ত বিরাজে,
বিরহ মিলন, মুগ্ধ প্রণয় নিবিড়
দুরাশা নিরাশা আশা করে থাকে ভিড়
শ্রাবণ মেঘের মত থাকে বুকে করে,
বৃষ্টি বজ্র সৌদামিনী ক্ষুব্ধ ধাক্কা ঝড়ে!
ভিন্ন হয়ে বসন্ত শরৎ
পূর্ণ করে বিশ্বের জগৎ,
এক আসে আর চলে যায়,
অন্তরের এই অমরায়
সকল সুষমা এসে করিয়াছে বাস,
নিদাঘ বরষা শীত আর মধুমাস!
অশোক চম্পক সাথে কুন্দের মিলন,
উদয়াস্ত, উন্মীলন আর নীমিলন!
বিশ্ব এসে করে বসবাস,
এ অন্তর তাইতে আবাস
মানবের আর দেবতার,
জগতের সব বারভার,
জনম আলয় আর সমাধি মন্দির,
ক্ষুব্ধ মত্ত পারাবার, নীলাম্বর স্থির,
তন্বী শ্যামা সুন্দরী ধরণী যুগে যুগে
ছিল যাহা, হবে যাহা, আছে এই বুকে!
শিলালিপি আছে যুগান্তের,
কোন দূর স্তব্ধ নিশান্তের
আলোকের প্রথম সূচনা,
তৃণপুষ্প পল্লব রচনা
আদিম বসন্ত প্রাতে, নবজীবনের
দুঃখ সুখ দ্বন্দ্ব কোলাহল, যৌবনের
প্রথম আবেগ, পশুপক্ষী পতঙ্গম
বাসা বেধে আছে হেথা স্থাবর জঙ্গম!

যে মহামানব যুগধর্ম্মে
উঠিবে গড়িয়া, এই মর্ম্মে
আছে ভ্রূণ তার, পশু-তেই
মরে নাই আজো, নিমেষেই
সহসা চকিত করি দেখা দিয়ে যায়,
নীহারিকা বাষ্প জালে রহস্য ছায়ায়
যে সৃজন, যে প্রলয় অবিরাম গতি ;
অন্তরের অন্তঃস্থলে তাহারি বসতি !
বিচিত্র একত্র হয়ে আসে,
ভগ্ন ছিন্ন যাহা চারি পাশে,
খণ্ড বলে' আছে তুচ্ছ হয়ে,
অখণ্ড সে মনের নিলয়ে
অপরূপ রূপ ধরি অনন্ত সুন্দর
আপনি হয়েছে মন, তাই মনোহর।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

ওপারের আলো।

এখানি প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লেখা একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানির নাম হয়েছে "ওপারের আলো"। নামটি আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে খুব সুন্দর খাপ খেয়েছে। কেন না উপন্যাসখানির ভিতর দিয়ে যে জিনিষটিকে খুব বেশি কোরে ফোটান হয়েছে তা এপারের হয়েও ওপারের।

এপার অর্থে গ্রন্থকার মহাশয় সম্ভবতঃ যুগযুগান্তরের সংস্কার এবং তাই দিয়ে গড়া মানব-সমাজকেই লক্ষ্য করেছেন। এই যে আমাদের সমাজ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারণ ব্যাপার, সংস্কারই ত একে আপনার মতন করে গড়ে তুলছে এবং তুলবেও। আর সংস্কার জিনিষটা কি? সেটা মানুষের গড়া গোটাকতক নিয়মের বেড়া ছাড়া ত আর কিছুই নয়। আর এই যে মানুষ নিজে হাতে নিজেদের চারিদিকে গণ্ডীর পর গণ্ডী খাড়া করে তুলছে এ কিসের

জন্যে? এ কেবল মানুষের জীবন-যাত্রাকে নিরাপদ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করে তোলবার জন্যে। এর মধ্যে শাশ্বত এবং নিরপেক্ষ সত্য শিব সুন্দরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঁচতে হবে, কাজেই সেই বেঁচে থাকার দিন কটাকে যতটা পারা যায় সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করে তুলতে হবে ত!—এই হোলো সমাজ এবং সংস্কারের ভিতরকার কথা।

এই ত গেল একদিকের কথা। আর এক দিকে কিন্তু মানুষের বুকের ঠিক মাঝখানটাতে একটা নির্জ্জন কোণে বসে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে একটি অখণ্ড শক্তি ক্রমাগতই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে—সমস্ত বন্ধন ভেঙ্গে, সমাজ এবং সংস্কারের সমস্ত গণ্ডী ভেদ করে। সে বলতে চায়, সমাজ না হয় তার সুবিধা অসুবিধার জমা খরচের অঙ্ক কসে ঠিক করে নিলে এইটে ন্যায় আর ঐটে অন্যায়, কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের মূল্য কি লাভালাভের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে নিতে হবে? তা ছাড়া লাভ লোকসান খতিয়ে দেখতে গেলে শুধু দোকান-ঘরটার বাড়বাড়ন্তর দিকে তাকালেই ত আর হবে না—দেখতে হবে সেই লাভের অংশ বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কিনা।

এই যে ভিতরকার ডাক, এই যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে মাঝে মাঝে কোন্ এক নিভৃততম অপ্রশস্ত রন্ধ্রপথ দিয়ে একটা নূতন আলোক মাঝে মাঝে এই বাহিরের জগতটার উপর এসে পড়ছে—যুগ যুগ ধরে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির রুদ্ধ দ্বারের ফাটলের ফাঁক বেয়ে—গ্রন্থকার একেই বলতে চেয়েছেন ওপারের আলো।

আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে যতগুলি চরিত্র পেয়েছি তার অনেকগুলির মধ্যেই এই আলোকের আভাস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে।

কিশোর রায় জমিদারের ছেলে—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁর মনে আদবেই সুখ নেই; আর থাকবেই বা কি করে?—স্ত্রী তাঁর কুচরিত্রা। তাও আবার কি রকম স্ত্রী, না যাকে তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসেন। সংস্কার গলাবাজি করে উঠলো, "এ কিন্তু ভয়ানক অন্যায়,—ওকে যখন তুমি বিবাহ করেছ তখন ও ত তোমারই সম্পত্তি—তবে কোন্ হিসাবে ও পরকে মনে স্থান দিতে যায়!—ত্যাগ কর এখুনি ওকে—দূর করে দাও বাড়ি থেকে।" কিন্তু অন্তরবাসী সেই নির্ব্বিকার পুরুষটি যা বল্লে, তা এই যে, "বিবাহ ত বাইরের বন্ধন। তুমি তাকে বাইরে থেকে বেঁধেছ ভিতর থেকে ত আর বাঁধনি। তাই আমি নিজে হাতে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার কাছ

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—তুমি পারবে না তাকে নিজের করে নিতে। ঐ একই জিনিষকে আর একটু সরস করে নিয়ে কানাই বাবাজী বৈষ্ণব ধর্ম্মের তরফ থেকে বল্লেন, "তুমি যখন তাকে ভালবাস তখন চেষ্টা কর যাতে সত্যি সত্যি তাকে ভালবাসতে পার। বিবাহের গাঁটছড়ার বাধন দিয়ে সে ভালবাসাকে বেঁধে রেখে দিতে চেষ্টা কোরো না; ছড়িয়ে দাও তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে। তুমি তাঁকে ভালবাস—বাস্! ঐ খানেই তোমার দেনা পাওনা সবই চুকে গেছে; তবে আবার বদলা পাবার জন্যে হাঁপিয়ে মরছ কেন? ভালবাসা কি বেচাকেনার জিনিষ যে লাভে না বিকুলে তাকে গুদম্-ছাড়া করবে না।

সংস্কারের সঙ্গে ভিতরকার মানুষটির এই যে ঠোকাঠুকি,—এটা খুব সুন্দর করে দেখান হয়েছে একটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার ভিতর দিয়ে। এই চরিত্রের ভিতর দিয়ে যে সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, সত্য যখন আসে তখন অনেক সময় সে তার রুদ্র মূর্ত্তি নিয়েই আসে, আর আমরা তাকেই বিপদ মনে করে পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করি। সত্যের এই যে রুদ্রমূর্ত্তি এ যে ধ্বংসের প্রলয়মূর্ত্তি নয়—নব গঠনের শান্ত মূর্ত্তি, সে কথা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। এই যে বিধবাটি,—ইনি সারা জীবন ধরে পূজা করে এসেছেন কেবল বাইরের গোটাকতক শুকনো আচার বিচারকে। ওদিকে কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে মনুষ্যত্ব যেখানে আপনার অচল আসনখানির উপর পূজা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে রয়েছে, সেখানে একটা ঝরা পুষ্পদলও গিয়ে পৌঁছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন হোলো কি না,—চাবাগানের লোকেদের পাল্লায় পড়ে বেচারা যে জিনিষটিকে সব চেয়ে বড় বলে মনে করত সেটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল। এমনি করে সত্য একদিন তার রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে এসে সুমুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "যাকে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীর আর সব ভাল জিনিষকে ভুলতে বসিছিলি—আজ তাকে ভেঙ্গে চুরে একবারে তচ্ নচ্ করে দিয়েছি, কিন্তু তার জন্যে একটুও আক্ষেপ করিস নে! বাইরের এই যে শুচিতা একে নষ্ট করে দিয়েছি কেবল ভিতরের শুচিতাকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে। আমার এ রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ভয় খাস্‌নে। এ রুদ্রমূর্ত্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যে জিনিষটি—তা ধ্বংস নয়—বরাভয়।

তার পর কানাইবাবার চরিত্র। এ চরিত্রটি আমার কাছে একটা জীবন্ত

allegory র মত ঠেকে। এই মানুষটি যেন মানুষের ভিতরকার সেই অন্তরতম শাশ্বত সুরটি যা সংস্কারের খাপছাড়া এবং বেসুরা কোলাহলের মধ্যেও কোন দিন বেসুরা হয়ে বেজে উঠেনা। এঁর জীবনটা যেন সংস্কার এবং সঙ্কীর্ণতায় এই এপারের জগতটার মধ্যে থেকেও কুমুদিনীর মত ওপারের ঐ উদার এবং স্বচ্ছ আলোর জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে—নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। এক্স-রে দিয়ে ডাক্তারেরা যেমন মানুষের শরীরের ভিতরকার বীজাণুটাকে পর্য্যন্ত দেখে নেন, ওপারের ঐ তেজালো আলোটা দিয়ে বাবাজী তেমনি মানুষের মনের ভিতরকার অতিবড় সূক্ষ্ম পাপের বীজটি পর্য্যন্ত খুটিয়ে দেখতে পান। বড় ভাই ছোট ভায়ের কাছ থেকে জোর করে তার "নববৃন্দাবন" ব'লে সখের বাগান এবং দেবমন্দিরটি কেড়ে নিতে চান। আমরা ভাবলুম, কি ভয়ানক অত্যাচার!—এ কখনই হতে পারে না. বেচারা এ অত্যাচার সহ্য করতে যাবে কেন?—সে না দিয়ে ভালই করেছে।—এ হোলো এ পারের আলো দিয়ে দেখা। কিন্তু ওপারের ঐ এক্স-রে দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে বাবাজী বল্লেন, "না আমার মনে হয় দিয়ে দেওয়াই ভালো; একটা জিনিষ যদি অপরের মনে হিংসার উদ্রেক ক'রে তোলে, তাহলে সে জিনিষটার দিকে না চেয়ে যাতে সেই জিনিষটার জন্যে অপরের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি না জেগে উঠতে পারে তারি দিকে চাওয়া ভাল নয় কি?—ওটা তোমার দাদাকে দিয়েই দাও—তা হলে আর কোন গণ্ডগোলই থাকবে না।"

মোট কথা বই খানি ঠিক সাধারণ উপন্যাসের মতন হয় নি। অনেক নভেল আছে যাদের উদ্দেশ্য কেবল রসসৃষ্টি! আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে যা রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানান সমস্যা (Problem) খাড়া করে তোলে। এই উপন্যাসটি সমস্যা প্রধান এবং সেদিক থেকে আমার মনে হয় এর মূল্য খুব বেশি।

পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল

কবি কালিদাস রায়ের কবিতার বই কয়খানি পেয়েছি, তাদের নাম পর্ণপুট, বল্লরী ও ঋতুমঙ্গম। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রামপ্রসাদ কমলাকান্তের ভাবমাধুরীতে বাঙ্গলার আকাশ মধুমান হয়ে আছে, এ দেশের মাঠ ঘাট ফল শস্য জল বাতাস কবিচেতনার চিদঘন রূপ। বাঙলায় তাই এত কবির ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে "কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো", সবারই

মাঝে কিছু না কিছু সুর আছে, সবারই প্রাণ এই হরিত শ্যামা মাটির ডাকে পাগল করা। কালিদাসের কবিতার প্রথম ও প্রধান গুণ স্বচ্ছতা—যেন ঝরণার টলটলে স্বচ্ছ বিমল কাকচক্ষু জল ঝির ঝির ঝির ঝির করে ব'য়ে চলেছে। এ গুণ পূর্ণ শোভায় মৌলিক মাধুর্য্যে ছিল বড়াল কবির বাঁশীর তানে, এ যেন—

কানুর বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে?
কি গুণ জানেরে বাঁশী কি গুণ জানে!

এ কবি নিবিড়ের কবি নয়, দিব্য ঘরের সেই. সবরসের রস -মিষ্টিক কবির সেই ঋষি দৃষ্টি কালিদাসে নাই। ভাবের কারুময় মর্ম্মর মাধুরীও তেমন জম্‌কালো শোভায় পর্ণপুটে নাই, মধুসূদনের "মধু হতে মধুতর" ঝঙ্কার, রবীন্দ্রের সে "অনন্ত ভুলের মদিরা পিয়া" বীণার মীড় কিছুই নাই। কিন্তু এত নাই নাই, এত দীনতা নিঃস্বতার মাঝে আছে অনির্ব্বচনীয় তাহাই যাতে সামান্য সিউলী বসরা গোলাপ কি শতদল শোভাকে হারিয়ে দেয়। এক কথায় এ কবি বড় নয়, ছোটর মাঝে এর একটুখানি নিজস্ব স্বভাব শোভা একরত্তি সুবাস, নগন্যেও একটু স্নিগ্ধ সরস রূপ আছে যা জগতে আছে বলে সান্তের বুকে অনন্ত দোলে, যাতে প্রতি অণুর মাঝে অসীম রাজে বলে মায়ার টানে এ গণ্ডগোল বাধে।

"ছোট হয়ে তুমি বাধালে গোল"

* * * *

ঝরে পড়ে বলি তাই অনুপম
মরমী বুঝে রে ফুলের মরম,
বিন্দু বলে কি সুখ ধরে কম
রমণীর আহা নয়ন জল!

—— ——

জাগৃহি।

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ)

(১)

জেগে উঠে মোর মন,
এ নব আলোক-উৎসব মাঝে
জাগো অন্তর ধন।
একি আনন্দ ভুবনে-ভবনে,
তরু বীথিকায় আকুল পবনে,
সাগরের বুকে—ফুলের নয়নে,
একি মধু-জাগরণ!
নবরূপে আজ সবার মাঝারে
প্রকাশিলে নারায়ণ!

(২)

এ নব আলোকে আজি,
অন্তরবাসী বন্ধু আমার—
উঠ গো নয়ন মাজি।
মুছে ফেল লোর—ঘুচুক্ বেদন,
টুটুক্ শঙ্কা—শোক-আবরণ,—
করমের শাঁখ ওই শোন মন,
উঠিছে সঘনে বাজি;
কর্ম্মশালার এ মহাযজ্ঞে
জেগে উঠ মন আজি।

(৩)

ওরে মোর বীণা খান!
নবীন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
সঙ্গীত কর দান

"সবই সুন্দর—সবই মধুময়,
মহাজননীর সকল তনয়
একই রাখী-ডোরে বাঁধা যেন রয়,'
ধরার এ মহাগানে—
ঝঙ্কৃত হোক্ সব তারে তোর
"ওরে মোর বীণা খান !

(৪)

ওগো সুন্দরতম !
লহ হৃদয়ের প্রীতি-বন্দন—
পূজা আয়োজন মম।
সত্য রথের হে মহা-সারথি,
মানব সঙ্ঘ জানায় প্রণতি,
যাচিছে করুণা—চাহিছে শকতি
তৃষিত চাতক সম ;—
সত্যের পথে জাগাও সবারে
ওগো সুন্দরতম !

চিঠির গুচ্ছ

২ দফা

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(১)

নরেশ,

এই ত জীবনের নতুন পর্য্যায় সুরু হয়ে গেল। যে দায়িত্বকে চিরদিন ভয় করে এড়াতে চেয়েছি—সবাই মিলে তোমরা আমার ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিলে তবে ছাড়লে। বিয়ে করলুমই। এজন্য অবশ্য আমি এখন এতটুকু দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই।

ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, যে সকলকে তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেও তুষ্ট করতে পারে না। আমার বেলায় এ কথা খাটল না দেখছি। পিতা এত-

দিনে তাঁর কর্ত্তব্য-সমাপ্তি হয়েচে মনে করে সুখী হয়েচেন—দাদা, বৌদি, তুমি ও কনক, ছেলে-মেয়েরা সবাই খুসি—আর আমি নিজেও কিছু মন্দ আরাম পাচ্ছিনে।

এ ক'দিন একটা বেদনাই কেবল আমার বুকের মাঝে গুমরিয়ে মরেচে। সে হচ্চে বিয়ের সময় তোমার অনুপস্থিতি। ছেলেবেলা হতে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত জীবনে যতরকম পরিবর্ত্তন হয়েচে, সব সময়েই, তোমাকে আমার পাশে দেখেচি—তাই এবারও বরের আসনে দাঁড়িয়ে সতীর্থদের মাঝে যখন তোমার মুখখানি দেখতে পেলুম না, তখনই বুকটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল। তোমার সেই দিনই ফেরবার কথা ছিল। আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছিলুম। শুভদৃষ্টির আগেও আমার দৃষ্টি চারদিকে তোমারই সন্ধান করছিল - বাসর ঘরে যাবার বেলায়ও একবার তোমার খোঁজ নিতে ভুলিনি।

পরদিন সকালে তোমার টেলিগ্রাম পেলুম যে, তোমার মাতামহীর মৃত্যু-শয্যা ছেড়ে তুমি আসতে পারবে না। আমার এখনো সময় সময় বুড়ীর ওপর ভারি রাগ হয়। পুরো আশী বছর সুস্থ শরীরে বেঁচে থেকে ঠিক ওই সময়টায় তার ব্যামো হোল কেন? আর ব্যামোই যদি হোল, তা' হলে দুটোদিন আগে মরলেও ত তার কোন ক্ষতি হোত না। তা হলেও ত তুমি আসতে পারতে।

বিয়েতে কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে কলকাতায় যারা থাকে, তারা প্রায় সকলেই এসেছিল এবং নানা রকমে আমায় বিব্রত করে তুলেছিল। তারপর দিন ছিল এদের উপহার দেবার পালা। উপহারের জিনিষগুলো আমি একটু বেশ নজর করেই দেখেচি। কারণ, ওই দিয়ে উপহার দাতৃগণের মনের ভাব অনেকটা বোঝা যায়।

ফ্যান্সি জিনিষ যারা দিয়েচে, তাদের রুচি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই—যারা বই দিয়েচেন, তাদের মাঝে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। মেয়েদের যারা সীতা সাবিত্রীর মত হতে দেখতে চান, তাঁরা রামায়ণ মহাভারত এবং পতিব্রতা গ্রন্থমালা উপহার দিয়েচেন। যাঁরা কাব্যরসিক, তাঁরা দেশীয় বিদেশীয় কবিদের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ দান করেচেন; আধুনিক ভাবের ভাবুক যাঁরা, তাঁরা য়ুরোপের ও এদেশের নবীন সাহিত্যিকদের নাটক নভেল দিয়েচেন; শুশ্রূষা, ধাত্রীবিদ্যা, পাকপ্রণালীও পাওয়া গেছে। একজনা আবার দিয়েচেন

ছেলে-মেয়েদের দুধ খাবার একটা ফিডিং বটল আর একখানা হাসিখুসী। কাগজের লেবেলে তার ওপর লেখা আছে—"প্রত্যাখ্যান করবেন না, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" ম্যাডোনার ছবিও একখানা পাওয়া গেছে।

নারীকে বাংলার তরুণেরা কে কি মূর্ত্তিতে দেখতে চান, এই উপহার নির্ব্বাচন দেখে তা অনেকটা বোঝা যায়।

আমি বুঝতে পারচি এ সব-কথা শুনতে তোমার ইচ্ছে ততটা হচ্চে না, যতটা কৌতূহল হচ্চে নব বধূকে জানবার জন্য। এ বিষয় আমি আজও কিছু তোমায় বলতে পারলুম না—হতাশ হয়োনা, সবই জানবে।

বিয়ের পর দশদিন একসঙ্গে ছিলুম। কনক আর বউদি ফন্দী খাটিয়ে আমাদের এক ঘরে বন্দী করে রাখত দিন ও রাত্রির বেশির ভাগ সময়টাই তখন যে আমরা চুপটি করে বসে একে অন্যের দিকেই চেয়ে থাকতুম, তা নয়; কথাই বলতুম। এত কথা কি যে বলেচি, তা কিন্তু আমার মোটেই মনে নেই।

একদিন রাতদুপুরে দরজায় বার বার আঘাত শুনে, দোর খুলে দেখলুম—বৌদি আর কনক দাঁড়িয়ে। হেসে বৌদি বল্লেন—"এমন রাতগুলো নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিচ্ছ!"

তারপর চারজন মিলে কত রকম গল্প করলুম—ফিরে যখন শোবার উদ্যোগ করলুম, তখন চারটে বেজে গেছে। এ-কদিনে এইটুকুই শুধু জানতে পেরেচি যে, নীহার লোকটি মন্দ নয়। এর বেশি কিছু জানতে চাইলে কনককে জিজ্ঞাসা করো—তার সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেছে।

এখন, নীহারের কাছে আমি কি কতখানি প্রত্যাশা করি, সেটা তুমি বোঝা পড়া করে নিতে চাও। দাবী আমি তার কাছে কিছুই করব না—কারণ, ও জিনিষটা দুনিয়ায় যত কম করা যায়, ততই সুখে থাকা যায়।

প্রত্যেক মানুষেরই যে একটা স্বাতন্ত্র্য বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আছে, তা বর্জ্জন করতে বলা আমার অভ্যাস নয়।

নীহারের কাছে আমি ততটুকুই চাইব এবং ততটুকু পেয়েই তৃপ্ত থাকব, যতটুকু সে স্বেচ্ছায় আমায় দেবে। যদি এমনও হয় যে তার দান আমার পাবার আকাঙ্ক্ষা মিটাতে পারে না—আর তাতে যদি আমি ব্যথাও পাই, তা'হলেও জোর করে কখনো তাকে এমন কথা বলব না যে, এটা তোমাকে করতেই হবে।

কনককে বউদি হয়ত এতদিন ছেড়ে দিয়েচেন। সে কেমন আছে? তাকে চিঠি লিখতে বলো।

তোমাদের

মোহিত।

(২)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রিয়তমে এডি,

সহপাঠীদের মধ্যে তুমিই একমাত্র বিদেশিনী যে ঘৃণা করে আমাদের কখনো দূরে রাখবার চেষ্টা করনি। রংএর তফাৎ ও জাতি বিচার না করে একা তুমিই ভালবাসার ডোরে আমাদের বেঁধে নিয়েছিলে। তাই বিয়ের সময় তোমার অভিনন্দন পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আমার নতুন জীবন যেমন শান্তিময় হোক বলে তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেচ, তোমার জীবনও তেমনি শান্তিময় হোক, তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা।

আমার স্বামী সে একজন এম-এ এবং কলেজের অধ্যাপক, একথা জানতে পেরে, তুমি লিখেচ, খুবই খুসী হয়েচ। কেবল তোমার না-কি আশঙ্কা হচ্চে যে, কূট গবেষণায় যার ললাট সর্ব্বদাই কুঞ্চিত থাকে, মাথার চুলগুলো যার যত্নের অভাবে অকালে শুক্ল হয়ে যায়, যার পরিচ্ছদে পারিপাট্য নেই, সুখাদ্যে রুচি নেই—জীর্ণ পুঁথির পাতা ওল্টাতেই যে পরম আনন্দ লাভ করে, সে রকম লোক আমার মত ফুটনোন্মুখ পুষ্প-কোরকের মর্ম্ম গ্রহণ করতে অক্ষম হবে।

অধ্যাপক সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা খুবই মজাদার সন্দেহ নেই কিন্তু আমার স্বামী এখনও তেমন পাকা অধ্যাপক হয়ে উঠতে পারেন নি। সবে কলেজ হতে বেরিয়েচেন, কাঁচা বয়স, আমার চাইতে মোটে দু'বছরের বড়— চুল ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বেশ, দাড়ী গোঁফের উৎপাত নেই, আহারেও একটু অতিরিক্ত রুচির পরিচয় পেয়েছি, গায়ের রং আমার চাইতে কিছু কালো —কিন্তু কালো রংটা তোমরা যত বিশ্রী মনে কর, আমরা তা করিনে। বেশ সুন্দর চেহারা। কাজেই তুমি আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ যে আশঙ্কা করেচ, তা অমূলক জেনে নিশ্চিন্ত হয়ো।

তারপর, তুমি যে প্রশ্ন করেচ তার জবাব চাও, কেমন? তুমি জিজ্ঞাসা

করেচ, স্বামীকে ভালবাসতে পেরেচি কি-না। হাঁ পেরেচি বৈ কি? নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন বুকে অত ব্যথা পেলুম কেন? আর এখনই কেন বা যখন তখন প্রাণটা এমন হা-হা করে কেঁদে উঠে?

শুনে তুমি বিস্মিত হচ্ছ ভাবচ আমি একটি জানোয়ার। আগে হতে জানা-শুনা নেই - হঠাৎ একদিন এসে অগ্নি স্পর্শ করে তিনি বল্লেন আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলুম, আর আমিও অমনি আমার দেহের ও মনের সকল সত্ত্ব তাঁকে সমর্পণ করে বলে উঠলুম—তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার জাগ্রত দেবতা। আমি যেন আমার যা কিছু সব মুঠোর ভিতর নিয়ে বসেছিলুম, যে কেউ চাইতে এলেই সব দিয়ে ফেলব মনে করে।

হয়ত তেমন করেই বসেছিলুম। ভালবাসা জিনিষটা যখন আমাদের বুকে জমে ওঠে, তখন সে-টাকে দিয়ে ফেলতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। সকল দেশের তরুণ তরুণীর হৃদয় এক সময় এতে করে টলটল করে নেচে ওঠে॥

যারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখতে অভ্যস্থ, তারা ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করেই আত্মীয় স্বজনের মাঝে আপনাকে অন্তরের এই ভালবাসা বিলিয়ে দিয়েই নিঃস্ব হয়ে পড়ে আর তার চাইতে উদার যারা তাদের এই ভালবাসা সমগ্র বিশ্বের বুকের উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে চলে যায়।

আমরা হচ্চি প্রথম শ্রেণীর লোক। আমাদের ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় নিতান্ত আপন দু'চার জনকেই দান করে। দিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি এবং দান করেই তৃপ্ত হই। কৈশোর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দান করবার আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের অন্তরে প্রবল হয়ে ওঠে—তখন হতেই আমরা আগ্রহ সহকারে তারই প্রতীক্ষা করি, যে আমাদের এই দান গ্রহণ করবে।

তোমাদের সমাজে মেয়েদের নিজেদেরই এই দানের পাত্রটিকে খুঁজে পেতে বার করে নিতে হয়, আর আমাদের আজন্ম সংস্কার যে, পিতা বা অভিভাবক যাকে নির্ব্বাচণ করবে, সেই-ই উপযুক্ত আমাদের এই দান গ্রহণ করতে। তাই, পূর্ব্ব হতে পরিচয় না থাকলেও, বিবাহের পরই আমরা স্বামীকে ভালবাসতে পারি। শেষটায় যে বুঝতে পারে যে, স্বামী তার ভাল লোক নন, অথবা ভালবাসার প্রতিদানে যে পায় শুধু লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতন, তার চিত্তের ভাল-

বাসার উৎস একেবারেই শুকিয়ে যায়। এমন অবস্থায় তোমরা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাও—আর আমরা পদদলিত কর্দ্দমেরই মত পায়ের তলায় লেগে থাকি।

শুনে হয়ত বিস্মিত হবে যে, আমার স্বামী বিয়ের দশদিন পরেই লাহোর চলে গেছেন, আমায় এখানে রেখে। মাস খানেক পর কিছুদিনের জন্য কর্শিয়াং যাব, তারপর হয়ত লাহোর যেতে হবে। তোমাদের কিন্তু বিয়ের পরই স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামী অন্যত্র গেলে স্ত্রী নিজেকে অপমানিতা বলে মনে করে কিন্তু আমরা স্বামী-বিরহে ব্যাথা পেলেও, সে-টা সয়ে নিতে পারি। কারণ, স্বামীকে অবলম্বন করে আমাদের এই যে নতুন সংসার গড়ে ওঠে, তার প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে বলেই আমরা মনে করি।

তুমি ভাবচ, আমায় কন্‌ভেণ্টে পড়া ব্যর্থ হয়েচে। আমি লেখাপড়া শিখে, সাত আট বছর তোমাদের সঙ্গে থেকেও যে পুরাতন নিয়মের বন্ধন ছিঁড়তে পারিনি এটা তোমায় খুবই বিস্মিত করে তুলেচে। আমি কিন্তু মনে করি তোমাদের ওখানে পড়া আমার সার্থকই হয়েচে। ওখানে না পড়লে, তোমাদের সঙ্গে না থাকলে, তোমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার আমি জানতে, বুঝতে পারতুম না।

আমি উৎকট রক্ষণশীল নই—পরিবর্ত্তন প্রয়াসী ; কিন্তু তোমাদের ভালটুকু নেব বলে মন্দখানি না নিয়ে বসি, সেই দিকেই আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করি।

আমাদের দেশের নারীর দুঃখ ও দৈন্য যে, কেবল বেড়েই চলেছে, তা আমি সকল সময়ই অনুভব করি—বিশেষতঃ তোমাদের সঙ্গে যখন নিজেদের তুলনা করে দেখি।

তোমরা মুক্ত—আমরা পিঞ্জরে আবদ্ধ। তোমরা শক্তি স্বরূপিণী আমরা অবলা, তোমরা সুস্থদেহে প্রফুল্ল মনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কর—আমরা রোগে ভুগে বিষন্ন প্রাণে সংসারের দেনা আর দৈন্য বাড়িয়ে তুলি।

তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, এ সব জেনে বুঝেও কেন আমি পিঞ্জরের ভিতর স্বেচ্ছায় প্রবেশ করলুম। এ প্রশ্ন নিজেকে নিজেই আমি বার কত জিজ্ঞাসা করেচি। সত্যিই ত, বিয়ে কেন করলুম!

না করেই বা করতুম কি? আমার প্রাণ যে চেয়েছিল ভিন্ন একটা আশ্রয়। তা'ত উপেক্ষা করে থাকতে পারতুম না। তুমি বলবে আমি

পারতুম একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে যাতে মেতে উঠে দেশের মেয়েরা তাদের পায়ের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলত। না-না, আমি তা পারতুম না। তার জন্য যে দুর্নিবার শক্তির আবশ্যক, তা আমি কোনদিন অনুভব করিনি। আর আমার বিশ্বাস বাহির হতে মেয়েদের বন্ধন ঘুচাবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে, যদি না আমাদের ভিতরেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

স্বামীর সঙ্গে অল্প কদিনের পরিচয়েই বুঝতে পেরেচি যে অমঙ্গলকে নাশ করতে তিনি নির্ম্মম বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। আমি কিন্তু তা পারিনে।

আমার সত্যিই বড় মায়া হয়। পরিবর্ত্তন যারা সইতে পারবে না, তারা যে বড় ব্যথা পাবে।

আশা করি তোমরা বেশ ভালোই আছ। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে।

তোমারই স্নেহের
নীহার।

(৩)

স্নেহময়ী বউদি,

তোমাকে বউদি বলে ডেকে আমার তৃপ্তি হয় না—সে যেন নেহাৎ পর পর বলে মনে হয়। যদি কিছু মনে না কর, আমি তোমায় নীহারই বলব আর তুমিও আমার নাম ধরেই ডেকো। কেমন, রাজী আছ ত?

বর্দ্ধমানের কোন ব্যক্তি বিশেষের কষ্ট হচ্চে বলেই, আমি তোমায় ছেড়ে চলে এলুম, নইলে আরো কটা দিন থাকবার ইচ্ছে ছিল। দূরে চলে এসেছি বলেই তোমাদের কনককে ভুলে যেয়োনা ভাই, নিয়মিত চিঠি পত্র লিখো। আমার আপনার জন কেউ যে নেই তা'ত তোমায় বলেচি।

আসবার আগের দিন প্রসঙ্গক্রমে তুমি আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্দ্দশার কথা বলছিলে। আমি কিন্তু আগে স্বীকারই করতুম না যে, সত্যিই আমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়ে থাকে। এখানে এসে একটি মেয়ের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী শুনে আমি মনে করি কোথাও কোথাও সত্যিই হয়ত পুরুষের পীড়ন ও নির্য্যাতন মেয়েদের জীবন ব্যর্থ করে দেয়। আমি তেমন শিক্ষিতাও নই—দেশ বিদেশের মেয়েদের অবস্থাও কিছু জানিনে,

কাজেই তাদের তুলনায় আমরা সুখে কি দুঃখে আছি, তা বলতে পারিনে।

আমি কল্পনাও করতে পারিনে যে, মেয়েদের অবস্থাটা ঠিক কেমনটি হলে আর অভিযোগ করার কিছুই থাকে না। মানুষ যতদিন না দেবতা হবে, ততদিন তাদের অবিচার অত্যাচারও ঘুচবে না। কেবল পুরুষই যদি মেয়েদের প্রতি অবিচার করত, তা হলে হয়ত বলা চলত যে, মেয়েদের স্বাধীনতা হলেই সে সব ঘুচে যাবে—কিন্তু মেয়েরাই যদি মেয়েদের মর্য্যাদা না বুঝে অমানুষিক অত্যাচারে তাদের পীড়ন করে, তা'হলে প্রতিকারের আশা কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সব সংসারে পুরুষের চাইতে বধূদের সঙ্গে মেয়েরাই বেশি দুর্ব্যবহার করে থাকে। তারপর আমরা যা করচি, তার চাইতে বেশি কিছু কি সত্যিই আমরা করতে পারি?

তুমি এ-সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেচ, আমায় যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পার ভাই, তা হলে সে পথ ধরে চলতে আমার অমত হবে না।

তাই বলে এখানকার এই গরীব বেচারাকে ছেড়ে আমি কিন্তু কোথাও যেতে পারব না। লোকে ডুবু ডুবু হবার সময় যেমন স্রোতে ভাসা তৃণগাছি পর্য্যন্ত জড়িয়ে ধরে, তেমনি কি যেন একটা ভাবের বন্যায় পড়ে তিনি আমার মত অপদার্থ এই নারীকেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েচেন—কূল পাবেন কিনা জানিনে—আমার কিন্তু ভাই বড় মমতা দাঁড়িয়ে গেছে।

দেশের পুরুষদের কথা ভাবতে গেলেই আমার এই স্বামী বেচারার কথা মনে পড়ে। তাই আমি পুরুষকে সত্যি সত্যিই নির্ম্মম অথবা স্বার্থপর বলে ভাবতে পারিনে। ও জাতটা যে আকাশের মতই উদার, তার দৃষ্টান্ত আমার এত কাছে থাকতে আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারিনে। হয়ত তুমিও পারবে না।

দাদার মনের ভাব স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও আভাস কিছু পেয়েচ। তাতে করে কি সত্যিই তুমি বলতে পার যে, পুরুষেরা স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচেতা আমাদের চেপে রেখে নিজেরাই প্রভুত্ব করতে চায়।

দাদা তাঁর বন্ধুকে যে চিঠি লিখেচেন, তাতে জানলুম যে, তুমি নাকি তাঁর চিত্তটা তোল পাড় করে দিয়েচ। আজ এই পর্য্যন্ত—

তোমাদের কনক।

শাস্ত্র বিচার।

[দরবেশ।]

শাস্ত্র আছে ব্যস্ত সদা
অস্তি-নাস্তি লয়ে;
তোমার পূজন বিধান তাহার
অমঙ্গলের ভয়ে।
লয়ে খানিক বিধি-নিষেধ,
কতই তাহার নিষ্ফল জেদ,
আমার কেন মিটেনা খেদ
শাস্ত্র-বচন কয়ে!
চিত্ত-বেদের গোপন পত্রে
সহজ ভাবের তুলি,
লিখেছে যে সরল সত্য
শিখাও গো সেই বুলি
শাস্ত্র মেনে তোমার সাধন,
সে যে কঠিন নিগড় বাঁধন,
সুখে দুঃখে তোমার দাদন
উঠুক সমান হয়ে।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের কথা।

৫

কাজটা নিয়েই আমার দু'রকমের ভয় হয়েছিল। একটা হচ্ছে, একাজ পারব কি না। আর একটা ভয় হয়েছিল যে কিসের, তা প্রথমটা খুব খোলসা

করে ধরতে পারিনি। কিন্তু যখন ধরতে পারলাম, কিসের ভয়, তখন ভয়ের কারণও পালিয়েছে। ব্যাপার দুটোর প্রথমটী এই :—

কাজটা ঘাড়ে নিয়ে, ভয়ে ভয়ে সারদাপুরের রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিতেই দেখি, আমার জন্যে জমিদারের গাড়ী এসে উপস্থিত এবং এমনি আদর করে কর্ম্মচারীরা আমায় ডেকে নিলে, যে জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানা পৌঁছাতেই আমার অর্দ্ধেক ভয় কেটে গেল। মন বল্লে, "নাঃ এদের ভয় করবার কিছু নেই।"

তার পর দু চার দিন সুস্থ হয়ে বাসায় বসতে না বসতেই মালিকেরা আমায় ডেকে পাঠালেন, এবং এমন অদ্ভুত ভাবে পর্দ্দার আড়াল হতে আমার ওপর হুকুম জারির সঙ্গে উপদেশ এমন কি মৃদু তিরস্কার পর্য্যন্ত বেরিয়ে এল যে আমার প্রথম ভয়টা এক নিমেষেই লজ্জায় পালিয়ে গেল। আর এটাও ত' সত্য যে জলের মাছ জলে পড়লেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করে অবশ্য যদি সে একেবারে না মরে গিয়ে থাকে। আমি মরিনি তাই এই অনভ্যস্ত কাজেও প্রথম দিন হতেই হারিনি।

যাক, আমি যখন সদর কাচারির পেছনকার ঘরের পর্দ্দার সুমুখে এসে দাঁড়ালাম, অমনি ভেতর হতে মধুর স্বরে হুকুম এল, "ঐ চেয়ার খানায় বসুন।"

আওয়াজ শুনেই কাণ জুড়িয়ে গেল, ইচ্ছে হল পর্দ্দাটার নীচে একটা প্রণাম ঠুকি, কিন্তু পারলাম না। বোধহয় অনভ্যাসে, কিম্বা হয়ত সঙ্কোচে, অথবা হয়তো তখনো এই চাপকান চোগার অন্তরালে সন্ন্যাসীটা লুকিয়ে বসে ছিল।

যে কারণেই হ'ক নমস্কার করা হল না। কিন্তু ভেতর হতে শব্দ হল, "আপনি ব্রাহ্মণ, শুনিছি আমাদেরই স্বজাতি, আপনাকে নমস্কার করছি। আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি চটকরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "আশীর্ব্বাদ করব, কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ?"

ভিতর হতে একটা মৃদু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর শব্দ শুনলাম, "আশীর্ব্বাদ করতেও জানেন না ? তা হলে এতবড় এষ্টেট চালাবেন কি করে ?"

আমি মাথা চলকিয়ে বললাম, "দেওয়ানজী বলেছেন চালিয়ে নেবেন,

"তা হলে, প্রথম থেকেই ভুল শুধরে দিতে হবে দেখছি—আপনি একলা এসেছেন কেন? ঐ অত বড় বাড়িটা কি আপনাকে একলা থাকবার জন্য দেওয়া হয়েছে? কেবল চাকর বামুনের হাতে আপনাকে আমরা ফেলে রাখব কি করে? উর্ম্মিলা দিদি পিসীমা দুজনেই বলে দিয়েছেন যে আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদের না নিয়ে আসেন তা হলে এ বিদেশে আপনার মন টিকবে কি করে? মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করবেন কি করে? চুপ করে রৈলেন যে? একলা এই বিদেশে আসা কি আপনার ভুল হয়নি?"

একলা! বিদেশে! ওগো অপরিচিতা, ওগো অন্তরালবাসিনী! তুমি যদি জানতে যে, তোমাদের এই আশ্রয়প্রার্থীটী কতখানি একলা! আর তার স্বদেশকে পাবার জন্য তার মধ্যে যে কত হাহাকার তা কি অনুভব করতে পারবে?

যাক, আমি অবাক হয়ে এই অপরিচিতার পরিচয়ের সঙ্গে এই অদ্ভুৎ সম্ভাষণের ভঙ্গীর মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলাম। তাই তিনি যখন বল্লেন, "চুপ করে আছেন কেন?" তখন আমি চমকে উঠে বল্লাম, "ছেলে মেয়ে আমার কেউ নেই, এক আছেন মা,—"

"কেউ নেই! ছি ছি শীগ্গির মাকে আনতে পাঠান। আজই চিঠি লিখে দেন, না হয় নিজে যান। না—এমন করে আপনার থাকা হবে না।"

আহা! কে গো করুণাময়ী, এই অপরিচিতকে অন্তরালে থেকে এমনি করে সহজেই আপনার করে নিলে! কেগো এমনি করে আমায় আমার স্বকৃত মরুভূমি হতে এক নিমেষে অনায়াসলব্ধ ওয়েশিসে পৌঁছে দিলে! ওগো তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব? তুমি যেখানে আছ সে স্থান বুঝি একেবারে কমলালয়, একেবারে পূর্ণের দেশ! ওগো অন্তরালবাসিনী, তুমি অন্তরালেই থাক, আর যেখানেই থাক, তবু তোমায় না জেনেই জানলাম, না চিনেই চিনলাম, না দেখেই দেখলাম।

আমি কোনো উত্তর করলাম না বলেই বোধ হয় পর্দ্দাখানি নড়ে উঠল, এবং দুখানি চরণকমল পর্দ্দার নীচে দেখা গেল। বোধ হয় যেন পর্দ্দা ভেদ করে সেই অপরিচিতা আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার মধুর স্বরে হুকুম এল, "আপনি মাকে চিঠি লিখবেন ত? দেরী করবেন না ত'।"

না দেরী না, দেরী করা আর হবে না। কি করে দেরী করব? এমন

স্থানে এমন আদরের মধ্যে মাকে যে আমার আর না হলেই নয়। মাকে আর দূরে রাখব কি করে?

আমি বল্লাম, "আমি আজই পত্র লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তিনি—"

"তিনি আসবেন না? ছেলে ফেলে দূরে থাকবেন? তা কি কখন হয়?"

"গঙ্গাহীন দেশে—"

"গঙ্গাহীন দেশ—হ'লই বা গঙ্গাহীন দেশ কিন্তু ছেলেকে ফেলে কি করে তিনি থাকবেন? ছেলের চেয়ে গঙ্গা বড়! না—না সে হবে না, আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন, নইলে যা শুনিছি তাতে বুঝছি যে আপনি এ রকম করে থাকলে বাঁচবেন না—অন্ততঃ বেশীদিন এখানে টিকতে পারবেন না।"

আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত মানুষটী অন্তরাল হ'তে আমার কতখানি লক্ষ্য করেছে। না জানি এর দৃষ্টি কতদূর যায়!

আমি অবাক হয়ে সেই কাঠের চেয়ার খানার ওপর কাঠের মত বসে রৈলাম। তারপর দেখলাম পা দু'খানি হঠাৎ সরে গেল অনুভব হ'ল যেন কে আর একজন ঐ ঘরে এলেন। তিনি এসেই বল্লেন, "বাবা, তোমায় আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে ডাকিনি, কারণ সে বিষয়ে দেওয়ানজীই তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন। আর তুমি শুনিছি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী মানুষ—অবিনাশ বাবু উকিল তোমার বিষয় অনেক কথাই লিখেছেন। তাই বিষয় সম্বন্ধে আর কি বলব? কিন্তু, বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের আগে চোখে পড়ে যারা আমাদের কাছে এসে পড়েছে তারা কষ্ট পাচ্ছে কিনা সেই দিকে। আমি শুনলাম, তুমি নিজে হাতে সব কর, চাকর বামুনদের কিছু করতে দাও না। তারা মুস্কিলে পড়ে আমার কাছে এসে জানিয়েছে। এ রকম করলে ত' চলবে না বাবা। কেন ওদের কাজ করতে দাও না?"

আমি হেসে ফেল্লাম, কিছু বল্লাম না—অমনি সেই আর একটী মধুর স্বরের মানুষটীর রাগের সুরে শব্দ হল, "না পিসীমা ও রকম মানুষ নিয়ে চলবে না, ওঁর মা আছেন, হয় তাঁকে উনি নিয়ে আসুন—না হয় আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে এসে রোজ প্রসাদ পেয়ে যান। অমন করে উপবাসী হয়ে থাকবার কারো অধিকার নেই, তাতে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে!"

মা বল্লেন,—মা! হ্যা তাইত—মা বল্লেন "কেন বাবা, তোমার চাকর বামুনদের খাটতে দাওনা? বিছানায় শোও না—খাওনা দাওনা, কেবল চুপ করে কি ভাব?"

এ কথার কি উত্তর দেব? আমি এসিছি সন্যাসী-মহারাজগিরি ছেড়ে চাকর হতে, আমার আবার চাকর! কিন্তু এ কথা কি এরা বুঝবে? আর সে কথা বলেই বা কি হবে? তাই মৃদুস্বরে বল্লাম, "আমি সামান্য মানুষ—আমার কিই বা কাজ আছে যে ওরা করবে?"

কিন্তু একথা হতে নানা কথা, নানা অনুরোধ উপরোধ দেখা দিল। এবং তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কি করে? অতি সহজে। বন্ধু অবিনাশ এবং আরও কে কে গিয়ে মাকে যখন বুঝিয়ে দিলে তখন আর কি তিনি থাকতে পারেন? তিনি সব ফেলে চলে এলেন। আমিও মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম—

"বেশ করেছ মা—ছেলের চাইতে কি বিষয় বড়? ওরা চাচ্ছে তাই নেক গিয়ে, তুমি ছেলে চাচ্ছ তাই নাও।

মা ত কেঁদে কেটে আদর আব্দারে আমায় ডুবিয়ে এই এত বছরের বিরহের দুঃখ এক মুহূর্তে মুছে ফেললেন। আমিও তাঁর কোলে মাথা রেখে কত কাল পরে ঘুমলুম। আঃ সে কি ঘুম! হাজার বছরের জমাট নিদ্রা আমার প্রাণের ওপর যেন চেপে বসল—আমি কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সব ভুলে মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে রৈলাম। যে ঘুমকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম সে আজ প্রতিশোধ নিলে—আমিও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি এতটুকু হয়ে মার কোল জুড়ে অতি সহজেই পড়ে আছি।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখনি অনুভব হল, মা আমার মাথাটা কোলে নিয়েই বসে আছেন এবং মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু তবু উঠতে হল; কারণ এমন ভাবে পড়ে থাকা ত, সহজ অবস্থায় যায় না বিশেষতঃ অপরের সামনে। তাই উঠে বসতেই হল। কিন্তু উঠে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি বুঝি এমনি করে ঘুম থেকে উঠেই দেখবার! এ মূর্ত্তি দেখাই বুঝি ঘুম ভাঙ্গার সার্থকতা! মায়ের অভাবে যে মূর্ত্তি পরদার আড়ালে ছিল, মায়ের মাঝে সেই মূর্ত্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

মূর্ত্তি অপরূপ হাসি হেসে বল্লেন, "আমি, মা এসেছেন শুনেই, দেখতে আসছিলাম, পিসীমা বারণ করলেন। কিন্তু আপনি যে এখনো এত শিশু তা জানলে হয়ত অন্ততঃ মাস খানেক দেরী করে আসতাম!

মা আমার হাসতে হাসতে বল্লেন, "ও আমার, চিরদিনের শিশু—ওযে কি শিশু তা তোমাদের একদিন বলব মা। ওরে প্রিয়, তুই কাছারী যাবি নে?

তোর পেয়াদা যে এসে বসে আছে, কাছারীতে না কি কে সাহেব এসেছে, তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "মা তোমায় যে কথা বলেছি তা যেন ভুলে যেওনা—কথার ঝোঁকে যা' তা' বলে এঁদের ব্যস্ত ক'র না। আমি আসার পর হতেই এঁরা আমায় নিয়ে যে রকম ব্যস্ত হয়েছিলেন তাতেই বলছি যে ছেলের আদর বাড়াবার জন্যে যা' তা' কতকগুলি কথার ঝুড়ি এদের শুনিয়ে কাজ নাই।"

আমার কথার ভঙ্গীতেই বোধ হয় হাসি দেবীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে তারপর মার দিকে ফিরে বল্লেন "এঁর বিষয় গোপন করবার কি কিছু আছে?" মা বল্লেন, "কি জানি মা, ও আমায় ওর বিষয় কোনো কথা বলতে মানা করে দিয়েছে। যাক, ভয় নেই মা, ও যা বলতে বারণ করেছে তাতে এমন কিছু নেই যা তোমাদের ভয় পাবার কারণ হবে।"

হাসি দেবী তবু হাসলেন না। আমিও বেরিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু এই হাস্যযশা হাসিদেবীর ভীত মুখ যেন আমাকেও একটু অস্বস্তি এনে দিলে। মন কেবলি বলতে লাগল—ওগো হাস্যময়ি তুমি হাস! যে হাসি হতে কেউ বঞ্চিত হয় না, সে হাসি হ'তে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

(৬).

এইবার আমার দ্বিতীয় ভয়টা কি এবং কি করে সেটা গেল সেই কথাটী বলব। কিন্তু একথাগুলো বলতে কেমন যেন লজ্জা করছে! লজ্জা! হ্যাঁ লজ্জাই ত--আমি যে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে গিয়েছি, আমার লজ্জা করবে না?

কিন্তু কিসের লজ্জা! লজ্জা এই, যে আমি যাঁর দাসত্ব করতে ফিরে এসেছি, এখানে দুদিন থেকেই বুঝলাম তিনিই আমার এই মালিক—একদিন এক অপূর্ব্ব দিনে অপূর্ব্ব অবস্থায় এঁকেই আজকের এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই চিরান্তরালের বাইরে রাণীরূপেই পেয়েছিলাম। বিশ্বমায়াময়ীর অপূর্ব্ব মায়ায় আজ আমি না জেনে না ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছাময়ীর (আমারই প্রতিষ্ঠিত) প্রতীকের সেবা করতে এসে পড়িছি। জগতের চিরন্তনী ইচ্ছাময়ী যে কি অঘটনঘটন-পটীয়সী তাই দেখতে পেয়ে ভয়ে লজ্জায় আনন্দে আমি একেবারে

এতটুকু হয়ে, এই আমার মন্দিরের দ্বারে এসে পৌচেছি। কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-প্রতীক এখন গোপনতার অন্তরালে লুকিয়েছেন, আমি এখন ই মন্দিরের গোপুরমে দাঁড়িয়ে আঁধার মন্দিরের গোপনতার দিকে চেয়ে আছি। মনে আশা—মন্দিরের দরজা কি খুলবে না—দেখতে কি আর পাব না? তিরস্কারিণীর আবরণ কি সরবে না?

নাই বা সর্লো, তবু জানছি যে তুমি আছ সেই যে যথেষ্ট! গোপন হয়ে আমার মধ্যে আশা জাগিয়ে, ব্যথা জাগিয়ে, আমার সব জাগিয়ে আছ—আছ, এই যে আমার পরম লাভ! একেবারে সমস্ত, অন্তরাল লোপ করে তোমায় পেলে যে সব দুঃখ লোপ পেত, জড় হয়ে যেতাম, না না—তা চাই না। ওগো দয়াময়ি; তোমার এই দুঃখ দেওয়াই যে পরম সুখ দেওয়া। এই ধরা না দিয়ে ধরা দেওয়াই যে পরম আনন্দ দেওয়া। একেবারে মুখোমুখি দেখায় ভয়ঙ্কর সুখ আর চাই না—আমি চাই না। এখন ভুল করতেই শেখাও। সত্যিকে একভাবে খুব দেখে নিয়েছি ভয়ঙ্কর নিয়েছি- সে যে সুখ দুঃখের বাইরে। ওগো, সে সত্যকে, নিয়ে আনন্দ নেই। যে আনন্দের অভাবে আনন্দের তাড়নে একদিন জগৎসৃষ্টি হয়েছিল সেই আদি ভুলে ভুলে থাকতে চাই যে। ভুল? আচ্ছা ভুলই সই,, তবু তাকেই চাই।

কি বলতে গিয়ে কি সব বাজে কথা লিখে ফেল্লাম। এ সব সহজ মানুষের কথা নয় যে। ওকথা আর বলব না—এই কাণ মলছি। ওগো ক্ষমা কর—আর কখন বলব না।

আমি বলছিলাম, যে, আমার ভয় হয়েছিল' যে কোন দিন বুঝি ধরা পড়ে যাব; আমার এই লুকোচুরী বুঝি কোন দিন এঁদের কাছে একেবারে খোলসা হয়ে যাবে, আর আমার এই অপরূপ দাসত্বের খেলা ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু দুদিন "যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, যে না—সে ভয় নেই—কারণ যাকে গর্ভধারিণীই চিনতে পারে নি তাকে কি করে এঁরা চিনবেন?—বিশেষতঃ এই অত্যন্ত সহজ বেশে। প্রথম যখন এঁদের কাছে এসেছিলাম, তখন একেবারে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানাশ্রয়ী সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁরা সেই অসহজ মানুষকে এই সহজ মানুষের মধ্যে ধরতে পারবেন কি করে? তখন ছিল গেরুয়া এখন হয়েছে পেন্টুলান, না হয় ধুতি চাদর, তখন মাথায় ছিল জটা এখন মাথায় আছে টেরী, যেখান শরীরে ছিল দীপ্তি আর শক্তি, এখন সেইখানে এসে জুটেছে কান্তি আর পুষ্টি! এ দেহের মধ্যে তাকে কোথায় পাবে, যাঁকে পাবার জন্যে শুনিছি এই

এত বড় সংসারটা সমস্ত ভারতবর্ষের বৈরাগ্যলোকের ধ্রুবলোকের দিকে চেয়ে বসে আছে। যাকে পাবার জন্য ঐ অত বড় একটা ধর্ম্মশালা হয়েছে—অন্ততঃ যাতে একটী সন্ন্যাসীও যেন দিনান্তে একবার এঁদের চোখে পড়েন। এবং আরও শুনেছি নাকি কে একজন স্বামীজী আজ কত দিন হতে এঁদের ঐ পুকুরটায় দক্ষিণ বাগানের মধ্যে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছেন। তিনি যে কে এখন পর্য্যন্ত তা কেউ জানে না, কেবল একটা সন্দেহ, কেবল একটা 'হলেও হতে পারে' এই আশঙ্কার জোরে তিনি ঠাকুরের মত পূজা পাচ্ছেন। কে তিনি তা জানিনে, জানতে চেষ্টাও করিনি কারণ সহজ মানুষ অসহজ মানুষের কাছে যেতে ভয় পাবে না কি? আমি চাকরী করতে এসেছি, দাসের কি স্বামীর কাছে, অতি কাছে যাওয়া ভাল দেখায়?

আমি স্বামীজীকে দেখতে যাই নি, তার নানা কারণের মধ্যে বড় কারণটা যে কি তা বলব কি? আচ্ছা বলছি, ভাই, কিছু গোপন করব না।

এই যে অদ্ভুৎ অবস্থার মধ্যে এসে পড়িছি এটার মধ্যে ভারি একটা লোভের জিনিষ পেয়েছিলাম। এই যে লুকোচুরী এই যে গোপনতা, এইটাই যেন ভারি একটা লাভ বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই যে প্রভু হবার জায়গায় জেনে শুনে দাস হতে পেরেছি এইটেই যে মায়ের আমার পরমদয়া, পরম স্নেহ দেখান। এ অবস্থা কি সহজে ছাড়া যায়—এই সহজ হবার মধ্যে এসে একটু অসহজ হওয়া এও যে আনন্দের জিনিষ, এও লোভের জিনিষ। আমি যে এখন বড্ড লোভী হয়ে উঠেছি! আমি চিরদিন অসহজকে অভ্যাস করে করে এসেছি কিনা, তাই এখানে এসেও সে আমার অজ্ঞাতে আমায় পেয়ে বসেছে, আমার এই দোষটুকু ক্ষমা কর ভাই। যেটা 'আপসে আতা হায়' তাকে আসতে দিলে কি খুবই দোষ হবে?

আর দোষই বা কি? এখন যদি চট করে বলে বসি, যে তোমরা আমাকেই খুঁজছ—যাকে খুঁজছ সে আর কেউ নয় এই চাপকান চোগা টেরী ছড়ী ধারী আমি, ঐ গেরুয়া জটা চিমটে ধারীর মধ্যে তোমাদের সেই খোঁজার বস্তু নেই, যার মধ্যে আছে তাকে তোমরা ধরেও ধরতে পারনি, পেয়েও পাবে না, একথা এখন বল্লে "এরা কি তা বিশ্বাস করবেন? না করাই ত' সহজ, বিশ্বাস করাই ত' অসহজ। আমি সহজের সেবক হয়ে কি করে সে কাজ করতে দেব এঁদের? আর করতে বল্লেই বা তা এঁরা করবেন কেন? হয় ত বলতে গেলে ফলে আমার এই যে মুফতে পাওয়া 'মস্ত আনন্দটুকু ভোগ করবার উপায় হয়েছে

তাও যে চলে যাবার সম্ভাবনা। না না, আমি বড্ড লোভী ভাই, আমি এ আনন্দের লোভ ছাড়তে পারব না। এই সুখ দুঃখের এই আশা নিরাশার দোলে দোলার আনন্দ হতে তোমরা বঞ্চিত হতে বলোনা। আমি পারব না, কিছুতেই না। যো আপ্‌সে আয়া উসকো আনে দিয়া—আনে দেও ভেইয়া আনে দেও। আওর ইসমে জো কসুর হায় উসকো ভি জানে দেও।

বাধা দেওয়া হবে না, জোর করা হবে না। বাপ্‌রে! আবার জোরা জোরী এই জোরা জোরীতে পড়ে এই ১৫।১৬ বছরটা কোন দিক দিয়ে চলে গেল তার হিসেবই নাই। এই ক'বছরের যে লোকসান হয়েছে তারই ঠেলা কি করে সামলাব। আবার বাধা দেওয়া? গতির বিরুদ্ধে উজান টানা? না ভাই আর নয়। এখন গা ভাসান দিয়েছি, ভাসতে শিখেছি, আর ভয় কি—এখন ভেসে চলব। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ভাসছি এ বোধ হতে ত' এ আনন্দ হতে ত' কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না। বাস্‌ তা হলেই হল। থাকা নিয়েই কথা; যখন আছি, তখন আছি বলেই থেকে গেলাম—বাস্ আউর কেয়া?

যাক, যে কথা বলছিলাম তাই বলি, এরা আমায় কেউ চিনলে না, আমিও বেঁচে গেলাম, মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের দুঃখ আকণ্ঠ পান করতে আরম্ভ করলাম। যাঁর দাসত্ব করতে এসেছি মুক্তভাবে তাঁর দাসত্ব করতে আরম্ভ করলাম। তিনি দেখলেন না—তিনি জানলেন না, তবু তাঁর কাছে তাঁর না চাওয়া পূজা পৌঁছে দিয়ে আমি বড় আনন্দে আছি ভাই। এই যে প্রতিপদে ব্যথা পাচ্ছি, প্রতিপদে মনে হচ্ছে বলি, একবার, ওগো অন্তরালবাসিনী কৃপা করে এই দীনের পূজোপহারের দিকে চেয়ে তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে সেই পরম মায়াবিনীর চোখের সুমুখে আমার নৈবেদ্যগুলো পৌঁছে দাও—কিন্তু প্রতিবারে বাধা পেয়ে ফিরে আসছি, এতে কি আনন্দ কি মুক্তি! কি বেদনা কি বন্ধন! ওগো এই বেদনার বন্ধন আমার অক্ষয় হোক, তোমরা এই পরম লোভীকে, পরম কামুককে এই আশীর্ব্বাদ কর! (উপাসনা—বৈশাখ)

চাই স্বারাজ্য

স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু স্বারাজ্য আরও ভাল কথা। স্বরাজের জন্য চেষ্টা চলুক, তাহাতে কিছুমাত্র ঢিলা দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বারাজ্যের বন্দোবস্তটাও ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্বরাজের উদ্দেশ্য বাহিরটা পরিষ্কার করা, সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেওয়া; কিন্তু সেই

সাথে চাই ভিতরটা পরিষ্কার করা, অন্তঃকরণে নূতন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা। ভিতরটা ঠিকমত গড়ন না পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্ত্তনে ওলট-পালটে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। এ কথাটি আজকালকার জগৎ-জোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বাহিরের বিধিব্যবস্থার নিয়মকানুনের যতই ভাঙ্গাচুরা গড়াপেটা হউক না কেন, মানুষের স্বভাব যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সব পণ্ডশ্রম। মানুষের স্বভাবে যদি গলদ থাকিয়া যায়, তবে সে গলদ তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে ফুটিয়া উঠিবেই। পরাধীন অবস্থায় যদি আমাদের প্রকৃতিতে থাকিয়া যায় অশুদ্ধ জিনিষ সব, তবে স্বাধীন অবস্থায় আসিলে সে সকল যে ভৌতিক বাজির মত দূর হইয়া যাইবে তাহা কেহ মনে করিবেন না। ইউরোপের দেশ সব দেখুন—সব দেশই ত স্বাধীন। কিন্তু ভিতরের অবস্থা তাদের খুবই কি লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়? ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া আমরা অশ্রু ফেলি, সব দোষ দেই পরাধীনতার উপর। কিন্তু স্বাধীন ইংলণ্ডেরই কি অবস্থা আজ তাহার পরিচয় দিতেছে শ্রমজীবীদের বিদ্রোহ। পরাধীন দেশে দেখি রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ (স্বাধীন দেশে এ সংঘর্ষও আছে), স্বাধীন প্রজাতন্ত্রদেশে দেখি প্রজায় প্রজায় সংঘর্ষ। স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় যে তাই বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, তাহা নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ দেশের সব লোকের কাছে না হউক অন্ততঃ একটা শ্রেণীর কাছে সুযোগ সুবিধা আনিয়া দেয়, পরাধীন দেশে দেশের কোন লোকই প্রায় সে সুযোগ সুবিধা পায় না। কিন্তু কথা হইতেছে এই স্বাধীন অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পূর্ণ ফল পাইব তখনই যখন মনের জগতে একটা স্বাধীনতা স্বারাজ্য আমরা স্থাপন করিতে পারিয়াছি। স্বাধীন হইয়াও ইংলণ্ড জর্ম্মণী রুশিয়া ফরাসী আমেরিকা এমন কি জাপান পর্য্যন্ত যে-সব ব্যাধিতে জরজর হইয়া পড়িয়াছে, সে-সকলের হাত এড়াইতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইতে হইবে। বিধান বা শাস্ত্র উল্টাইয়া দিলে যে মনটাও উল্টিয়া অন্য রকম হয়, তা নয়। আর মন যদি অন্য রকম না হয়, তবে ব্যবস্থা বদলাইয়া গেলেও কিছু হয় না। ইংরাজীতে ইংলণ্ডের ইতিহাস না পড়িয়া, বাংলায় বাংলার ইতিহাস পড়িলেই তাহাকে জাতীয়শিক্ষা নাম দেওয়া চলে না; সেই রকম সাদা-রাজের পরিবর্ত্তে কালো-রাজ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হইবে তাহাও একটা একান্ত ভুল বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাই একটা জিনিষের জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। দেশবাসীর কাছে তিনি চাহিতেছেন যে অহিংসা, তাহার অর্থ তিনি চাহিতেছেন স্বভাবের একটা সংযম ও শুদ্ধি। অন্তরাত্মার বল তিনি যে অর্থে গ্রহণ করেন তাহা আমরা হুবহু গ্রহণ না করিতে পারি,—তাঁহার অন্তরাত্মার বল হয়ত শুধু নৈতিক বল, ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে হয়ত বলা চলে না—কিন্তু তিনি যে এই গোড়ার কথাটা এমন জোর দিয়া বলিয়াছেন যে আমরা বাহিরের ব্যবস্থা উল্টাইব, বাহিরের শক্তি দিয়া নয়, রাজনীতিকের ছল বল কৌশল দিয়া নয় কিন্তু অন্তরাত্মার বলে, তীব্র বৈরাগ্যের জোরে, তপস্যার চাপে, ইহাই ভারতবাসীর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আর ঠিক এইজন্যই আমাদের রাজশক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, চেষ্টা করিতেছেন যেন আমরা বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সমান স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে-শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই শক্তি লইয়া তাঁহাদের সাথে লড়ি ও পরাভূত হই। ভারতবন্ধু ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত এই জন্য বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। কর্ণেল ওয়েজউড গান্ধীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ভারতের গোলমাল মিটিবার নয়, কারণ ভারতবর্ষ যে কেবল ইংলণ্ডের হাত হইতে মুক্তি চায় তা নয়, সে ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে চায়। কর্ণেল ওয়েজউড সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন—ভারতের স্বরাজচেষ্টা শুধু একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, বাহিরের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা নয়, ইহা হইতেছে অন্তরের পরিবর্ত্তনের কথা। প্রাণের তোড়ে দেহের জোরে তর্কবুদ্ধির দাপটে ইউরোপীয় প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে ভারতের অধ্যাত্মপ্রতিভা স্বারাজ্য-শক্তি—মানুষের মধ্যে ভগবানের শান্ত সমাহিত অথচ বিপুল অটুট ইষণা। ভারতের স্বরাজ সাধনার ইহাই মূল কথা।

দুইটি জিনিষের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি এখন দিতে হইবে। প্রথম, স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থে কি বুঝি, অধ্যাত্ম-শক্তি কাহাকে বলি। স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থ স্বভাবের আমূল রূপান্তর, অধ্যাত্মশক্তি অর্থ মানুষের নিবিড়তম উদারতম সত্তার ঐশ্বর্য্য। মানুষের আছে দুই রকম স্বভাব, একটা হইতেছে প্রাকৃত স্বভাব আর একটা হইতেছে আত্মিক বা ভাগবত স্বভাব—গীতা যাহাদের নাম দিয়াছেন আসুরী প্রকৃতি আর দৈবী প্রকৃতি। আসুরী প্রকৃতি বা প্রাকৃত স্বভাবটিকেই মানুষের সহজ, নিত্যনৈমিত্তিক, খুব আপনার বলিয়া বোধ হয় আর বস্তুতঃ আমরা দেখি মানুষ সচরাচর ইহারই দ্বারা পরিচালিত;

কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা ভাগবত স্বভাবও মানুষের পক্ষে কম আপনার নয় বরং এইটিই মানুষের গভীরতম সত্তার মধ্যে আছে, মানুষ ইহাকেও সহজ নিত্য-নৈমিত্তিক করিয়া লইতে পারে। তারপর দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, এই দৈবী প্রকৃতি, ভাগবত স্বভাবকে চিনিয়া বুঝিয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনে ফলাইয়া ধরিতে হইবে—মানুষের প্রত্যেক চিন্তা ভাব ও কর্ম্মের লক্ষ্যই হইবে এই নিবিড়তর ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা। আসুরী প্রকৃতি দিয়া স্বরাজলাভ করা যে যাইতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু সে স্বরাজ হইবে আসুরিক-স্বরাজ —তাহাতে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অন্যায় অত্যাচার অভাব দৈন্য থাকিবেই, সেখানে যথার্থ স্বাধীনতা যথার্থ সাম্য যথার্থ ঋদ্ধি স্থান পাইবে না। সেইজন্য আমরা যদি সত্য সত্যই স্বরাজপ্রয়াসী হই কায়েন মনসা বাচা, কেবল উত্তেজনার বশে বা বাহিরের একটা খোঁচার ফলে নয়—তবে আমাদিগকে স্বারাজ্য পাইতে হইবে অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতি ভাগবত স্বভাব পাইতে হইবে। সমস্যার এই একমাত্র খাঁটি সমাধান, আর সব গোঁজামিল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথটি যদি মানুষের অগম্য বলিয়া বিবেচনা কর, যদি বল মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য সাধন, তবে বুঝিতে হইবে মানুষের কোনই আশা নাই, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মায়া মরীচিকা। তবে বলিতে হইবে মানুষের শিক্ষার সাধনার কোন অর্থ নাই, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

মানুষ যে দৈবী প্রকৃতি পাইতে পারে না এ রকম বিশ্বাসের অবশ্য যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক, সমষ্টি হিসাবে যখনই মানুষ এ সাধনা করিয়াছে তখনই দেখিতে পাই প্রথম প্রথম একটু আধটু সুফল পাওয়া গেলেও অচিরে যথাপূর্ব্বং তথাপরং হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস একটু দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই যে বিফলতা ইহার কারণ কি আদর্শের মধ্যেই, না সাধনার মধ্যে, না উপায়ের মধ্যে? আমরা বলিতে চাই দোষ আদর্শে নাই, দোষ হইতেছে যে পথে চলা হইয়াছে সেই খানে। প্রথমতঃ দৈবীপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া অর্থাৎ আসুরীপ্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া, কোন রকমে চাপাচুপি দিয়া যে প্রকৃতিটা পাইয়াছি তাহারই নাম দিয়াছি দৈবীপ্রকৃতি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈবী প্রকৃতি তাহা নয়, আর শুধু এই টুকু দিয়াই দৈবীপ্রকৃতি পাওয়া যায় না। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? চাপা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়া উপরে উপরে একটা সাত্ত্বিকতা বা সাধুভাব—দৈবীপ্রকৃতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সেটা প্রকৃতি নয়,

স্বভাব নয়, সেটা নিয়ম দিয়া আইন কানুন দিয়া প্রকৃতিকে স্বভাবকে বাঁধান মাত্র। দুই রকমে আমরা আসুরী প্রকৃতিকে ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতে পারি, স্বভাবের উপর দৈবী প্রকৃতির একটা ছায়া বা জলুস লাগাইতে পারি। প্রথম, কঠোর ইচ্ছা শক্তির জোরে, তপস্যার তাপে, তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা, শিক্ষার সভ্যতার বলের দ্বারা। দ্বিতীয়, একটা চিত্তাবেগ, ভাবোন্মত্ততার দ্বারা। কিন্তু উভয় পন্থাই অনিশ্চিত। কারণ কোনখানেই আসুরী প্রকৃতির গোপন বীজ নষ্ট হয় নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া ফুলিয়া উঠিবে। চাই আসুরী প্রকৃতির রূপান্তর, সমস্ত আধারের একটা নির্ম্মল টলটল শুদ্ধির উপরতম স্তর হইতে নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত একটা প্রসাদগুণাত্মক স্থির সমতা। এ জিনিষ জোর করিয়া হয় না, সহজ ভাবাবেগেও হয় না। এ জন্য চাই নিবিড় জ্ঞানের, অন্তরাত্মার জাগরণের ক্রমবিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রম বিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রমবিস্তার। ইচ্ছা শক্তি ও ভাবাবেগ সহায় হইতে পারে, কিন্তু ও দুটি ছাড়া চাই ভিতরে একটা পূর্ণব্রহ্মের অনুভূতি, এবং তাহারই এষণায় অঙ্গের একটা ধীর রূপান্তর।

যম নিয়ম অহিংসা অস্তেয় স্বাধ্যায় দ্বারা নৈতিক মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধু মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন দিব্য মানুষ; দিব্য মানুষের সম্ভাবনা হইবে তখনই যখন মানুষ দাঁড়াইবে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, পাইবে গীতার 'ব্রাহ্মীস্থিতি"। সুস্থ অখণ্ড সহজ স্বাভাবিক মানুষ—এইরূপ লক্ষ্য হইলে যে সাধনা যে ক্রিয়া যে পথ মানুষকে একবগ্‌গা, একদিক ভারী, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের বা চিত্তের কসরৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে; সমস্ত আধারকে সহজ ছন্দে দুলাইয়া দিতে হইবে, ও সেই ভাবেই তুলিয়া ধরিতে হইবে একটা উচ্চতর গ্রামে অর্থাৎ মনের চিত্তের কোন বিশেষ ধারার মধ্যে ঢালিয়া নয় অন্তরাত্মার পূর্ণ বিস্তৃতির মধ্যে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।

অন্তরাত্মার সিদ্ধি বল, ব্রহ্মসিদ্ধি বল আর স্বারাজ্যসিদ্ধি বল—আমরা গোড়ার সেই একই জিনিষকে লক্ষ্য করিতেছি। ইহার পথ কি? ইহার কোন বিশেষ পথ নাই, কারণ ইহা আছে সমস্ত জীবনকে ঘিরিয়া, ইহা উপার্জ্জন বা লাভ করিবার বস্তু নয়, ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বিশেষ পথ ধরিয়া, একটা কাটাছাঁটা সাধনার ক্রম ধরিয়া এখানে পৌছান যায় না, সমস্ত আধারটিকে পুটুলি পাকাইয়া, নিজের সমস্তখানিকে গুটাইয়া ইহার মধ্যে যে

ঝাপাইয়া পড়িতে পারিবে, সেই ইহাকে পাইবে। এই রকমেই সকলকে এ জিনিষ পাইতে হইবে।

(প্রবর্ত্তক)

প্রিয়।

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

কে আজ আমার অঙ্গে অঙ্গে
পরশ বুলালো,
আনন্দ-সঙ্গীতের মালা
কণ্ঠে দুলালো ?

হৃদয়খানি গলে' গলে'
ঝরে রে তা'র আঁখির জলে,
তার মাঝে তা'র হাসির কিরণ
ভুবন ভুলালো।

তরুণ-রবির আলোক-রথে
এই পথে তা'র আনাগোনা,
সন্ধ্যা-শেষের গানটিও তা'র
এখান হ'তেই যায় রে শোনা!

দুঃখ সুখের লহর বেয়ে
চলে সে গান গেয়ে গেয়ে,
জানি না হায় কোন্ ভিখারী
রাজার দুলাল ও!

পণ্ডিচারীর পত্র।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

একদিন অরবিন্দের কাছে পণ্ডিত হৃষীকেশ ভারতীয় চিত্রকলার মহত্ব ও সৌন্দর্য্য বুঝতে চাইলো। তারপর যে কথা আরম্ভ হ'লো তা' আমার ভাষায় বলা কঠিন। এবারকার "শ্যামা"য় "হামিসে"র পাথরে খোদা রূপ আছে, তা' দেখিয়ে অরবিন্দ বললেন, "দেখো, এতে শরীর ও প্রাণের মূর্ত্ত কবিতা আছে, তার বেশি নেই। দেহের সৌষ্ঠব, সুঠামতা ও নিখুঁৎ গঠন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর আছে action কর্ম্মের সহজ লীলা, দুই হাতের ভঙ্গি ও দাঁড়াবার হাব ভাবে স্বর্গের বারতা জগতে বলবার ভঙ্গিটি বেশ ফুটেছে; এ ছবি তাই শুধু প্রাণ ও দেহের কলা, আত্মার অনন্তত্ব ও মহত্ব এখানে আদৌ নাই।

আর নন্দলালের এই "নৌকাবিহার" দেখো। এতে রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে আগে রাধাকে লক্ষ্য কর। এ চিত্রে বাস্তবের details বা বহুবৈচিত্র্য পাবে না, রূপ আঁকা হয়েছে শুধু simple essentials নিয়ে অর্থাৎ শুধু সেই কয়টি সরল ললিত আসল রেখায় যা না হ'লে অরূপ রূপ পায় না। তারপর রাধার মাঝে দেখো দু'টি জিনিষ পাবে,- প্রেম ও আত্মদান! মুখের ভাবে, দুই হাতের ভাবে, এমন কি দেহের ললিত রেখার ছন্দে (rythm) পা দু'খানির রাখার রকমে এমন কি সমস্ত শরীরের হেলনে আনমনে ঐ আত্মদান —শ্রীকৃষ্ণার্পণ ও প্রেম ফুটে উঠেছে। অথচ এ জমাট প্রেমে উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য নাই বিরাট শান্তির মাঝে যেন কি মধুর পূর্ণতায় বিধৃত এ চাওয়া—এ দেওয়া। এই রাধাই হ'লো এ চিত্রের key বা রহস্যের দ্বার। একে বুঝলে তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও সখি দু'জনকে বোঝা যায়।

তারপর শ্রীকৃষ্ণে পাবে দেবতার অনন্ত স্থৈর্য্য, মগ্ন ভরাট মহিমা, আর সেই আপন ঐশ্বর্য্যে দৃঢ় আসীন হয়ে প্রেমে এই আত্মোৎসর্গকে গ্রহণ। কৃষ্ণের হাতের বাঁশীটি যা'-দিয়ে রাধাকে টেনে এনেছে—জয় করেছে তা' কেমন হেলায় আলগোছে ধরা! ভগবানের পক্ষে এটা যে কত স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ লীলা তাই যেন দেখাচ্ছে। সখী দু'জনের মাঝে চাঞ্চল্য আছে, কৌতুক আছে, কিন্তু শান্তির নিবিড়তাও আছে।"

তারপর পারস্য ও মিশরের কলা, চীন জাপানের কলা, অজন্তা, মোগল কলা এমনি কত কলা ও শিল্পের কথাই না হ'লো। পারস্যের কলা পরীর

জগতের ছবির মত হালকা তুলির স্বপ্ন, এ যেন আরব্য উপন্যাসের জগত। মোগল কলা সূক্ষ্ম বা psychic জগতের, জীবনের মহাকাব্যের মহত্ব তা'তে না থাকলেও লালিত্য ও মাধুর্য্যে সেও অনুপম। জাপানে জাপানী চিত্রকর মানুষ আঁকলে যেন ব্যঙ্গ চিত্র হয়ে যায়, ওরা প্রকৃতির ছবি natural scenery বড় রমণীয় করে ফোটায়। অরবিন্দ চীনের খুব বড় শিল্পীর আঁকা বৌদ্ধরূপ দেখেছেন, তা'তে সমস্ত জগতের দুঃখ যেন প্রাণতরঙ্গে মূর্ত্ত হয়ে বুদ্ধের মুখের বেদনায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভারতের আঁকা আর একটি বুদ্ধ রূপেও ঠিক ঐ রকম দেখেছেন, সেই অনন্ত জগদ্দাহী দুঃখ সে মুখেও ফোটান বটে কিন্তু শান্তির অটল মহত্বে সমস্তটি ধরা।

অর্দ্ধেন্দু প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা "গঙ্গা" দেখে বললেন, "ছবিটি খুব সুন্দর হয়ে উৎরোয় নি, কিন্তু গঙ্গার চোখ দেখ! দৃষ্টি যেন এ জগতে নেই, পিছনে অনন্ত কি এক জগতে ডুবে আছে—সেইখান থেকে কলনাদিনী বয়ে আসছে কিনা! নন্দলালের "গিরীশ" দেখে বললেন, "মহত্বে মণ্ডিত! নন্দলালের ঐটিই বিশিষ্টতা, দেবতার অন্তরের দেবত্ব এমন করে ফোটাতে সহজে কেউ পারে না। তবে এ স্কুলের একটা বিপদ আছে, তা' অল্প অল্প দেখা দিচ্ছে। কলাভবনের ছোট ছোট চিত্রশিল্পীরা বড় বড় আঁকিয়ের বাহিরের ভঙ্গি ও ধারাটা (mannerisms) ধরে এঁকে যায়, ভিতরের সত্যটি হারিয়ে ফেলে বা ধরতে পারে না।"

তারপর কথা হ'লো এক দিকে সাধক ও অন্যদিকে প্রতিভাশালী কবি বা চিত্রকরের মধ্যে পার্থক্যটি কি তা' নিয়ে। প্রতিভায় মানুষ মনের অলক্ষ্যে কোন্ গোপন দুয়ারের একটুখানি ফাঁক দিয়ে ঝলক ঝলক আলো মনের মাঝেই পায় আর তাই কথায় বা রঙে ধরতে থাকে। এ পাওয়া তার সাক্ষাৎ পাওয়া নয়, অবগুণ্ঠন তুলে সমস্ত মুখখানি দেখা নয়; আবার সেই ক্ষণিক পাওয়াও তার সহজে হাতধরা জিনিষও নয়,—সে কখন পায় কখন পায় না; কখন অল্প পেয়ে তাই ফেনিয়ে তোলে, কখন বেশি পেয়ে দু'একটি টানে দু-পাঁচটি আখরে তা' অমর করে রেখে যায়। কিন্তু তবু চিত্রে কবিতায় বা ভাস্কর্য্যে যেন রূপের বা ভাষার আবরণ ভেদ করে পিছনের ভূমাকে দেখিয়ে দেয়, সাক্ষাৎ দেখাতে পারে না—you look at the infinite though the form, not at it direct."

"শ্যামা"য় এবার বারাণসী বিদ্যাপীঠের আবেদন বেরিয়েছে। তার সম্বন্ধে

কথা হ'লো। তা'তে লিখছে, "১৯১০ সালে Tagore Collection নামে ঠাকুর বাড়ীর রাশি রাশি ছবি ভারতীয় চিত্রভবন দেশকে বিনামূল্যে দান করতে রাজী ছিলেন। তার একমাত্র সর্ত্ত ছিল যে দু'চার লক্ষ টাকায় ভাল চিত্রভবন গড়ে যেন সে গুলি যত্নে রাখা হয়। ভারতে কিন্তু কেউ তার মর্য্যাদা বুঝলো না, আমেরিকা সে চিত্ররাশি নিয়ে গেল। এখন ভারতীয় চিত্রকলার সব চেয়ে বড় স্থায়ী প্রদর্শনী বা চিত্রভবন দেখতে হ'লে তাই বোষ্টনে যেতে হয়। এবার চার লাখ টাকায় আবার Tagore Collection বিক্রী হচ্ছে। এবার দেশ জাগুক, কোন ধনী এই চিত্ররাশি কিনে কালী বিদ্যাপীঠে দিয়ে নিজের নাম ও যশ' অক্ষয় করুন। নইলে এ অমূল্য সম্পদ আবার দেশের বাইরে চলে যাবে।" অরবিন্দ বললেন, "আজ যার দাম চার লাখ, ভবিষ্যতে একদিন চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়েও তা' দেশে ফেরাতে পারবে না, তখন ভারতের গৌরবের যুগে আমেরিকা জয় করে এ সম্পদ লুটে আনা ছাড়া আর গতি থাকবে না। কিন্তু দেশ মরে অবধি (art sense) কলাজ্ঞান নিঃশেষে হারিয়েছে। কেবা এ সবের মূল্য বোঝে!"

আমার রাখালরাজ।

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এ

হে মোর রাখাল রাজ,
জাননা কি প্রভু কি চাহি জীবনে?
তোমার রাতুল চরণ বিহনে
কি চাহিব অধিরাজ?
তুমি যে আমার শত সাধনার
ধ্যান জপ তপ সীমা সবাকার
প্রেমিক হৃদয় রাজ।
কোন্ আলোঘেরা গোষ্ঠের মাঝে
কোলাহল হ'তে লয়ে গিয়ে সাঁঝে
বসায়েছ নিজপাশ,
জ্যোছনা বিছান বট তরু তলে
সোহাগের ভরে বসায়ে বিরলে
পুরায়েছ মোর আশ।

তব বেণুধ্বনি উঠিত গুমরি
সারা প্রান্তর পুলকেতে ভরি
ছড়ায়ে পড়িত তান ;
যমুনার বারি উঠিত কাঁপিয়া
কলকল রবে চলিত বাহিয়া
আবেগ পূরিত প্রাণ।
কুসুম বিতান উঠিত দুলিয়া
ভাবহিল্লোলে পড়িত হেলিয়া
ফেলিত সুরভি শ্বাস,
মাথার উপর অমল,ধবল
চারু ইন্দুর কিরণ তরল
লুটাত মধুর হাস।
এখনো সে সব পড়িছে স্মরণে,
যে অমৃত স্বাদ পেয়েছি জীবনে,
পুলকে ভরিত প্রাণ,
মুগ্ধ পরাণ হারাত চেতনা
তোমার চরণে সঁপিত কামনা
জপ তপ কুল মান।
তুমি যে আমার পিপাসার বারি
জীবন জুড়ান প্রেম তৃষাহারী
অফুরাণ প্রেমাধার,
সকল অভাব মিটায়েছ মোর
প্রেমের স্বপনে রেখেছ বিভোর
বিলায়েছ প্রীতিভার।
তোমার আদরে যবে মোর হিয়া
অসহ পুলকে উঠিত কাঁপিয়া
অবশ এ দেহলতা,
ধীরে ধরে তুমি কোলেতে টানিয়া
বাহুবেষ্টনে রেখেছ বাঁধিয়া
জাগায়েছ নবীনতা।
এস পুন আজ হে পরাণ স্বামী !
পুরায়ে বাসনা অন্তরযামী
ধরিয়ে মোহন সাজ—
এস এস মোর পরাণ ভুলান
এস এস মোর জীবন জুড়ান
এস হে হৃদয় রাজ।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল।

শ্রাবণে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

আজ, শ্রাবণ ঘন নিবিড় মেঘে
আকাশ ছেয়ে আসে,
সন্ত্রাসিতা বসুধা ক'ার
উন্মাদনার ত্রাসে !
এধার ওধার চম্‌কে চিরে'
আলোর করাত বেড়ায় ফিরে'
নিঝুম বাতাস, না জানি কার
কোন্ ইসারার আশে,
ব্যথার মত নিবিড় ঘন
মেঘের সারি ভাসে !

ওই আসে, ওই আসে বুঝি
ঝড়ের হানা হানি !
অভিসারের সাজটী আমার
দাও গো এবার আনি' !
পিয়ার মিলন লগন এযে
রাধা এখন রইবে সেজে'
বাঁশী কখন্ উঠ্‌বে বেজে
কিছুই যে না জানি,
বাইরে যে ওই মেঘের ঘটা
ঝড়ের হানা হানি !

ঝঞ্ঝা নয় রে বাদল নয় রে,
ওই যে মহোৎসব!
নূপুর কুহু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব।

আকাশ ভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার,
সাড়ীর সাথে মিশ্‌বে রে মোর
নিশির অন্ধকার;
অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুন্‌বে না আজ আর!

শ্রাবণ নিশার আঁধার যে আজ
গভীর হ'য়ে আসে,
এই লগনে আজকে তোরা
একলা রবি বাসে?
বাতাস ডাকে 'আয় চলে আয়',
মাতাল সে আজ কিসের নেশায়,
হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে,
শ্রাবণ নিশার আঁধার যে ওই
জমাট হ'য়ে আসে!

———

বাঙলা কাব্যে একটী নূতন সুর

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ।]

যে নূতন কবির নূতন সুরের কথা আজ বলিব তিনি অনেকের অপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে "মরীচিকা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে—আশা করি তখন তাঁহার বিশেষ সুরটি সাধারণের নজরে পড়িবে। আমি শুধু তাঁহার "ঘুমের ঘোরে" নামক কবিতাগুলি হইতেই নূতন সুরটী কি তাহা দেখাইব। এই কবিতাগুলি পূর্ব্বে "যমুনা"য় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করা উচিত তাহা করে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ কবিতাগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আমিও এগুলির ভিতর একটি নূতন সুরধ্বনি পাইয়াছি; কবিতার ভিতর দিয়া এমন একটা বিদ্রোহ ভাব বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া "যমুনা"য় কিছু কাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাতে নূতন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুমঘুমে কবিতা, প্রবল কম্প কবিতা, পালা কবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে কবিতা, একমাস অন্তর কবিতা, চাপা চাপা কবিতা প্রভৃতি যেরূপ কবিতা রোগই হউক না কেন নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। বুকজ্বালা, মন হুহু করা, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা, ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছগাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোন ধরাকাটা নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ।"

এ হেন কাব্য কালান্তক রসের আবিষ্কর্তা যতীন্দ্রনাথের হাত হইতে কি করিয়া কবিতা বাহির হইল, ইহাতে অনেকের বিশেষ সন্দেহ হওয়ার কথা।

ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে আমাদের কবির লেখার জায়গায় জায়-

পায় বেশ মিল আছে। "ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাতলা ঠোঁটের জিয়ান রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত, তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।

"কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন? না তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।"

যতীন্দ্রনাথ ঘুমের ঘোরে অবসন্ন হইলেও ভগবান এবং সংসারটাকে একবারে সাদা চোখে দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং উপরের রংচঙে না ভুলিয়া ভিতরকার খড় বাঁশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। এই বাস্তবতার প্রতি ভক্তি এবং অবাস্তবতার উপর নিদারুণ বিদ্রোহ বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ধ্বনিত করিয়াছেন।

আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়াছে যে কবিতার ভিতর কথায় কথায় ভগবানকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করা। অসীম লইয়া সীমার ভিতর নাড়াচাড়া করা, দুঃখকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, যন্ত্রণাকে দেবতার মঙ্গল দান বলিয়া লইতে বলা—ইহাই কবিদের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনে যিনি সত্যই ইহা অনুভব করেন, তিনি এরূপ কথা বলুন আপত্তি নাই, কিন্তু যার তার মুখে এসব কেবল কথার গাঁথুনি মাত্র বলিয়া বোধ হইবে—ভাবহীনের অসারতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তাই যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া বাস্তবকে বাস্তবের আকারে দেখিবার জন্য বলিলেন—

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে,
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল—ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা!
কোথা সে অগ্নিবাণী!
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো!
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্মব্যথা!
এ কথা বুঝিবে কবে?
ধান ভানা ছাড়া কোন উচুঁ মানে থাকে না ঢেঁকির রবে।

ইংরেজ কবি সুইনবার্ণের ভাবের সহিত দু এক জায়গায় আমাদের কবির ভাবের মিল আছে। ইবসেন, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি শক্তিশালী লেথকগণ সত্যের এই নগ্নমূর্ত্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রিয়তম মৃত্যুশয্যায় কাতর—বহুদিন শুশ্রূষা করিতে করিতে নারীর দেহ মন প্রাণ অবসন্ন—এমন সময় প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে শুশ্রূষাকারিণীর মনে প্রিয়তমের দুঃখ শান্তি হইল বলিয়া হয় ত যে একটু আনন্দ হয়; তাহার পিছনে নিজের ক্লেশের অবসাদ জনিত আনন্দ লুক্কায়িত থাকে কি না ইউরোপীয় কবি বুকে হাত দিয়া দেখিতে বলিতেছেন। বাস্তবিক কথাটার স্পষ্ট সত্য জবাব দেওয়ায় সাহসের দরকার বটে! আমাদের কবিও বলিতেছেন!—

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্মে জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
প্রেম ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন বলিলে আমি এ কথা,
মিথ্যা মাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।

আমাদের রোগ এই যে কবিতা পাইলে তাহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাথা

খাড়া করিয়া থাকি। জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনাতেই যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কারণ না পাইয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে আমরা সেখানে সত্য মিথ্যা একটা উদ্দেশ্য দর্শাইয়া নিজের মনটাকে প্রবোধ দিই। ইহাতে মানসিক বলহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছেন যে একজন স্পষ্টবাদী সরল নাস্তিককে তিনি একজন অবিশ্বাস সম্পন্ন আস্তিকের অপেক্ষা বেশী ধার্ম্মিক মনে করেন। ওঁষ্ঠের চোটে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—সংসারের ভাষায় যাহাকে দুঃখ কষ্ট বলে তাহা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছি, অথচ মুখে বলিতেছি—ওটা সুখেরই একটা রূপান্তর মাত্র, এবং ভগবানকে ইহার মঙ্গলময় দাতা বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

তাই কবি বলিতেছেন—

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ,—
কেন যে এ সব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব দারু মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে যায় তোমার নাহিক হাত!
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাস লীলা!

কবির বিদ্রোহ এইবার পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন ভগবান যদি থাকেন তো তিনি সৃষ্টি করিয়াই খালাস—সৃষ্টির উপর আর তাঁহার কোনো হাত নাই। তাঁহার চন্দ্র তপন তারকা সকলই ঘড়ির মত চলিতেছে। "থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা। আর জগৎটা—

চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব কারা।
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা!
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়ি চাচা, কাদাখোঁচা।
পথ নাই পালাবার ;
উঠে, প'ড়ে, ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।

যুগ যুগান্ত ভ্রমণ ক্লান্ত নিশ্চল কত পক্ষি,
ফাঁকি খুজে কত মহাতপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি।
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ায় মিলে না পার।
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা বিদ্রূপ করো না ক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?
কয়েদে যখন ব্যবস্থা কর কয়েদীর মত রহি।

বিদ্রোহী মন উপায় নাই দেখিয়া বলিতেছে—

নচেৎ মুক্তি দাও
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একবারে খুলে নাও।
জীবন মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন।
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভ'রে কেঁদে ধুয়ে মুছে দেব নিজে গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু ব'লে
সমানে সমানে ছলনা বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই—যদি চান ভগবান কোনোদিন Mr. Montagur মত কাহাকেও পাঠাইয়া আমাদিগকে reforms দিতে চান তাহা হইলে কবি বর্ণিত এই democratic equality এবং free will আমরা চাহিব। আর এখন কি আছে—

বন্ধু গো আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হ'য়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা।

আমি বলি, কিনে কুলো
পিঠে বেঁধে দাও গভীর নিদ্রা, দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।"

লাট্টুর সহিত একটি উপমা দিয়া কবি বুঝাইতেছন যে আমাদের জীবনে কি খেলা চলিতেছে তাহা আমরা জানি না—সেই খেয়ালী খেলোয়াড়ই জানেন। তাঁহার আনন্দ কিসে তাহা তিনি নিজেই বুঝেন আমরা কেবল মিথ্যা একটা লক্ষ্য জীবনে আরোপ করিয়া নিজেরা ঘুরিয়া মরি।

ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুড়ে ফেলে
বম্ বন্ বন্ ঘুর ঘুর পাক চিত্তেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায় ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা।
জীবন যে আসে ফুরায়ে।"
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে।

এ স্থলে ওমরের নিম্নলিখিত লাইনগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন্ যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু, জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তাই জীবনের সুখ দুঃখের জন্য সে নিঠুরের কাছে হাত পাতিয়া কি হইবে—

আমি বেশ জানি সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ
জোর করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়!
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

জগতের এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কবি এই মস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিলেন—

একটি নিয়ম মান তুমি সেটি কোন নিয়ম না রাখ,
আঁখি মুদে দেখি পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা।

বলিলেন ইহকাল পরকাল লইয়াও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—

পূর্ব্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন
পরকালেতেও যা হবে তা হবে, কেন বৃথা আয়োজন।

যে ভগবান ক্ষুধা দিয়া অন্ন দিয়াছেন আবার জন্ম দিয়া মৃত্যু দিয়াছেন—তাঁহার দান আদান সবই সমান। এ যেন গোরু মেরে জুতা দান।

গোরু পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় কোরে কে পুনঃ কাড়িছে হায়!
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দৈত্যো হেসে বলে ইচ্ছাময়েরি ইচ্ছা পূর্ণ হোক;

অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক তাহে অপরের কি?

জগতে কত অবতার আসিলেন, কত নূতন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, কিন্তু জগৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিল—জীবের দুঃখের ভার আর কমিল না—

ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ
কণফুসিয়স মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান,
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর তোমাদেরি তিনি চান।

উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরাব্যাধি শোক পাপতাপ আদি দুঃখ।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল নড়িল না একচুল
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল!

কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি শিখিলেন—

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি ভাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

যদি বল তুমি সুখ দুঃখ নাই দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম।
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিও প্যাথি।"

হানিমানের হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর বিংশশতাব্দীতে কবিবর "ঘুমিওপ্যাথি" আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সংসারের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বড় দুঃখেই পরামর্শ দিলেন। দেখিলেন "এজগৎ মাঝে সেই তত সুখী যার গায়ে যত ঘাঁটা," এ সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ জন্মান্তরের রহস্যের ভিতর তিনি পাইলেন না। জগৎটা একটা হেঁয়ালি বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল—"যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।" বিশ্বস্রষ্টাকে স্তব স্তুতি করা ভুল—যা হবার তা হবেই। "মোরা ভুল ক'রে প্রণমি তোমায় ভুল ক'রে করি রোষ। তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ। আমরা তোমায় ডাকি,—যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি।"

দার্শনিকের ন্যায় কবি Personal God অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ঈশ্বর যেন বেদান্তের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। জগৎরহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, 'অনিয়মটা সকলের চেয়ে জগতেরই বড় নিয়ম—

জগতের শৃঙ্খলা
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ক্রটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

এতটা শ্লেষ করিয়াও কবি ক্ষান্ত নহেন—মানবের প্রেম নশ্বর এবং তাহা যে বারোটার বেশী রাত জাগিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাও বলিলেন—অবশেষে "কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ"—এতখানি প্রশ্নও করিয়া বসিলেন। মানুষের দর্শন সত্যই ইহার সন্তোষ জনক উত্তর আজও দিতে পারে নাই। কবির এই বিদ্রোহ ভাবের পরিচয় পাঠক পাইলেন। ইহার মূল বেদান্তের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তিনি ঢেঁকির শব্দে ধান ভানা ছাড়া আর কোনও মানে যে নাই—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। এখন আমরা সংসারটাকে সেই ভাবে দেখিতে পারিব কি?

সুখের ঘর গড়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

সেই দিনই বিকাল বেলা গেঁড়া সরকার ভোলানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরকার ভোলাকে জানাইল যে চৌধুরী মশাই তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চান। ভোলানাথ ইতিপূর্ব্বে জমীদার-তর্ক-সিদ্ধান্ত-সাক্ষাৎ সম্বাদ অবগত হইয়াছিল; সম্বাদের ফলাফলও যে না জানিয়াছিল তা নয়, ব্যাপার যে রকম দাঁড়াইতেছে তাহাতে সে ভয় পাইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় উপযাচক হইয়া দেখা করিতে চাইয়াছেন শুনিয়া সে উদ্বিগ্ন হইল, এবং কারণ কতকটা মনে মনে আন্দাজ করিয়াও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বলতে পারেন সরকার মশাই?

গেঁড়া। কেমন করে বলবো ভায়া—বড়লোকের মনের ভাব আমরা কি করে জানবো সরকারের যে তা জানা নাই এ কথা ভোলা বিশ্বাস করিতে পারিল না; তবে কি জানি কি অপ্রিয় কথা শুনাইয়া বসিবে সেই ভয়ে সে আর জিদ্ করিল না। কাঁধে চাদরটা ফেলিয়া মহেশের বৈঠকখানার অভিমুখে চলিল। গেঁড়া সরকার অন্যত্র কাজের অছিলা করিয়া আর একদিক দিয়া চলিয়া গেল।

ভোলানাথ সভয়ে মহেশের বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মহেশ ও জীবন ভট্টাচার্য্য ও দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কি আলোচনা করিতেছে। ভোলানাথ ঘরে ঢুকিবামাত্র মহেশ বিদ্রূপের সুরে আহ্বান করিয়া বলিল—"আরে মাষ্টার যে! এস, এস আর যে বড় এ দিক মাড়াওনি হে, ব্যাপারটা কি?"

ভূষণ আড্ডি সুর করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—'এ পথ মাড়ালে বঁধু কোন ভুলে ভুলিয়া?'

ভোলানাথ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "হ্যাঃ কদিন আসিনি বটে—ভারি ঝঞ্ঝাটে পড়িছি—

ম। কি ঝন্ঝাট্ হে শুনিই না—কি নাকি যজ্ঞি ফেঁদে বসেছ—

ভো। যজ্ঞিই বটে তা—

ম। কি রকম যজ্ঞি—কিসের কিরূপ ?

জীবন। শিবরহিত যজ্ঞ—এইরূপ—

ম। (চাপা হাসি হাসিয়া) শিবরহিত যজ্ঞ! সে কিরূপ ভট্‌চাজ ? শিবটী কে ?

জী। আবার কে—আপনি ?

ভোলা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তথাপি কিছু উত্তরে বলা তো উচিৎ। বলিল ভট্‌চাজ আমাকে আর জড়াচ্ছ কেন? আমার সাধ্যি কি কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকাই? বৌদির খেয়াল হয়েছে মেয়েটার মুখে ছুটো ভাত দেয় তাই জনকতক বাউন খাইয়ে একটু উৎসব করা—

ম। উৎসব না মহোৎসব হে? সারা গাঁয়ের বাউন নেমন্তন্ন—আর আমরা অব্রাহ্মণ বলেই বাদ দিলে হে? না হয় তোমার ঢেঁকিশালে পাত পেতে তোমার ভাজের রান্নাটা খেয়ে আসতাম—?

ভোলা। এ রকম দুঃসাহস করতে আমাদের ভরসা হবে কেন?

ম। দুঃসাহস যা করেছ তার চেয়ে এটা আর মাত্রায় বেশী কি ?

ভোলানাথ অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে চমকাইয়া বলিল "কি দুঃসাহস করিছি বলছেন ?"

ম। বাকি কি? ব্যাচারী বাউনদের নেমন্তন্ন করে তাদের জাতটী মারা কম দুঃসাহসটা কি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাদের সাধ্যি কি এ কাজ করি? বিশেষ আপনার রাজ্যে বাস করে, আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে—

ম। সাধ্য হয়ে পড়েছে দেখছি যে—তোমার বাটীর কাণ্ড তুমি জাননা? মুসলমান নিয়ে তোমার ভাজ কি কীর্ত্তিটা করেছে জাননা—না জেনেও জাননা হে ?

ভো। আজ্ঞে সত্যি কথা বলছি যতটা রটেছে ততটা কিছু নয়—

ম। কতকটা তো বটে হেতা হলেই হলো, বিষ্ঠে কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁলেও অশুদ্ধ আর গায়ে মাখলেও অশুদ্ধ; তোমার ভাজ ভাইপো না হয় সহুরে কেতার লোক; হিঁদুয়াণীর ধার ধারে না, গাঁয়ের বাউন কায়েৎরা তো আর তত আলো পায়নি! একটা হাজার হোক্ আচার বলে জিনিষ আছে পাঁচজনে যখন মেনে চলে, তখন পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হলে মানতেই হবে—কি বল হে ভট্‌চাজ ?

ভট্ট। (গম্ভীর ভাবে) তার আর ভুল কি পিসেমশাই! শাস্ত্রেই আছে—

"আচারে রক্ষতি ধর্ম্মং অনাচারে ধর্ম্মহানিং
অনাচারী দেবদ্বিজং নরকং যান্তি সবংশং"

ম। শুন্‌লে মাষ্টার? ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের ভাই ভাগ্যিস্ বেশী বিদ্যে হয় নি—সে যাগ, কাজটা ভাল হচ্চে না মাষ্টার; এতই যদি সাধ হয়েছিল উচ্ছব করতে, জ্ঞাতিভোজন করালেই পারতে। বাউন ব্যাচারীদের এতে টানা কেন? একে তো ফলারের লোভ বাউনের পক্ষে সম্বরণ করা কঠিন—

ভো। আপনি বলেন যদি তা হলে কি বল্‌বো—অনাচার কি হয়েছে তাতো বুঝ্‌ছিনি—

ম। কি মুস্কিল! এত বোধশক্তি কি করে কমে গেল হে? স্নান করে উঠে মুসলমান ছোঁয়া হয়ে ছিল তো? তারপর সেই কাপড়েই বাড়ী ফেরা, ঘর দোরে ওঠা আবার মুসলমানীদের খাইয়ে সেই বাসন নিজে ধোয়া আর ঘরে তোলা এ কি খুব শাস্ত্রসিদ্ধ সদাচার বল্‌তে চাও? ভাজের হাতে বুঝি কিছু পয়সা আছে তার লোভে বুদ্ধি শুদ্ধি বিগড়ে গেল?

ভো। তিনি তারপর বাড়ীর পুকুরে চান করেছিলেন, আর বাসন যা বলছেন্ তা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়—

ম। প্রমাণ?

ভো। আমরা মিছে কেন বলবো? তারও তো একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?

ম। আছে যে তার প্রমাণ?

ভো। বিশ্বাস যদি না করেন তা হলে—

ম। আমি করতে পারি তুমি আমার ইয়ার, বকসীর একজন—কিন্তু সমাজ? সমাজ তা বিশ্বাস করবে কেন?

ভো। আপনারা কল্লেই সমাজ মান্‌বে—

ম। উহুঁ তা কি হয় সমাজ আমার মাথার ঠাকুর—আমার খাতিরে ন্যায় অন্যায় না বিচার করে মান্‌বে?

ভো। তা হলে কি করতে বলেন?

ম। রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করে জেতে উঠ্‌তে হবে তা না করা পর্য্যন্ত কেউ তোমার বাড়ী পাত পাত্‌তে পারবে না—কেন মিছে একটা দলাদলি ঘটিয়ে নিজেও বিপদে পড়বে আর পাঁচজনকে বিপন্ন করবে?

ভো। দেখুন দেখি এই যে এতকাল দেশে বাস করছি কারুর সঙ্গে জোরে কথাটী কইছি শুনেছেন?

ম। আরে তাইতো বলাবলি করি না হে আজ্জি? বলাবলি করি যে ভোলামাষ্টার হঠাৎ এত ভারিক্কের হলো কি করে, এতই বা হঠাৎ কি বলে সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌লো কি করে—যে মেয়ের ভাতে ঘজ্জি লাগিয়েছে।

জী। শুধু ঘজ্জি নয় শিবরহিত ঘজ্জি তা বলবেন্—

ভোলা ভট্টাচার্য্যের দিকে একটা নীরব আক্রোশের বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখিল জীবন মাথা বা চোখ না তুলিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে—মহেশের কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে বলিল—

আমার কি ক্ষমতা না সাধ; জানেনই তো বৌদির হঠাৎ সখ্ হল বল্লেন কি মেয়ে ছেলে কি ছেলে নয়—ব্যাটাছেলের মূল্য আছে মেয়ের থাকবে না কেন? আমি আর কি বলি বলুন?—

ম। তাতো দেখছিই হে মেয়ে মানুষ যে মেয়েমানুষ নয় পুরুষের বাবা তা তোমার ভাজ এসে দেখাতে আরম্ভ করেছেন। স্বামী ছিল পয়সাওয়ালা, স্বামী নেই কিন্তু চালটা আছে তো।

জী। অর্থাৎ বিষ নেই—চক্র আছে।

ভোলা জীবনের এই মৃদু দংশনগুলা সহ্য করিতে পারিতেছিল না, বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের লক্ষ্য করে এই যে সব মন্তব্য—সে কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিল "হাঁ ভটচাজ্ বিষ যা সব পুরুৎ বাউনের বাড়ীর মেয়েদের একচেটে হয়ে গিয়েছে কিনা—

ম। ব্য মাষ্টার বা! তোফা—সব যে বলে মাষ্টার উল্টো কামড় দিতে পারে না! কি বলহে ভট্‌চাজ্—

ভট্ট। তাইতো দেখ্‌ছি ঢোঁড়াতেও ছোবল দেয়—

ভো। তা চতুষ্পদ বিশেষে দেয় বৈ কি, তবে কি জান ভট্‌চাজ ঢোঁড়া হলেও সাপ, কিন্তু শিবের মাথায় উঠে হেলেও কেউটে হয় এই আশ্চর্য্য!

ভট্‌চাজ যে কথাগুলার জ্বালা অনুভব করিল না তাহা নহে। কিন্তু চট্ করিয়া উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল। যেমন ধূম দর্শনে পর্ব্বত বহ্নিমান অনুমান করা যায়, ভটচার্য্যের উদ্গিরীত ধূম পরিমাণ হইতে বুঝা গেল, মাথায় রাগের টেম্পারেচার কত হইয়াছে।

লগ্ন মাফিক কথা বলিতে পারিলে রসিক লোকেও অতি অপ্রিয় কথায়

আমোদ বোধ করেন ও ভিতরে ক্ষুন্ন হইলেও বাহিরে তারিপ্ করিতে ছাড়ে না; মহেশ ও ভূষণ ভোলানাথের কথায় খুব মজা পাইল, ভট্টাচার্য্য চটিবে বলিয়া মজাটা বাহ্য চিহ্নে প্রকাশ করিতে পারিল না।

ভোলা মহেশের কথা গুলার ভঙ্গীভাব মনে মনে পছন্দ করিতে ছিলনা; অথচ নিজের দুর্ব্বলতা বশতঃ যে বাড়ীর কুললক্ষ্মীর প্রতি তীব্র মন্তব্যগুলার প্রতিবাদ করিতে পারিল না ইহাতে সে বড় লজ্জিত ও মর্ম্মাহত বোধ করিল; পাছে আর বেশী কিছু শুনিতে হয় এই ভয়ে সে উঠিয়া পড়িল—মহেশ বলিয়া উঠিল কি মাষ্টার উঠ্‌লে যে?

ভো। দেখি যাই বৌদিদিকে বলে যদি যজ্ঞি বন্ধ করতে পারি, মিছিমিছি কেন কুস্‌কুড়ী চুলকে বরণ তোলা—

ম। তাইতো বলি; বাউনদের ব্যাপার, একটা কাণ্ড যদি হয় তাহলে আমাকে ন্যায় বিচার করতে হলে তোমার দিকতো নিতে পারবো না—মাঝখান হতে তুমি ব্যাচারী মারা যাবে কেন? তা ছাড়া বন্ধু বলেই ডেকে সামলে দিলাম, তা না হলে আমার আর এত গরজ কেন? মোদ্দা কথা বন্ধু নারী বুদ্ধিতে আর ঘর মজিওনা আর নিজে মজোনা—

ভোলানাথ আর বিলম্ব করিল না। দেখিতো কি হয় বলিয়া সে মহেশের নৈকট্য ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ভোলানাথ চলিয়া গেলে জীবন ভট্টাচার্য্য হুঁকা রাখিয়া বলিল, "আসল কথা ভোলামাষ্টারকে কেমন মনে হয় আপনার?"

মহেশ। ব্যাচারী গো বেচারা, তবে লক্ষ্মণের মত দেওর বলে বোধ হয় প্রবলা ভ্রাতৃজায়ার কবলে পড়ে গিয়েছে তাল সামলাতে পাচ্ছে না।

ভূষণ আড্ডি একটা বিকট বহরের হাই তুলিয়া জড়িতকণ্ঠে মুদিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাষ্টারের ভাজ হঠাৎ এত প্রবলা কি করে হলেন, মাষ্টারের দাদা তো ইতি হয়েছেন—আর মতলবটাই বা কি এই যজ্ঞি করে বাউনদের জাত নষ্ট করার? খোলসা হচ্চেনা উদ্দেশ্যটা।

জীবন। বুঝলে না আড্ডি? পিসেবাবুকে তো বলেছি—লোকনাথ মুখুজ্যে প্রথম ছেলের—সেটী গত—ভাত দেশে এসে দেয় তাতে সহুরে কটা খৃষ্টান্ বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে পংক্তিতে খাওয়াতে চায়, তাইতে খুব হুলস্থুল পড়ে; বাউনরা বেঁকে বসলো খাবেনা, তখন বাছাধন নাকখৎ দিয়ে মান বাঁচান্। সেই অপমানের পর লোকনাথ দেশ ছাড়ে কিন্তু তার পরিবার সে

অপমান ভোলেনি আজ তাই মেয়ের ভাত অছিলায় তার শোধ নিচ্ছেন। বুঝলে গুহ্য কথাটা।

ভূষণ। তাই নাকি? কি জন্‌জাল্! দুর হোক্‌গে ছাই, আবার হাই!

ম। মৌতাতের সময় হয়েছে হে বুঝছো না—নাও ওঠো—

ভোলানাথ বাস্তবিকই মহেশের চোখ রাঙ্গানীতে ভড়কাইয়া গিয়াছিল। সে বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে সমস্ত কথা শুনাইল। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ করার মতই যে তার অবস্থা দাঁড়াইতেছে তা সে সদুকে ভাল করিয়া বুঝাইল! সদু বলিল তা দিদি তো বলছে অত ভয় পাবার কারণ নেই? কি আর করবে?

ভো। মন্দ কথা না! কি না করতে পারে? উনি জমিদার আর আমি নগণ্য স্কুলমাষ্টার! ওঁরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত এতদিন তো? আজ না হয় বৌদিদি এসেছেন? না ওসব বুদ্ধি করনা আর উনিই যে কি ভরসায় মেয়ে মানুষ হয়ে প্রবলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে ভরসা পান তা জানিনি!

স। তা কি করতে বলো?

ভো। কাজ কি এই অন্নপ্রাশনের হেঙ্গাম করে? আমি বলি কি বন্ধ করে দি, সব গোল মিটে যাক ফুসকুড়ী চুলকে ফোড়া করে তোলা কেন?

স। দেখ যা ভাল বোঝ করবে, দিদিকে বুঝিয়ে বলি চলগে—

ভো। চলো তর্কসিদ্ধান্ত মশাইকে নাফি বাবু ডেকে মানা করেন এ বাড়ীতে খেতে না আসেন, তিনি নাকি মুখের ওপর বলেছেন "খেতে যাবই কারোর কথা শুনছিনি"। কথায় বলে রাজারাজড়ায় যুদ্ধ করে উলুবন পুড়ে মরে? আমার হবে দেখছি তাই বৌদিদি যে কিসের জোরে পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকছে তা জানিনি—

স। তুমি ঝগড়াঝাটী বাধিওনি দিদিকে বুঝিয়ে বলো আগে।

ভো। বলিছিতো একবার, যে পুরুষের বেহদ্দ রোক আর গোঁ—

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রতি উত্তর দিলেন—"সাধে এ দেশে মেয়েরা মদ্দানি করে ঠাকুরপো; পুরুষরা যে মেয়েলী হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী একটা উচিৎ কথা বলতে বা উচিৎ কাজ করতে পুরুষরা যদি ভয় পায় তা হলে গেরস্থর মানমর্য্যাদা থাকে কি করে? সে যাগ্, ব্যাপারটা কি হয়েছে? তিলকে তাল করে তুলেছে কারা? ভোলানাথ অকস্মাৎ ধরা

পড়িয়া লজ্জিত হইল। সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল দাদা থাক্‌তেন তো দেখতে আমার সাহস হতো কিনা; কার ভরসায় উচিৎ কাজ করি বলো?

য। ও কথা মেয়ে মানুষে বলবে যারা পর-ভরসার জীব! তুমি পুরুষ মানুষ ও কথা বলোনা ঠাকুরপো—তোমার বৌদি কি এমন গুরুতর অপরাধ করে বসেছে শুনি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি বলেন তোমার ভাজ এই ম্লেচ্ছ কীর্ত্তি করে এখন কি দেশের বাউনদের জাত মারতে চায়? নিতান্তই যদি—

য। নিতান্তই কি?

ভো। কি নয় বলো? আমার হলো পুঁটীমাছের প্রাণ!

য। (হাসিয়া) মনেই পুঁটী মনেই কাতলা বুঝলে ঠাকুরপো!

ভো। সে যাক্‌, কাল যদি তোমার বাড়ী কেউ পাত না পাতে?

য। তাতে কি?

ভো। গ্রামে মাথা হেট হবে না! একঘরে হওয়া তো?

য। মাথা হেট নিজে করলেই হেট হবে; তা ছাড়া একঘরে কে কাকে করে ভাই? আর আমাদের সে ভয় নাই এস্‌মাইল আছে জমী চষবে, তর্কসিদ্ধান্ত আছেন, মন্ত্র পড়বেন্ তুমি আছ বিজু আছে রোজগার করবে;—সদু আছে আমি আছি, কথা কইবো, কাজ করবো, রাঁধবো খাবো আবার চাই কি? কি বলিস সদু?

সদু শুধু হাসিল, মনে মনে দিদির তারিফ করিয়া বলিল—দিদি যে কি মানুষ! ফুঁ দিয়া পাথর ওড়ায়, আর আমরা সরসের চাপে হাঁপিয়ে উঠি।

ভো। যতটা সোজা ভাবছো বৌদি ততটা নয় ব্যাপারটা

য। তুমিও যতটা কঠিন ভাবছো ততটা হবে না—

ভো। ধোবা নাপিত বন্ধ হয় যদি?

য। সাজি দিয়ে নিজেদের কাপড় কাচ্‌বো, নিজেরা নাপিত নাপিতিনি হবো—

ভো। শুধু তাই। ওরা হলেন গাঁয়ের মালিক, আমার মত দীনদুঃখীকে টিপে মারতে কতক্ষণ?

য। অনেক কাট্‌ খড় লাগে ঠাকুর পো! অত সোজা হ'লে দেশের দীন

দুঃখী উজোড় হয়ে যেতো; ওপরে একজন আছেন, তিনি অন্ধ পঙ্গু নন। আমি সে বিশ্বাস রাখি—দেখই না—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—

সদু। কিন্তু যদি কেউ খেতে না আসে জিনিষ পত্তর সব তো নষ্ট হবে—

য। তা কেন হবে বোন্? কাঙ্গাল গরীবের অভাব দেশে? তারা এসে খাবে—আমার লক্ষ বাউন ভোজনের পুণ্যি হবে—

ভো। সে না হয় আর একদিন কর না—এটা বন্ধ থাক্।

য। পাগল হয়েছো? তাই হয়? এত কষ্টের আয়োজন, সব পণ্ড হবে?

ভো। তা হয় তো কি হবে! তা বলে প্রবলের আক্রোশে পড়ে মারা যাব—

য। মারাই যায় সবাই! মিছে কেন ভয় পাচ্ছ ঠাকুরপো?—

ভো মিছে নয়—গাঁয়ে বাস করনি, জাননি এখানকার হাল্ চাল্।

য। বেশতো ঠেকে শেখা যাগ্ না—এক কথা—সবাই তো আসবে না জানি; যে দু চার জন আসবে তাদের জন্যে কি করবে? মান রক্ষে করা চাই তো?

ভো। মান রক্ষে করতে গিয়ে যদি অপমান হ'তে হয় তবে এসব কাজে হাত আগে হতে নাই বা দিলুম—

য। বলছি তো দেখাই যাগ্ না! অপমান কিসে? খেতে ডাক্‌লাম, এলনা—এলনা, বাস্, অপমান কিসের? আমিও বুঝলুম, এর পর আর লোকের সঙ্গে কার কারবার না করলেই হবে?

ভোলানাথ কি বলিতে যাইতেছিল, যজ্ঞেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন—দেখ ঠাকুর পো, যজ্ঞি বন্ধ করতে বল্‌ছো, তাও ওদের মন্ত্রণায় তো? কিন্তু ওরা যদি তোমাকে আমাকে জব্দ করবার মতলবই করে থাকে তা হলে এই পরামর্শ অনুসারে কাজ কল্লেই জব্দ হবে—

ভো। কিসে?

য। তুমি সব বন্ধ করে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ—ওদিকে নেমন্তন্ন হয়ে আছে কাল যখন সব খেতে আসবে?

ভো। কেউ আসবে না; সব জমীদারের কথায় সায় দিয়েছে—

য। তবে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন, আমি যজ্ঞি বন্ধ করি আর না করি।

ভো। বোধ হয় তর্কসিদ্ধান্ত যদি আসেন তা হলে তাদের জিদ্ বজায় থাক্‌বে না, এই ভয়ে—

য। আসল কথা তা নয় ঠাকুরপো তুমি বুঝলে না, আমি মেয়ে মানুষ হয়েও বুঝেছি। তোমাকে নয় আমাকে, ওরা জব্দ করবে পণ করেছে; আমি যজ্ঞি বন্ধ করলে ওরা সব আসবে—আর না বন্ধ করলে অধিকাংশ আসবে না —মোট কথা, একটা গোলমাল ওরা ঘটাবে এঁচে আছে—তুমি চুপ করে থাক দেখাই যাগ্ না কি দাঁড়ায়?

ভো। দাঁড়াবে আর কি একটা দলাদলি—

য। তাতে কি?

ভো। তাতে সব—আমার মত ক্ষুদ্র লোকের গ্রামে টেকা কঠিন হবে—

য। তখন তা বোঝা যাবে—এখন যে দায় তাহতে উদ্ধার হও—লোক জন এসে না অপ্রস্তুত করে তার জন্যে প্রস্তুত হও—

ভোলানাথ ব্যাজার মনে ও বিরক্ত মুখে "যা খুসি করগে"—বলিয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী সে কথায় কান না দিয়া আপন কাজে গেলেন। সত্ন ভোলার পিছন পিছন গেল। যজ্ঞেশ্বরী হঠাৎ কি ভাবিয়া উভয়ের পদানুসরণ করিলেন। আড়ালে কান পাতিয়া শুনিতে পাইলেন দেবর বলিতেছে—"তেমন তেমন কিছু ঘটে যদি, তুমি ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাও আমি অন্য কোথাও একটা কাজ নিয়ে থাকিগে পরে যা হয় করা যাবে—মেয়ে বুদ্ধিতে মজে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করা পোষাবে না"—কথা শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরীর চৈতন্য হইল। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ও জিদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি না থাকায় দেবর যে অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ কল্পনা করিতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এত দূর অগ্রসর হইয়া সবদিক মাটি হইবে ইহা তিনি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। তিনি মুহূর্ত্তেক হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; হঠাৎ ভোলানাথ আসিয়া পড়িল, ভাজকে তথায় তদবস্থায় দেখিয়া তার ভয় ও লজ্জা হইল বোধ হয় তিনি তার গৃহত্যাগের মন্তব্য শুনিয়াছেন - এই সভয় অনুমানটা সুনিশ্চিত সত্য কি না জানিবার জন্য ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে? চলে গিছলে না?

য। হ্যাঁ এই মাত্র ফিরে এলাম, তোমার কাছে একটা কথা জান্‌তে?

ভো। কি?

য। তর্কসিদ্ধান্ত মশায়ের বাড়ী আমি যেতে পারি?

ভো। কেন যাবে না?

য। কথা কইতে পারি? আপত্তি নেই তোমার?

ভো। না আপত্তি কি? তুমি বাড়ীর গিন্নি—অপরে যেটা নিষেধ তোমাতে তা হতে পারে না—

য। দেখ ভাই যে তোমাদের গ্রাম আর পাড়া—

ভো। না।

য। তার সঙ্গে একটা যুক্তি করতে চাই। দেখছি তো তিনিই গ্রামে একমাত্র দুর্ব্বলের বন্ধু; অসহায়ের সহায়—'

ভোলানাথের গোপন ভয় ঘুচিয়া গেল। সে নিশ্চিন্ত হইল যে তাহার অসাবধানে উচ্চারিত কথা গুলা যজ্ঞেশ্বরী শুনিতে পান নাই। যজ্ঞেশ্বরীও কৌশলে ধরা না দিয়া দেবরের গোপন ভয়কে ঘুচাইয়া দিলেন। কিন্তু দেবরের কথায় তাঁহার মনে যে অনির্দ্দেশ্য ভয় হইয়াছিল তাহার নিরাস হইল না।

সে দিন সকালে তিনি স্নান করিতে গিয়া ঘাটে একটা আলোচনার ভগ্নাংশ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার উপস্থিতি মাত্রেই তাহা থামিয়া যায়; কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে দক্ষঠাকুরাণীর মুখ হইতে সমস্তটা শুনিতে পান। জীবন-ভট্‌চাজ্জির পরিবার নাকি বলিতেছিল—"মেয়ে ছেলের ভাত তো কোথাও শুনিনি; তা আবার ভোলার মেয়ের! এ ওর ভাজের খেল্, ঐ অছিলে করে বাউনদের জব্দ করা? কে একজন শ্রোতা বলিল—"জব্দ করা কেন? উত্তরে ভট্টাচার্য্যগৃহিণী বলেন" ওমা :তা জানিনি? কর্ত্তার মুখে শুন্‌লাম লোকনাথ মুখুয্যে নাকি প্রথম ছেলের ভাত দেশে এসে দেয়—তাতে তার এক বেহ্ম বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে এনে খাওয়ায় এই নিয়ে বাউনদের মধ্যে কথা ওঠে তাতে বাবু খুব জব্দ হন, মাথা হেট করে সমাজকে তো মান্যি করতে হয়! এখন সেতো মরে গেছে সেই আক্রোশ আছে পরিবার তার সেই আক্রোশ মেটাচ্ছে। বাউনদের জাত মেরে জব্দ করা মাগী কম জাঁহাবাজ গা! তা নৈলে কাঙ্গাল গরীবের আবার মেয়ের ভাত দেবার সখ হয় গা?" শ্রোত্রী-মণ্ডলী ভট্টাচার্য্যগৃহিণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার তারিপ করিতেছে এমন সময় দক্ষ-ঠাকরুন সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইলেন; দক্ষদেবীকে দেখিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী যে যার স্নান প্রসাধনে ব্যাপৃতা হইল। যজ্ঞেশ্বরীর সেই কথা এখন স্মরণ হইল। তাঁহার ভয় হইল ভোলানাথ যদি সে কথা শুনিয়া থাকে তাহা

হইলে তাহারও তো বিশ্বাস হইতে পারে? যজ্ঞেশ্বরী সাতপাঁচ ভাবিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন; কিন্তু বাজে চিন্তায় উন্মনা হলে চলিবে না—বুঝিয়া তিনি কাজের চিন্তায় অন্তমনস্ক হইলেন। তবু এক একবার এই কাথটা মনে উঁকি মারিতে লাগিল "সাধ করে এক করতে গিয়ে শেষে ঘর ভাঙাভাঙি হয়ে যাবে নাকি?"

অকুলের আহ্বান।

(জ্যোতির্ম্ময়ী)

যাই যাই কোথা তুমি কোন্ দূর হ'তে
আহ্বান করিছ মোরে মধুর সঙ্গীতে;
যাই প্রিয় এই যাই
আর তো বিলম্ব নাই
ক্ষুদ্র গৃহে ক্ষুদ্র কাজে তৃপ্ত নহে মন
অসীমে ধরিতে প্রাণ ব্যাকুল এখন।

অনন্তের পথে মোর আজি অভিসার
তোমার সঙ্গীত-মুগ্ধ আকুল হিয়ার।
আজি চিত্ত ছুটে চলে
প্রেম-যমুনার কূলে,
পাসরিয়া লাজ-মান-কলঙ্ক-কালিমা,
বিশ্বকুঞ্জে ধায় আজ পরাণ উন্মনা।

সীমার বাঁধনে প্রাণ বাঁধা নাহি রয়,
শাশুড়ি ননদী গৃহে কত কথা কয়;
কে জানে প্রাণের জ্বালা
হানে বাক্য বিষে ঢালা,
তোমার মিলন পথ রুধিয়া দাঁড়ায়।
রাধারে বাঁধিতে চাহে ক্ষুদ্র সীমানায়।

যাই আমি এই যাই সন্ধ্যাদীপ জ্বালি'
রাধার দিবস-প্রান্তে নেমেছে গোধূলি
প্রিয়তম ক্ষম মোরে
দাসীর বিলম্ব হেরে
ডেকে ডেকে অভিমানে যেয়োনা ফিরিয়া
এই যে এসেছি ছুটে পথে বাহিরিয়া।

ধর্ম্মের বনিয়াদ

(২)

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

পূর্ব্বে দেখিয়েছি ভারতের সত্য হচ্চে সর্ব্বত্রকে সমস্তকে অভিভূত করে ব্যাপ্ত যিনি তাঁরি সঙ্গে যোগ। (Consciousness) এই যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত একদিন দেখেছিল এক স্থির অচঞ্চল অনুদ্বেল সমুদ্রের মত পরম সত্বা রয়েচেন,—আমরা যা কিছু দেখচি সমস্তই হয়েচে হচ্চে এবং হবে,—হয় ত বা একদিন অব্যক্তেই বিলীন হয়ে এই প্রবাহ সুপ্তবৎ অবস্থান কর্ব্বে, আবার জাগবে আবার বিলীন হবে—যেন ওই সমুদ্রের বুদ্বুদ কিন্তু ওই যে পরম সত্বা তিনি স্থির একম্ অদ্বৈতম্—নিক্ষয়ম্। তাঁরেই অনুভব করে ভারত আপাতঃবিধ্বংসী এই লীলাবিলাসের ওপর অবিনশ্বর একটা কিছু গড়তে পেরেছেন সেইটেই হচ্চে—অমৃতম্। উর্দ্ধের অমৃত লোকে অধিষ্ঠিত হয়ে সে এই নিম্নের দিকে চেয়ে আবিষ্কার করেছিল সমস্ত বিশ্বে চারিটী ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম,—আর এই তিনের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ। সে দেখেছিল মূলে ঐ পরম সত্বা, ঐ অমৃতম্, নিম্নের স্তরে এসে এই চারিটী ভাব নিয়ে চারি খণ্ডে আপাতঃবিক্ষিপ্তবৎ, বিক্ষিপ্ত প্রকৃত নয়। সকলেরই মধ্যে, আনন্দের আভাষরূপে ঐ অমৃতমই আত্মগোপন করে রয়েচেন। তারপর আরও নিম্নস্তরে ঐ চারি ভাবের বিবিধ বর্ণশঙ্কর আর তারই সমাবেশে গ্রথিত এই বিচিত্র জগৎ ব্যাপার।

গীতায় এই জগদ্ব্যাপারকে উর্দ্ধমূল অধঃশাখা অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা

করচে। অশ্বত্থ যেমন অন্ধকার হতে নীরবে আপন জীবন রস আহরণ করে এ জগদ্ব্যাপার তেমনি ঐ দূর অপূর্ব্ব রহস্যাচ্ছন্ন লোক থেকে আপন জীবন রস আহরণ করে। এক কাণ্ডযোগে সঞ্চারিত শত শত শাখা পল্লব পত্রে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বিকশিত করে তোলে। যেন নীচের থেকে কোনও কিছুই গড়ে ওঠেনি, সব উপরেই গড়া, ঝুলিয়ে ধরা।

সত্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে হলে একেবারে ওই উপরকার সত্যকেই (Consciousness) বুঝা আমরা ধরে নিই। ওইখান থেকেই সকল শক্তি এ দিকে আসচে এসে প্রকাশিত হচ্চে মাত্র। সেই প্রকাশিত হওয়াটাই জড়ের বুদ্বুদ বিকাশ। এক্ষণে যেমন যেমন প্রকাশিত হচ্চে আমাদের মন যদি তার আইনগুলো কেবল নাড়াচাড়া করে, সে এই উপকরণ পুঞ্জকেই তাদের অভ্যন্তরে নিহিত প্রবাহের মুখে ফেলে কাজে লাগাতে পার্ব্বে সত্য— প্রকৃতির অন্ধবেগকে নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পার্ব্বে সত্য—কিন্তু প্রকৃতির হাত থেকে তার ছুটী কই, সেও ত ওই অন্ধবেগেরই অধীন। আর যদিই বা অমন ভেল্কি একটু আধটু আমরা দেখাতে পার্লুম, ওত প্রকৃতিরই হাতে পড়ে তারই খেলান খেলা খেললুম মাত্র। উইপোকা যে গড়েচে বুঝে দেখতে গেলে উইঢিপি তারই গড়া। ক্ষুদ্র পোকাগুলা মুখে করে মাটী বয়ে এনে সাজিয়েচে বলেই তার মধ্যে সত্যই তার এমন বাহাদুরী কিছু নেই। যে তারে গড়েচে সে অমনি করেই গড়েচে যে বেচারি মাটী বইবেই। মর্ত্তে মর্ত্তেও বইবেই।

আমাদের ভারতের সত্য এমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মনকে সচেতন করে সত্যকার প্রাধান্য এনে দেয় যে, আমরা এইটে বুঝি বুঝে জেগে জেগেই জগৎ প্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখি। ঠিক প্রকৃতির হাতে খেলব না, প্রকৃতিকে যিনি খেলাচ্চেন তাঁরই হাতে খেলব এইটে হল আমাদের জীবন প্রকাশে পার্থক্য। তাই আমরাও এই বিশ্বে অপর সকল জাতির মতই জীবনের খেলাই খেলে এসেছি,—তারা সমাজ স্থাপনা করেচে সভ্যতা স্থাপনা করেচে শিল্প বাণিজ্য নিয়ে আড়ম্বর করেচে, আমরাও করেচি। তারাও যুদ্ধ করেচে শান্তি এনেচে ধর্ম্মপ্রচার করেচে, আমরাও করেচি। তাদের ব্যষ্টি জীবন পারিবারিক জীবন সুখ সম্পদ সাহিত্য সঙ্গীত বিলাস—আমাদেরও বাদ যায় নি। সবই আমাদের মত হয়েচে কিন্তু তাদের যেমন করে হয় আমাদের তেমন করে হয় নি। আমাদের পার্থক্য আছে। আমাদের মত তারা প্রকৃতিকে যিনি চালাচ্চেন তারই হাতে

চলবার চেষ্টা করে নি। প্রকৃতি যেমন চালিয়েচে সহজ ভাবে তেমনই একরোখা চলে আসচে।

সাদাসিদে দেখলে ওদেরই যেন কত উন্নত স্বচ্ছন্দ ভাব যেন ওইটেতেই শক্তির বেশী স্ফুরণ, যেন আমাদের পথটা কুটীল, জাড্য আর অকর্ম্মণ্যতায় ভরা।

কিন্তু ভাল করে দেখতে গেলে তাতো নয়। আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে চলেছি ওরা চলেচে অনুকূলে। ওরা যাচ্চে ভেসে আমরা যাচ্চি ঠেলে। আমরা একদিকে নদীর উৎপত্তি স্থানের সন্ধান নিচ্চি ওরা ওই নদীরই জোয়ার ভাটায় একবার নামচে একবার উঠচে। সাদা চোখে দেখাচ্চে বটে ওরা হুহু করে ভেসে চলেচে—আমরা যাচ্চি টিমে তালে। কিন্তু ওরা যাচ্চে যাচ্চেই, কোথাও ত যাচ্চে না, আমাদের ত তা নয়। আমরা যে টুকু যাচ্চি—সে যত টুকুই হোক্ পথ কমিয়ে যে ফেলচি।

প্রত্যেক জাতির মূলে এক একটা ভাব আছে বলেচি সেইটে তার সত্য। হিন্দুর মূলে যেটা ভাব বলে ধরে নেওয়া গেছে অন্যজাতির ভাব থাকার তুলনায় সে এক নয়। সকল জাতির ভাব এক একটা স্বতন্ত্র ভাব, আর হিন্দুর ভাব হচ্ছে সকল ভাব সমন্বয়ের ভাব। ইংরাজের ভাব স্বার্থ ফরাসীর ভাব স্বাধীনতা মার্কিণের ভাব সাম্য জার্ম্মানের ভাব প্রাধান্য। জাতিগুলা দানা বাঁধবার দিন থেকে এই এক একটা ভাব নিয়েই আছে, থাকবে, যে দিন পর্য্যন্ত না ধ্বংস শতচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে তারা আপন আপন ভাবেই অটুট কিন্তু দেখ ওই দোয়ারে ওঠা আর নামা—উন্নতি আর অবনতি—দিনকতক বড় মানুষী আবার তারপর গরিবীয়ানা, এই নিয়েই ওই মূল ভাব ধরে ওরা পড়ে আছে। ও ভাবটার কোনও লক্ষ্য নেই কোনও গতি নেই। ভাবটার এতটুকুও ওদের পরিণতি নেই চোখের ওপর যে হাউই বাজি দেখব সে ওই উন্নতিরই, বড় মানুষের রঙ বেরঙের আগুনের ফিন্‌কি. কাটতে কাটতে সর্ সর্ শূন্যে ঠেলে ওঠা আর ধুপ্ করে পড়া। ইতিহাস খুলে পড় এ ছাড়া আর কিছু দেখবে না।

তার উপর ওই যে স্বার্থ স্বাধীনতা সাম্য প্রাধান্য বড় বড় কথা গুলো দেখচ —ওর মূলগত যে ভাব সে ওদের একার নয় জেনো, ভারতের সমন্বয় ভাবের ভিতর সকলকেই খুঁজে পাবে। ভারত ও সবগুলোকেই তার তপস্যার গণ্ডী মধ্যে টেনে এনে—মহা সমন্বয়ের চেষ্টা করচে। সে ভবিষ্যৎ জগতের জন্য একমনে একটা কিছু গড়চে, উন্নতির খেয়ালই রাখে নি। অমন কত উন্নতির

হাউই তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে ফিরে তাকায়নি। সমস্তের ভাবকে এক করে একটা মহাসমন্বয় গড়াই যে তার লক্ষ্য। পৃথিবী তাকে আপনার উন্নতি দেখিয়ে বার বার উপহাস করে গেছে, কখনও কুণ্ঠিত কর্ত্তে পারে নি।

ওই যে চারটে মূল ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম আর তাদের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ, জগতের সকল দেশের সকল ভাবই এর মধ্যে পাবে। প্রথম ওই তিনটে ভাব ছাড়া মানুষের জীবন রচনা হতেই পারে না আর চতুর্থ ভাবটী আদর্শ স্বরূপ না থাকলে কোনও ভাবই স্বভাবে কোনও দিন থাকে না ঘুলিয়ে উঠে। ভারত শূদ্রের মধ্যে কাম, বৈশ্যের মধ্যে অর্থের ভাব ঢুকিয়েছিল। আর ক্ষত্রিয় গড়েছিল, তার কাজ ছিল প্রকৃতির জড় শক্তির প্রবাহে যেন ওই দুই জড়ের মধ্যে সমাপ্ত বর্ণ ভেসে না যায়। ক্ষত্রিয়ের তাই ভাব ছিল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের কাজ হচ্ছে অমৃতের অমর সত্বায় উদ্বোধিত অন্তর্মুখী শক্তির অনিবার্য্য স্ফুরণে বাহু বলের বিপুল প্রকাশ। তার উপর ছিল ব্রাহ্মণ, যে ঐ জীবনাতীতকে জীবনের সকল দ্বারে বিঘোষিত করে মোক্ষের আদর্শ দিয়ে ধর্ম্ম অর্থ কামকে সংযত রাখত—ভারতের বৈশিষ্টের অভিমুখী করতো।

এই ত constitition; এখন হিন্দুজাতি ধর্ম্মের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে কি বুঝব? বুঝব কি ওই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, না বৈশ্যের অর্থ, না শূদ্রের কাম, না বুঝব ব্রাহ্মণের মোক্ষ?—কোন বনিয়াদের উপর হিন্দুজাতি প্রতিষ্ঠিত বুঝব?

বোঝার কথা বলতে গেলে বল্‌তে হয় এখনও চরম বোঝা ভারতের শেষ হয়নি। এখনও সে বুঝচে। যে জিনিষ তার মধ্যে রচিত হয়ে উঠলে সে আর আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকতে পার্ব্বে না, পাকা ফল যেমন করে বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি করে তার অন্তরাত্মা আপনার জন্মভূমি ছেড়ে বিশ্বের অভিমুখে যাবেই, সে বোঝা এখনও হয়ে ওঠেনি। সে বোঝা যেদিন পঞ্চনদে যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘিরে ঋষিগণ আপনাপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সঙ্গে করে আহুতি দিতেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যে দিন তথাগত গৌতম জন্ম ব্যাধি জরা মৃত্যু পীড়িত সংসারের উপর আপনার বোধিসত্ব লব্ধ জীবনের বাণী ছড়িয়ে দিলেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন চূর্ণীকৃত বৌদ্ধমঠের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুর তরবারি ও নব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসের হর হর ব্যোম ব্যোম নাদ দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করেছিল সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন ইসলামের দীন্ দীন্ রবত্রস্ত পরাজিত ব্রাহ্মণত্ব গ্রাম্য সমাজে বিবাহাদি অনুষ্ঠান মাত্র সম্বল করে আত্মগোপন

দ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিল সেদিন যেমন করে চলছিল,—আজও এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভগ্ননৈতিক-মেরুদণ্ড জাতির সম্মুখে ধ্বংসের বিকট ব্যাদান দেখে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন সব একত্রিত হয়ে এই আর্ত্তনাদ এই কম্পনের মধ্যে তেমনি করেই চলচে। বোঝা তেমনি করেই চলচে। সেটা অতীত বলে কোনও মহামহিমার্ণব ভগবানের রাজত্ব ছিল না। এটা বর্ত্তমান বলে আর একটা জরাজীর্ণ শীর্ণ কুব্জ অভিশাপগ্রস্ত ভগবান এ যুগের অধীশ্বর হয়ে বসেন নি। সেই একই ভগবান, এ মানুষও এক। প্রভেদ যা সে ক্রমঃপরিবর্ত্তিত অবস্থার।

বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অপরাপর দেশগুলায় মানুষ কেউ ধর্ম্ম কেউ অর্থ কেউ কাম এই ভাবেরই একটীকে প্রবল করে তারি ওপর আপনাপন জাতির বিশিষ্ট সুর চড়িয়ে একটা একটা আদর্শ রচনা করে। ঐ পর্য্যন্তই তাদের চেতনা। বাকিটা সমস্তই প্রকৃতির উদ্দাম অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি থাকে উপরে, চেতনা তার প্লাবনের নীচে কোথায় তলিয়ে যায়, তাই কেউ স্বার্থ অমন প্রবল সপ্রগলভতার বজায় কর্ত্তে পারে, কেউ নররক্তে পৃথিবী ধৌত করেও আপন প্রাধান্য বজায় করে চলে যায়। কেউ বা আপনার ধর্ম্ম কেউ বা আপনার রাষ্ট্রনীতি কেউবা আপনার সভ্যতা বিকট বক্তবৎ বিস্তার করে অপর জাতিগুলিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পৃথিবীর ভূধর গণে, কান্তার চষে সমভূমি করে বেড়ায়। প্রকৃতির যতখানি জোর ঝঞ্ঝায় বজ্রে সাগরোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত এদের এক এক জনের এক একটা দাপট তার চেয়ে কম জোরে ত পাখশাট মারে না।

এখানে ভারতে ওমনি একটা ভাবকে প্রকৃতির জড়বেগের কুণ্ডলীকৃত স্তম্ভের মাঝখানে ফেলে ভগবান কখনও শক্তির আবর্ত্ত রচনা করেন নি। এখানে যা হচ্চে, সে বরাবরই বলে আসছি একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

মোক্ষের ভিত্তির ওপর, ধর্ম্ম অর্থ কাম, আপন আপন সামঞ্জস্য রেখে একটী ভাবসমন্বয়মূলক চেতনা রচনা করচে এখানে। সেই চেতনা প্রকৃতির প্লাবনের নীচে তলিয়ে যাবে না, তার ওপরে উঠেই আমরা যেমন আমাদের কলকজার মধ্যে প্রকৃতির একটু আধটু বাষ্পশক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাই তেমনি করে সমগ্র প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তি ভাণ্ডারকে কাজে লাগাবে। মানবত্বের একটা মহৎ পরিণামই ভারত ধীরে ধীরে আপনার উত্থানে পতনে সুখে দুঃখে এই পুণ্যভূমিতে রচনা করে যাচ্চে।

অতএব বলতে অবশ্যই পারি যে কোন বনিয়াদের ওপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত সে ত এখনও আমি বুঝে উঠিনি। হিন্দুর সমস্তটা এখনও গড়ে ওঠে নি যে। আমি কেবল বললুম মাত্র যে হিন্দুর এইটিই বনিয়াদ। ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম কিন্তু সে মেরুদণ্ড শরীরতত্ত্বের বাইরের জিনিষ। ভারতবর্ষের দেহটাকে কেটে খান খান করেও তাকে তুমি চক্ষের উপর তুলে ধর্ত্তে পার্ব্বে না।

ভারতের ধর্ম্ম হচ্চে মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কামের সামঞ্জস্য, তা যদি না হবে তাহলে ত বৈদিক যুগেই জাতির সমাপ্তি ঘটে যেত। একটা মূর্ত্তি নিয়ে যেমন ইসলাম ধধূপের জ্বালাময় উদ্গারসম ছুটে বেরিয়ে আপনার সমস্ত আলোটা জ্বালিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে ফেলেছিল, স্পেন বেরিয়েছিল, দীনেমার বেরিয়েছিল, ইংরাজ বেরিয়েছে, জার্ম্মাণ রুষ বেরুচ্চে,—তেমনি করে সে যুগে ভারতও বেরুত। তার সেই গগনস্পর্শী যজ্ঞধূম কত কত বিভিন্ন জাতির ছিন্ন শির আহুতি স্পর্শে বিকট গন্ধসহ গগনমার্গে কুণ্ডলীকৃত হত কে তা বলতে পারে? তার সামগানের ছন্দে কত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধের গাথা কীর্ত্তিত হয়ে যেত। তা ত হল না। বরং উল্টে ভারত একদিন কোন এক নব স্বপ্ন দেখে আপন মনে আপনিই শিহরিয়া উঠ্‌ল। সে আপনার মধ্যেই ভেঙ্গে, গড়া স্থরু করে দিলে। ধর্ম্মের যে আদর্শ একটু একটু করে তৈরী হয়ে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল, তাকে সে বদলে দিলে। সে নব অনুষ্ঠানে নূতন করে ফিরে বসল। ভারতে বৌদ্ধ সাধনার ভিতর দিয়ে মোক্ষের আদর্শ টাকে সম্মুখে রেখে মোক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে নবীন জীবন রচনা আরম্ভ হল। সমাজ বদলে গেল, সভ্যতা বদলে গেল, আচার বিচার বসন ভূষণ জীবন ধারণ সবই ভারত নূতন করে নিয়ে আপনাকে আবার ঢেলে সাজলে। এ যুগে যে জিনিষ তৈরী হয়ে উঠেচে সেও ত সামান্য নয়। তারে দেখে বিশাল চীন সম্ভ্রমে মাথা নীচু করেচে, পারস্য অভিভূত হয়ে গিয়েচে, জগতের শত শত জাতি সংস্পর্শ লাভ করে আপনাকে ধন্য কর্ত্তে ছুটে এসেচে কিন্তু ভারতের গণ্ডী সেখানেও পড়েনি,—তারে যে তখনো এগোতে হবে। হ'ক না পথ সঙ্কটময়; সে অত্যুজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত শৃঙ্গ থেকে উপত্যকা তার পর আরো নীচু একেবারে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে না হয় তার পথ গিয়েছে; তাই বলে কি তাকে থেমে যেতে হবে? তাই ভারত সেখানেও চুপ কর্ত্তে পারে নি। ধর্ম্মবিরোধ আত্মসঙ্কোচ পরাজয় অপমান সমস্তের মধ্য দিয়ে ভারত একেবারে মৃত্যুমুখেও এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

ভারতের নিজস্ব জীবন ধারা অন্তঃসলিলা হয়ে ঠিকই বয়ে আসচে। মুসলমান আমলে ঐ গোঁড়ামীর ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিতে দেখেই তারে উৎসন্নে গেছে ভেবো না, ইংরাজ আসলে এই যে গোলামীর গাধার টুপি পরে সেই ভারত—সেই যাজ্ঞিক ভারত—সেই মুমুক্ষু বুদ্ধ ভারত—এমন সঙের মত ধেই ধেই করে নাচচে,—এ দেখে নিরাশ হয়ো না।

যে ভগবান এরে ধর্ম্মের আদর্শ মোক্ষের আদর্শ যুগের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ছিলেন; এখনও তিনিই আছেন—তাঁরই হাতে এর ভাগ্যরজ্জু। ইচ্ছার অনিরুদ্ধ বেগ নিয়ন্ত্রিত বলধর্ম্মী মুসলমান আর স্বার্থ সর্ব্বস্ব পরম নাস্তিক ইংরাজ আজ তাঁরই বিধানে ভারতের প্রবাহের মধ্যে পড়েচে। ঐ চতুর্ব্বর্গের সামঞ্জস্যে এরাও আপন আপন দান দিতে এসেচে,—এরা কেউ ছোট নয়। আপন কাজ সমাপ্ত হলে সকলেই ভারতের আপন হয়ে যাবে।

এই শেষ লক্ষ্যের মধ্যে পৌছান পর্য্যন্ত ভারতের জাতির গঠনই চলবে। তারপরই ভারতবর্ষ দাঁড়াবে, যে দাঁড়ানকে প্রকৃত নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ান বলে।

বিশ্ববিদ্যালয় বিদায়-গীতি

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

আমার স্কন্ধে মন্দমতি
চাপ্‌ল দুষ্ট সরস্বতী
বিদায় নিলাম বিদ্যাসতী
তোমার আলয় থেকে
এতদিনের ভালবাসা
মিটলনাক প্রাণের তৃষা
মরীচিকায় ভোলায় দিশা
স্বপন-মায়া ডেকে।

চাইলে চোখে লাগে ধাঁধা
মুদ্‌লে আঁখি সবই আঁধা
ভাবতে গিয়ে দেখি—গাধা
কথায় আছে ডাক!
নামিয়ে দিয়ে ভূতের বোঝা
এবার আমি হ'লাম সোজা
রইল আমার 'ডিগ্রী' খোঁজা
'নোটের' ঘানিপাক।
তোমার কৃপা-দৃষ্টি পেলে
লক্ষ্মী সে তো পায়ে ঠেলে
সরস্বতী দূরে ফেলে
ত্যজ্যপুত্র করে।
শরীর—সে তো নাকের আগায়
দৃষ্টি—সে তো চশ্‌মা লাগায়
জীবন—সে তো শ্মশান জাগায়
জ্যান্ত শবের পরে!
তোমার কোলে যে সব ছেলে
নন্দদুলাল শরীর মেলে
জীবনটা তো অবহেলে
কাটিয়ে দিল খাসা
ভুঁড়ি, দাড়ি, চেন ঝুলিয়ে
প্রথম ছুটোয় হাত বুলিয়ে
জ্ঞান-সাগরের জল ঘুলিয়ে
তুল্‌ছে বালির খাসা
তাদের মতন্ হয় বা কজন্?
লাখের মধ্যে দু এক ডজন—
মেখে পায়ে কৃপার রজন্
ভাগ্য-দোলায় নাচে
পিটিয়ে গাধা বানান্ ঘোড়া—
পূজ্‌তে তাঁদের চরণ-জোড়া

নিয়ে মোটা টাকার তোড়া
অনেক ছেলেই আছে।
বাক্‌সে তাদের আছে যে দম্,
শরীরেই তা' বিশেষ কি কম!
তাইতে তারা হয়না বেদম্
বিদ্যা-রেসে ছুটে;
চক্ষু মুদে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছুটছে তারা জয়ের আশে
দেখেই বিদ্যা পলান ত্রাসে
ভাবেন ধরল-ভূতে!
কিন্তু যাঁদের বাক্‌স শূন্য
নাইক খোসামোদের পুণ্য
কিম্বা কর্ম্ম দোষের জন্য
ধনের ঘড়া খালি।
তা'রাও কেন মোহের ভরে
ঋণের বোঝা মাথায় করে'
বিদ্যা বলে' অবিদ্যারে
দিচ্ছে পূজার ডালি।
দরিদ্রতার তাইতো জ্বালা
তাইতো গলে দুখের মালা,
তাইতো যখন হাসির পালা
অশ্রু চোখে ক্ষরে।
ফুলের মত জীবন-শত
আধেক-ফোটা ফুলেরমত
মধ্য-দিবস না হয় গত
অকালে যায় ঝরে'!
বুঝে শুঝে বোঝার দায়
এড়িয়ে এবার—স্বস্থ-কায়ে
ভাসিয়ে দিলাম জীবন নায়ে
অথই সাগর-বুকে।

নিজের হাতে ধরেছি হাল
নিজের হাতে তুলেছি পাল
চক্ষু চেয়ে সকাল বিকাল
বাইব তা'রে সুখে।
যেমন সহজ সূর্য্য উঠে
যেমন সহজ কুসুম ফুটে
যেমন সহজ গন্ধ ছুটে
হাওয়ার বুকে ভেসে,
তেমনি করে' বাঁধন টুটে
পরাণ আমার উঠবে ফুটে
হাওয়ার সনে ছুটে ছুটে
চলব দেশে দেশে।
প্রাণের কথা আপন ভুলে
গাইব নিতি পরাণ খুলে
বিশ্ব চিত্ত উঠ্‌বে দুলে
আপন ভোলা সুরে।
অন্ধ আঁধার খুলবে নয়ন
করবে আলোর কুসুম-চয়ন
মরণ হ'বে কুসুম-শয়ন
জীবন-মোহন পুরে।

চিঠির গুচ্ছ

দুই দফা

(৪)

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

সত্যিই ভাই অধ্যাপক সম্বন্ধে আমার বড়ই বিদ্‌ঘুটে একটা ধারণা আছে। শুনে নিশ্চিন্ত হলুম যে তোমার স্বামী সুপুরুষ এবং রসিক লোক।

আমি ভাই, খুবই লজ্জিত যে আমাদের মাঝে এমন সব মেয়ে আছে, যারা তোমাদের ঘৃণা করে শুধু তোমাদের রং কালো আর তোমাদের আচর ব্যবহার ভিন্ন ধরণের দেখে। নতুনকে যারা সইতে পারে না, আমার মতে, দুনিয়ার আনন্দ তারা উপভোগ করতে অক্ষম। অতি ছোট বয়সেই আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে এসেচি এবং তারপর আর সেখানে ফিরে যাবার সৌভাগ্য কখনো আমার হয়নি; কাজেই সেখানকার মেয়েরা কেমন, তা আমি ঠিক বলতে পারিনে। তবে পুঁথি পত্রে তাদের পরিচয় যা পেয়েছি, তাতে মনে হয়, ভারতে পালিতা ইংরাজ-দুহিতার মত তারা সঙ্কীর্ণ চেতা নয়—দুনিয়াকে তারা দেখতে চায় পূর্ণরূপে, আর, নূতনকে বরণ করে নিতে সর্ব্বদাই তারা প্রস্তুত।

তুমি বিয়ে করেছ বলে আমি মোটেও আশ্চর্য্যান্বিত হইনি—আর স্বামীকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছ বলে তোমায় জানোয়ার ঠাউরে বসিনি।

আমি শুধু ভাবি, তোমরা এমন কি এক আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, যার জন্য, এত অল্প বয়সে তোমরা জীবনের চাঞ্চল্য বর্জ্জন করতে পার। তোমাদের জীবনে কর্ত্তব্যের দাবীটা আমাদের কাছে বড়ই বিচিত্র বলে মনে হয়। জীবনের কত কিছু হতে নিজেদের বঞ্চিত রেখে বেস প্রফুল্ল চিত্তে পার তোমরা নিজেদের বিলিয়ে দিতে।

এর মাঝে নিশ্চতই তোমরা একটা আনন্দ পাও, নইলে এ নিয়ম কিছুতেই চলত না। তোমার সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই খসে যেত; যদি তোমরা এতে ব্যথা পেতে। এই রকম কোটি কোটি নারী নিয়েইত তোমাদের জাতি গড়া—অভিযোগ কেউত করে না।

তোমরা যারা, নতুন ভাবকে গ্রহণ করতে পেরেচ, কেবল তারাই বেদনা অনুভব করচ এবং সেই ব্যথা বুকে চেপে না রেখে প্রতিকার প্রার্থনা করচ। তোমাদের সমাজে রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা এতেই চঞ্চল হয়ে উঠেচেন এবং আমাদের দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার নিন্দা করে, তোমাদের সতর্ক করে দিচ্চেন, তোমরা যেন ওই ভুয়ো সভ্যতার বাইরের আবরণ দেখে মুগ্ধ না হও। এ সব কথা আমি তোমার কাছেই শুনেচি—কাজেই এত সভ্যতা সম্বন্ধে আমার চাইতে তুমিই ভালো জান।

এ সব যদি সত্য না হয়, তা হলে তোমাদের দেশের নারী জীবন ইচ্ছামত তোমরা গঠন করতে পারবে—কিন্তু যদি সত্য হয় তা হলে তোমাদের খুবই বেগ পেতে হবে।

জীবনের আদর্শটাকে যদি তোমরা খুব ছোট করে নেও, আর ছোট্ট সেই আদর্শ লাভ করেই তোমরা যদি তৃপ্ত থাক, তা হলে তোমাদের নিজেদের ভিতরই যে পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবেনা। তোমরাত স্বভাবতই মনে করবে যে অবস্থায় তোমরা আছ, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতেই পারে না।

পরিবর্ত্তন যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে চরম সুখের ও শান্তির অবস্থা বলে মনে করে নিয়েছেন এবং পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁরা আন্দোলন কর্‌চেন, তাদের বলচেন দেশের মেয়েদের চিত্তে মিথ্যে অভাব তুলে তাদের জীবনে অশান্তি এনে দিয়ো না।

শান্তির মূল্যস্বরূপ তোমরা অনেক, কিছুই দিতে পার, দেখচি। এমন কি এই শান্তির জন্য তোমরা মরতেও পিছুপাও নও। আমার মনে হয়, জীবনের পক্ষে তোমাদের প্রার্থিত এই ধরণের শান্তির চাইতে সংগ্রামেরই বেশি প্রয়োজন।

শান্তির জড়তায় যদি জীবন আড়ষ্ট হয়ে যায়, অথবা প্রাণের স্পন্দনকেই যদি শান্তির বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে কর, তা হলে, কাণাকড়ি মূল্যেও আমি সে শান্তি ক্রয় করতে রাজী নই।

মানুষ শান্তি চায় কেন? জীবনকে উপভোগ করবার জন্যই ত। তোমাদের ওই ঘরের কোণের বদ্ধ-জীবন কি উপভোগ্য হতে পারে? অবশ্য যা করতে হবেই, না করে উপায় নেই, সে কাজটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলে, তা দুঃখের বোঝা হয়ে ওঠে না—সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই মেয়েদের

ঘরের কাজ প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলিকে আনন্দপূর্ণ বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গৃহ-কর্ম্ম প্রভৃতির পরেই সহসা তোমরা একটা বড় দাড়ি টেনে দিয়েচ—আর, সেইটেই হচ্চে তোমাদের জীবনের পক্ষে মারাত্মক।

আমাদের সমাজের মেয়েদের কি ঘরের কাজ করতে হয় না? ব্রিটিশ-সন্তানেরা কি মাতৃস্নেহের মধুর স্বাদ পায় না? দম্পতী পায় না একে অন্যের ভালবাসা? এ-সব যদি না পেত, তাহলে শুধু কামানের আর বন্দুকের জোরেই এত বড় জাতি গড়ে উঠতে পারত না—এ জাতির মানুষ শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যেত, অথবা মৃতপ্রায় হয়ে আটল্যান্টিকের ওই ক্ষুদ্র দ্বীপটির ধুলোর ওপরই লুটিয়ে পড়ে থাকত।

জীবনকে উপভোগ্য করতে হলে, তার পরিসরও বৃহত্তর করতে হবে। যাতে করে এক জায়গায় বেদনা পেয়ে, অন্যত্র লব্ধ আনন্দের উল্লাসে সেই বুকের ব্যথা ঘুচান যায়।

সাংসারিক অপরিহার্য্য দুঃখ-দৈন্য যখন কেবলই পীড়ন করে, মানুষ যদি তখন এমন একটা যায়গা না পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সে এতটুকু আনন্দ লাভ করতে পারে, তা হ'লে বেদনার আঘাতে সে ত ভেঙে পড়বেই—তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নারীকে কেবলমাত্র গৃহের ঘরণী করে রেখে তোমাদের সমাজ নারীজীবন একেবারে বিফল করে দিয়েচে। এই বিরাট বিশ্বে প্রাচীরবেষ্টিত ওই ক্ষুদ্র আঙিনাটুকু ব্যতীত কোথাও তাদের দাঁড়াবার স্থানটিও নেই। তোমার সমাজের পুরুষ যখন অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, তখন ঐ আবদ্ধ স্থানটুকুর মাঝে পড়েই তাকে যাতনায় ছটফট করতে হয়!

তবুও যে তারা অভিযোগ করে না, তার কারণ হচ্চে এই যে, তারা বোঝে না প্রচলিত প্রথার চাইতে ভাল কিছু থাকা সম্ভব, যা তাদের জীবনকে বেশি কিছু আনন্দ দিতে পারে।

তোমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের সমাজ, সম্মোহনমন্ত্র আউড়ে তোমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, তোমরা ছোট, শক্তিহীন, পুরুষের দাসী। তাই ভিক্ষাস্বরূপ যতটুকু পাও, তাতেই তৃপ্ত হয়ে থাক; আর সেই অবস্থাটাকেই স্বাভাবিক বোলে মনে কর।

তুমি ঠিক বলেচ যে, 'বাইরের আন্দোলনে কিছু হবে না—নারীর অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে মুক্ত হবার, পূর্ণ হবারই একটা আকাঙ্ক্ষা। কোন বিষয়েরই

অধিকার ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না—নিজের চেষ্টায়, নিজেরই শক্তির জোরে সব আদায় করে নিতে হয়। তোমাদের পুরুষেরা তোমাদের কোন অধিকার দেবে কি দেবে না, তা আমি জানিনে। যদি দিতে চায় ত কাজ সহজ হয়েই যাবে। আর দিতে না চাইলেই কি তোমরা চুপটি করে বসে থাকবে? ছুনিয়ার ওপর দাবীটা কি শুধু তাদেরই—তোমাদের কিছুই নাই? আমি একথা কখনো ভাবতে পারিনে যে কেবল পুরুষদের নিয়েই একটা জাতি গড়ে উঠতে পারে। জাতিগঠন ব্যাপারে নারীর দান কি অগ্রাহ্য করা চলে?

তুমি লিখেচ যে, ভাঙ্গতে তোমার বড় ব্যথা লাগে। কিন্তু, সেই ব্যথার ভয়ে চুপ করে থাকলে ত চলবে না। দেহে ফোঁড়া হলে, সে ফোঁড়া কাটতে হবে, চিরতে হবে।—ব্যথা পাবার ভয়ে তাকে বাড়তে দিলে তোমার জীবন নিয়েই শেষটায় টানাটানি পড়ে যাবে। ফোঁড়া কাটবার বেলায় ডাক্তার নির্ম্মম ব্যবস্থাই করে থাকে—তখন রয়ে সয়ে কাজ করলে তার চলে না। রোগী যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, ডাক্তার তখনই মায়ের মত স্নেহ ও যত্ন নিয়ে তার সেবা করে।

যুগান্ত-সঞ্চিত যে অনিয়ম সমাজদেহ সহস্র-বন্ধনে বেঁধে রেখেচে, তার অবিচার হতে মানুষকে মুক্ত করতে হলে নির্ম্মমই হওয়া চাই। ভাঙবার চেষ্টা তখনই নিন্দনীয়, গড়বার প্রবৃত্তির যখন অভাব হয়—কিন্তু গড়বারই জন্য যে ভাঙা, সে ত অনাবশ্যক নয়—সে অপরিহার্য্য।

জেনে খুসী হয়েচি যে, তোমার স্বামী উদারচেতা ও সংস্কার প্রয়াসী। তোমাদের দুজনের চেষ্টায় তোমাদের দেশের মেয়েদের মনের দাসত্ব অন্তত কিছু বিদূরিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তোমার চিঠি পেলে আমার বড়ই আনন্দ হয়—তোমার কাছে চিঠি লিখেও খুব আরাম পাই। তোমাতে আমাতে পত্রব্যবহার কোন দিনই যেন বন্ধ না হয়। জীবনের গতি তোমার আর আমার মাঝে যদি সুমেরু আর কুমেরুর ব্যবধানও ঘটিয়ে তোলে, তবুও যে বন্ধুত্ব-সূত্রে আমরা একবার বাঁধা পড়েচি, তা যেন শিথিল হয়ে না যায়। অটুট বন্ধুত্ব চিরদিনই যেন আমাদের দুটি প্রাণ এক করে রাখে। কেমন রাজী ত?

তোমারই

এভি।

(৫)

ভাই মোহিত,

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েচি—দিচ্চি দিচ্চি করে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। তুমি লিখেচ, পরিবারের লোকের দাবী-দাওয়া আমাদের দেশে বড়ই বেশি—যতদিন না ওর পরিমাণটা আমরা সবাই কমিয়ে ফেলতে পারচি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের ঘরের বিবাদ নিরারিত হচ্চে না। সংসারে কারু কাছে কিছু চেয়ে নিতে হবে না সকলেই প্রাপ্য যা তা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবে—কিছু না পেলেও কেউ রুষ্ট হবে না, এ রকম অবস্থাটা সত্যি মন্দ নয়। সে রকমটি হলে অনেক অ-প্রীতির বোঝা কমে যাবে তাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তুমি কি পারকি তা? যেখানে আমাদের নিজেদের এতটুকু অসুবিধা হবে মনে করি, সেখানেই ত আমরা যেতে নারাজ। সকলের প্রাপ্য যা, তা তখনই দিতে কার্পণ্য করি, যখনই আমরা বুঝতে পারি যে, দান করতে গেলে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা। এই লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশে প্রবৃত্ত হয়েই ত আমরা যত গোলযোগের সৃষ্টি করি—আমরা পেতে চাই অনেক কিছু, কিন্তু দেবার বেলায় কেবল শূন্য।

এটা যে আমাদের বাঙালীদেরই কেবল দোষ তা নয়। মানুষের অন্তরে সর্ব্বত্রই এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রচ্ছন্ন রয়েচে। মানুষ যখন দেখলে যে নিজ নিজ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে উজিয়ে উঠতে পারচেনা, তখনই সমাজগঠন সুরু হোল এবং সবাই কিছু কিছু দাবীর অংশ ছেড়ে দিল, আর একে অন্যকে কিছু দিতেও প্রতিশ্রুত হল। দেনা-পাওনা এমনি করেই দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের সাহায্যে জীবন চালিয়ে নেওয়া সহজ হবে মনে করে। মানুষকে সাধারণোপযোগী একটা কিছু নিয়ম সব সময়েই গড়ে নিতে হবে।

তুমি যদি বল যে, সময় এসেচে, যখন আমাদের এই দেনা-পাওনার দাবীটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে অন্যরকম করে নিতে হবে, তাতে আমি অসম্মত হব না। জীবনের আদর্শ যে বদলে গেছে সেটা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কাজেই নবীন আদর্শ লাভের জন্য এই নতুন জীবনে অনেক কিছু বাদ দিতেও হবে আবার গ্রহণও করতে হবে। অর্থাৎ মানুষ অন্ধের মত গতানুগতিক না হয়ে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগে আপনি জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি আপনিই স্থির করে নেবে।

দাবী যখন তুমিও কর, আমিও করি,—তখন ও জিনিষটাকে ত মুখের

কথায় উড়িয়ে দিতে পারচি নে। গোল এই নিয়েই হচ্চে যে, আমরা যেটাকে দাবীর যোগ্য বিবেচনা করিনে, অন্যে সেইটেই চায়—আর তা আমরা সইতে পারি নে।

তুমি লিখেচ, যে দাবীর জোরে তোমার বউদি প্রভৃতি নীহারকে তোমার কাছে না পাঠিয়ে তাদের কাছে রেখে দিয়েচেন, সে অতি অন্যায় দাবী আমি অস্বীকার করিনে। তোমার মতে এখন পত্নীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এই মিলনের মস্ত বড় একটা সার্থকতাও আছে।

গৌরীদান করে যারা অভ্যস্ত তারা কিন্তু নব-বিহাহিত দম্পতীর মিলনটাকে আবশ্যকীয় বলে মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে দেহের অথবা মনের আকর্ষণ তখন সহজেই উপেক্ষা করা যেত। আজ পরিপূর্ণ দেহ-মন নিয়েই যে বিবাহ বাসরে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় হচ্চে—জানবার ও জানাবার অনেক কর্ম্মই যে এখন তাদের বুক ভরে জমে ওঠে। এখন স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে রাখলে, তারা ত স্বভাবতই খুব ব্যথা পাবে।

কিন্তু তুমি ব্যথা পাচ্ছ বলেই কি অন্যকে আঘাত করবে। আজ যদি তুমি নীহারকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বল, তোমার অভিভাবকেরা পাঠিয়েই দেবেন—কিন্তু অসন্তুষ্ট হবেন, বৌদি হয়ত ব্যথাই পাবেন। সব সময় সঙ্গীন খাড়া করে সংসারে চলা যায় না—ব্যক্তিত্বকে কখনো কখনো চেপে রাখতে হয় এক সঙ্গে অনেকে থাকতে হলে। এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করোনা।

তুমি অবশ্য বলবে, এই রকম সামান্য সামান্য ঘটনার বহুল সমাবেশই একসঙ্গে মিলে দারুণ অবিচারে মানুষকে পীড়ন করে; সুতরাং চোখের সামনে, মনের গোচরে, যখনই তার পরিচয় পাবে, তখনই তাকে নষ্ট করতে হবে। তোমার এ কথার কি জবাব দেব, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারচিনে। ও রকম যাদের মনের ভাব তাদের আমি সাধারণ মানুষের বাইরে—তাই বলে কিন্তু নীচে নয়—স্থান দিতে চাই; আর অসাধারণ যারা হবে, তাদের জন্য কোন বিধি নিয়মই খাটবেনা। আপনাদের শক্তির জোরেই নিজ নিজ লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে যাবে, কিছুই তাদের গতির ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

সমাজে যদি এই ধরণের অসাধারণ লোক ক্রমে বেড়েই চলে, তা হলে

শেষটায় তারাই সাধারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এখন যাকে অবিচার অত্যাচার বলচি সে গুলি বিদূরিত হয়ে আবার নতুন রকমের অবিচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হবে। এই রকম ততদিন হতে থাকবে যতদিন না মানুষ দেবত্ব লাভ করবে। অবশ্য, দেব সমাজে যে কেউ কারু ওপর অত্যাচার করে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারিনে। ঠিক কোথায় গেলে সে মানুষকে এতটুকু উৎপীড়ন অত্যাচার সইতে হবে না তা' আমি কল্পনায়ও জানতে পারিনে।

সেই জন্যইত আমি চারিদিকের সব কিছু ভেঙে চুরে এগিয়ে যেতে চাইনে। অমঙ্গল মাত্রকেই পায়ে দলবার প্রবৃত্তি আমি রাখিনে কারণ, আমি জানি, সেখানেই যাব, ওসব ঘাড়ে চেপে বসবেই—যদি ধীর স্থির ভাবে অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিবর্ত্তিত করতে না পারি। আমি যে পরিবর্ত্তন আনতে চাই তাতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হবেনা, তাতে সমস্ত বিষয়েরই একটা আগা-গোড়া সামঞ্জস্য থাকবে। সেই জন্যই কেবল আস্তিন গুটিয়ে চলবার ভাবটা আমার ভাল লাগে না—সবই রয়ে সয়ে করাই আমার অভিপ্রেত।

কিছুদিন হতে একটা কথা কেবলই আমার মনে হচ্চে এবং সে-টা তোমায় না জানিয়ে থাকতে পারচিনে। সে হচ্চে আমাদের নবজাগরণের কথা। আমাদের চিত্তে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েচে, যার ফলে আমরা নিজেদের ভিতর একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তির বেগ অনুভব করচি এবং যা আমাদের কেবল সামনের দিকেই ছুটিয়ে নিতে চাইচে—তাতেই উত্তেজিত হয়ে হাতের মাথায় যখন যা কিছু পাচ্ছি, তাই নিয়েই আমরা টানাটানি সুরু করে দিয়েচি। কোথাও কিছু সামঞ্জস্য নেই—আগাগোড়া কেবলই অমিল।

শক্তি সু-নিয়োজিত না হলে, তার অপচয় অবশ্যম্ভাবি। অকাজে ব্যয়িত হ'লে অফুরন্ত যা নয়, তার অভাব ঘটবারই বেশি সম্ভাবনা আমার ভয় হয়, যে শক্তি আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হয়েচে, তা তেমন ভাবে খরচ করে আমরা শেষটায় দেউলে হয়ে না যাই।

তুমি চাও সমাজের সংস্কার সাধন করতে নির্ম্মম শক্তি প্রয়োগে। তোমার এই বল প্রয়োগ নারীকে স্বাধিকার লাভে কতটা সহায়তা করে তাই একবার দেখা যাক। তুমি আঘাত করে যাদের বুকে ব্যথা দেবে, কেমন করে প্রত্যাশা করতে পার যে তারা তোমার কাজের সহায়তা করতে অগ্রসর হবে? রক্ষণশীল বলে যাদের তুমি নিন্দা পরিহাস করবে তারা স্বভাবতই ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণই করবে। এরূপ অবস্থায়

যে পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টা তুমি করচ, সমাজের বহুসংখ্যক লোকের প্রতিকূল আচরণে তা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ক্ষেপে উঠে তারা অমনিই যতটুকু দিতে চাইত, তাও দেবে না – বাংলার নারীরা যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে, অকারণে তোমার খানিকটা শক্তি ক্ষয় হবে।

অথচ, ধীরে ধীরে তুমি যদি স্থিরভাবে কাজ করতে থাক, তা'হলে হয়ত তোমার ঈপ্সিত সহজেই মিলবে, তোমার চেষ্টা সফল হবে।

আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ভাল আছি। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখো। কনক নীহারের চিঠি রীতিমতই পাচ্ছি ইতি—

তোমারই—নরেশ

নিশ্চিন্ত।

(শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত)

তুমি গো আমায় করেছ পাগল,
হৃদয় দুয়ারে ভেঙেছ আগল,
বিনাশি সরমে
পশেছ মরমে
মোর ;
তাই লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিকাশ
হয়েছে ভোর।
আমার মাঝারে তোমার বিকাশ
আজ
করেছে সফল,
আমার সকল
কাজ ;
জানি মোর কোন কাজ নাই
এবে আর,
উদাসীর মত আছি আমি তাই
নিশিদিন অনিবার।

ততো জয়মুদীরয়েৎ।

(ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির অনুবাদ)

(অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম, এ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ"

মহাভারতে প্রত্যেক পর্ব্বের আরম্ভে এবং গ্রন্থশেষে (১৮শ পর্ব্ব, ২৩২) পাঠমাহাত্ম্য বর্ণনাকালে এই শ্লোকটি দেখিতে পাই। এই নমস্ক্রিয়াবাক্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সাধারণে ইহা শুধু পড়িয়াই যায় এবং কিছুমাত্র না ভাবিয়া কথাটা সাদাসিধাভাবে অনুবাদ করিয়া লয়। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় এই প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,— "নারায়ণকে, নরশ্রেষ্ঠ নরকে, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিবে।" চতুর্থ পাদের যে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখাইয়াছেন—ততো ব্যাপ্তস্তয়ৈব সরস্বত্যা পরম-কারুণিকয়া জনবোধায়াবিষ্টৌ জয়ং 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ম্' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাজ জয়সংজ্ঞম্ ভারতাখ্যম্ ইতিহাসম্ বা—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতম্ তথা
কার্ষ্ণ্যম্ বেদম্ পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ
ইতি ভবিষ্যবচনাৎ পুরাণাদিকম্ বা—

'চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োঽস্ত্রিয়াম্' ইতি কোষাদন্তং বা পুরুষার্থ-প্রতিপাদকং গ্রন্থং শারীরকসূত্রভাষ্যাদিরূপম্ উদীরয়েৎ উচ্চারয়েৎ।

প্রকৃত টীকাকার নীলকণ্ঠ 'ততঃ' এই শব্দটির নিজস্ব একটা অর্থ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্র ইহা ছাড়িয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার প্রতিশব্দ, 'পরে', তাহার পর' অর্থাৎ এখানে ঐ ত্রিবিধ নমস্কারের পর নীলকণ্ঠ পূর্ব্ববর্ত্তী 'সরস্বতী' শব্দের সঙ্গে ইহা ঘনিষ্টভাবে যুক্ত করিয়া

দিতে চাহেন। তাঁহার ব্যাখ্যা—'সেই পরমকারুণিক সরস্বতীদেবীর প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া, আর 'জয়' শব্দের 'জয়লাভ' এই সাধারণ অর্থ না ধরিয়া তিনি বলেন, এখানে উহা স্বয়ং মহাভারতকেই বুঝাইতেছে। ইহার পক্ষে তিনি মহাভারতের শ্লোক স্পষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে দুইবার আছে—ইহার জয় নাম দেওয়া হইল। (১।২৩০২ ; ১৮।১৯৪) এই সংজ্ঞা মহাকাব্যে 'বিদুলপুত্রানুশাসন' (৫।৪৬০৯) উপাখ্যানে প্রযুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ প্রমাণস্বরূপ ভবিষ্যপুরাণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ভবিষ্যপুরাণে শুধু মহাভারতকেই জয় নাম দেওয়া হয় নাই,—অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, বিষ্ণুধর্ম্ম ও শিবধর্ম্মকেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক অভিধানে, জয়শব্দের অর্থ, "যাহা চারি পুরুষার্থের কারণ"; এই অভিধানের বলে তিনি ব্যাসের দার্শনিক গ্রন্থ, শারীরক সূত্র, ও সেই সঙ্গে শঙ্করাদি প্রণীত তাহার টীকা,—সমস্তই 'জয়' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে চাহেন।

নীলকণ্ঠ যেন এখানে পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; তিনি এখানে জয় শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা শুধু অভিধানেই আবদ্ধ, কিম্বা, কাল্পনিক; সাহিত্যে ও ভাষায় তাহার প্রয়োগ নাই। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিলে আধুনিক যুগের প্রতাপচন্দ্র রায় এবং পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা সঙ্গত। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য উদাহরণ নাই যে, 'উদীরয়তি' ক্রিয়া যাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ। পাঠকদিগকে অবশ্য একথা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে 'উদীরয়তির' প্রকৃত অর্থ চালাইয়া দেওয়া, বায়ুতে ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা, এবং ইহা হইতে রূপক অর্থ, শব্দ উচ্চারণ করা। কিন্তু সেরূপস্থলে ক্রিয়ার সহিত এমন একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা শব্দের ঠিক বোধটি আনিয়া দেয়;—ন তাং (বাচম্) উদীরয়েৎ; মনু, ২।১১৬; বাচম্ উদীরয়ন্, রামায়ণ ২।৫৭।৩; উদীরয়ামাসুঃ···আলোকশব্দম্, রঘু ২।৯; মন্ত্রমুদীরয়ন্, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩৬।

নীলকণ্ঠের প্রস্তাবিত এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পরে দেখা যাউক, আর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা যাহা অধিক সহজ ও অধিক সঙ্গত হইতে পারে। লোকে অনায়াসে এরূপ অনুবাদ করিতে পারে,—নারায়ণ, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নর, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া (মানুষ) তবে জয়লাভ করিতে যায়। নর-নারায়ণ আর কৃষ্ণার্জ্জুন একই, একথা আমাদের

জানা আছে, কারণ ইহা মহাভারতে বহুবার বলা হইয়াছে—১।২১৮।৭৮৮৯, ১।২২৪।৪১৬১, ১।২২৮।৮৩০২; ৩।৪৭।১৮৮৮; ৫।৯৬।৩৪৯৬, ৫।১১১।৩৮২৪; ৭।১১।৪২২; ৭।৭৭।২৭০৭; ইত্যাদি। এই একত্ব স্বীকার করিলে আর একটি বাক্য মনে পড়ে, তাহা এই প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর মত সমগ্র গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে আছে, তাহা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষারূপে ভারতের অন্তরে আজিও বিরাজমান :—যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ১।২০৫।৭৫১৩; ৪।৬৮।২৫৩১; ৬।২১।৭৭১; ৬।২৩।৮২১ ইত্যাদি। 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়। অনেক স্থানে এই বাক্য ইহার অনুরূপ আর একটি বাক্যে পূর্ণতালাভ করিয়াছে, "যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ"...৬।২৩।৮২১; এই দুই বাক্য একত্র হইয়া হইল—যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ১৩।১৬৮।৭৭৪৬ যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। অবশেষে 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' এই বাক্যের উৎপত্তি হইল। এই আকারে বাক্যটি যেন বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা দিতেছে—ধর্ম্মের জয় হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহাভারতের প্রধান অর্থই বাদ যায়। মহাভারত যে নীতিমূলক শিক্ষাগ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কাব্যে ও নীতিতে ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের চিহ্ন স্পষ্ট আছে; হিন্দুজাতির অন্যান্য কৃতির ন্যায় এই মহাকাব্যও সমগ্র জাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের। ইহার নাম পঞ্চমবেদ, লোকে ইহাকে পঞ্চমবেদ বলে, ব্রাহ্মণদের চতুর্ব্বেদের প্রাতিপাদ্য বিষর, আর্য্য জীবন, পবিত্র জীবন; আর মহাভারত এই চারিবেদের সমান আসন অধিকার করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ জীবন শিক্ষা দেয়। ইহার অন্য নাম কার্ষ্ণ্যবেদ, কৃষ্ণের বেদ, কারণ ইহা ক্ষত্রিয়দের নিকট সিদ্ধিও মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়রূপে কৃষ্ণধর্ম্ম প্রচার করে। "জয়"—যুদ্ধে জয়লাভ—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সিদ্ধি; ক্ষত্রিয়ের শরণ, ক্ষত্রিয়ের প্রণম্য—ক্ষত্রদেবতা কৃষ্ণ। "যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়," কারণ "কৃষ্ণকে পাইলে সবই পাওয়া যায়।" "যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্ব্বে।" যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম তাহাকে বলে,—"মরিলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে মহীভোগ করিবে, সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরণ যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না জয়লাভ কর।" দুষ্টের দমন ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের হস্তে শাসনদণ্ড অর্পণ করে। এই সকল নীতির বা মতের উদাহরণ ও পরিণতি—মহাভারত, এই সকল মত ভগবদ্গীতায় একত্র হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ভগবদ্গীতা অনুপম নাট্য, লোকে প্রায়ই বলে, মহাভারতে ইহা অসংলগ্নভাবে অনর্থক জুড়িয়া

দেওয়া হইয়াছে, মূলে আখ্যানবস্তুর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে, সমস্ত গ্রন্থটির কেন্দ্রই হইতেছে এই ভগবদ্গীতা। নরনারায়ণ-রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবতীর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুন, প্রধান সঙ্কটের সময় ধ্যানমগ্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, বীরধর্ম্মের শ্রেষ্ঠগুরু আনন্দময় ভগবানের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন; আর ভগবান্ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন, বিশ্ববিধান মতে তাঁহার স্বধর্ম্ম, নিজের ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে; শুভ যাহা, সাধু যাহা, তাহার জন্য আবশ্যক হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া আত্মীয়দের রক্তপাত করিতেও তিনি প্রস্তুত। ব্রাহ্মণদের অধ্যাত্মতত্ত্ব এতদিন কর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিল, আজ তাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মপ্রাণতার সহিত বেশ মিলিয়া গেল। অর্জ্জুন শুধু বীরশ্রেষ্ঠ নহেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে। একদিকে বহুসংখ্যক দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণীসেনা, অন্যদিকে সারথীরূপী শ্রীকৃষ্ণ একা, এই উভয়ের মধ্যে তিনি সিদ্ধির অভ্রান্ত নিদর্শন কৃষ্ণকেই সহায়রূপে গ্রহণ করিলেন। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মহাভারতকে বিশুদ্ধ নীতিগ্রন্থ বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত; তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে লইয়া বড় গোলে পড়েন,—বীরধর্ম্মের আদর্শের সহিত পাণ্ডবদের কয়েকটি কৌশলের মোটেই সামঞ্জস্য নাই; দ্রোণকে নিরস্ত্র করিতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এক হীন কৌশলের আশ্রয় লইলেন, ভীমসেন অন্যায়রূপে দুর্য্যোধনকে আহত করিলেন। এই সকল কর্ম্মের দায়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণের স্কন্ধে চাপাইতে কবি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন; তাঁহার অতীন্দ্রিয়জ্ঞানে তিনি কর্ম্মজীবনে আবশ্যক বলিয়া ইহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবানের জয় যদি উদ্দেশ্য হয়, ত যে উপায়ই অবলম্বন কর না, সকলই সাধু।

তাহা হইলে মনে হয়, ঐ প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর এরূপ ব্যাখ্যা করিলে কেহ আপত্তি করিবেন না—"নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী সরস্বতীকে পূজা করিয়া তবে লোকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জয় আশা করিতে পারে।"

উপরের ব্যাখ্যা ঠিক হইলে অনেক পরিশ্রম করিয়া মহাভারত সম্বন্ধে যে সব মত খাড়া করা গিয়াছে সে সব মত আর টিঁকিবে না। এমন কি, এ পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক প্রাচীন কাব্য বাড়াইয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে, সেই মূল কাব্যের নায়ক ছিল দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ। কিরূপ ভাবে কাব্য বাড়িয়া উঠিল, কাব্যের ক্রমবিকাশ লইয়া, আলোচনা না করিয়া

তাহার রসভোগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাধু। ভারতবর্ষে যে এমন এক-দল কবি ছিলেন যাঁহারা কাব্য আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এই ভারত সূর্য্যের তলে একদিন মধ্যযুগের জীবন ফুটিয়াছিল। আধুনিক রাজপুতদের ন্যায় প্রাসাদদুর্গে সুখাসীন সেকালের রাজগণ এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানের আবৃত্তি শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার অবসরে চিত্তবিনোদন করিয়া লইতেন; অতীত বীরকীর্ত্তি প্রখ্যাপনকারী অনিয়তবাস কবিদের জন্য ইঁহারা অধীর উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু এই মহাকাব্য ত এক একটি করিয়া গ্রথিত বীরগণের উপাখ্যানের সংগ্রহ মাত্র নহে, ইহা একভাবে ভাবিত, আর সে ভাব ইহাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছে, প্লাবিত করিরা দিয়াছে; পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইহা, ইহার আখ্যান ভাগ এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে কলাকৌশল সহযোগে সংস্থাপিত। পাশ্চাত্যে ঐক্য জাতীয়ভাবে প্রকাশিত, সেখানে কবির প্রেরণা আসে স্বজাতিপ্রীতি হইতে। ইলিয়ড্ ইনিয়ড্ গ্রীস রোমের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। চ্যাপলিনের লা পুসেল ও ভল্টেয়ারের হাঁরিয়াড্ ফ্রান্সকে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সকল শ্রেষ্ঠ উপায়ে বহুকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারা যায়, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস একটি; এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেও কাব্যের প্রেরণা আইসে; 'স্বর্গচ্যুতি,' 'মেসিয়া,' খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব বাড়াইবার জন্য রচিত। এইরূপ জাতীয় ভাব ভারতে কখনও উদ্বুদ্ধ হয় নাই; ধর্ম্ম এবং সমাজ ছাড়া আর কোথাও ভারত তাহার ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পায় নাই। মহাভারতের প্রেরণা আসিয়াছে এই সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে। হিন্দু সমাজ গঠনে ক্ষত্রিয়কে যে আদর্শ সাধন করিতে দেওয়া হইয়াছে, মহাভারত সেই আদর্শ প্রচার করে; ভগবানের যে মহিমা ক্ষত্রিয়ের সিদ্ধিপ্রদ, মুক্তিপ্রদ, মহাভারত ক্ষত্রিয়কে সেই ঈশমহিমা শিখাইতেছে। যে কৃষ্ণপূজা যুগে যুগে ভারত সাহিত্যে অবদান পরম্পরা সাধন করিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ সমাজে কাব্যে তাহার প্রতিচ্ছবি রাখিয়া গিয়াছে। শোভা সৌন্দর্য্য কোমলতা মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু ভারতে লুকান ছিল, ব্রাহ্মণদের ভারত সে সব একত্র করিয়া রাখিয়াছে। শুধু সাহসবীর্য্য-ব্যঞ্জক সেই মহাপুরুষের অসামান্য কান্তিই বুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। একজন জগতের বিষাদের অবতার জীবনের দুঃখকষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নির্ব্বাণ ছাড়া আর কোথাও শান্তি নাই। আর যাঁহারা বীরত্বে, মহৎকর্ম্মে অনুরক্ত তাঁহারা অন্যটির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—আকৃষ্ট

হইলেন। দুইয়ের ভক্ত ভারত ও বিদেশ হইতে আসিয়া মিলিত। দার্শনিক রাজ মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক হিলীওডর নামে তক্ষশিলাবাসী (রাজা অ্যান্টাক্লিডাস কর্ত্তৃক ভারতের কোনও রাজ সভায় প্রেরিত দূত) আর একজন গ্রীক, ক্ষাত্রদেবের শরণ লইয়া দেবদেব বাসুদেবের গৌরবচিহ্ন স্বরূপ গরুড় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুষণেরা যখন হিন্দুস্থানে এক প্রকাণ্ড সিথিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল, তখন কনিষ্কের এক বংশধর 'বাসুদেব' আখ্যাও গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক উপাদানের একান্ত অভাবে, এই সব লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি, বৌদ্ধদের মত ভাগবতদেরও ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল।

রচনারীতি দেখিয়াও মনে হয়,—মহাভারত প্রণয়নের মূলে আছে—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মহাভারত এই বলিয়া স্পর্দ্ধা করে যে, সে শতসাহস্রী; অর্থাৎ, এমন প্রকাণ্ড গ্রন্থ যে, সাধারণ মানবরচিত গ্রন্থের পরিমাণ অনেক মাত্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। "ইতি শ্রীমহাভারতশাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্...পর্ব্বাণি......অধ্যায়াঃ।" এই অভিধান পঞ্চমযুগের রীতির অনুমোদিত ছিল। খোয়াতে প্রাপ্ত ২১৪ খৃঃ এর শর্ব্বনাথের শিলালিপিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়,—মহাভারত শতসহস্র শ্লোকের সংগ্রহ। "উক্তঞ্চ মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াম্" কিন্তু এই নাম বৌদ্ধ সাহিত্যের এক মূল গ্রন্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই গ্রন্থের নাম 'শতসহস্রিকা' বা 'শতসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।' জন সমাজে প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে আয়তনে কমিয়া ২৫০০০, ৮০০০ (প্রাচীন প্রথায়, অষ্টসহস্রিকাই গ্রন্থের আয়তন হওয়া উচিত), ১০০ বা ৫০৳ ছত্রে আসিয়া পৌছিয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর, একই কথার বার বার প্রতিশব্দ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার যেরূপেই হউক ইহাকে নির্দ্দিষ্ট আকার দিতে কৃতসঙ্কল্প, সুন্দর যাহা তাহাকে পাওয়ার পথে ভারত আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে সুন্দরের সন্ধানে বৃহতের কাছে, বহুর কাছে চলিয়াছে। কথা সাহিত্যের "বৃহৎকথা"য় ও এইরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে; গুণাঢ্য, কথাসাহিত্যের ব্যাস; তিনি "বৃহৎকথা" লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসের শতসাহস্রী ও বৌদ্ধ শতসহাস্রিকায় লেখকদের যে ধর্ম্মানুরাগ প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনায় ধৈর্য্যের অনুকূল: তাঁহার গ্রন্থরচনায় সে ধর্ম্মানুরাগ ছিল না; তাই তাহার নানারূপ সংক্ষিপ্ত

সংস্মরণ আছে। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী" বাঁধিয়াছেন, 'সংগ্রহ' করিয়া বুদ্ধস্বামী তাহা কাব্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সোমদেব গ্রন্থখানি আকারে আরও সংক্ষিপ্ত কলেবর করিয়াছেন—বলিয়াছেন, "সংগ্রহং রচয়ামি অহম্।"

মহাভারতের উপমা খুঁজিতে গেলে আবার এই বৌদ্ধধর্ম্মেই আসিতে হইবে। মূল সর্ব্বাস্তিবাদিগণ সংস্কৃতকে শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষলাভের প্রমাণ স্বরূপ এক প্রকাণ্ড "বিনয়" গ্রন্থ জগৎকে দিয়াছেন, এই গ্রন্থ সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বিনয়ের প্রায় দ্বিগুণ, সর্ব্বাস্তিবাদীগণের "বিনয়" আবার স্থবির, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, মহাসংঘিক, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিনয়কে আকারে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিনয় শতসহস্রিকা হইতেও বৃহৎ; এক গ্রন্থমালায়, শতসহস্রিকা যদি দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বিনয় গ্রন্থ তবে ত্রয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বিহারের শিক্ষাদীক্ষাবিষয়ক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর চারিদিকে অনুবাদক নানারূপ গল্প, জাতক, উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়াছেন, প্রকৃত বুদ্ধের জীবনী হইল কি না, তাহা দেখেন নাই। ইহা একপ্রকার 'বুদ্ধবংশ,' মহাভারতের হরিবংশের মত। এই সকল উপাখ্যান ও বিচিত্র কথামালা লইয়া মহাভারত এইরূপ এক বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার উদ্দেশ্য—ভাগবত প্রথামত ক্ষত্রিয়দিগকে শিক্ষাপ্রদান।

মিছে।

(শ্রীকালীপদ ঘোষ)

মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে কেন আঁটা কাঁচলি,
মিছে কেন আর কাজলের টিপ্, মিছে শোভা সাজ সকলি;
মিছে কেন আর বকুলের মালা,
মিছে কেন আর চন্দন ঢালা,
মিছে কেন পরা নীলবাস খানি, শ্যাম বিনা সব বিফলই;
মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে মেছে কেন আঁটা কাঁচলি

মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া,
মিছে কেন আর নুপুরের ধ্বনি, মিছে কেন পথ চাওয়া,
মিছে কেন আর চকিত নয়ন,
মিছে কেন আর রচিত শয়ন,
মিছে কেন বল কুসুম চয়ন, মিছে অভিসারে ধাওয়া ;
মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া।

মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে,
মিছে কেন সওয়া গঞ্জনা তার, চলে গেছে বঁধু যেকালে,
মিছে কেন চ'খে অঞ্জন আঁকা,
মিছে কেন পায়ে রঞ্জন মাখা,
মিছে কেন বল অধরের হাসি যৌবন সুধা ফুরালে ;
মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে।

মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে,
মিছে কেন ফুটে অশোক পুঞ্জ মিছে কেন চলে বাতাসে,
মিছে কেন শুধু করা হা হুতাশ,
মিছে কেন ফেলা বেদনার শ্বাস,
মিছে কেন মরা মরম দহনে, মিছে কেন আর ভাবা সে ;
মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে।

মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে,
মিছে কেন বল আঁখি না মেলিতে বকুল বালার ঝরা এ,
মিছে কেন অলি আসে উড়ে উড়ে,
মিছে মধুটুকু গেছে যদি ঝরে,
মিছে কেন বল যমুনার পাড়ে গাছ গুলি শাখা বাড়ায়ে ;
মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে।

মিছে কেন আর তমালের শাখে শুকসারি গাহে বন্দনা,
মিছে কেন আর শিরীষের শিরে শিস্ দিয়ে ডাকে চন্দনা,
মিছে কেন আর মাধবী বিতানে,
পবন সঘন শিহরণ হানে,

মিছে কেন আর কন্ধুক বনে পিকরাণী করে মন্ত্রণা,
মিছে কেন আর তমালের শাখে শুক্‌সারি গাহে বন্দনা।

মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি,
মিছে কেন ওই পথে চলে যেতে ফিরে ফিরে চায় ধবলী,
মিছে কেন মাঠে শ্যাম ঘাসগুলি,
পায় নাই যদি পূত পদধূলি,
মিছে কেন কর পরশন যাবি দাঁড়ায়ে র'য়েছে শ্যামলী ;
মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি।

মিছে কেন আশা 'রাধা' ব'লে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী,
মিছে কেন ভাবি শ্যাম যে আমার, আমি সে শ্যামের কিশোরী,
মিছে কেন সখি আমি গরবিণী,
তারে ভাল বাসি তার প্রণয়িণী,
মিছে কেন সখি করি তারে দোষী যদিই সে যায় পাসরি ;
মিছে কেন আশা 'রাধা' বলে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী।

মিছে কেন সখি সংসার আর, মিছে কেন সহা যাতনা,
মিছে কেন আর বিফল প্রয়াস, মিছে কেন বল কামনা,
মিছে কেন বল আর না মরিব,
সে মরণে যদি কালায়ে পাইব,
মিছে নয় এই যমুনায় রব, পুনঃ ঘরে ফিরে যাব না ;
মিছে কেন আর সংসার সখি, মিছে কেন সহা যাতনা।

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাখু এইবারে বুঝিল, রাত্রির মত আর চারুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত তার বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আলাপ-কুশলতার অভাবে তাহার কথায় চারু বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নহিলে বোধ হয় অত শীঘ্র সে ওরূপভাবে চলিয়া যাইত না। বোধ হয়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া তাহার সঙ্গে চারুর গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহারও তো চারুকে শুনাইবার অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল! অন্ততঃ যে একটা কথা না বলিতে পারিলে, শুধু সে রাত্রি কেন, ইহার পরেও কত রাত্রি তার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইবে, সে কথা ত চারুকে শুনাইবার উপায় রহিল না! বলিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি রাখু তাহা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই—চারুকে দেখিলেই তার স্ত্রী রাখীর মুখ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে কেন, দুই মুখের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে, এক একবার চারুকে দেখিলে তাকে রাখী বলিয়াই ভ্রম হয়। অবশ্য চারু রাখী নয়। চারুর ভাষায় যে লালিত্য তাহা রাখীর ভাষায় ছিল না, চারুর বর্ণটাও বুঝি রাখীর বর্ণ হইতে অনেক উজ্জ্বল। তার হাসির ঝঙ্কারের মিষ্টতা—রাখীর বাপের সমস্ত ক্ষেতের আখ নিংড়াইলেও বুঝি পাওয়া যাইবে না! আর সম্পদ? ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কন্যা হইলেও রাখু তার যে অহঙ্কার দেখিয়াছে, চারুর সম্পদের অধিকারী হইলে রাখীর কি আর মাটীতে পা পড়িত? না রাখুই তার দশ হাত দূরেও দাঁড়াইতে পারিত? বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ এই চারুর সঙ্গে সেই রূঢ়ভাষিণী পল্লীবাসিনীর কত প্রভেদ!

তথাপি—তথাপি চারুকে দেখিয়াই রাখুর মনে হইয়াছিল, যেন বহু বৎসর না দেখা এক কমল-কোরক হঠাৎ তার চোখের উপর শতদল সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহাকে আবার দেখার সাধ অতি তীব্রভাবে যুবকের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর ত সে তাকে

ডাকিতে পারে না! চারু আঁধারে ডুবিল, তার সঙ্গে রাখুর পুনঃ সাক্ষাতের আশাও বুঝি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল!

ঘরের ভিতরে এক একবার ঝটিকা তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল। ঘরের একটি কোণে থাকিয়াও আলোটা মাঝে মাঝে মৃত্যু-শিহরণে রাখুকে দ্বার বন্ধ করিতে মিনতি করিতেছিল। তথাপি সে বাতাসে বুক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; গৃহ প্রবেশের সময় অন্ততঃ সে একবার চারুকে দেখিবে। দেখিবে, ঘরে ঢুকিবার মুখে সে একবার তাহার পানে চাহে কি না। ফিরিয়া চাওয়ার কোন মূল্য আছে কি না, সেটা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এটাও সে ভাবিবার অবসর লইল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে চলিয়া চারু তার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। এতক্ষণ রাখু তাহাকে দেখিতে পায় নাই—এইবারে দেখিল। দেখিল—সে মুখ না ফিরাইয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণের অপেক্ষায় যখন রাখু দেখিল, চারু দোরটা বন্ধ করিতেও আসিল না, এবং ঘরের নৃত্যশীল আলোক একটি বারের জন্যও তার ছায়ার একটু প্রান্ত পর্য্যন্তও নাচাইল না, তখন সে ফিরিয়া গালিচার উপরে বসিয়া আবার তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল।

তামাক পুড়িয়া, আগুন নিবিয়া যখন নলটা গড়গড়ার ভিতর হইতে কেবল-মাত্র জলের বাষ্প বহিয়া তার কণ্ঠ শীতল করিতে আসিল, তখন আলোটা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে।

অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল, কিন্তু কবাট বন্ধ করিতে যেমন সে আবার দোরটির কাছে আসিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল—সেই সন্ধ্যাকালের মত অদ্ভুত অপ্সরার গান ঝড়ের পৃষ্ঠে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

আর রাখুর কবাট বন্ধ করা হইল না। শুনিবার অত্যন্ত আগ্রহে চারুর ঘরের পানে চাহিয়া সেই অপূর্ব্ব সুরের রূপটাই যেন সে পান করিতে লাগিল। ঝড় সুরটাকে ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া স্তবকে স্তবকে তাহার কানে উপহার দিতে-ছিল। অবকাশে অবকাশে সেই ভাঙ্গা সঙ্গীতের পুঞ্জীকৃত উচ্ছ্বাসে তাহার শ্রবণ লালসা তৃপ্ত না হইয়া এমন উছলিত হইল যে, রাখুর সেখানে স্থির থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু মর্য্যাদা বোধের সামান্য মাত্রও অভিমান যদি তার থাকে, তাহা হইলে, চারু বিদায় গ্রহণকালে যেরূপ সংযত ব্যবহার

তাহার প্রতি দেখাইয়াছে, তাহা দেখিবার পর এরূপ গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ রাখুর কোনও মতে কর্ত্তব্য হয় না।

সে তখন মুগ্ধ চিত্তের প্রেরণায় দুই চারিবার ঘরের ভিতরেই চলাফেরা করিল। দুই একবার বসিল, আবার উঠিল, কিন্তু একটিবারও চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে ভরসা করিল না।

অবশেষে গানটা যখন তার নির্ম্মম মুখরতা একটা বিচিত্র গিটকিরী ভরা করতবে মিশাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, রাখুও অমনি বদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অবশাঙ্গের মত গালিচার উপরে শুইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

১৩

আসল কথা—চারুর ঘরে আজ তার স্বামী অতিথি হইয়াছে। বারো বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। দেখিবার প্রত্যাশা ত করেই নাই—রাখেও নাই। পথহারা দেবতার মত ঝড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া সে যে আজ তার অপবিত্র বিলাস মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে; স্বপ্নের সাহায্যেও এ নারী যদি সে কথা ভাবিতে যায়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নটাও বুঝি পাগল হইয়া উঠে। অথচ সমস্ত সত্যের আবির্ভাবের মত সেই ঘটনাই আজ ঘটিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই সে তার তখনকার বাবুর আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোনও কারণে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সেদিনকার মত স্থগিত থাকিলেও রাত্রিকালে তাহার বাবুর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধুর আগমনও সে যে প্রত্যাশা না করিয়াছিল এমন নয়। সে জন্য সে তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা ও সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই সে দেখিল, হঠাৎ ঝড়টা প্রবল হইয়া তার আয়োজন পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি তার বিশ্বাস ছিল, আর কেহ না আসুক, সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ বাবু আসিবে। যেহেতু তার জানা ছিল, সে দিন সে বাড়ীতে এমন একটি ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকও ছিল না যে, সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে চারুর সঙ্গী হইতে পারে।

ঝির মুখে তার বাবুর অবস্থানের কথা শুনিয়া লীলাবিলাসের এ একটা নূতন ভাব বুঝিয়া চারু তাহাকে ধরিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, ঝি অন্ধকারে লোক ভুল করিয়াছে। অন্ধকারে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়—বাবুর একজন ইয়ার। বাবু আসে নাই জানিয়া, পথের পানে চাহিয়া সে তার

আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রসিকতার অঙ্গস্বরূপ 'বাবু'র বিলাস-গৃহের সহচরেরা কখন কখন তার প্রণয়িনীর পদ-প্রহারে চরিতার্থ হইয়া থাকে। চারুও সেইভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিতে গিয়াছিল। তাহার পায়ে সুকোমল মখমলের জুতা ছিল। সে 'ইয়ার'কে প্রহার করিবার ছলে মখমল দিয়া রাখুর জানুর পিছনে ধীরে আঘাত করিল। করিয়াই বুঝিল, সেও ঝিয়ের মতই ভুল করিয়াছে। ভুলের পরিমাণটা বুঝিতে গিয়া সে বিস্ময়-বিমোহে চাহিয়া দেখিল, তাহার জীবন-সৌধের সমস্ত প্রাচীর কোন এক ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাথা স্থির রাখা তখন তার অসম্ভব হইয়া পড়িল, সে দেয়ালের সাহায্যে ভগ্ন স্তূপের ভিতর হইতে আপনাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিল। এখন তার প্রাণটা অস্তিত্বের লোভে ঝড়ের বাতাসকে পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সে কুলত্যাগ করিয়াছিল। সে ত্যাগের ইতিহাস আমাদের এ আখ্যায়িকার পক্ষে একান্ত অবান্তর না হইলেও সে কথার উল্লেখ করিতে আমরা নিরস্ত হইব। তবে এ কথা আমরা বলিতে পারি, চারুর গৃহত্যাগে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের অল্পবিস্তর দোষ থাকিলেও রাখু সে সম্বন্ধে একেবারেই নিরপরাধ ছিল।

চারুর পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের তীরস্থ একটি গ্রামে, রাখুদের বাড়ী হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে।

যখন তাহাদের বিবাহ হয়, তখন রাখুর বয়স ছিল এগারো, চারুর দশ। রাখু কুলীন, এইজন্য চারুর বাপ এই অল্প বয়স্ক বালককে একরূপ কিনিয়া আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল।

তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল রাখহরি। মায়ের তিন চারিটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে সে জন্মিয়াছিল বলিয়া ঐ নাম সে মায়ের কাছে পাইয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুর পর যখন সে তার মামার অভিভাবকত্বের আশ্রয় পাইল, তখন তার বয়স সাত। মামা অভিভাবক হইলেও নির্ম্মম মামীর কাছে পড়িয়া এই হতভাগ্য বালক অতি অনাদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তার প্রতি তার মামীর ব্যবহার প্রতিবেশীদের চক্ষে সময়ে সময়ে এমনি কঠোর বোধ হইত যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল, সেই অল্প বয়সে রাখু শ্বশুরের আশ্রয় না পাইলে তাহাকে সত্বর কোনও নিরুদ্দেশের পথে পলায়ন করিতে হইত।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া রাখু দিন কয়েক বেশ সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, বছর দুই শ্বশুরের গৃহে বাস করিতেই তার শ্বশুর মরিল এবং সেও বিষম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। রোগ রহিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসর ক্রমাগত জ্বরের উপর জ্বর রাখুর শরীর একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই কয় বৎসরের ভিতর কিন্তু বালিকার দেহ যৌবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আর বালক রাখু প্লীহা ও যকৃতের আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে রক্তশূন্য দেহে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া ক্রমে একটি পুঁটুলির আকার ধারণ করিয়াছে।

চারুর পূর্ব্ব নাম ছিল রাখী; তাহার স্বামীর নামেরই অনুরূপ। নামটা বোধ হয় রক্ষাময়ী কিম্বা ঐরূপ কোন একটা নামের অপভ্রংশ। সেও বোধ হয় তার মায়ের অনেকগুলা মরা সন্তানের পর জন্মিয়াছিল। তার একমাত্র ভাই, তা হইতে বয়সে অনেক বড় ছিল। সেইজন্য বাপ মা তাহাকে শিশুকাল হইতে এতই আদরিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই, তার ব্যবহারের অসংযম দেখিলেও, কেহ তাহাকে শাসন করিতে মনোযোগী হয় নাই। এই অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পাওয়াই শেষে মেয়েটার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এই হতভাগ্য বালক শ্বশুর বাড়ীর সকলেরই একরূপ বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ হইল রাখীর—যৌবনের নবোচ্ছ্বাসে অদম্য লালসার প্রেরণায় স্বামী নামের অযোগ্য এই বালকটাকে আর সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

যখন ডাক্তার কবিরাজের মতে রাখুর বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না, তখন তার ভাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তাহাকে তার মামার গৃহে রাখিয়া আসাই স্থির করিল।

শ্বশুরের দেশে আসিবার পর রাখু দুইবার মাত্র নিজের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। তাহার মধ্যে একবার মামার গৃহে একটা কার্য্যোপলক্ষে সে রাখীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আসিয়া কিন্তু একমাসের মধ্যে মামী-শাশুড়ীর আচরণ বালিকার এমনই তীব্র বোধ হইয়াছিল যে, সে এক মাসের অধিক শ্বশুর-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রাখুর সঙ্গে কন্যাকে পাঠানো সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইলেও কন্যার প্রতি একান্ত মমতায় তার মা সে অভিভাবকহীনের সংসারে তাহাকে আর পাঠাইতে সাহসী হইল না।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—রাখু এখন মরে ত তখন মরে করিয়াও মরিল না। মরিল—রাখীর মা ও বাপ।

ইহারই কিছুকালের পরে রাখুর মাতুলের কাছে সংবাদ আসিল, 'রাখুর কল্যাণের জন্য কালীঘাটে 'মানত' করিতে গিয়া তাহার পত্নী আদিগঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল, তাহার এক দূর সম্পর্কিয়া মাসী। মাসী কলিকাতায় কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঁধুনী বৃত্তি করিত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে নানাবিধ পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অসংযত চিত্তের প্রেরণায় যখন বালিকা বাপের বাড়ীতে অবস্থানে জ্বালা বোধ করিতেছিল সেই সময় মাসী তাহাকে প্ররোচনায় ও প্রলোভনে কুলের বাহির করিল। কলিকাতায় মাসীর আয়ত্তে আসিয়া অভাগিনী এই আত্মনাশের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। চরিত্রের সঙ্গে সে পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিল।

এখন সে সহরে গায়িকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গানের ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট অর্থাগম। বিলাসী সম্প্রদায়ে তার এমন প্রতিষ্ঠা যে, বহু ধনী যুবক তার কৃপালাভ করিতে পারিলে আপনাদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। দু'চার জনের সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে তার পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় দু' চারখানা ভাল ভাল বাড়ীর সে 'বাড়ীওয়ালী'। এ বাড়ীখানি সে নিজের ব্যবহারের জন্য করিয়াছে। আজ গৃহ-প্রবেশের দিনে এ বাড়ীতে খুবই ধুমধাম হইত। কেবল মাসী নাই বলিয়া সে শুধু 'নামমাত্র পূজা সারিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে। মাসীর ইচ্ছা, বাড়ীখানি চারু তাহার নামে করিয়া দেয়। চারু সেটি করে নাই বলিয়া রাগ করিয়া সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ দেখিতে গিয়াছে। চারুকে এই হীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া মাসীর কম লাভ হয় নাই। আর তাহাকে রাঁধুনীর কাজ করিতে হয় না। চারু যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অনেকাংশই সে আত্মসাৎ করিত। তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কেন মিটিবে? তা হ'তেইতো চারুর এমনভাবে অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। রাখুর কাছে থাকিলে তার এতদিনে দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইত। একমাত্র সেই ত চারুকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত কথা কহিয়া যখন-তখন সে চারুর নিকট টাকাকড়ির দাবী করিত। মাসীর ভাই-পো'ও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া চারুর নিকট হইতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র লইয়া যাইত।

অল্পদিন হইল চারুর ভাই আবার গোপনে গোপনে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই গোপন-যাতায়াতের ফলে, তাহার দশ পোনেরো বিঘা

নূতন নূতন জমি হইয়াছে; স্ত্রীর গায়ে এমন ভাল ভাল দু' চারখানা অলঙ্কার হইয়াছে যে, সেদেশের লোক সেরূপ অলঙ্কার দেখা দূরে থাক, সেগুলার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনে নাই! এই সবে সেদিন চারু ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়নের প্রায় সমস্ত খরচটাই দিয়াছে। এ সবগুলা দেখা এখন আর মাসীর একেবারেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার উপর চারু পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির পর বাড়ীখানা তার নামে না করা তার ভাইয়েরই পরামর্শে হইয়াছে বুঝিয়া রাগ করিয়া সে গৃহপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তীর্থ-দর্শনের ছলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতরে একদিনের জন্যও চারু কাহারও কাছে তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর সন্ধান পায় নাই! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার পাপ-ব্যবসায়ের ফললোভী আত্মীয়গুলিকে তাহার কথা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেহই কিছু বলিতে পারে নাই অথবা জানিয়াও তাহাকে বলে নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে চারুর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষতঃ তাহার মাতুল-পত্নীর কৃপায় জীবনের দিন ক'টা আরও যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এটাও তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তথাপি তার অন্তর হইতে একটা সংক্ষুব্ধ সংশয় মাঝে মাঝে সে-যুগের সেই রোগ-জীর্ণ বালকটার কথা জানিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিত।

এত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝেও এক একবার তার কথা চারুর মনে পড়িত। এক একদিন এমন পড়িত যে, সে মরিয়াছে স্থির বুঝিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। প্রণয়প্রার্থী যুবকগুলার কারুণ্যপূর্ণ মুখচোখের পার্শ্ব দিয়া এক একদিন তার ছায়া-মূর্ত্তি উঁকি দিয়া চলিয়া যাইত। মনের খেয়াল জানিয়াও সে শরীর-শিহরণ রোধ করিতে পারিত না। বড় বড় মজলিসে তার গানে আবদ্ধ শ্রোতৃবর্গের অজস্র উচ্চ প্রশংসাধ্বনী ভেদ করিয়া রাখুর ব্যাধি-নিপীড়িত কঠোর ক্ষীণ ধ্বনি কতবার তার কর্ণে আঘাত করিয়াছে।

তবু সে স্থির বুঝিত, সে মরিয়াছে। অথবা যদিও অসম্ভব হয়, যদি রাখু কোনও দৈব ঘটনায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এতদিনে সে আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও সে না ভুলে—তাহার তখন অপ্রীতিকর হইলেও তৎপ্রতি সেই রুগ্ন বালকের একটা ব্যাকুল মমতা স্মরণে সে বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলা রাখুর পক্ষে অসম্ভব। সত্যই যদি সে তাহাকে ভুলিতে না পারে তাহা হইলেও এ জীবনে চারুর সঙ্গে তার পুনঃ সাক্ষাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সেই স্বামী সত্য সত্যই বাছিয়া বাছিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিনেই তার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আর আতিথ্যের দক্ষিণাস্বরূপ আগেই তাহাকে দিয়া তার সেবাব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

(১৪)

রাখুকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া খাবার পাত্র হাতে ধরিয়া চারু তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম বার মনের যে ভাব লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এখন তার আর সে ভাব নাই।

প্রথমে বিস্ময়ে, লজ্জায়, সহসা প্রজ্বলিত অনুতাপে আপনাকে সে স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বামীর সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিকে এমনই উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তার জন্য সে যেন সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়াইবার স্থান দেখিতে পাইতেছিল না। সর্ব্বদেহের রক্তবিন্দু-গুলাও যেন সেই আক্রমণে ভীত হইয়া রুদ্ধ ধমনী-পথে পলাইবার স্থান না পাইয়া এক একবার সমবেত প্রবাহে তার বুকের দিকে ছুটিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে যেন এক পলকে তার ঘৃণিত আচরণগুলা অগণ্য তিরস্কারকারী কথা লইয়া সহস্র পাপ-চিত্রের যবনিকা তার চোখের উপর মুক্ত করিয়াছে। সে যাতনা চারু সহিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। অশ্রুবিন্দুগুলা চোখের কোণে সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিরবয়ব হইয়া অগ্নিভরা ঘরের বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল।

তার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া সে এমন স্থানে আপনাকে বসাইতে পারিতেছে না, যেখান হইতে সে কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নামাইয়া তার স্বামীরদিকে নিরীক্ষণ করে। সে দেখিল, স্বামীর দারিদ্র্যতার সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ধর্ম্মপথে যার সঙ্গিনী হইবার একমাত্র তারই অধিকার ছিল, আজ সে কি না তার দত্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সত্য সত্যই তখন চারু আপনাকে প্রবোধ দিবার একটাও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বামীর রূপটাকে উপলক্ষ করিয়াও যে আপনাকে একটা সান্ত্বনা দিবে, হা ভগবান, তারও উপায় তুমি কিছুই রাখ নাই! চারু দেখিল, তার কৃপা-ভিক্ষার্থী, চোখে কাতরতা মাখানো, কথায়

নারীর ভাষা জড়ানো, পুরুষনামধারী মেয়েগুলার মাঝখানে যদি একবার তার স্বামীকে সে বসাইতে পারিত, তাহা হইলে রাখুর সে পুরুষোচিত মূর্ত্তি জলাশয়ে একমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের শ্রীতে দীপ্যমান হইত। আপনাকে হারাইয়া তাই চারু মেঝেয় মুখ ঢাকিয়া, অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এবারে কিন্তু ভাব তার অন্যরূপ। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া এবারে সে উল্লাস বিষাদে, আশা নিরাশায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লাস—স্বামী তার স্নেহের উপহার অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিষাদ—হতভাগী রাখীর এ সৌভাগ্য একদিনের জন্যও ঘটে নাই। আশা—স্বামীর সহিত আলাপে তার মন বলিতেছে, সে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। নিরাশা—যদিই সে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের মধ্যে স্বামীর পাশে বসিয়া পরিণীতা ভার্য্যার পবিত্র অধিকার এ জন্মে আর সে লাভ করিতে পারিবে না ; রক্ষিতা বারাঙ্গনারই মত, শুধু তার ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকিবে মাত্র। এই আশা নিরাশার মধ্যে পড়িয়াও রাখুকে সে ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই চারু সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধির দোষে হারাইয়াও, শুধু দেবতার আশীর্ব্বাদে অভাবনীয় রূপে যাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহাকে যে কোন উপায়ে আবার আপনার করিয়া লইব। ঘরে আসিয়াই প্রথমে সে স্বামী প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভক্তিভরে তার প্রসাদ গ্রহণ করিল। তারপর স্বামীকে ধরিবার উপায় স্থির করিতে বসিয়া গেল।

সে একবার আপনার বিভবের দিকে চাহিল। ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, এই সমস্ত দিয়াই সে রাখুকে প্রলুব্ধ করিবার কামনা করিল। কিন্তু চারু দেখিতে পাইল, তার সমস্ত সম্পদ তার স্বামীর পায়ে অঞ্জলি হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, আর সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

যদি এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও তার পাপ-উপার্জ্জন লইতে সম্মত না হয়? দুই একবার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য স্বামীকে তাহার ঘরে আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আনিবার কল্পনাতেই এই ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়গুলা এমন মলিন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল যে, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল।

তবে—চারুর মন এবারে তাহাকে বেশ আশ্বাস দিতেছে—স্বামী ধরিবার নাগপাশ তাহার কণ্ঠদেশে বিধাতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাখুর কথায় চারু বেশ বুঝিয়াছে, সে গান বাজনায় বিলক্ষণ পটু। তবে গানের চেয়ে বাজনা-তেই তার দক্ষতা অধিক। সে যতই বিনয় দেখাইয়া বলুক না কেন, বুঝি তার মত 'বাজিয়ে' এই কলিকাতা সহরেই অতি অল্প আছে।

চারু উপায়টার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। খাবার পাত্রগুলা প্রথমে সে বারান্দায় রাখিতে গেল। গিয়া দেখিল, স্বামী এখনও দোর খুলিয়া রাখিয়াছে। উঁকি দিয়া দেখিল, সে গালিচায় বসিয়া হেঁট মাথায় এখনও তামাক টানিতেছে।

সে ফিরিল, পাছে ঝড়ের বাধায় তার কার্য্য সিদ্ধ না হয়,—দোরটা খুলিয়া রাখিল। এইবারে বিনা সুর যোগে দোরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই সে একটা গান ধরিল। দেখিল—স্বামী গালিচা ছাড়িয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

দেখামাত্র তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বারাঙ্গনা কত যে হতভাগ্যের বক্ষ সামান্য অপাঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিবার মত করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু নিজে এই এতকালের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া এরূপভাবে বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে নাই। সে তাহাদের লইয়া যাদুকরীর ইঙ্গিত সাহায্যে খেলা করিত মাত্র। আজ নিজে সে খেলার পুতলী হইয়াছে। এ স্পন্দন সে সহ্য করিতে অসমর্থ হইল—তাহার দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গান সুর-লয়-হারা হইবার উপক্রম করিল। কোনও প্রকারে বুকটা চাপিয়া গানটাকে কোনও রকমে সে শেষ করিল। শেষ করিতেই সে দেখিল, রাখু দোর ছাড়িয়া আবার গালিচায় শয়ন করিয়াছে।

এবারে সে ঘরের অপর পার্শ্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। আয়নাটি যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল ; তাহাতে সমস্ত দেহটা সমান দৈর্ঘ্যে পরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এতক্ষণ আপনার নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পায় নাই। বেশের পরিবর্ত্তনে তার শ্রীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া সে হাসি রাখিতে পারিল না। সে তখন প্রতিবিম্বটাকে তিরস্কার ছলে বলিতে লাগিল—"বা! বেশ তো কুলের বউটি সেজেছিস পোড়ামুখী! কিন্তু সেজেই বা তুই করলি কি! সে তো কই তোকে চিনতে পারলে না! সে পুরুষ মানুষ—এই বারো বৎসরে তার শ্রী বদলে' সে যেন এক নতুন মানুষ

গড়ে' উঠেছে, তবু তুই তাকে দেখামাত্র চিন্‌লি, কিন্তু সেত তোকে চিন্‌তে পারলে না!"

হৃদয়ের যে বিশেষত্বটুকু লইয়া নারীর নারীত্ব, শত অকার্য্যের প্রলেপেও সেটিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। স্বামীর উপর অসংখ্য অত্যাচারে তার মনে যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়াছে, তাহার ভিতরেও, স্বামী যে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে জন্য চারুর মনে তীব্রতর অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। যদিও সে বুঝিয়াছে, রাখুর তাহাকে না চেনা ভালই হইয়াছে, তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে চিনিল, স্বামী তাহাকে চিনিল না কেন? ভালবাসার চক্ষে সে যদি রাখীকে একদিনের তরেও দেখিত, তাহা হইলে কখনই সে এমন ভুল করিতে পারিত না! প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি রাখীকে চারু গোটাকতক টিট্‌কারী দিল। তথাপি তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এই বিষম ঝড়ে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম নিরাশ্রয় মনে করিল। যার আশ্রয়ে আজকাল সে ছিল, সে কাপুরুষ ঝড়ের ভয়ে জ্বরের অছিলা করিয়া তার কাছে আসিতে পারিল না। লোকের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে চোরগুলার পক্ষে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদিন। তারা যদি আজ তার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত? অভাগিনীদের চোরের হাতে এরূপ মৃত্যুর কথা সে যে না জানিত এমন নহে। সে দেখিল, শাস্ত্রের আদেশে ধর্ম্মতঃ যে তাকে রক্ষা করিবার অধিকারী, তাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেবতার নির্দ্দেশে সে যেন তাকে আজ রক্ষা করিতে আসিয়াছে। আর চারু কোনও মতে তাহাকে ছাড়িতে পারে না। যদি ধরিতে না পারে, এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে বসাইয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া মরিবে।

রাখুকে বাঁধিতে চারু কোমর বাঁধিল। প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"রাখী, ও রকম হাতছাড়া স্বামীকে বশে আনা, তোর মত লজ্জাশীলা কুলবধূর কর্ম্ম নয়। যদি পারে, ও সে এই লোক-মজানো চারী। সে তখন যথা সম্ভব সত্বর সেই অবস্থাতেই একরূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া লইল। মাথার চুলগুলা সে এলোমেলো করিয়াছিল, সেগুলাকে সে বুকে পিঠে ফেলিয়া এক রকম মনোহর করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত, কটাক্ষ, মুখের হাসি সে কার্য্যোপযোগী করিয়া,—যে সমস্ত হাবভাবে সে লোক ভুলায়,—তার একটা অবলম্বনে অরগ্যানের সুর সংযোগে এবারে গাহিতে চলিল।

অরগ্যানের পার্শ্বেই সেই দাঁড়া-আয়না। গাহিবার সময়ে হাবভাবগুলা ঠিক রাখিবার জন্য সেটাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেইখানে রাখিয়াছিল। চারু গাহিতেছে, এক একবার আয়নার দিকে মুখ ফিরাইতেছে, এক একবার যেন অন্যমনস্কের মত দোরের দিকে চাহিতেছে। দু'চার বার দেখিয়া যখন বুঝিল, রাখু সেখানে আসে নাই, তখন গানটা কোনও রকমে শেষ করিয়া যখন আর একবার সে আয়নার পানে চাহিল, তখন দেখিল—রাখুর প্রতিমূর্ত্তি তাহার মূর্ত্তির বহু পশ্চাতে নিশ্চল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিল, রাখু দোরের পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের সাহায্য লইয়া লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে এইবারে জয়ের সন্নিকটে আসিয়াছে বুঝিয়া সেই প্রতিবিম্বের চোখে একটা মিষ্ট তীব্র কটাক্ষ হানিয়া মাথাটা ঈষৎ ঘুরাইয়া চুলগুলা তার একরূপ নূতনভাবে পিঠে মুখে সাজাইয়া লইল। কিন্তু সে রাখুকে দেখিতে মুখ ফিরাইল না। যেন সেখানে আর কেহ নাই, এরূপভাবে প্রতিবিম্বকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"দূর ছাই, ঘুম তো হবেই না, তখন এস না গা, দু'জনে মুখোমুখী বসে গান গেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সত্য সত্যই রাখু চারুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া সসঙ্কোচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রথম গানের সময় সে কোনও ক্রমে জোর করিয়া আপনাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যখন চারু সুরের সঙ্গে গান ধরিয়াছে, তখন আর সেই আকর্ষণে তার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

এবারে সে গায়িকার সুর-লয়-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল। সঙ্গতের সঙ্গে হইলে এ গান আরও না জানি কত মধুর হইতে পারে। সঙ্গতহীন গান—সে তো রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ। চারু গাহিতেছে শুধু তাহাকে শুনাইবার জন্য। কিন্তু এরূপ কার্য্য করিতে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞা নারী মর্ম্মে কতই না বেদনা অনুভব করিতেছে! তাহার এমন গানে বাজাইবার লোক নাই! অথচ একটু আগে সে চারুর কাছে বাজনা জানার পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল, এবারে চারু গান ধরিলে সে বিনা সঙ্গতে তাকে আর গাহিতে দিবে না। বিশেষতঃ প্রথমবার যে বস্তুটাকে দেখিয়া সে একটা বড় রকমের বিচিত্র সিন্দুক মনে করিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব তেজে সুর বাহির হইতে দেখিয়া সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে যে, সেইটার সঙ্গে নিজের গলাটা মিলাইবার লোভও সে যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে

পারিতেছে না। যা থাকে ভাগ্যে চারুর অনুমতি লইয়া সে তার ঘরে প্রবেশ করিবে।

সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চারুর প্রতিবিম্ব অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার চোখ দুটাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। লজ্জায় সে দৃষ্টি তার চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইতে গিয়াই সে চারুর আবাহন কথা শুনিতে পাইল। চারু যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, তথাপি বাতাসের শব্দ তার অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়া ফেলিল। শেষাংশটুকু শুনিবামাত্র এমন সে শিহরিয়া উঠিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে দোর ধরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, চারুকে সে দেখে নাই, তার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছে। দোর ধরিতে গিয়া আয়নার ভিতরে চারুর প্রতিমূর্ত্তি :হইতে দূরে অবস্থিত নিজের প্রতিবিম্বটাকেও সে দেখিতে পাইল।

এইবারে লজ্জা, বিষম লজ্জা—লুকাইয়া চারুর গান শুনিতে আসিয়া সে তো তবে তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে! 'এসো' বলিতে সাহস করিয়াছে। প্রীতিময়ীর এই বড় আদরের আহ্বান শুনিয়াও সে যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় চারুর কাছে চোর হইতে হইবে। দূর ছাই, আমারও যখন ঘুম হইবে না, তখন চারুর কাছে বসিয়াই রাতটা কোনও রকমে কাটাইয়া দিই। সেই অপূর্ব্বসুন্দরীর পরমাত্মীয়তার আকর্ষণের কাছে ব্রাহ্মণ যুবকের নৈষ্ঠিকতা পরাভূত হইল।

(১৩)

ঘরে প্রবেশ করিতেই রাখু দেখিল, চারু শ্রান্তি দূর করিতে তাকিয়ায় বাহু-মূল রাখিয়া, করপত্রে মাথা দিয়া, মদালস-দৃষ্টি উপরে তুলিয়া, ঈষদুন্মুক্ত উর্দ্ধদেহে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন পটে আঁকা একখানি ছবির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

শশব্যস্ততার ভাণ দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য নগ্নতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া অঞ্চলে দেহ আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারু উঠিয়া বসিল।

রাখু চক্ষু মুদিল। দোরের দিক হইতে ঝড়ের একটা রহস্য হুহু করিয়া তার বুকের ভিতর ঢুকিয়া চোখ কান দিয়া অগ্নিরূপে বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—"রাখু, তুই মরিতে আসিয়াছিস।" রাখু অন্তর হইতে উত্তর দিল—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

চোখ মেলিয়া রাখু দেখিল, চোখ দুটাকে আরও যেন বিলোল করিয়া সেই ঘরের কোথায় লুকানো কাহাকে দেখিতে নিশ্চল প্রতিমা বসিয়া আছে। সুতরাং রাখুকেই আগে কথা কহিতে হইল—

"ওগো, তোমার গান শুনতে এসেছি।"

"আসুন, আসুন—আমার কি এমন ভাগ্য হবে।"—বলিয়াই চারু রাখুকে আবাহন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ও ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শোনবার চেষ্টা করেছিলুম। শুনতে পেলুম না বলে' তোমার দোয়ে এসেছিলুম, কিন্তু আসতে আসতেই গান শেষ হ'য়ে গেল। শুনে সাধ মিট্‌লো না, তাই ঘরে এসেছি।"

"বেশ করেছেন।"

—বলিয়াই সে অরগ্যানের অন্তরাল হইতে একখানা আসন ক্ষিপ্রতার সহিত লইয়া আসিল এবং সেখানাকে সোফার উপর পাতিয়া রাখুকে বসিতে অনুরোধ করিল। রাখু না বসিয়া বলিল—

"এসে কি অন্যায় করলুম চারু?"

"না না এত আপনারই ঘর।"

"তোমার গানে আমার একটু সঙ্গত্ করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।"

"বল কি গো; তা হ'লে যে আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই।"

"তবু তোমার কাছে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল—চারু, আমি বড় গরীব।"

"আমি তোমার চেয়েও গরীব।"

—বলিয়া, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাখুকে হাত ধরিয়া আসনের উপর বসাইল।

এইবারে চারু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আলুগা চুলগুলাকে একটা কুণ্ডলিত ফণীর আকারের খুপি করিল এবং মুকুটের ভাবে সেটাকে মাথার উপর বসাইল। সম্মুখে অবস্থিত রাখুর দিকে এখন তার দৃষ্টি নাই, রাখুর পশ্চাতে আয়নার দিকে চাহিয়া সে কেশের এক অভিনব বিন্যাসে আপনাকে একটু উগ্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে লাগিল। সাজিতে সাজিতে সে দেখিল, রাখুর প্রতিবিম্ব এক একবার মাথা তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। ছায়ার পশ্চাৎ দিকটা মাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেই স্বামীর দৃষ্টিকে সে যে তার মুখ-সৌন্দর্য্যের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, এটা সে বিলাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইবারে সে দোরের কাছে গিয়া, মুখ বাহির করিয়া সন্তর্পণে কত কি যেন দেখিয়া লইল। তারপর—অন্ধকারের ঈর্ষা-কৃশা অপ্সরাগুলা এই বিলাস-গৃহে দৃষ্টি দিয়া, পাছে রাখুর সহিত তাহার চিরপরিচিত পত্নীর এই অপূর্ব্ব বাসরসজ্জা উত্তপ্ত করিয়া দেয়, তাই যেন সে নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে তাহাতে খিল দিল।

রাখুর বক্ষে এক একটা মধুর আন্দোলন ক্রীড়া করিতেছিল, মস্তিষ্কটাও অবসন্নের মত হইতেছিল। চারুর মুগ্ধ লাস্য তার চক্ষুকে দৃষ্টিহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। এইবারে একটু গোল বাধিল চারু এখন সন্তর্পণে যেন কাহাকে লুকাইয়া দোর কেন বন্ধ করিতেছে, সে বুঝি বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না; সলজ্জ ওষ্ঠাধরে বিলীনবৎ কথা বিপুল প্রয়াসে বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"দোর দিলে কেন চারু?"

"কেন বল দেখি?"

"আমি কেমন করে' বলব?"

"আমিই বা কেমন করে' বলব?"

—বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। রাখু আর কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া সে আবার বলিল—

"তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

"ভয় হবে কেন চারু, আমার মনে হচ্ছে, আমি নিজের ঘরেই এসেছি।"

"আমার মন-ভুলানো কথা বলছ, না সত্যি বলছ?"

—বলিয়াই উত্তরটা দুর হইতে শোনা তৃপ্তিকর হইবে না বুঝিয়া, সে সোফার নীচে রাখুর পাদমূলে আসিয়া বসিল।

রাখু কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। বাস্তবিক কথাটার জ্ঞান না করিয়াই সে চারুর পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল।—গিয়াছিল তাহাকে একটু আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য। চারু নিজেই যে একটু পূর্ব্বে সে ঘরটা তার বলিয়া তাহাকে আত্মীয়তা দেখাইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কথাটার অর্থ তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। একটি নব-পরিচিতা নারী, তাহাকে দেখিবা মাত্র, এমন আশ্চর্য্য করা আত্মীয়তায়, গল্পে-পড়া প্রণয়-কথার মত তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে, তার প্রভাবে সে আপনার অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়াছে।

চারুর দ্বিতীয় প্রশ্নে তার চমক ভাঙ্গিল। অতি সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করার পর তার প্রশ্নটার সরল অর্থ রাখু গ্রহণ করিতে পারিল না। কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া সে কেবল চারুর মুখের পানে চাহিল।

যুবতী উর্দ্ধমুখী—উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাথার কেশ-শীর্ষ রাখুর উদাস দৃষ্টির তলে মন্ত্র-মুগ্ধ ফণীর মত যেন ফণা তুলিয়াই নিশ্চল হইয়াছে।

দেখিবা মাত্র রাখুর মন আবার দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া, এ সৌন্দর্য্যের উপমা খুঁজিতে অতীতের এক মাধুর্য্য-মণ্ডিত বিস্মৃতির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দৃষ্টি তার মাতালের মত, বোধশক্তি হারাইয়া চারুর মুখখানির উপর যেন অবশভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়াই চারু শিহরিল। রাখুর এরূপ অর্থশূন্য দৃষ্টির কারণ বুঝিতে তার বাকি রহিল না। ধীরে চরণ স্পর্শে তাহার চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল—

"বাঁয়া তবলা আনি?"

রাখু বলিল—

"আন।"

বাঁয়া-তবলা ও একটা হাতুড়ি সোফার উপর রাখিয়া, একটা ছোট হারমোনিয়ম লইয়া যখন চারু আবার রাখুর পাদমূলে বসিল, তখন ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। শুনিয়াই রাখু বিস্মিতের মত বলিয়া উঠিল—

"তাই ত চারু, রাত যে শেষ হ'তে চল্‌লো!"

"থাকতে বলব নাকি?"

—বলিয়াই এবার সে গিট্‌কিরি দেওয়া হাসিতে ঘরটাকে এমন পূর্ণ করিয়া দিল যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারুর হারমোনিয়মে সুর দিবার পরও সে হাসির ঝঙ্কার রাখুর কান হইতে অপসৃত হইল না। তবলাটা যে বাঁধিতে হইবে, সেটা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। আবাঁধা তবলায় বার দুই চাঁটি দিতেই চারু বলিয়া উঠিল—

"ও কি করছ! বাজাবার ইচ্ছা থাকে ত বাজাও, নইলে আমি শুয়ে পড়ি। মিছে বসে' রাত কাটাই কেন?"

রাখু নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা ঢাকিতে বলিয়া উঠিল—

"বাজাতেই ত এসেছি, কিন্তু তুমি বাজাতে বলছ, না তামাসা করছ?"

"কি রকম?"

"বাজিয়ে রইল স্বর্গে আর গাইয়ে রইল পাতালে; এতে কি বাজনায় হাত আসে?"

"তা কেন, তুমিই স্বর্গে ওঠ। এখানে তো যথেষ্ট স্থান আছে।"

"ওখানে কি আমার স্থান আছে?"

"আমার যদি থাকে, তাহ'লে তোমারও আছে।"

রহস্য করিতে গিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণ চারুকে কাঁদাইয়া দিল। বুঝিল সে নিজের হীন ব্যবসায়কে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হাত ধরিয়া চারুকে সে সোফার অপর প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল। চারু বাধা দিল না—হারমোনিয়মটা লইয়া সোফার উপর উঠিয়া সে স্বামীর দিকে মুখ করিয়া বসিল।

চারু গান ধরিল—

"ভাল আমি বসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।"

গাহিয়া কলির পুনরাবৃত্তি করিতেই রাখু তবলায় অঙ্গুলি-প্রহারে গানের অভিবাদন করিল।

১৬

ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।
আমি যদি ভুলে ভুলেছি তোমারে, তুমি ভুলে রবে কেন হে।
বাসনাবরণে নয়ন অন্ধ দিবস করেছি রাতি,
তুমি কেন নাথ, ধরে এই হাত, ফিরালে না মোর গতি?
আজি এ মর্ম্মব্যথার কথা শুনেও যদি না শুনে হে!
এখন নিশীথে কেন দেখা দিলে বঁধু হে, সখা হে, প্রাণ হে।

গান শেষ হইতে আধঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চারু তাহার সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার, যত রকম কস্‌রতে পারিল, পরিচয় দিল। রাখুও বাজনায় এমন হাত দেখাইল যে, চারু গাহিতে গাহিতে ইঙ্গিত আভাষে তার মুগ্ধতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। গীত শেষে চারুই প্রথমে কথা কহিল—

"আমার গান শেখা আজ সার্থক হ'ল।"

"না চারু, ও কথা বল' না, অনেক ভাল ওস্তাদ তোমার গানে সঙ্গত করেছে; আমারই বাজনা শেখা সার্থক। আমি যে এ রকম গানের সঙ্গে বাজাবো, এ কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমি যদি বলি, এ রকম মিষ্টি ওস্তাদী হাত আমি আর কখন শুনিনি?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমার কথা অবিশ্বাস করলে?"

রাখুর চোখে জল দেখা দিল। তাহার মুখে শুধু প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া চারু সন্তুষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রোতাদের মুখে এত সে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়াছে যে, ইদানীং সে কথাগুলাতে আর তৃপ্ত হইবার কিছু ত ছিলই না, বরং সময়ে সময়ে সেগুলা তার বিরক্তির কারণ হইত। গাহিবার সময়ে তাহাকে এক একবার অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—স্বামীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিতে। নীরস স্বামী একটিবারের জন্যও তা' দেখায় নাই, অথবা মূর্খ বামুন তার গানের মর্ম্ম বুঝে নাই; শুধু সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবারে তার চোখে জল দেখিয়া, কারণটা স্থির বুঝিতে না পারিলেও সে প্রফুল্ল হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—

"লোকে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি যে কেঁদে উড়িয়ে দিলে গো!"

"না চারু, তোমার কথায় আমার ওস্তাদকে মনে পড়লো। তুমি যা বললে, আমার বাজনা শুনে তিনিও একদিন খুসী হ'য়ে ঐ কথা বলেছিলেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন?"

"বেঁচে থাকলে কাঁদবো কেন? অল্পদিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন।"

চারু বুঝিল, তার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। মূর্খ ব্রাহ্মণ শুধু সুর শুনিয়াছে, গানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। রাখুর অশ্রুরেখা অবলম্বনে সে যে আজ তার হৃদয় অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইলেও তাহার ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই!

নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আবার সে হারমোনিয়মে সুর দিল। সুর কীর্ত্তনের—রাখু শুনিবামাত্র বলিল—

"এ যে কীর্ত্তন ধরলে গো!"

"কীর্ত্তনের সঙ্গত জান না?"

"মদনমোহনের দেশে বাস, কীর্ত্তনে সঙ্গত করতে জানি না, এ কথা কেমন করে' বলব? তবে এ বাঁয়া-তবলায় ত কীর্ত্তনের অপমান করব না!"

ঘরের এক কোণে খোল ছিল, চারু মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে সেইটা রাখুকে দেখাইয়া গান ধরিল—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষা রাখিল না।

চণ্ডীদাসের সেই চিরবিশ্রুতপদ—"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।" প্রথম প্রথম চারু শুধু সুরটাই আবৃত্তি করিতে লাগিল;—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষায় একবার, দুইবার, তিনবার—রাখু উঠিল না।

"খোল এনে দি ?"

"থাক্, তুমি গাও, আমি বসে' বসে' শুনি।"

চারু বুঝিল, পতিতার মুখ-নিঃসৃত মহাজন পদে সে সঙ্গত করিবে না। তখন চক্ষু মুদিয়া সে গাহিতে লাগিল—

কি মোহিনী জান, বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

চক্ষু মুদিয়াই সে আঁখর দিল—মুদ্রিত পলকের ভিতরেই বুঝি সে সমস্ত সঙ্গত বন্দী করিয়াছে—

(কি মোহিনী জান, ওহে মদনমোহন)
(তুমি পলকে মজালে মোরে
মোহনিয়া কি মোহিনী জান)
(পলক আমার ঘুমিয়ে গেল,
প্রাণ সখা কি মোহিনী জান)
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি।
(বোঝা গেল না, সে কি চায়, চায় কি না চায়
পিরীতি রীতি বোঝা গেল না)

চারুর কানে সহসা মৃদুমধুর খোলের শব্দ প্রবেশ করিল। অভিমানিনী তাহা সহ্য করিতে পারিল না—চোখ মেলিয়াই সে বামহস্তে রাখুর দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করিয়া আবার আঁখর দিল—

(কার চোখে সে চোখ রেখেছে
চোখ মেলে তা বোঝা গেল না)

রাখু এবার দু'টি কর পত্র পরস্পরে বাঁধিয়া কোলের উপরে জানু স্থাপিত করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়াছে।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।'
(আমার সব বিপরীত)

(ঘরের বাইরে এসেও ঘর পেতেছি

এ যে আমার সব বিপরীত)

(এখন তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,

(এখন শুধু তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,

এখন শুধু তুমি আছ)

(আমার যেথায় যা ছিল পর করেছি

পরাৎপর তুমি আছ)

(বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও,

(যেন নিদয় হ'য়ো না)

(ওহে প্রাণবল্লভ, নিদয় হ'য়ো না)

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও

(যদি নিদয় হও)

(কি জানি যদি নিদয় হও)

(পদে অপরাধ বহু করেছি নাথ,

তাই যদি নিদয় হও)

(তবে দাঁড়াও হে, একবার দাঁড়াও হে)

(আমি তোমারই প্রাণ তোমারে দিই,

একবার বঁধু দাঁড়াও হে)

মন্ত্রাদিষ্টের মত সত্য সত্যই রাখু দাঁড়াইয়াছে, তার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে সত্যই সে অনুভব করিল, চারুর মাথা তার পায়ে লুণ্ঠিত হইতেছে।

"চারু।"

চারু মাথা তুলিল—উত্তর দিল না।

"তোমার ঘরে এসে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি।"

হাঁটুতে ভর দিয়া যুক্তকরে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিল মাত্র। বুঝি কথা কহিতে সে সামর্থ্য হারাইয়াছিল।

"আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌লে না?"

"না।"

"এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখন হয় নি।"

"বেশ ত মন-ভোলানো কথা কইতে জান? তা হ'লে তুমি মোহনিয়াই বটে।"

"সে তুমি যা বল, কিন্তু চারু, আমি মিছে কই নি।"

"যাও ঠাকুর, আর চারু চারু ক'র না।"

—বলিয়াই সে দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়াই আবার বলিল—

"তুমি হেরে গেলে, বলতে পারলে না—এটা তোমার ঘর।"

রাখু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না! সে শূন্য দৃষ্টিতে মাথা ঘুরাইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল মাত্র। বুঝি দৃষ্টি দিয়া সে চারুর ঐশ্বর্য্য মাপিবার চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টায় আবার সে চারুর মুখে তাহা ফিরাইয়া আনিল। চারু বলিল—

"বস, তামাক আনি।"

রাখু একটু ব্যস্ততার ভাবেই বলিল—

"না না—প্রয়োজন নেই।"

"আমি দেখছি আছে।"

—বলিয়াই সে দোরের দিকে অগ্রসর হইল। রাখু প্রথমে সাগ্রহ কথায় তাকে নিষেধ করিল, যখন সে শুনিল না, তখন পিছন হইতে বাহুমূল ধরিয়া নিরস্ত করিল।

"ছিঃ! কর কি,—ছেড়ে দাও।"

"তা তুমি যত পার, তিরস্কার কর—আমি তোমাকে আর ভিজতে দেবো না।"

"তাতে কি হবে—আমি কি মরে যাব?"

"আমার জন্য ঠাণ্ডা লেগে যদি এ গলার সামান্যমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে আমার মহা অপরাধ হবে।"

"আর আমি কি গাইব মনে করেছ?"

"আর গাইবে না?"

"মুখ্খু বামুন, বুঝতে পারলে না?—আমি যে গানের ব্রত উদ্‌যাপন করলুম।"

"আমি যদি শুনতে চাই?"

"সে তোমার গান তুমি শুনবে।"

"তামাক আনো।"

"আর ব'লে দরকার কি ? বলবার সময় ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল !"

এই সময় প্রবল বাতাসে দ্বারটা সহসা পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

"ও রাখী, এখনও বিষম ঝড় !"

"কি বললে ?"

দমকা বাতাসে মনটাও যে তার উড়িয়া গিয়াছে এটা রাখু বুঝিতে পারে নাই। অন্যমনে মুখ হইতে পত্নীর নাম বাহির হইতেই সে এমন অপ্রতিভের মত হইয়া গেল যে ক্ষণেকের জন্য তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"রাখী কে গো ?"

"তাই ত চারু, আজ যে ঝড়ের রাত সেটা যে তুমি একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিলে !"

চারু কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিল—

"সে ত আমিও ভুলেছিলুম গো, এখন যে বাইরের ঝড় ঘরে ঢুকলো,—রাখী কে ?"

"তুমি ফিরে এস, এসে শুনো।"

"আমার কাছে মিথ্যে কইলে ! তবে নাকি তোমার স্ত্রী নেই ?"

"ভ্যালা বিপদ, তুমি আগে ফিরেই এস না গো !"

"সে আমার সতীন নাকি ?"

"না চারু ও কথা বলতে নেই ! তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি।"

চারু বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন চুম্বন করিতে করিতে বলিল—

"ওমা, এটার কথা যে মনেই ছিল না। তা আমি এটার সম্পর্ক কি রেখেছি ?"

"তুমি রাখতে না বললেও ত সম্পর্ক যাবে না, ওটা বিধাতার দেওয়া।"

অতি উল্লাসে চারু বলিয়া উঠিল—

"সত্যি বলছ ?"

"কেন চারু, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাস করছ ? হিঁদুর মেয়ে—হাতে যখন চিহ্ন রেখেছ, তখন এটা কি জান না ?"

"আমি যদি এখন সোয়ামীর কাছে যেতে চাই—"

"স্বামী নেবে কি না, বলতে চাচ্ছ ?"

"নেবে না ?"

"তা আমি কেমন করে' বলব ?"

"আমি যদি তোমার স্ত্রী হতুম ?"

রাখু পাগলের দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল।

"ভয় কি ঠাকুর বল না।"

রাখু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু স্থিরনেত্রে অবনত মুখ স্বামীর পানে তাকাইয়া তার সারা দেহটা যেন অন্তরিন্দ্রিয়ের নীরবতায় যোগ দিতে নিথর হইয়া গিয়াছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া আবার যেই রাখু মুখ তুলিল, অমনি চারু বলিল—

"তামাক পাঠিয়ে দিই।"

—বলিয়াই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে গৃহত্যাগ করিল যে, রাখু তাহাকে ফিরাইয়া, যে কথা বলিবার জন্য বুক বাঁধিতেছিল, সে কথা ঠোঁটের কাছে আনিতেও সে সময় পাইল না।

(ক্রমশঃ)

কৃপা-দান।

[কবিতা]

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(কীর্ত্তনের সুর)

(১)

আমি শুষ্ক ক্লিষ্ট তরু,—আছিনু দাঁড়ায়ে শীর্ণ এ-মূরতি নিয়ে;
তুমি ঝটিকায় ভেঙ্গে,—সাজালে তাহায় নবীন পল্লব দিয়ে!

(২)

আমি দরিদ্র ভিখারী,—লালসা-অধীর, যত পাই তত লোভ!
তুমি অজানা-ধনের ভাণ্ডার দেখায়ে মিটালে দারিদ্র্য ক্ষোভ!

(৩)

আমি নয়ন থাকিতে অন্ধ যে পথিক,—কেবলি আঁধার দেখি;
তুমি অভিনব আঁখি ফুটায়ে দেখালে—আঁধারে আলোক যে-কি!

(৪)

আমি নিকটে তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘুরিলাম কত দেশ;
তুমি "সাথেই" রয়েছ,—জানায়ে আমার করালে ভ্রমণ শেষ!

(৫)

মোর যা ছিল আজিকে লইয়ে দেখালে,—তবু মোর কত আছে;
মোর স্মৃতি কেড়ে নিলে!—তুমি বা দিয়েছ ভুলে যদি যাই পাছে!

(৬)

আমি আছিনু "অঙ্গার",—"কালী" ঘোচেনিকো "জলে ধুয়ে শতবার",
তুমি অনল পরশ,—"কৃপাদান" দিয়ে জ্বালালে "কালিমা" তার!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

নবম পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই পুলীসের আনাগোনা একটু ঘন ঘন আরম্ভ হইয়াছিল—সাজা কমাইবার প্রলোভনে যদি কেহ কোন নূতন কথা বলিয়া দেয়! আমাদের ধরা পড়িবার পরই নানা সূত্রে এতকথা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে পুলীসের জানিবার আর বোধ হয় বেশী কিছু বাকি ছিল না। কিন্তু তথাপি পুলীস একবার নাড়া চাড়া দিয়া দেখিল আরও কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না। নির্জ্জন কারাবাসের সময় মানুষের মন অপরের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যে কিরূপ অস্থির হইয়া উঠে, পুলীসেরা তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। দুই এক মাস যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষের টিকটিকি, আরসুলার সহিতই কথা কহিতে ইচ্ছা হয়—পুলীস ত তবু মানুষ! কতকগুলা বাজে কথা কহিতে গেলে তাহার সহিত দুই একটা গোপনীয় কথাও বাহির হইবার সম্ভাবনা। আর ২০।৩০ জন লোকের নিকট ঘুরিলে অন্ততঃ চার পাঁচ জনের নিকট হইতে এইরূপ এক আধটা কাজের কথা পাওয়া যায়। পুলীসের তাহাই ভরসা।

কথা বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, নামে 'গুপ্ত সমিতি' হইলেও কতকটা অভিজ্ঞতা ও কতকটা অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে; এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত বিনা প্রয়োজনে পরিচিত হইবার অবসর পায় না। সমিতির অধ্যক্ষদের এই চেষ্টা থাকে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্ম্ম ভিন্ন অপরের কর্ম্ম না জানিতে পারে। এইরূপ নিয়ম থাকায় এক আধজনের দুর্ব্বলতায় সমস্ত কাজ নষ্ট হইতে পায় না। নানা কারণে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হইয়া উঠে নাই; আর তাহার উপর আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ গল্প করিবার প্রবৃত্তি ত আছেই। আমাদের দেশে প্রত্যেক সমিতির ভিতর হইতে যে দুই একজন করিয়া সরকারী সাক্ষী বাহির হইয়াছিল কার্য্যপ্রণালীর শিথিলতাই তাহার প্রধান কারণ। দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেক সময় অনেক সমিতির গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতা লোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

একটা সুবিধার কথা এই যে গল্প করিবার প্রবৃত্তি শুধু আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে! ইউরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। একদল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইত।

কিছু দিন এইরূপ থাকিবার পর শুনিলাম যে Civil Surgeon আমাদের আন্দামানে পাঠাইবার জন্য পরীক্ষা করিতে আসিবেন। যথা সময়ে Civil Surgeon আসিয়া পেট টিপিয়া, চোখ দেখিয়া সাত জনের ভবনদী পারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুধীর ও আমি তখন রক্তআমাশয়ে ভুগিতেছিলাম বলিয়া আমাদের আরও কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিয়ম এই যে একবার রোগের জন্য আন্দামান যাওয়া বন্ধ থাকিলে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হয়; কিন্তু আমাদের

বেলা সে আইন খাটিল না। সরকার বাহাদুরের আদেশ ক্রমে আমাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কারাগৃহ হইতে একবার দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। একদিন ভোরবেলা আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া আমাদের একখানা গাড়ীতে চড়ান হইল। দুই পাশে দুইজন সার্জেণ্ট বসিল; আর গাড়ী খিদিরপুর ডকের দিকে ছুটিল।

জাহাজে উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জ্জেণ্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল—Now say, my native land farewell.' আমরা হাসিয়া বলিলাম—Au revoir. বলিলাম বটে, কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল।

রাজনৈতিক কয়েদী আমরা শুধু দুই জন মাত্র ছিলাম—সুধীর ও আমি। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় আমরা ছিলাম; অপর কামরায় অন্যান্য কয়েদী ছিল। জাহাজের একজন বাচ্ছা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের ফটো তুলিয়া লইল। বিলাতের কোন্ কাগজে সে এই সমস্ত ফটো ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কথাটা শুনিবামাত্র আমি পাগড়ীটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইলাম! সস্তাদরে যদি একটা ছোট খাট বড়লোক হইয়া পড়া যায় ত মন্দ কি!

তিন দিন তিন রাত সেই জাহাজের খোলের মধ্যে চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে যাইতে হইবে দেখিয়া, সুধীর ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে একটা হাতীর মত জোয়ান—তিন মুঠা চিঁড়া চিবাইয়া তাহার কি হইবে? পুলিসের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান হাওলদার বলিল—"বাবু, যদি আমাদের হাতে ভাত খাও, ত দিতে পারি।" মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতিও আছে, আর ভাত খাওয়াইয়া হিন্দুর জাত মারিবার ইচ্ছাও একটু একটু আছে। আমরা বলিলাম—"খুব ভাল কথা। আমাদের জাত এত পাকা যে, কোন লোকের হাতের ভাত খাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না।" সেখানে শিখ হাওলদারও ছিল তাহারা ভাবিল পেটের জ্বালায় আমরা পরকালটা একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছি! তাই তাহারাও আমাদের ভাত দিতে চাহিল। আমরা নির্ব্বিবাদে উভয়দলের রান্না ভাত খাইয়া পেটের জ্বালাও থামাইলাম ও আপনাদের উদারতাও সপ্রমাণ করিলাম। শিখেরা ভাবিল—"বাঙ্গালী বাবুরা বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারে নাই।" যাই হোক, ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু দুটি ভাত খাইয়া সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচিয়া

গেল। জাহাজে আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেকগুলি বাঙ্গালী মুসলমান মাল্লাও ছিল, তাহাদের হাতে রান্না ভাত ও কুমড়ার ছক্কা যেন অমৃতোপম মনে হইল।

যাই হোক, কোনও রূপে তিন দিন জাহাজে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে পোর্ট ব্লেয়ারে হাজির হইলাম। দূর হইতে জায়গাটি বড়ই রমণীয় মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরের কথা তখন কে জানিত?

দূরে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া একজন সিপাহী বলিল— "ঐ কালাপানীর জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল ডাক্তার আসিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া গেল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া আমরা বিছানা মাথায় করিয়া বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"So, here you are at last. Well, you see that block yonder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there but mind you don't talk."

(এই যে এসেছ! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খপরদার, কথা ক'য়ো না)।

আমরাও শ্বেতাঙ্গটীকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলাম। লম্বায় ৫ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় ৩ ফুট। মোট কথা একটী প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙকে কোট পেন্টুলান পরাইয়া মাথায় টুপি পরাইয়া দিলে যেরূপ দেখায়, অনেকটা সেই রকম। তখন জানিতাম না যে ইনিই মহামহিম শ্রীমান্ ব্যারী, জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার বুলডগের মত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া ইঁহাকে কালাপানি জেলে কর্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিলেই Uncle Tom's Cabinএর লেগ্রিকে মনে পড়ে।

ভবিষ্যতে ইঁহার সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, কেন না প্রায় এগার বৎসর ইঁহার অধীনে এই জেলে বাস করিতে হইয়াছিল।

ইনি রোমান ক্যাথলিক আইরিস। সারা বৎসর কয়েদী ঠাঙাইয়া যে পাপের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে গির্জ্জায় গিয়া পাদরী সাহেবের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া আসিতেন। বৎসরের মধ্যে ঐ এক-দিন তিনি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেন; সে দিন কোন্ কয়েদীকে তাড়না করিতেন না; আর বাকি ৩৬৪ দিন মূর্ত্তিমান যমের মত কয়েদী তাড়াইয়া বেড়াইতেন।

কয়েদীদের স্বভাবের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে দুর্দ্দান্ত লোক-দিগের প্রতি তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ লোকদিগেরই সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্যারী সাহেবের নিকট প্রহার খাইবার পর অনেক কয়েদীকে বলিতে শুনিয়াছি—"শালা বড় মরদ হৈ।' যাহারা ভাল মানুষ তাহারা কয়েদীদের মতে স্ত্রী জাতীয়। কয়েদীরা কোন কুকার্য্য করিয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিলে ব্যারী বলিতেন—"জেলখানা আমার রাজ্য; এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্ট-ব্লেয়ারে আছি; একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই।"—ব্যারী সাহেবের মুখের কথা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

জেলে ঢুকিলে প্রথমেই নজরে পড়ে বহু জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দু-স্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মী, মাদ্রাজী সব মিশিয়া খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান; বর্ম্মীও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় হিন্দুর এক চতুর্থাংশ কিন্তু জেলখানায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান কি করিয়া হইল তাহা স্থির করিতে গেলে উভয় জাতির একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশে লোকসংখ্যা মোট এক কোটি; অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। খুন, মারামারি করিতে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষ মজবুদ। অল্পদিন মাত্র তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষের লোকের মত একেবারে শিষ্ট শান্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্যদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষা-প্রচারের আধিক্য বশতঃই হোক বা প্রকৃতির নিরীহতা বশতঃই হোক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমরা যে সময় উপস্থিত হইলাম তখন জেলখানার মধ্যে পাঠানের প্রাধান্য খুব বেশী। সব জাতিকে একত্র রাখার ফলে যে দুর্ব্বল জাতিদের উপর অযথা অত্যাচার যথেষ্ট হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

দিন কত থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে জেলখানায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুবিচার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ দিবার বুকের পাটা কয়েদীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পরের জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে? যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতেই ব্যস্ত। যাহারা খোসামোদ করিতে সিদ্ধহস্ত, মিথ্যা কথা যাহারা জলের মত বলিয়া যাইতে পারে তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভালমানুষ এবং তাহারাই প্রভুদিগের প্রসাদ লাভে সমর্থ। আর যাহারা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া অপরের জন্য লড়াই করিতে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটে; মিথ্যা মোকর্দ্দমার ফাঁদে পড়িয়া তাহারা অযথা সাজা খাইয়া মরে। ফলে জেলখানায় যত কয়েদী আসে, তাহার মধ্যে একজনও যে জেল খাটার ফলে সচ্চরিত্র হইয়া যায় তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে সে তত কাজের লোক; তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আর একটা মজার কথা এই যে, সে উল্টা রাজার দেশে মুড়ি মিছরী সব একদর—সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পায়। কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (coir) পাঠাইবার দরকার হয় সে সময় সকলকেই ছোবড়া কুটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয় তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসাদারী কাণ্ড! কয়েদী সরকার বাহাদুরের গোলাম; আপনাদের দেহের রক্ত জল করিয়া সরকারী কোষাগার পূর্ণ করাতেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা!

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা সরকারী পুঁথিতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো পুঁটি অফিসার পর্য্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে

তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটি পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অস্পষ্ট; কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ক ভাই?" সে উত্তর করিল—"সাত।" তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙ্গুলের গাঁট গণিয়া পাঁচ জনের নাম করিল। বাকি দুই জনের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—"ভুলে গেছি।" তাহার খাওয়া পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না; কখনও আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা সারা দিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে লোকটার মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে দুই একজন এমন ওস্তাদও মিলে যাহারা কাজের ভয়ে পাগল সাজে। একজন বাঙ্গালীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চুণের সামান্য গুঁড়া লাগাইয়া চোখ দুটা লাল করিয়া লইল; আর আবল তাবল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসাগুলাও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁরে কলার খোসা চিবুতে গেলি কেন?" সে বলিল—"কি করি বাবু, জেলার বেটাকে ত বোকা বানাতে হবে! একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?"

তৃতীয় দৃষ্টি

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

দম্‌কা ঝড়ের হাওয়া!
নিবিয়ে দিল ঘরের বাতি,
চোখে চোখে চাওয়া!
এলিয়ে দিল ঘরের আগল,
ঝিলিক্ মারা পাগল বাদল
তাই চোখে নয় সবার প্রাণে
দৃষ্টি এবার পাওয়া!
চোখের ভিতর যে চোখ আছে
সবার ভালে সবার কাছে
সেই খানেতে দৃষ্টি রেখে
জীবন আমার বাওয়া!

"ঋগ্‌বেদের সময় ভারত"।

২

বেদে ভূ-তত্ত্ব ও বৈদিক জনপদ সমূহের স্থিতি নির্দ্দেশ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছে ভূ-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা 'ইলা' ও অন্যান্য জনপদ সমূহের স্থিতি নির্ণয়। ইহা ছাড়াও 'ইলার' স্থিতি নির্দ্দেশ করিবার আর একটী উপায় আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহাভারতের শাকদ্বীপ আর ইলাবৃত একই স্থানের বিভিন্ন নাম। কেন না শাকদ্বীপেও মেরুপর্ব্বত অবস্থিত আছে, এবং উহাতে দেব, ঋষি ও স্বকর্ম্মনিরত বহু ব্রাহ্মণের বাস। আর ইন্দ্রই সেখানকার রাজা। ঐ শাকদ্বীপে মঙ্গ, মানস, মশক ও মন্দগ, এই চারিটী লোকসর্ম্মত দেশ আছে। এই মঙ্গদেশই বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন নাম। মানস হইতেছে আধুনিক মানচুরিয়া। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১ অধ্যায়)

ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বেদ হইতে তথ্য বাহির করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আসিয়া মহাদেশ একটী মহান্ ভূমিখণ্ড, আর ভূ-তত্ত্ববিদেরা এখনও পর্য্যন্ত ইহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আপনাদের সুবিধানুযায়ী পৃথিবীর জন্ম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমস্ত কালকে পাঁচ মহাযুগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) অতি প্রাচীন (Archaean), (২) প্রাথমিক (primary or paleaozoic), (৩) দ্বিতীয়ক (Secondary or Mesozoic), (৪) তৃতীয়ক (Tertiary), এবং (৫) আধুনিক (Quaternary) মহাযুগ। আবার প্রত্যেক মহাযুগকে কয়েকটী যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়ক ও তৃতীয়ক মহাযুগের অন্তর্গত যুগ-বিভাগ গুলি জানিলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়ক (Secondary or mesozoic) মহাযুগ

(১) Triassic (ট্রিয়াসিক্)

(২) Jurassic (জুরাসিক্)

(৩) Certeceous (সার্টে সিউস্)

এবং তৃতীয়ক (Tertiary) মহাযুগ

(১) Eocene (অয়োসিন্), (২) Oligocene (অলিগোসিন্) (৩) Miocene (মায়োসিন্), (৪) Pliocene (প্লায়োসিন্) (৫) Pliestocene (প্লিষ্টোসিন্)।

ভূ-তত্ত্বের আলোচানায় দেখা যায় সে প্রাথমিক মহাযুগের পূর্ব্বে সমস্ত আশিয়া মহাজনপদ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে দ্বিতীয়ক যুগের শেষ ভাগে উত্তর পূর্ব্ব আশিয়ার অনেকটা ভূমি স্থলে পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কতক অংশ, সমস্ত মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া ও চীনের কতক অংশ এবং চীনীয়-তুর্কিস্থানের উত্তরাংশ এই ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্নে Encyclopaedia (Britanica Edition) হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "There is positive evidence that much of north and east of Asia has been land since the Palaeozoic or Primary era……The Triassic deposits of the Yerkhoyansk range show that this land did not extend to the Bering sea, while the marine deposits of Japan on the east, the western Tian-

shan on the west and Tibet on the south give us some idea of its limits in other directions." (P. 768, Vol. 2). এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভূ-তত্ত্ববিদেরা এখনও অসংশয়ে বলিতে সক্ষম নহেন যে এই ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি কতখানি, আর তাঁহারা ইহার যথার্থ সীমা নির্দ্দেশও করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই মতবাদ মাত্র। ঐ সকল মতবাদ এখনও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই।

এই সময়ে অন্যান্য সমস্ত স্থানই জলমগ্ন ছিল। কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ স্থলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু অসংশয়ে বলা যায় না এই ভূমিখণ্ড মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডের ঠিক সমসাময়িক কিনা। এই দুই ভূমিখণ্ড প্রাচীনত্বে এক হইলেও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ইহার কোনও বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ এই দুই স্থানের মধ্যে সাগরের এত বেশী ব্যবধান ছিল যে সেই প্রাচীন কালে মঙ্গোলিয়া নিবাসী দেবগণের পক্ষে এই দ্বিতীয় স্থানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকা অসম্ভব। তত্রাচ মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

হিমালয়-পার্ব্বত্য-প্রদেশ ও উত্তর ভারতের কতক অংশ প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব আফ্‌গানি স্থান (গান্ধার) ও বল্ক প্রদেশ (বহ্লিকদেশ) ইহারই অন্তর্গত ছিল। হিমালয় প্রদেশ Eocene (আয়োসিন্) যুগে উত্থিত হয়, আর উত্তর ভারতের পশ্চিমাংশ তৃতীয়ক মহাযুগের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করে। আফ্‌গানিস্থানের পশ্চিমাংশ ও পারস্যদেশ আধুনিক (Quaternary) যুগের প্রথম ভাগে স্থলে পরিণত হয়। বেলুচিস্থান আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই সম্বন্ধে Encyclopaedia হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "Persia consists of a central region covered by Quaternary deposits and bordered on the north, west and south by a raised rim composed of older rocks. These older rocks form the isolated ranges which rise through the Quaternary deposits of the central area." আবার, 'The Miocene deposits generally lie at the foot of the chains, or in the valley...... Pliocene deposits cover a considerable area near the coast. Both in the Elburz range and near Baluchistan frontier there are numerous recent volcanoes. Some of these seem to be

extinct but several continue to emit vapour and gases. (P. 190 bc, Vol. 21).

আবার সাইবেরিয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশ আধুনিক (Quaternary) মহাযুগের প্রথমভাগে কিম্বা আরও পরে স্থলে পরিণত হয়। কারণ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহা তৃতীয়ক মহাযুগ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। "This vast tract, only a few dozen feet above the sea, most probably was covered by the sea during the post-pliocene (Pleistocene) period. It stretches from the Aral-caspian depression to the low-lands of the Tobal, Irtysh, and Ob, and thence towards the Yenisei and Lena." (P. 11d.—Vol. 25).

এইবার আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে বেদে এই সকল বিষয়ের কি প্রমাণ আছে। বেদে আমরা স্বঃ (ইলা, দ্যো, বা যজ্ঞ), ভূ (ভারত, পৃথিবী), ভুব (অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, আপ), ও দিব্, এই চারিটী জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাই। 'স্ব' ও 'ভূ' কোন্ কোন্ দেশ তাহা মোটামুটি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। যদিও পুরাণ প্রণেতারা ও অনেক ভাষ্যকারের ভ্রমবশতঃ 'অন্তরীক্ষকে' শূন্য আকাশ বলিয়াছেন, তথাপি বেদে ও ব্রাহ্মণে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে অন্তরীক্ষ একটি জনপদ ও মনুষ্যের বাসস্থান। আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই সে 'অন্তরীক্ষ' ভুবর্লোকের আর একটী নাম (ভুব ইতি অন্তরীক্ষম্)। সায়ণও স্বকীয়ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে 'পৃথিবী'র ও 'দ্যোব' মধ্যস্থলে যে লোক তাহাই 'অন্তরীক্ষ' (১৬৭ পৃ, ও ৬২৪ পৃ, প্রথমখণ্ড অথর্ব্ববেদ)। 'অন্তরীক্ষের' অর্থ যে 'সমুদ্র' তাহাও সায়ণ বলিয়াছেন (১৮।৩০।১, ঋক্)। 'অন্তরীক্ষ' আবার তিনটী (ত্রিরন্তরিক্ষম্, ৫।৫৩।৪, তৈঃ ব্র)—যথা, (১) অলোগস্থান, (২) অর্য্যায়ণ (Iran), (৩) অসুরীয় জনপদ (প্রাচীন আসিরিয়া)। আবার ভারত হইতে ইলায় যাইবার জন্য পুরাকালে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সুন্দর সুন্দর পথ নির্ম্মিত ছিল। ঋগ্বেদে (১১।৩৫।১) আমরা দেখিতে পাই যে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সবিতৃদেব নির্ম্মিত যে সকল পথ আছে, তাহা অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত ধূলি পরিশূন্য। অন্তরীক্ষের আর একটা নাম পৃশ্নি (১।৬৬।৩, ঋক্, সায়ণ শিষ্য)। আর সায়ণ বলিতেছেন, পৃশ্নি ইন্দ্র সৈনিক মরুদ্‌গণের মাতৃভূমি (১০।২৩।১, ঋক্)।

ইলার উত্তরে যে দেশ তাহারই নাম দিব্। দিব্ চারিটী যথা—সত্যলোক

অহর্লোক, রাত্রিলোক, ও সংবৎসর লোক। অনেক ভাষ্যকারেরা এই সত্য-লোকের অর্থ সত্য কথন, আর অহ, রাত্রি ও সংবৎসর জনপদদিগকে কালপদ-বাচ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পরন্ত সত্য অর্থে যদি এখানে সত্যকথন বুঝায়, এবং অহ, রাত্রি ও সংবৎসর যদি কালপদবাচ্যই হয়, তাহা হইলে তাহাদের একে একে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থানের কথা 'বেদে' লিখিত থাকিবে কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না (১।১৯৮।১০, ও ২।১৯০।১০, ঋক্)। ইহারা যে জনপদ তাহা ঋগ্বেদে ও অনেক ব্রাহ্মণগ্রন্থে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে। ঋত ও সত্যের এক অর্থ সত্যকথন। ইহাদের আর এক অর্থ সত্যলোক। যথা,— ঋগ্বেদে যাহারা সত্যলোকে বাস করিয়া থাকে তাহারা সত্যলোকবাসী (৫।৪০।৪) —ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৯৫ পৃ ও ৪৯৬ পৃ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় আছে যে পরস্পর বিবদমান দেবতারা অহর্লোক ও অসুরেরা রাত্রিলোকে আশ্রয় করিলেন। আবার, অসুরেরা ভ্রাতৃব্য দেবগণকে অহর্জনপদ প্রদান করিলেন (৬৩৯ পৃ ঐ)। সংবৎসর দেবতাদিগের অধিকৃত একটী দেশ, উহা অসুরেরা জয় করিয়াছিলেন। পরে দেবতারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পুনরায় অধিকার করেন (৯৯ পৃ, কৃষ্ণযজু)। দ্বাদশ মাসে এক সম্বৎসর হয়; ইহা ভিন্ন আরও একটী সম্বৎসর আছে। উহা দেবতাদের একটি পুরী (৩১৬ পৃ, তৈঃ ব্র)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে যে বারমাসে এক সংবৎসর, আর প্রজাপতি চন্দ্রের (আকাশের চাঁদ নহে, এই চন্দ্র প্রজাপতি চন্দ্র-বংশের আদি পুরুষ) একটি আয়তনের নামও সংবৎসর (৬০ পৃ)।

এইবার আমরা দেখিব কোন্ স্থান কত প্রাচীন; আর কোন্ স্থানই বা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ঋগ্বেদে (১।৫৫।৪) বিবৃত আছে যে মহতী 'দ্যো' ও 'পৃথিবী' জগতের সকল জনপদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা বর্ষীয়সী। আর এক স্থলে, এই দ্যাবা পৃথিবী অতি বিস্তৃত বাসস্থান ও ইহারা সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল (৮।৬৫।১০)। ইহা হইতে বুঝা গেল যে 'দ্যো' ও পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর? ঋগ্‌বেদের একজন ঋষিই এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন, 'দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে উৎপন্ন, আর কোন্ স্থানই বা পরে উৎপন্ন হইয়াছিল? (১।১৮৫।১ম, সায়ণ ভাষ্য)। পিতা (পিতৃভূমি দ্যো) সকল স্থানের মধ্যে প্রাচীনতম' (৩।৭৩।৯, ঋক্)। আর আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের এক স্থলে দেখিয়াছি যে, যে জলরাশি প্রথমে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল সে আপন মহিমায়

'যজ্ঞ' জনপদকে জন্মপ্রদান করিল। তাহা হইলে দেখাগেল ইলা, দ্যো, বা যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম।

প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় পৃথিবী বা ভারত (উত্তর ভারতের কতক অংশ, কারণ অতি পুরাকালে ভারতের অন্যান্য অংশ জলমগ্ন ছিল), আর অন্তরীক্ষ তৃতীয়। আমরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে পুরাকালে কেবলমাত্র দ্যাবা পৃথিবী ছিল, তখন উহাদের মধ্যে অন্তরীক্ষ জনপদ ছিল না (৯৬ পৃষ্ঠা—সায়ণ ভাষ্য)। তৎপরেই পশ্চিম মহাসাগর গর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয় (১।১৯।১০, ঋক)। এই অন্তরীক্ষে বরুণ রাজত্ব করিতেন (৫।৮৫।৫, তৈঃ, ব্র)। আর এই বরুণই পার্সিদের 'অহুরমজ্‌দা'। পুরাণ প্রণেতারা সমুদ্র জনপদকে সাগর ভাবিয়া বরুণকে জলদেবতায় পরিণত করিয়াছেন। অসুরেরা (বৃত্র ও বল) ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্তরীক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে (১৩।৬।৮ম, ৮।১৪।৮, ও ৫।৬।১ম, ঋক্)। বৃত্র পারস্যে 'আয়ায়ণ' (পরে আইরাণ বা ইরাণ) জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'বল' অসুরীয় (পরে assiryan) সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বলই আসিরিয়ার বেল বা বিলুস্। *

অন্তরীক্ষ সৃষ্টি হইবার সময়েই সত্য ও রাত্রিলোক স্থূল পরিণত হয় (১।১৯০।১০, ঋক)। তারপরই সংবৎসর ও অহর্লোক সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় (২।১৯০।১০, ঋক)।

অতএব ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে ইলাই মঙ্গোলিয়া ভূমি খণ্ড, পৃথিবীই ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ পারশ্য ও তুর্কি, এবং দিব্‌ সাইবেরিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ। আমরা ঋগবেদে (১।১০।২ ও ১০।৪৫।১।১) আরও দেখিতে পাই যে অগ্নি প্রথমে দ্যোতে, পরে ভারতে ও তৎপরে অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হয়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে আর্য্যমানব প্রথমে দ্যোতে বাস করিতেন, পরে ভারতে আসেন, এবং ভারত হইতে অন্তরীক্ষে গমন করেন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আর্য্যেরা তাঁহাদের ভারতের বাসস্থানকে কেন 'দেবনির্ম্মিত-দেশ' বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সমালোচনা শেষ করিব।

---

* পার্সিদের জেন্দ আভেস্তা পড়িলেই বুঝা যায় ইহা দেবদ্রোহী অসুরের প্রণীত। তাহাদের অর্য্যাণেম্‌ বৈজো আমাদের 'আর্য্যাণ বর্ত্ত' (আর্য্যাবর্ত্ত) ছাড়া আর কিছুই নহে। আরও দেখা যায় যে আভেষ্টীর লেখক অঙ্গরামৌনকে (Angra Mauna) অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এই অঙ্গরামৌন বেদের অঙ্গিরস্‌ মুনি। বেদে এক স্থলে দেখা যায় যে অসুরেরা (বিলু ও তাহার অনুচরেরা) অঙ্গিরাগণের গাভী প্রায়ই হরণ করিয়া লইয়া যাইত (৫।৬।১ম ঋক্)॥

অশান্তি।

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

তবু ঝরিল না প্রাণ।
একে একে জীবনের বসন্ত, নিদাঘ,
বরষা, শরৎ ঋতু স্নিগ্ধে শ্যামরাগ
ল'য়ে হ'ল অবসান;
তবু ঝরিল না প্রাণ।
হিমের কুয়াসা আজ চৌদিকে আঁধার
ঘিরেছে—দেখি না পথ—সবি একাকার—
ভয়েতে আকুল প্রাণ;
তবু ঝরিল না প্রাণ।
শিথিল জীবন বৃন্ত পীত জরাতুর
ঝরিয়া পড়িতে চায় মৃত্যু নহে দূর,—
ওই এসেছে আহ্বান—
তবু ঝরেনাক প্রাণ।
নাহি রূপ নাহি গন্ধ নাহি কোনো কাজ
এসেছে অতিথি নব পরি নব সাজ;
ছাড়িতে চাহি যে স্থান—
তবু ঝরে নাত প্রাণ।

———

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

সহজিয়া।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৭

কিন্তু আমার এই বিফল পূজার পূর্ণ ফলও যে একজন নিজে বয়ে এনে দিচ্ছে, তার কথা যেন বলতে না ভুলি। সে কে? সে দয়াময়ী হাসিদেবী—বিশ্বের হাসির প্রতীক নয়, একেবারে জমাট প্রতিমা, বিশ্বলক্ষ্মীর মূর্ত্তি বিগ্রহ! এ যে কেন এমনি ভাবে আমার মায়ের আড়াল হতে আমাকে ঘিরে ফেল্‌লে তা যে বুঝতে পারছি নে। তা কি কেউ তোমরা বুঝিয়ে দেবে? আমার স্বর্গগত মালিকের মহা বৈরাগীর সংসারে এমন লক্ষ্মীর পদ্মাধারটি কি করে ফুটলো কে ফোটালে? কার জন্যে ফোটালে?

কার জন্যে ফোটালে? আমারি জন্যে—আমারই জন্য যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ফোটালে; যার বিশ্বমানসে প্রত্যেকের জন্য সবের, সবারই জন্যে প্রত্যেকের জন্ম হয় তারই এই কারসাজী। কিন্তু কারসাজী ধরা পড়ে যাচ্ছে। এইটেই সেই চিরন্তনী বোকা মেয়ে বুঝি বুঝছে না।

বুঝছে না? তাই বা কেমন করে হবে? সে যদি না বোঝে ত' এই হাসিই বা কি করে সব বুঝে ফেলে। আমার কি চাই, কোন্ সময় কোন্ মুহূর্ত্তে কি দরকার তা সবই কি করে এ বুঝলে? আমার ঘরখানা কি করে ঠিক এমনি ভাবে মন ভুলান হয়ে উঠ্‌ল। এমন সব ছবি—এমন ফুলের অর্ঘ্য, এমন বিচিত্র মালা, এমন সব রঙ্গিন খেলনায় কেন আমার ঘরখানা ভরে উঠল!

আবার ঐ অত শোভার সম্ভারের মাঝখানে এমন একটা ভিখারীর ছবিকে এমনি ভাবে শ্বেত পাথরের হোয়াট্‌নটের ওপর গোলাপ আর পদ্মের মালার ফ্রেমে কেন সে বসিয়ে দিয়েছে? এই এত রূপের, এত আলোর মাঝখানে ঐ ভিক্ষাপাত্র হাতে জগদেক-ভিখারী বুদ্ধদেবকে কেন সে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে? সে কি প্রায় প্রথম দর্শন হতেই টের পায়নি? সে কি না জেনেও জানে নি?

যে অমনি করে তাদেরই দ্বারে এই হতভাগা কামুকটা পতিত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে?

সে টের পেয়েছে ভাই, অনেক আগেই টের পেয়েছে, কারণ সে সবারই সব খোঁজ রাখে, যার কাছে কিছুই হারায় না সে সর্ব্বনাশী সর্ব্বলোলুপাই যে এই মানুষটির প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে ঢুকে এর অন্তর বাহির সবটুকুকে তাতিয়ে রাঙ্গিয়ে ভরিয়ে ভরিয়ে তুলছে'।

কিন্তু আমি কবে এবং কি করে এ কথা জানতে পারলাম? সে একটা গোপন কথা—তবু বলতে হবে? আচ্ছা বলছি। 'আমার মধ্যে যে একটুও আড়াল রাখতে দেবে না তোমরা, তা জানি, আমার সব অহংকার যে তোমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। তবে শোনো—

আমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, ঠিক আমার নয় আমাদের তিন জনের। আমার যিনি সেই যোগীগুরু—মন্ত্রগুরু জ্ঞানগুরু তিনি, আর আমার হিমালয়ের সেই বন্ধু সাথী সখা এবং কর্ম্মগুরু সেই তুরিয়ানন্দ স্বামী আর এই অধম মানুষটার তখনকার চেহারার ফটোগ্রাফ আমার গুরুদেবের এক শিষ্য তুলে আমাদের তিন জনকে দিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে ঝোলায় রেখেছিলাম, এবং এখনো ওটা রেখেছি। কেন? তা কি বলতে হবে। এই শরীরটার ওপর, এই বিকশিত আমিটার ওপর চিরদিনই আমার বোধ হয় লোভ ছিল। তাই রেখেছিলাম—ফেলিনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফখানা বেরুল কি করে, তা ঠিক বুঝাতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটা মার যেমন একটা কাজ হয়েছিল, বোধ হয় হাসিদেবীরও একটা কাজ হয়েছিল। আমি যখন ষ্টেটের কাজে বাইরে থাকতাম, তখন এই দুঠি নারী-হৃদয় আমাকে নিয়ে কি যে করত তার সঠিক খবর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে মা আমার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া যা কিছু বলবার সবই বলে ফেলেছিলেন। এবং সেই আমার যেটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত নারীর মনে এমন একটা আকর্ষণ করেছিল যাতে এই সেবাপরায়ণাকে আমার জন্য অনেক সময় ভাবিয়ে তুলত।

সেই ভাবনাকে মূল করে এই ফটোখানার ওপর সেদিন মার সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র কাছারী হ'তে ফিরে মার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক থেমে গেল। হাসি তাড়াতাড়ি ফটোখানি লুকালে।

মা কিন্তু সে লুকোচুরী রাখতে দিলেন না—ফটোখানা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'প্রিয়, তোর বাক্সে এ কাদের ফটো রে ?'

আমি চমকে বল্লাম, 'কৈ দেখি।' ফটোখানা হাতে পেয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগল—আমি বল্লাম, 'কেন বল ত ? এদের কি তোমরা চেন নাকি ?'

মা বল্লেন, 'আমি ত' একজনকেও চিনতে পারছি নে, তবে এই মানুষটার মুখ যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।'

'কার মত মনে হচ্চে ?'

'যেন তোরই মত।'

আমার মুখটা তখন কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল সেটা গোপন করব না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'হলেই বা আমার মত, আমিই যে তা ত জোর করে বলতে পার না !'

মা দেখে দেখে বল্লেন, 'না, তা ঠিক বলা যায় না।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বল্লাম, 'ও আমার তিনটি চেনা লোকের ছবি। কিন্তু এটা তোমরা পেলে কোথায় ?'

মা এইবার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তোর বাক্সর মধ্যেই পেয়েছি। বাক্স গোছাতে গিয়ে—'

আমি একবার হাসির মুখেরদিকে চাইলাম তারপর বল্লাম, 'তা বেশ করেছ, তাতে আর এত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন ? এখন দাও ওখানা রেখে দিই—ওদের তোমরা চেন না ; কি করে চিনবে ?'

এইবার হাসি কথা কইলে, বল্লে, 'আমি কিন্তু ওর মধ্যে দু জনকে অন্ততঃ ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

আমি প্রাণপণ বলে জোর করে বল্লাম, 'আপনি ত' আর কালিদাস নন যে বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ভানুমতীর তিলটা হ'তে বনের বাঘ ভালুকের কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবেন। আপনাদের বাড়ীতে বহুদিন হ'তে সন্সিসী মহারাজরা যাতায়াত করছেন, হয়তো কারুর সঙ্গে এদের মুখের সাদৃশ্য আছে। তাই বলে এরাই যে তারা তার কোনো মানে নেই, অন্ততঃ একটার বিষয় আমি ঠিক জানি যে কখনো তাকে দেখেন নি।'

হাসি বল্লে, 'কোন্‌টার বিষয় শুনি ?' আমি আমার চেহারাটা দেখিয়ে বল্লাম 'অন্ততঃ একে কখনো দেখেন নি।'

'কি করে জানলেন ?' আমি জেরায় পড়ে জব্দ হবার মত হলাম, তব

সাহসে ভর করে বল্লাম 'আমার ইনি খুব চেনা লোক, ইনি কখনো এখানে আসেন নি তা জানি।'

হাসি হাসিহীন মুখে উজ্জ্বল চোখে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, 'ঠিক জানেন আসেন নি ?'

আমি বল্লাম, 'ঠিক জানি, ইনি, ঠিক ইনিই, কখনো আসেন নি। আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না—'

আমার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে হাসি বল্লে, 'বিশ্বাস করা না করা ত' আমার হাত নয়। যাক, ও নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই আর একটী লোককে যে আমি দেখেছি এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'সে কি! কবে দেখেছেন ? কোথায় দেখেছেন ?'

'এইখানে, ঘণ্টা দুই আগে।'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। হাতের ফটোখানা যে কি জোরে কাঁপতে লাগল তা বলতে পারিনে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলে নিয়ে বল্লাম, 'ইনি এইখানেই আছেন, আর আমি জানি নে! আশ্চর্য্য !'

হাসি এইবার হেসে উঠলেন, কিন্তু সে হাসিটা যে ঠিক হাসির মত শুনিয়েছিল তা যেন মনে হল না। হাসি বল্লে, 'আপনি অনেক খোঁজই রাখেন না, যাক আপনার এক বন্ধুর খোঁজ দিলাম যদি দেখা করতে চান ত' বড় বাগানে গিয়ে দেখা করে আসবেন।'

মা এতক্ষণ চুপ করে এই প্রগল্‌ভা রমণীর কথা শুনছিলেন। কি যে তাঁর মনে হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমি যে খুব একটা মুস্কিলে পড়েছি তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতড়ি বল্লেন, 'সাধু দর্শন! সে তো খুব ভালকথা, আজই আমায় নিয়ে চল না মা আমি দেখে আসি। প্রিয় যখন সময় পাবে যাবে এখন, এখন ওর জলখাবারটা এনে দিই, তুমি দাঁড়াও।'

হাসি কিন্তু দাঁড়াল না; বল্লে, 'না মা এখন নয়, দিদি হয়ত আমায় খুঁজছে, তার সন্নিসী পূজোর সময় উত্তীর্ণ হচ্ছে, আমি যাই, কাল আপনাকে নিয়ে যাব।'

হাসি চলে গেল—মাও বেরিয়ে গেলেন, আমি কেবল অবাক হয়ে যে পথে ঐ অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করলে সে দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

উপাসনা।

উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য

অনেক দিন হইতে দেশে কেবলই একটা কলহ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে—আমাদিগকে কোন্ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের ভাষা ছাড়া কোন ভিন্ন জাতির ভাষাকে যদি আপনার করিয়া লওয়া সম্ভব হইত তবে আমি দেশবাসীকে কহিতাম, তোমরা উর্দ্দু বাঙ্গালা সব ভুলিয়া আরবীকে মাতৃভাষায় পরিণত করিয়া লও। কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব। এক আত্মার পক্ষে অন্য শরীরে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, কোন জাতির পক্ষে নিজেদের গৃহের ভাষা ভুলিয়া ভিন্ন দেশের ভাষাকে আপনার করিয়া লওয়াও তেমনই অসম্ভব।

কল্পনা করুন, যদি সমস্ত বিশ্বের মোসলমান জাতির ভাষা আরবী হইত, তাহা হইলে এসলামের বিরাট দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইত তাহার সম্মুখে কি কেহ দাঁড়াইতে পারিত? দুঃখের বিষয় এই কল্পনা কখনও কার্য্যে পরিণত হইবার নয়।

শিশু বয়স হইতে কত সুখ ও দুঃখের কথা, কত স্নেহ মায়ার প্রকাশ, কত স্মৃতি, কত প্রার্থনা, কত পরিচিত প্রাণ, কত হাসি, কত হারাণ কণ্ঠস্বর যে ভাষার সহিত জড়াইয়া আছে, তাহা কি ভোলা যায়? তাহা ভুলিলে আমার যে কিছুই থাকে না। আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ-অশ্রুর কঠিন ভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি—কিন্তু আমার শেষ সম্বল—ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।

দুঃখের দাবদাহে যখন আমার বক্ষ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন আমি মাতৃভাষায় সান্ত্বনার গীত গাই, যখন প্রবাসে দুঃখ-ক্লেশের মাঝে সংসারকে নিতান্তই অনাত্মীয় বলিয়া মনে হয়—তখন দিগন্তের বাতাস আমার আমারি ভাষায় কত প্রীতির কথা বলিয়া যায়। আমার হারান প্রিয়তমার মুখখানি কতবার নিশীথে আমার বাতায়ন পাশে আসিয়া, আমারি ভাষায় আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। প্রকৃতির শ্যাম মাধুরী, বিশ্ব জোড়া আলোক, বাতাসের হাসি, শ্রাবণের বর্ষাধারা, কালমেঘের অসীম আবেগ কাহার ভাষায় অনন্তের সঙ্গীত শোনায়?

আমার ভাষা কাড়িয়া লইয়া আমাকে দরিদ্র করিও না।

মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার

জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায়—কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য কে আমাকে উপদেশ দেয়?

মাতৃভাষার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ যত দ্রুত হয় এমন আর কিছুতে হয় না। বিদেশী ভাষায় হুঙ্কারজনক অসরলতা ছাড়িয়া মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সহজ ও সরল করিয়া দেশবাসীকে মহত্ত্ব ও জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ কর, দেখিবে কত সহজে সে তোমাকে সাড়া দেয়।

গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না। সে তাহাতে যথার্থ আনন্দ ও শান্তিলাভ করে না। বহু লোককে উর্দ্দুর জয়গান গাহিতে শুনিয়াছি,—তাঁহারা বলেন—উর্দ্দুর ভিতর এসলামের যে সম্পদ রহিয়াছে বাঙ্গালায় তাহা নাই। এতদিন বাঙ্গালী মোসলমান বাঙ্গালা ভাষার সেবা করে নাই। বহু সাধকের সাধনা সে পায় নাই—তাহার এ দীনতার জন্য সে নিজে দায়ী নহে।

উর্দ্দুর ভিতর এসলামের অনেক সম্পদ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সে সম্পদ লৌহ কীলকাবদ্ধ হীরক স্তূপের মত নিরর্থক হইয়া আছে। সে সম্পদে মানুষের কোন কল্যাণ হইয়াছে কিনা জানি না। অনুবাদ ও প্রাণহীনতার নির্দ্দয় চাপে সারা উর্দ্দু সাহিত্যটা একটা মরু মাঠের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। উহাতে একটু জল পাওয়া যায় না। উহাতে ঈশ প্রেমের যথেষ্ট ছড়াছড়ি আছে,—কিন্তু স্নেহ সহানুভূতির ক্ষীণ পরশ নাই! উহাতে দাসজীবনের অবনত মাথা আছে,—স্বাধীন চিত্তের সরল সহজ প্রীতি গন্ধ নাই।

যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব। উর্দ্দু সাহিত্য নিজের প্রিয়তমাকে লইয়া নির্জ্জনে প্রেমালাপ বা কাঁদাকাঁদি করিলেও উহা মানব হৃদয়ের ব্যথা বেদনার কোন খবর রাখে না। মানুষকে সূক্ষ্মভাবে ভাবের স্পর্শ দিয়া আঘাত করিবার সার্থকতা স্বীকার করে না—ইট সুরকীর কথা না ভাবিয়া ইমারত গড়িবার দুরাশা সে রাখে। যে মানব হৃদয় লইয়া জাতির বিরাট হৃদয় গঠিত—তাহাকে সে একেবারেই বাদ দেয়।

কলিকাতার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক উর্দ্দুভাষী—ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি হিংস্র জন্তুরই সমান। উর্দ্দু সাহিত্যে যদি এমন কোন শক্তি না থাকে যাহার স্পর্শে আসিলে মানুষের আত্মবোধ জন্মে, সে তাহার জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, তবে সে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? শুধু

নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কথা নহে, উর্দ্দু ভাষী উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও সাধারণতঃ স্নেহ-সহানুভূতি ও কোমল স্বভাবের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। জীবনের উচ্চ রকমের সার্থকতার কোন খবর ইহারা রাখেন না, দুই একজন আত্মীয়, মাতা পিতা ও পত্নী ছাড়া ইহারা সকলের প্রতিই নিষ্ঠুর। অথচ ইঁহারা এসলামের মুক্তি চান। মুক্ত এসলামের স্বরূপ ইঁহাদের কাছে 'কেমন, তাহা তাঁহারাই জানেন—হয়ত কতকগুলি দালান কোঠা, ভিন্ন জাতীয় মানুষের আভূমি নত মাথা—বালাখানার পরাধীন দাস দাসীর সেবা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

নারায়ণের নিকষমণি।

ব্যক্তি ও সমাজ।—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি, এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বি, প্র, ভাণ্ডার গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। মূল্য ছয় আনা রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ থাকিবার সময় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রশ্নগুলি লেখকের মনে উদিত হইয়াছিল সেইগুলি স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ছলে এই পুস্তকখানির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র, সহধর্ম্মিণীর আদর্শ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। লেখকের প্রকৃতি অনেকটা রক্ষণশীল, গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক টান অধিক। সুতরাং সামাজিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিয়াও তিনি অনেক সময় পুরাতন আদর্শকে সনাতন নাম দিয়া নূতন রূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে এই ভাবটী বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে নাকি স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন-হৃদয়; শুধু ভিন্ন দেহ। লেখকের মতে "তাই স্বামী দুষ্ট হইলেও স্ত্রী প্রার্থনা করে জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই যেন স্বামী পাই।" সত্যই কি তাহাই হয়? যুক্তিগুলি নব বিবাহিত যুবক ভিন্ন অপর কাহারও মুখে শোভা পায় না।

কিন্তু স্থানে স্থানে একদেশদর্শিতাদুষ্ট হইলেও পুস্তকখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। লেখকের ভাষা সরল ও মার্জ্জিত; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাঁহার সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

পুস্তকখানি Evolution of German statecraft নামে Contemporary Review পত্রিকায় যে প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয় তাহার বঙ্গানুবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্ম্মানী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিরূপ শিক্ষা ও ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া জর্ম্মানী এক 'নেশনে' পরিণত হইয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া জগতকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মূল প্রবন্ধ ইংরাজের লিখিত; সুতরাং তাহাতে কতকটা ইংরাজ-জাতি-সুলভ সঙ্কীর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বাংলা অনুবাদটিও সেই কারণে এক-দেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বক্রগতি জর্ম্মানীর অধঃপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরেজ বা ফরাসী জাতির জীবনেও কি সেই বক্রগতি নাই?

পুরুষকার

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান অল-ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৵০ আনা।

নিষ্ফল অদৃষ্টবাদের চাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া আমাদের দেশের যুবকেরা যাহাতে আত্মনির্ভরশীল ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকা-খানি রচিত।

এই সাধু উদ্দেশ্যের আমরা সফলতা কামনা করি।

পথের সাথী

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত; প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় পয়সা।

পুস্তিকাখানি স্বামী স্বরূপানন্দের কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি। উপদেশ-গুলি সজীব, বিদ্যুদগর্ভ; অসাড় প্রাণে সাড়া আসিয়া দেয়।

"ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সকলকে লইয়া দেশ। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া তুমি দেশকে তুলিতে পার না। ছোটকে বাদ দিলে বড় ছোট হইয়া যাইবে; বড়কে বাদ দিলে ছোট ছোটই রহিবে। দেশ উঠিবে না।"

"আমরা প্রেম পাই না ; কেবল প্রেম দেই না বলিয়া। * * আমাদের যদি প্রেমই থাকিত, ঘরে ঘরে দশটা করিয়া উনান জ্বলিত না, বিশটা করিয়া জাতি হইত না, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব ভাতের হাঁড়িতে যাইয়া প্রবেশ করিত না।"

"এক একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট, বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তি দেবতার প্রতিষ্ঠা।"

"পরকে ভাল বাসিয়াছ কি? নিজের কথা ভুলিয়া যাইয়া মুখের গ্রাস ক্ষুধিতেরে তুলিয়া দিয়াছ কি? একটা ছাগ শিশুকে বাঁচাইতে চাহিয়া আপনার শির যুপকাঠে পাতিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, উপাসনায় তোমার কিসের প্রয়োজন?"

এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে আশা করি পুস্তিকাখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে।

খুকুর জন্ম।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়)

কামনা-বাসনা-রূপে হৃদয়ে লুকায়ে ছিলি
আনন্দ মুরতি ল'য়ে খুকু হ'য়ে দেখা দিলি।
সন্ধ্যার সে মেঘমাঝে এঁকেছিনু ছবি তোর
জাগিত মা তোর তৃষা রজনী হইলে ভোর।
সাগরের ঢেউমাঝে দেখেছিনু তোর মুখ
জীবনে সাধনা মোর তুই মোর সব সুখ।
বিশ্বের মঙ্গল রাশি তুই মোর মা আমার
তুই মোর ব্রতপূজা বস্তু ধ্যান ধারণার।
আঁখি তোর আনে প্রাণে বিশ্বের বারতা রাশি
স্বর্গসুধা ঢালে প্রাণে তোর ক্ষুদ্র কল হাসি।
অমৃত সমান মাগো কোমল পরশ তোর
শব্দে ফুটে কত ভাষা শুনিয়া আপনা ভোর।
সুখে তুই সুখরবি দুখে তৃপ্তি সান্ত্বনার
নারীত্বের সার্থকতা বিধাতার উপহার।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]　　　　[ভাদ্র, ১৩২৮ সাল ।

সত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার]

ফরাসী দার্শনিক বার্গস্ঁ বলেন যে আমাদের সত্যোপলব্ধি দুই প্রকারে হইয়া থাকে,—এক জ্ঞান অথবা যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা আর অনুভূতির সাহায্যে।* জ্ঞানের দ্বারা যে সত্যোপলব্ধি হইতেছে তাহার বিশালতা মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, জ্ঞানগরিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার মনে হয় জ্ঞানই জীবনের সার। সামান্য একটী বালুকণার মধ্যে এত অসংখ্য সত্য নিহিত আছে যে ইহাও তাহার ধারণার অতীত হইয়া পড়ে। যে দিকেই তাকায় সে দেখিতে পায় কত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান জ্ঞানের ধারা প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে,—দিনের পর দিন তত্ত্বের সহিত তত্ত্ব সংযোজিত হইয়া সৃষ্টির বিশালতা বাড়াইয়া দিতেছে। একদিকে যেমন জ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব বিস্তারে তাহার মন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে,—আর একদিকে তেমনই মানুষের জ্ঞানকে মানুষের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়া সে নিজেকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে যে জীবনে মরণে কোথাও যেন সোয়াস্তি পায় না,—এই নিখিলবিশ্বে আশ্রয়হীন প্রবাসীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য আজ বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য জগতে হৃদয়ের এত শূন্যতা, এত হাহাকার দ্বিধা ও অসন্তোষ। জর্ম্মান কবি গ্যয়টে তাঁহার রচিত ফাউষ্ট-চরিত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেরই প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন। বিপুল

---

* কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় "সাহিত্যে অনুভূতি" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

তাহার ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার, অমেয় তাহার শক্তি,—যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার, যাহা কিছু কামনার সবই তাহার হস্তগত,—তবুও,—তাহার অন্তরাত্মা চির-ক্ষুধিত, সে সমস্ত জগৎ পাইতে গিয়া নিজেকে হারাইতে বসিয়াছে। যদি কেবল জ্ঞানের চর্চ্চায় অথবা কর্ম্মের উল্লাসে সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইত, :তাহা হইলে আজিকালিকার পাশ্চাত্য মনীষিদিগের রচনার মর্ম্মস্থলে এমন হুতাশের শ্বাস ও বুকফাটা দুঃখ গুমরিয়া উঠিত না। ইউরোপ তাহার মনের গভীর অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণাকে এবং প্রয়াসের ব্যর্থতাকে ভুলিবার জন্য অহমিকার তাণ্ডবনৃত্যে জগৎটা দলিত মথিত করিয়া তুলিয়াছে,—কিন্তু এই নটরাজের নর্ত্তনে মাধুর্য্য যতখানি দেখা যায় ভীষণত্ব ও ক্ষুব্ধ বেদনা তার চেয়ে ঢের বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, হৃদয়হীন জ্ঞান ভাঙ্গিতে পারে, গড়িতে পারে না; সংহার করে, সৃষ্টি করে না। বরং সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সে যে নূতন সংসার পাতাইতে চায় তাহাতে প্রাণের আনন্দ বড় থাকে না, রক্তমাংসের মানুষ সেখানে শান্তি পায় না। জ্ঞানের সহিত মানব-মনের এইরূপ একটী দ্বন্দ্ব আছে বলিয়া, শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজন, কারণ উহারা অনুভূতির সাহায্যে এই দ্বন্দ্বকে ঘুচাইতে চেষ্টা করে, হৃদয়ের সহিত জ্ঞানের পার্থক্য লোপ করিয়া ইহাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলে। জ্ঞান যখন সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের পদতল হইতে সরাইয়া নিরবলম্ব মহাশূন্যে আমাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়, শিল্পী তখন এই জীবধাত্রী ধরণীর সহিত আমাদিগকে আবার স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া দেন;—জ্ঞানকে ভাবের দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া সৃষ্টির লীলার সহিত তাহাকে একাত্মবোধ করান্। নিয়মের অন্ধ আবর্ত্ত, কার্য্যকারণ পরম্পরার নিষ্ঠুর তাড়না হইতে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া তিনি একটী স্নেহপূর্ণ কুটীর রচিত করেন, চির-পিপাসার্ত্ত মানবাত্মার জন্য প্রেমের উৎস খুলিয়া দেন, তখনই আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের আবাসের চতুর্দ্দিকে উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রমত্ত ঝটিকায় আলোড়িত হইতেছে!

জ্ঞানচর্চ্চার একটী স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি যাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানচর্চ্চা সহজ। কি পদ্ধতিতে জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে ইহা জানিবার শিখিবার বিষয় এবং জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। অঙ্কশাস্ত্রের

কতকগুলি মূলসূত্র জানা থাকিলে যেমন তাহাদের সাহায্যে অসংখ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় এবং ইহাতে যেমন বিশেষ প্রতিভার অথবা মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় না,—তেমনই জ্ঞানের সূত্র যাঁহাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে, নূতন তত্ত্ব-আবিষ্কার তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। কেবলমাত্র জ্ঞান-চর্চ্চার দিক হইতে দেখিলে, রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ড অথবা মহাত্মা পেরিক্লিসের সময়ের এথেন্স যে খুব উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল একথা বলা যায় না, কিন্তু ঐ সব ঐতিহাসিক যুগের বিশেষত্ব এই যে তখনকার সমাজে জ্ঞানের স্পন্দন সর্ব্বত্রই কমবেশী পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল,—তাঁহারা স্বতঃই জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞানকে কেবল অনুশীলনের বিষয় করিয়া ফেলিলে তাহাতে কেমন যেন একটা জড়ত্ব আসিয়া পড়ে,—মানুষের সমগ্র সত্তা তাহাতে উদ্বোধিত হয় না এবং এইরূপ জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানানুশীলন যেরূপভাবে চলিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন মানবের মন জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার যন্ত্রবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জ্ঞানের সীমা কোথায় এবং কিসের জন্য, কাহার জন্য যে এই জ্ঞান,—এ কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। টাকা করিবার নেশা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন অঙ্কের পর অঙ্ক ফেলিয়া তাহার যেমন সুখ,—লক্ষ ছাড়াইয়া নিযুত, নিযুত ছাড়াইয়া কোটি হইয়া যায় তবু তাহার সঞ্চয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না—এ টাকার কতটুকু যে ভোগে লাগিতে পারে নেশার ঝোঁকে সে কথা সে একবার ভাবিয়া দেখে না—এ যেন শুধু একটা রেষারেষি পাল্লাপাল্লির ব্যাপার হইয়া পড়ে,—তেমনই জ্ঞানের নেশা যখন কোনও সমাজকে পাইয়া বসে তখন জ্ঞানই মুখ্য, জীবন গৌণ হইয়া দাড়ায়—জ্ঞানের চাপ প্রকাণ্ড একটা জড়স্তূপের ন্যায় মানুষের মনকে নিষ্পেষিত করিতে থাকে, জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়।

জ্ঞানের সহিত যদি আনন্দের যোগ না থাকে, তাহা যদি আমাদের জীবনে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত করিয়া প্রাণের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারে তাহা হইলে এইরূপ জ্ঞানের স্বভাব ধর্ম্মই এই যে ইহা কর্ম্ম জগতে সাফল্য লাভ করিতে চায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের সেই জন্য কর্ম্মের সহিত একটী নিগূঢ় যোগ আছে—বিজ্ঞানের সার্থকতা কর্ম্মে। সাহিত্যও একহিসাবে আমাদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে বটে; কিন্তু সে কর্ম্ম স্বভাবোচিত, আনন্দ নিঃসৃত,—মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সরল স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহারই সহিত বিশেষ

ভাবে সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক সত্য একদিকে যেমন নির্ব্বিকার আর একদিকে তেমনই ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্বদ্ধ আমাদের সংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই জন্য ভিতরকার মানুষের সঙ্গে,—আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির সহিত,—বিজ্ঞানের যোগ অতি ক্ষীণ বৈজ্ঞানিক জগতের কর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ চিত্তের শুদ্ধি, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি অথবা ভাবের কমণীয়তা জ্ঞাপিত করে না। আমাদের বাহ্য-প্রকৃতিকে,—জীবনের বহির্রঙ্গকেই বিজ্ঞান মার্জ্জিত করিতে চাহিয়াছে—কিন্তু সেই পরিমাণে মানুষের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করে নাই। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মের কোনও শেষ দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ জড় শক্তির অসংখ্য যোগাযোগের উপরই ইহার ভিত্তি। কর্ম্মের জটিলতা যত বাড়িতে থাকে ইহা ততই যেন মানুষকে আরও বেশী কর্ম্মে নিয়োজিত করে,—সমস্ত জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড কলকারখানায় পরিণত করিয়া তবে ছাড়ে। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মের ফাঁসে যদি মানুষ একবার নিজেকে ধরা দেয় তবে তাহা হইতে যতই মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কর্ম্ম কমাইতে চায়,—ততই যেন তাহাতে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে কর্ম্মকাণ্ডের যে বিশাল যজ্ঞ আরব্ধ হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া নিজেকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করে।

সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান একটী কাজ এই নীরস জ্ঞান, এই কর্ম্মের জঞ্জাল হইতে মানুষকে রক্ষা করা। আমরা যে জ্ঞানের কারা রচিত করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি, শিল্প বা সাহিত্য তাহাকে দু চারিটী গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বাহিরের বাতাস ও আলো আসিবার পথ খুলিয়া দেয়;—এই যে চিরকল্লোলিত জীবনের স্রোত, অবারিত শূন্যতলপথে সৃষ্টির এই যে অনাদি আবেগ ধারা জল স্থল গগন পূর্ণ করিয়া এই যে অভিনব সৌন্দর্য্যের কত বিচিত্র বিকাশ, ইহাদের সহিত আমাদের নিত্য নূতন পরিচয় করাইয়া দেয়। কর্ম্মজীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে একটী অজানিত পুলক, একটী দূরাগত মুক্তির স্বাদ বহিয়া আনে। বাস্তবের প্রকাশকে জ্ঞানের দিক হইতে না দেখিয়া, হৃদয়ের দিক হইতে, সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্তি-হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করে। এই হিসাবে ভুলভ্রান্তি থাকিলে তাহার বেশী কিছু আসে যায় না কারণ সাহিত্যের জ্ঞানকে ত আর কর্ম্মের নিক্তিতে "ওজন" করিয়া লইতে হইবে না,—তাহার সার্থকতা কর্ম্মে নহে, আনন্দে! জ্ঞানের যে অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে যত আনন্দ দান করিতে পারে সেই জ্ঞানই সাহিত্যকে তত পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

সহজোচ্ছ্বসিত আনন্দ শিল্প ও সাহিত্য সমস্ত জ্ঞানের কূল প্লাবিত করিয়া কর্ম্ম-জীবনের কাঠিন্য ও শুষ্কতার মধ্যে রসের সঞ্চার করে। যে জ্ঞানের সহিত আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধ,—গরজের দায়,—তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত করিয়া তুলে;—তাহার ভিতর একটা স্পন্দমান যে আনন্দের রেখা তাহাকে দীপ্তি-প্রদান করিতেছে, যাহার সহিত আমাদের সাংসারিক সুখসাচ্ছন্দ্যের কোনও প্রকাশ্য যোগ নাই;—সেইটিকেই বিশেষভাবে প্রতিফলিত করিতে চায়। সাহিত্যে আমরা জ্ঞানের যে পরিচয় পাই—তাহা তাহার সরল নগ্ন মূর্ত্তি, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সুবিধা অসুবিধা ইহার সৌন্দর্য্য বিকৃত করিয়া তুলে না,—কিম্বা কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা ইহাকে শত সহস্র-ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এত জটিল, কঠিন নীরস হইয়া পড়িতেছে কারণ ইহার চুলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই কর্ম্মজগতে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন সহজ সরলভাবে, প্রাণের উৎসারিত আনন্দে,—আমরা জ্ঞানকে দেখিতে পাই, তখন তাহা আপনিই সাহিত্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আবার যদি জ্ঞান অলীক ঔৎসুক্যে চালিত হইয়া নূতনত্বের প্রলোভনে নিজের সীমার এবং পথের নির্দ্দেশ না করিয়া মনে করে, চলারই বুঝি একটা সার্থকতা আছে, তাহা হইলে জ্ঞানের এই জটিলতার মধ্যে, যুক্তিবুদ্ধির এই বিড়ম্বনার ভিতর সাহিত্য তাহার দিব্যদৃষ্টি লইয়া একটী সহজ পথ আবিষ্কার করে;—সে পথের সুবিধা এই যে তাহাতে আর কিছু না হউক মানুষের মনে তৃপ্তি ও শান্তি দেয়, জ্ঞানের অহেতুক বিক্ষোভ হইতে তাহাকে রক্ষা করে। দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই সাহিত্যের মধ্যে আসিতে পারে, যেখানে শুধু বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা নাই অর্থাৎ সত্যের সহিত প্রাণের অনুভূতি আছে। আমাদের উদ্ভাবিত প্রায় সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানই সাহিত্যে ক্রমশঃ স্থান পাইতেছে এবং তাহাকে ব্যাপ্তি প্রদান করিতেছে। কিন্তু সাহিত্যে আসিলেই সে জ্ঞান ভিন্নাকৃতি হইয়া একটী অখণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দেয়,—অন্তরের সম্পূর্ণতা তাহাতে প্রতিফলিত হয়। যখন এইরূপ সম্পূর্ণভাবে আমরা জ্ঞানকে উপলব্ধি করি অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির কেবলমাত্র একটা দিক নহে, যখন তাহা সমগ্র অন্তরাত্মাকে ভরিয়া দেয়, তখনই সেই জ্ঞানের ভিতর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়, তখনই আমরা অনুভব করি—সত্য ও সুন্দর এক। সত্যমাত্রই সুন্দর একথা বলিতে পারি না, কিন্তু তেমন শিল্পীর হাতে পড়িলে, তাঁহার অন্তরের "জ্বালায়" নির্ব্বাসিত হইলে, প্রত্যেক সত্যই সুন্দর হইতে পারে।

জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যেন সে অচল, স্থির,—জড়জগতের চাঞ্চল্য এবং প্রাণের সদা প্রবাহিত গতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে, গতির মধ্যে স্থিতি, ঝটিকার মধ্যে শান্তি, পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপ্তি দেখিতে চায়। সেই জন্য জ্ঞানের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের জগৎ হইতে ভিন্ন। আমাদের চক্ষের সম্মুখে যাহা চিরসঞ্চালিত, প্রাণ পূর্ণ, গতিমান,—জ্ঞানের নিকট তাহা স্থির অচঞ্চল গুণের সমষ্টি। আমরা নিজের প্রাণের ভিতর যে অবারিত গতি অনুভব করিতেছি তাহার সহিত ইহার যেন কোনও যোগ নাই,—এ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার যোগী,—নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত,—আমাদের ঘরকন্নার সামান্য সুখদুঃখের সহিত, আমাদের আবেগ বিহ্বল হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। জ্ঞানের এই অস্বাভাবিক স্থৈর্য্য, এই প্রশান্ত নির্লিপ্ত ভাব আমাদের হৃদয় পীড়িত করে তাই সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে ভুলাইয়া এই তাপস কুমারকে আমাদের সংসারেতে লইয়া আসেন, —অমনই আনন্দের ধারা বর্ষিত হইয়া জগৎ আবার নূতন রূপে আমাদের নিকট ধরা দেয়। আমাদের মধ্যে এমন একটা প্রেরণা আছে, যাহাতে শুধু জ্ঞানে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। সেই জন্য প্লেটো তাঁহার দর্শনতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া সাহিত্য-রচনা করিতে বসেন,—বেদান্তদর্শন হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইয়া হৃদয়ের জিনিষ হইয়া যায় আর বর্ত্তমান যুগের ব্যর্গসঁ সাহিত্যিক কি দার্শনিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবিক সেই একই প্রেরণা যাহা আমাদের মনকে জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহাই আবার জ্ঞান হইতে অনুভূতির দিকে আমাদিগকে সঞ্চারিত করিতেছে। কারণ দেখিতে গেলে আমাদের জ্ঞান যাহা বাস্তবের বহিঃপ্রকাশের উপর স্থাপিত তাহাও ত একেবারে নিশ্চল, স্থির নহে। ইহারও গতি আছে, ইহা ক্রমশঃই ব্যাপকতর হইয়া চলিয়াছে কিম্বা গভীরতর হইয়া অনুভূতিতে মিশিয়া যাইতেছে। আজ যাহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কাল তাহা জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যায়। জড় ও শক্তির দেহ ও চৈতন্যের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান ও অনুভূতির ব্যবধান ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। এবং এই ব্যবধানকে তিরোহিত করিয়া সাম্যে পরিণতি লাভ করানই সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য।

সত্য—শুভ্র, নিরঞ্জন, অমূর্ত্ত, রূপরসশব্দ গন্ধ স্পর্শহীন। মানবের জ্ঞানে তাহার সব চেয়ে নির্ম্মল প্রকাশ অঙ্কশাস্ত্রে এবং অন্যান্য মানবীয় শাস্ত্র যতই ইহার সান্নিধ্যে গমন করে, যতই অঙ্কশাস্ত্রের

মত হইয়া পড়ে, ততই আমাদের জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সত্যকে শব্দে আবদ্ধ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা ইহার স্বরূপ বিবর্ত্তিত হয় না। আমাদের বস্তুজ্ঞান যেমন একদিকে রূপ হারাইয়া অরূপের মধ্যে যাইতেছে,—বৈজ্ঞানিক সত্য ক্রমশঃই—অঙ্কে, কেবলমাত্র সাঙ্কেতিক চিহ্নে পরিণত হইতেছে; এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আপনাকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করে;—আর একদিকে তেমনই অরূপ এই যে সত্য, রূপের পর রূপের মধ্য দিয়া, স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। সত্যের এই বহির্মুখী যাত্রা,—জ্ঞানের দিকে বিকাশই বি-জ্ঞান; আর তাহার অন্তর্মুখী যাত্রা, ভিতরের দিকে বিকাশ,—হৃদয়ের সহিত সমীকরণই সাহিত্য। বাস্তবিক, বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পর-বিরোধী নহে,—একই সত্যের দুই প্রকাশ। অথবা ধর্ম্মের ভাষায় বলা যইতে পারে,—বিজ্ঞান নিরাকার চৈতন্যের উপাসনা করে, সাহিত্য সাকার চৈতন্যের উপাসক। বৈজ্ঞানিক সত্য,—চৈতন্য-স্বরূপ, জ্ঞানে বোধ্য,—সাহিত্যের সত্য,—ভাবের আনন্দে রূপে পরিণত।

আমরা যাহা অন্তরের মধ্যে হৃদয়ের ভিতর যত গভীরভাবে অনুভব করি, তাহা তত রূপবান হইয়া উঠে। আসক্তিই সৌন্দর্য্যের মূলাধার। আসক্তিবিহীন ধর্ম্মেই নিরাকার উপাসনা সম্ভব কারণ প্রেম ত কখন আধার ছাড়া হয় না এবং ভালবাসিলেই যে ভাল দেখিতে হয়। অঙ্কশাস্ত্রের মত একেবারে নির্ব্বিকার সত্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না এবং তাহাকে আমরা রূপও দিতে পারি না। সাহিত্যে যে সত্যের অনুভূতি আমরা পাই তাহা একদিক দিয়া না একদিক দিয়া রূপের সহিত সংযোজিত,—সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টি লইয়া সাহিত্য ব্যস্ত এবং ইহা সমষ্টিকে ও ব্যষ্টির মধ্যে দিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, মানব-মনের নিগূঢ় সত্য ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার মধ্যে ফুটাইয়া তুলে। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি সত্য আকারহীন বাষ্পের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এবং সাহিত্যিক তাঁহার প্রাণশক্তি দ্বারা সেগুলিকে আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিতে পারে না। যে শক্তিপুঞ্জ প্রকৃতির মূলে থাকিয়া তাহাকে রূপবান প্রাণবান করিয়া দিয়াছে তাহাদের নিজের ত কোনও রূপ নাই। এই যে অরূপকে রূপদান ইহাই সৃষ্টির লীলা এবং তজ্জন্যই সাহিত্যিক স্রষ্টা। বাহ্যজগতে যেমন এই লীলা প্রতিমুহূর্ত্তে কত বিচিত্র রূপে ও বর্ণে কত গন্ধ ও স্পর্শে আপনার মহিমা প্রকাশিত করিতেছে,—অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিয়া দিতেছে,—অন্তর্জগতেও তেমনই এই লীলাভিনয় কত অশরীরি সত্যকে ও মূর্ত্তিবিহীন প্রজ্ঞাকে ভাবের

রূপ দিয়া সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বলিয়া বোধ হয় যে কোন অজানিত রাজ্য হইতে এই মুহূর্ত্তে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে আইসে, মানসনেত্রে দেখা দেয়,—পর মুহূর্ত্তেই তাহা কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়ের বাহিরে জ্ঞানের আলোকে মিশিয়া যায়। কাব্যে ভাব ও রূপের এমন অভেদাত্মযোগ, যে একটীকে আর একটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে আমরা পারি না এবং এই দুইয়ের সংঘাতে চিত্ত আন্দোলিত হইয়া আপনার স্থিতি খুঁজিয়া পায় না,—বাস্তব হইতে চ্যুত হইযা কল্পনা-প্রবাহে ভাসিয়া যায়। এমন কি গদ্যেও ভাব ও রূপ যে কেমন উকি ঝুঁকি মারিয়া চলে তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক পড়িলেই বুঝা যায়। সাহিত্যে উপমা ইত্যাদি—এক কথায় তাহাদিগকে অলঙ্কার বলা যাইতে পারে,—বাস্তবিক তাহারা ঠিক অলঙ্কার নহে,—তাহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই খসান' কিম্বা পরাণ' যায় না। তাহারা অনুভূতির রূপে অভিব্যক্তি ভাবের সহিত তাহাদের যোগ, বাহিরের নহে, অন্তরের। জড়জগতে যেমন কোনও শক্তির প্রকাশের সময় সৃষ্টি হয় ও আলো বিকীর্ণ হয় তেমনই ভাব ও রূপ উভয়েই একই অনুভূতির যুগপৎ প্রকাশ,—বাহিরের দিকে ইহা রূপে, ভিতরের দিকে ইহা ভাবে অভিব্যক্তিলাভ করিতে চায়। সেইজন্য আলঙ্কারিকদিগের প্রাচুর্য্য ঘটিলে, রচনার অবনতি হইতে থাকে, কারণ শিল্পসৃষ্টি শুধু অলঙ্কার সংযোজনা নহে।

অনেক সময়ে গদ্যে যাহা নিতান্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, পদ্যে তাহা অপরূপ সৌন্দর্য্যধারণ ও নির্ম্মল আনন্দ প্রদান করিতে পারে। এই আনন্দ কেবল ভাবেও নহে ভাষাতেও নহে,—ভাব ও রূপের সংস্পর্শে চিত্তের যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, একটি হইতে আর একটিতে যাওয়াতে মনের যে গতি আরব্ধ হয়,—ইহা মুখ্যতঃ তাহারই উপর নির্ভর করে। এই জন্য কাব্য-সমালোচনায় এত মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। কেহ কেবল ভাবের দিক হইতে, কেহ আবার শুধু রূপের দিক হইতে কবিতা বুঝিতে চেষ্টা করেন। একদল ইহাকে টানিয়া টানিয়া আধ্যাত্মিকতার চরম সীমায় গিয়া পৌঁছেন, আর একদল ইহার অন্তরকে বিলুপ্ত করিয়া রূপের মধ্যেই ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন, উভয়েই ভুলিয়া যান যে প্রাণের অভিব্যক্তি রূপে, এবং রূপের সার্থকতা-প্রাণে। কাব্যে যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে, ভাবের যে তড়িৎগতি ইহাতে খেলিয়া বেড়ায়, তাহাকে ব্যাখ্যায় অথবা সমালোচনায় ঠিক বুঝা যায় না কারণ মনের গতি কথায় ধরা পড়ে না।

গীতিকবিতাতে এই গতির দিক্‌টা যেমন সহজে স্ফুট হয়, অন্য কবিতায় তাহা হইতে পারে না। গীতিকাব্যে বহুমুখী গতি অথবা ভাবের জটিলতা নাই, কাজেই প্রাণের মূল সুরটি আপনিই ধরা দেয়। গীতি-কবিতা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন মূর্ত্তিমান জীবন, নিষ্কলঙ্ক গতি। কবি তাঁহার ভাবের শুভ্র গতি ভাষায় নিরোধ করিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গীত যেমন বিভিন্ন সুরলয়ের মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় মাধুর্য্য বিতরণ করিতে থাকে, এই নিরন্তর গতিই যেমন তাহার শ্রুতিমাধুর্য্যের প্রাণ, এবং ইহাকে স্থিতিমান করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চাহিলে তাহা সঙ্গীত নহে,—শব্দ-বিজ্ঞান;—কাব্যেরও তেমনই একটি আভ্যন্তরিক গতি আছে, যাহার স্বরূপ সহৃদয় পাঠক ছাড়া আর কাহারও কাছে ব্যক্ত হয় না। কবিতা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। কিন্তু অলক্ষ্যে হৃদয়ের সুর বদ্‌লাইয়া যায়, রাগে বর্ণে জীবন ভরিয়া উঠে। কবি তাঁহার ভাবের পশরা লইয়া হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যিনি একবার হৃদয় খুলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আর তাহা ফিরাইয়া দিতে পারেন না। চিরকালের জন্য ইহা তাঁহার জীবন-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া যায়। এই খানেই কবিতা ও শিল্পকলার সঙ্গে জ্ঞানের প্রভেদ।

(ক্রমশঃ)

এই ক্লান্ত গোধূলিতে

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১)

এই ক্লান্ত গোধূলিতে কি চাস্ হৃদয়,
রূপ রস গন্ধ গান কোন্ বিনিময় ?
পশ্চিম আকাশে ওই ওড়ে স্বর্ণ-রেণু
দূরে বাজে গৃহে-ফেরা রাখালের বেণু,
তরুতলে তরুছায়া দীর্ঘ হ'য়ে নামে
মুখর তরঙ্গগীতি শ্রান্তির আরামে

মৃদুতর হ'য়ে আসে ; পূরবীর সুরে
দিগন্ত ঘিরিয়া ওই দূরে দূরে দূরে
নামে গাঢ় সান্ধ্য ছায়া ; ঘন কলরবে
আপন কুলায় ছোটে বিহঙ্গম সবে
এর মাঝে ওরে হিয়া, কি চাহিস্ দান
কোন্ আকাঙ্ক্ষায় তুই কি গাহিবি গান ?
কিছু নয় কিছু নয় কহিছে হৃদয়—
শুধু শূন্যে চেয়ে থাকা রিক্ততা সঞ্চয়।

(২)

এই শান্ত সন্ধ্যাবেলা কি চাহিস্ মন
শব্দ স্পর্শ প্রেম প্রীতি কোন্ পরশন ?
নিবিড় নীলিমা ওই সুনীল আকাশে
ঘনতর হ'য়ে আসে, সুধীর বাতাসে
দূরে ফেরা অপ্সরীর নূপুর-গুঞ্জন
দিগন্তের কোলে কোলে করে সঞ্চরণ
নিবিড় স্বপ্নরাশি ; এক দুই করি'
আকাশের বক্ষ ওঠে তারকায় ভরি,
লক্ষ কোটি জোনাকিরা পলে পলে পলে
কোন্ রত্ন সম্পাদিয়া ঘুরি ফিরি চলে
এর মাঝে ওরে মন কি চাহিস দান
কোন্ আকাঙ্ক্ষায় তুই কি গাহিবি গান ?
কহে মন—আর কিছু আর কিছু নয়
শুধু শূন্যে আঁখি তুলি স্বপন সঞ্চয়।

(৩)

এই মৌনে নিশিথিনী ওরে মর্ম্ম মোর
আজি তোর বক্ষতলে কোন্ স্বপ্ন ঘোর ?
নিবিড় রহস্য-বেগে অঞ্চলের মাঝে
অনন্তগগনব্যাপী কোন্ সুর বাজে
অচঞ্চল অচপল ; দিনান্তের স্মৃতি
ডুবে গেল কোথা ; কোন সমাধির গীতি

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করিল মহান্
নিবিড় মৌনতা ঘিরি' ; বিরাট শয়নে
নভস্থলে কার পাতা ঝিকি ঝিকি ঝিকি
লক্ষ কোটি তারা জলে কার কথা লিখি
দৃপ্ত মোহে ; এর মাঝে ওরে মর্ম্ম মোর
আজি তোর বক্ষস্থলে কোন্ স্বপ্ন ঘোর ?
মর্ম্ম কহে স্বপ্ন মোর স্বপ্ন এবে মোর
বক্ষে শুধু খুলি' রাখি অসীমের দোর।

চিঠির গুচ্ছ

দুই দফা

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

(৩)

নরেশ,

তোমার চিঠির শেষ দিকটা পড়ে, সত্যই বিস্মিত হলুম। নারীর প্রাপ্য অধিকার তাকে কে দেবে ? তোমার দেশের পুরুষ ? যার নিজেরই কোন বিষয়ে অধিকার নেই কাঙ্গালের প্রবৃত্তি নিয়ে যে বিশ্বে বড় হতে চায়, আপনাকে শতরকম বন্ধনে বেঁধে ফেলে জীবনের আদর্শ ক্ষুদ্র হতে সে ক্ষুদ্রতর করে ফেলেচে, সে সেকি কখনো পারে অন্যকে মুক্তিদান করতে ?

ভিক্ষা করে নারী স্বাধিকার লাভ করবে না -তাকে, যখনই হোক জোর করেই নিতে হবে। এই যে শতাব্দীর পর শতব্দী অতীত হয়ে গেল ; এই দীর্ঘকাল ধরে বাংলার নারীরা কি সমাজের পরিবারের প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রত্যেকটি দিন শতরকমে তাদের দৈন্যের কথা, বেদনার কথা জানায় নি ? কি তোমরা করেচ ? স্বামীহীনা নারী যখন পরিবারের গলগ্রহ স্বরূপ হয়ে তাচ্ছিল্য, অবমানায় ক্ষুব্ধ হয়ে নারীচিত্তের মাধুর্য্য, বর্জ্জন করে জীবনটাকে একটা দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে করে, তখন তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের একটা

ভূয়ো আদর্শ খাড়া করে তার রক্ত-মাংসে গড়া শরীরের দাবী অগ্রাহ্য করে এসেচ—নির্য্যাতিত হয়ে রোগে ভুগে যখন অকালে তারা প্রাণত্যাগ করচে ; তখন সধবা-অবস্থায় মৃত্যুতে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে বলে উল্লাসে নৃত্য করেচ—অশিক্ষায়, কুসংস্কারে তারা যতই নীচে নেমে যাচ্ছে—ততই তোমরা জোর গলায় গার্গী, লীলাবতী, সীতা সাবিত্রীর আদর্শ প্রচার করছ।

তোমরা ত তাদের চাইতে উন্নত শ্রেণীর জীব—চোখ ঘুরিয়ে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে তোমরা না কি ভগবানের পরোয়ানা একেবারে হাতে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেচ, তোমরা তাদের শুধু অভিভাবক নয়, তাদের ইহকালের সম্বল পরকালের গতি ; কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে, তাদের দুখ বেদনার কথা স্থির ভাবে চিন্তা করে তোমরা তা বিদূরিত করতে এতটুকু চেষ্টা কখনো করেচ? তোমরা তা করনি, অধিকন্তু যারা চেয়েচেন শক্রজ্ঞানে তাদের তোমরা পরিহার করেছ।

তুমি ভাবছ পুরুষ আগে মুক্ত হোক, তারপর নারীকেও সে আপনার পাশে টেনে নেবে। তা হয় না, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাতৃ-দুগ্ধের সঙ্গে দেহের রক্তমাংসে মিশে না গেলে—জীবনের জড়তা ঘোচে না। তুমি শক্তিক্ষয়ের আশঙ্কা করছ, এই জন্যই যে,তোমার ভিতরে শক্তি সঞ্চারিত হচ্চে না—বাইরের কর্ম্ম প্রেরণা জাত আকস্মিক একটা শক্তি তোমার মাঝে চাঞ্চল্য এনে দিয়েচে মাত্র। মায়ের দান ব্যতীত সে দেহের অথবা মনের শক্তিলাভ যে অসম্ভব। এ কথা ত প্রাণীতত্ত্ববিদগণই বলে থাকেন। বহু প্রমাণ প্রয়োগে তাঁরা এ সত্য নির্ণয় করেচেন।

আমি অনেক কিছু ভাঙতে চাই, একথা সত্য; কিন্তু আমার কার্য্য পদ্ধতিটা তুমি ঠিক ঠিক ধরতে পারনি। তুমি ভাবচ, যে নারীর অধিকার তাকে দেবার জন্য আমি দেশের পুরুষদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেব ; না—আমি তা মোটেও করব না, সে সম্বন্ধে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমাদের মেয়েরা নিজেদের শক্তির পরিচয় যে কখনো পায়নি, তাইত ভয়ে সঙ্কোচে সরমে সর্ব্বদাই জড়-সড় হয়ে এক কোণে পড়ে থাকে। তাদের মনের এই দৈন্যই আমি ঘুচাতে চাই—যদি তা না পারি, তা হলে তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু এসে যাবে না। আপনাদের মুক্তি তারা আপনারাই আনতে পারবে। শুধু তাই নয়, তোমাদেরও মুক্তির আনন্দ বুঝতে সক্ষম হবে।

আর একটা কথা, তুমি নিশ্চতই লক্ষ্য করেছ যে আমাদের মেয়েরা স্নেহময়ী বটেই অধিকন্তু স্নেহের আতিশয্যে পীড়িত! তোমরা এই আতিশয্যের গৌরব কর—আমি কিন্তু ব্যথা পাই। বলতে পার, এ আতিশয্য কেন! আমার মনে হয় দুনিয়ার সব কাজে তাদের বঞ্চিত রেখেচ বলেই তাদের অন্তরে নিহিত সেবার আকাঙ্ক্ষাটা তৃপ্ত হতে পারচে না—আর তার জন্যই তাদের যা কিছু দেবার সব স্নেহের আকারে ঢেলে দিচ্চে, নিজেদের হৃদয় একেবারে খালি করে। অতিরিক্ত স্নেহদানের আকাঙ্ক্ষা একটা মানসিক ব্যাধি।

বিজ্ঞেরা অনেক সময় বলে থাকেন, নারীর উন্নতি করতে যারা চায়, তারা নারীর সত্যিকার আসন কোথায় হওয়া উচিত তা বোঝে না। সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করবার অধিকার পুরুষের নেই—নারী নিজেই তার আসন যথা স্থানে স্থাপন করবে; নইলে সে সত্যিকার আসন হবে না।

নারী যাতে তাই করতে পারে, তার জন্য তার মনকে মুক্ত করে দিতে হবে, তার বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে, তার যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সে কথা তাকে বুঝতে হবে।

নারীর প্রতি তোমার সমাজ যে অবিচার করচে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই, অত্যাচারীর দল ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিকূল আচরণ করবে সন্দেহ নেই—কিন্তু নির্য্যাতিত যারা হচ্চে, তাদের অন্তরে যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে, তখন তোমরা কি কামান দেগে তাদের বিনাশ করতে পারবে?

তারপর, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁরা চেষ্টা করচেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার কথাটা আগে থেকেই তোমায় জানিয়ে রাখি। হাতের মাথায় যখন যা কিছু পাচ্ছেন, তাই নিয়েই আন্দোলন সুরু করেচেন বলে তাদের চেষ্টা বিফল না হলেও এই জন্যই বিফল হবে যে, তাঁরা শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চাইচেন, দেশের লোকের মনের পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা না করে। দেশের লোক তৈরি না হলে, শাসন ভার প্রাপ্ত হলেও দুঃখ দৈন্য ঘুচবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

নীহারকে আমার নিকট হতে দূরে রাখাই যে উচিত নয়, একথা তুমি স্বীকার করেচ। কেবল আমার পরিবারের শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা করেই আমাকে একেবারে চেপে যেতে উপদেশ দিয়েচ। আমি অবশ্য ঝগড়া করতে চাইনি কখনো; কিন্তু আমার ওপর যে অবিচার করা হচ্চে সে কথাটা আমি

বলব না কেন? এত অল্পেই যে পরিবারের শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা; সে শান্তির মূল্য কি?

নীহারের চিঠি নিয়মিতই পাচ্চি। কনক যে একেবারেই চুপ! তোমরা ভাল আছ ত? তোমারই মোহিত।

(৭)

স্নেহের ঠাকুর পো,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। এত শিগ্‌গীর আমাদের দূরে ঠেলে ফেলবে, তা আমি কখনো মনে করিনি। অবশ্য নীহারের চিঠিতে আমাদের খবর তুমি পাচ্চ—এবং সে চিঠি রোঁজই যাচ্ছে, বলে আমাদের সম্বন্ধে তেমন চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

আমি দু'চার দিনের মধ্যে একবার বাপের বাড়ী যাব- মাস খানেক থাকতে পারি। সংসারের সমস্ত কাজের ভার নীহারেব ওপর পড়বে—ছেলে মানুষ এত সব পারলে হয়। কিন্তু কি, করব! আমাকে যেতে হবেই। তোমাদের সংসারে এসে ছুটি ত বড় পাইনি, তাই বুড়ো বয়সেও মায়ের কাছে যাব বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

তোমার কাছে নিশ্চিতই এ খবরটা খুব ভাল লাগবে না, কারণ, নীহারের সঙ্গে তোমার মিলন, এতে করে অনেকটা দিন পিছিয়ে যাচ্চে। তুমি হ'চ্চ মুক্ত প্রেমের পক্ষপাতী একেবারে সাহেবী মেজাজের লোক। এমন অবস্থায় নীহারকে এখানে রেখেই হয়ত আমি অন্যায় করেচি, তাতে আবার নানা রকমের ফন্দী খাটিয়ে তাকে আরও অনেকদিনের জন্য দূরে রেখে তোমার বিরক্তি-ভাজন হয়েচি—কাজেই চিঠি না লিখে তুমি আমায় শাস্তি দিচ্ছ দেখে আমি বিস্মিত হইনি।

না, ঠাকুরপো, রাগ করোনা। আমি সত্যিই তোমার অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরেচি। বিবাহিত জীবনের প্রথম সময়ের কথা যদিও প্রায় ভুলে গেছি —তবুও মনে পড়ে একদিনের বিচ্ছেদ কি ব্যথাই বুকে জমিয়ে তুলত। আর এখনো যে ব্যথা পাইনে তা নয়। কিন্তু কেবল নিজের কথা ভাবলেই যে চলে না—অন্যের দাবীও যে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই ত সয়ে থাকতে হয়। আমি কিন্তু নীহারকে শীঘ্রই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলুম। বাবা-মা কাশী যাচ্চেন, তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—তাই দেরি হয়ে যাবে।

আজ ক'দিন মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। তুমি জান যে, আমি নিয়মিতভাবে আমার একটী বাল্য সহচরীর কাছে পত্র লিখে থাকি। বিয়ের আগে আমরা দুজনে প্রায় সব সময়েই এক সঙ্গে থাকতুম। তাদের আর আমাদের বাড়ী ঠিক পাশাপাশি। তার নাম হচ্চে গৌরী, তাও তুমি জান, কারণ, তোমাকে দিয়েই আমি চিঠি ডাকে পাঠাতুম।

গৌরীর বিয়ে হবার পর বছরই তার বাপ মারা যান। গৌরীর স্বামী ফরিদপুরে কাজ করতেন—বিয়ের অল্প পরেই গৌরীকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যান। সে পনের বছর আগেকার কথা। গৌরীর স্বামী অনেকটা তোমাদের ধরণের লোক ছিলেন, তাই তাকে বেশ লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন —বেশ সুখেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল।

গেছে বছর একরাত্রিতে জলে-পড়া একটি লোককে উদ্ধার করতে গৌরীর স্বামী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞাহীন সেই লোকটিকে জল হতে উঠিয়ে তার চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভিজে জামা-কাপড় পরেই নদীপাড়ের সেই ঠাণ্ডায় অনেকটা সময় অপেক্ষা করেন। ফলে দু'দিন পরেই তার নিউমোনিয়া হয়, আর তাতেই অভাগী গৌরীর সর্ব্বনাশ করে দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে রেখে তিনি মারা যান।

গৌরী কি যে বিপদে পড়েছিল, তা কাউকে বোঝান যায় না। স্বামীকুলে তার আপন বলতে কেউ ছিল না। স্বামীর অসুখের সময় ভাইদের জানিয়েছিল, তারাও কেউ গিয়েছিল না। বিদেশে অসহায় অবস্থায় কতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে একাই বা সে কি করে থাকে আর এতগুলি প্রাণীর আহার্য্যই বা কেমন করে জোটে?

গৌরীর একটি ছোট ভাই কলকাতায় কলেজে পড়ত। সে খবর পেয়ে গৌরীকে আর তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ী রেখে আসে। গৌরীর জ্যেষ্ঠ দু'ভাই কিন্তু বিধবা ভগ্নী এবং তার ছেলে মেয়েদের একটা বোঝা রূপেই মনে করলেন। তাদের সংসারে অভাব বেশী নাই; তবুও গৌরীর শোকতপ্ত চিত্ত তারা ভ্রাতৃস্নেহ ঢেলে শীতল করবার চেষ্টা করলেন না! দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাই আর ভাই-বউদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারের সমস্ত কাজ গৌরী স্বেচ্ছায় এবং হাসিমুখেই করত। ভ্রাতৃগৃহে এসে গৌরীর এমন অনেকদিন গেছে, যখন খেতে বসে সামনের ভাতে চোখের জল ফেলে তাকে উঠে যেতে হয়েচে।

এতদিন এ সব কথা আমি জান্তুম না। স্বামীকে হারাবার পর গৌরী আর আমার কাছে চিঠি লেখে নি। আমার ছোট বোন চারু বাড়ী গিয়ে গৌরীর খবর আমায় পাঠিয়েচে। তারপর গৌরীকে আমি দু'তিন খানা চিঠি লিখি, কিন্তু একখানারও জবাব পাইনি। চারুর কাছে সন্ধান নিয়ে জানলুম যে আমার চিঠি গৌরীর হাতে পড়ে নি। বাইরের লোকের মুখের দু'টো কথায় যে, গৌরী একটু সান্ত্বনা পাবে, তার ভাই দুটি তাও সইতে পারেন না—অথচ একই মায়ের সন্তান তারা!

তোমার দাদাকে সেদিন গৌরীর ইতিহাস বল্লুম। এ রকম আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্চে বলে' পাশ ফিরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার ব্যথাটা তাতে আরও বেড়ে উঠল। বিধবার দুঃখে এ দেশের আপন্ বা পর কারও প্রাণ কাঁদে না, কেউ এদের দিকে ফিরে চায় না তবুও সংসারে এদের সকলের মন যুগিয়ে চলতে হবে।

তুমি যখন আমাদের সমাজের মেয়েদের দুরবস্থার কথা বলতে, তখন আমি জানতুম—ভাবতুম ওহচ্চে হাল-ফ্যাসান, সাহেব সাজবারই বাসনা। এখন কিন্তু বুঝতে পারচি, ওটা হেসে ওড়াবার কথা নয়। একটা কিছু করা আবশ্যক, যাতে মেয়েদের জীবনটা এমন দুর্ব্বহ না হয়ে ওঠে।

সহমরণ প্রথা বড় ভাল ছিল, ঠাকুরপো। স্বামীকে হারিয়ে অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এমন জ্বলে পুড়ে ছাই হতে হোত না—এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যেত।

এ সব কথা তোমায় কেন লিখচি জান? বেদনার কথা মানুষ তাকেই জানায়, যে সহানুভূতি দেখিয়ে বুকের ব্যথা কমাতে পারে। তোমার দাদার কাছে সে জিনিষটা ত পেলুমই না অধিকন্তু তাঁর নির্ম্মমতার পরিচয় পেয়ে আরও ব্যথিত হলুম। গৌরীর প্রতি তার আপন জনের অবিচার এতই স্বাভাবিক, এমনই উপেক্ষনীয় যে, তার জন্য সমাজের কারো এতটুকু ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হওয়াটাই অস্বাভাবিক!

আজ ঠাকুরপো, তোমায় আমি দু'হাত তুলে এই আশীর্ব্বাদই করচি যে, বাংলার নারীদের দুঃখ দূর করবার যে ব্রত তুমি নিয়েচ, তা সার্থক হোক। তোমাদের চেষ্টায় ও যত্নে বাংলার গৌরীর দল আর বৃদ্ধি না পেয়ে দিন দিনই যেন কমে যায়।

মিনি আমার সঙ্গেই যাবে—খোকা থাকবে তার কাকীমার কাছে। এখানকার সকলেই ভাল আছেন। নীহারের জন্য তুমি বেশি চিন্তিত হয়োনা

তাকে সাধ্যমত যত্ন করতে আমি বিরত হব না। তার নিজের সুন্দর স্বভাবের কথা ছেড়ে দিলেও সে যে তোমার স্ত্রী এইটেই কি তাকে ভালোবাসবার আমার যথেষ্ট কারণ নয়?

এ চিঠির জবাব আমাদের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ো। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার বউদি।

(৮)

প্রিয়তমে এভি,

কর্ত্তব্য পালন করা যত সোজা ভেবেছিলুম, এখন দেখচি তা নয়। মনের মাঝে কোন ব্যথা না নিয়ে পারতুম যদি কর্ত্তব্যের বোঝা বইতে, তা হলে বেশ হোত—কিন্তু এ যে কেমন নিজেকে শুকিয়ে মারা, আপন বুকে নির্ম্মম আঘাত করা। স্বামীর নিকট হতে দূরে রয়েচি বলেই যে, সব কিছু কঠোর বলে মনে হচ্চে, তা নয়। হয় ত দিনগুলি সে জন্য অনেকটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলে মনে হচ্চে—বড় একঘেয়ে, সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য বিহীন, সুতরাং আনন্দের লেশ-মাত্র পরিচয় তাতে পাচ্ছিনে—কিন্তু ওই এক কারণই সব নয়। আরও কি যেন আছে, যা আমার সঙ্গে মোটেও খাপ খাচ্চে না।

এ বাড়ীতে দাসদাসী যথেষ্টই আছে—নিজেকে এমন কিছু করতে হয় না; তবু সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি তাঁতের মাকুর মত এধার ওধার ঘুরচি—নয় ত দীর্ঘ দুপুরের সবটা সময় সমবেত পুরঙ্গনাদের মজলিশে ঘোমটায় নাক-মুখ ঢেকে বসে থেকে কাটিয়ে দিচ্ছি। যদি কখনো কোন ছলে গিয়ে নিজের ঘরে বসে বই খুলে দু পাতা উল্টিয়েচি, অমনি বিবাহিতা, অবিবাহিতা একপাল মেয়ে ঘরে ঢুকে 'বিবি-বউদি' 'বিবি-বউদি' বলে আমায় অস্থির করে তুলেচে। বিরক্ত হয়ে আমি আবার মজলিশেই ফিরে গেছি।

সত্যি ভাই, বলত, এ রকম করে কি থাকা যায়? এরা যে আমার কাছে কি চায়, তাই-ই এতদিন আমি আবিষ্কার করতে পারিনি।

আমার জা-টি কিন্তু বড় ভাল লোক। তাঁর সকল সময়েই নজর রয়েচে আমার সুখ সুবিধার দিকে। তাতেই আরও আমি বিব্রত হয়ে পড়েচি। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গ যে আমি পছন্দ করি নে, তা কিন্তু তাদের ঘৃণা করে নয়। তাদের সঙ্গে বাইরের গল্প করতে নেহাৎ মন্দ লাগে না; কিন্তু তারা যে তাতেও তুষ্ট নয়। তাদের দাবীগুলো

একবার শোন—তারা আমার স্বামীর চিঠি দেখবে, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমার স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে হবে, বিয়ের রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে আমার কি সব কথা হয়েছিল, তাই তাদের বলতে হবে—এই রকম আরও কত কি। এরা সব আমার চাইতে অনেক ছোট, এত ছোট যে, এদের মাঝে সব চাইতে বড় যে, তার বয়সও চৌদ্দ বছরের বেশি হবে না।

এখন, বলত, এদের মাঝে আর আমাতে এমন কি ভাবের ঐক্য থাকতে পারে, যাতে আমি প্রাণ খুলে এদের সঙ্গে মিশতে পারি, দু'টো কথা বলে আরাম পাই। মিশতে পারি নে বলেই এরা সব আমায় বিবি-বউদি বলে ডাকে। ও কথাটা একটা গাল নয় বলেই আমার দুঃখ হয় না, কিন্তু দুঃখ হয় এই জন্যই যে, এই সব দুধের মেয়েদের সঙ্গে আমি 'প্রেমের কথা' বলিনে শুনেই, এদের মা-খুড়ীরাও আমার প্রতি অবিচার সুরু করেচেন।

কিন্তু, তাঁরা যাই করুন আর যাই বলুন, এদের দাবী আমি মেটাতে পারব না, সারাজীবন সঙ্গীহীন হয়ে থাকলেও না।

আমার জা' যেদিন আমায় ডেকে চুপি চুপি বল্লেন—"ওরা যা শুনতে চায়, জানতে চায়, তা ওদের বলিস—নইলে ওরা দুঃখিতা হবে, আর লোকেও তোর নিন্দা করবে।

আমি বল্লুম—"দিদি, ওরা যে কত ছোট।"

"হোলই-বা" বলে তিনি হেসে চলে গেলেন।

সেই অবধি আমি ভারি অশান্তি বোধ করচি। এতদিন বাহির হতেই মেয়েদের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেচি, এবার ভিতরে এসে দেখচি, অবস্থা কত শোচনীয়। হয় ত তোমার কথাই ঠিক, এভি। খুব প্রবল একটা আলোড়নে সব ওলট পালট না করে দিলে, যে অমঙ্গল একবার শিকড় গজিয়ে বসেচে, তা আর দূর করা যাবে না। মানুষ যে নিজেকে এমন করে ভুলতে পারে, তা আমার আগে জানা ছিল না। আশে পাশে যাদের দেখচি, যাদের সঙ্গে কথা কইচি, চলচি, ফিরচি—তাদের কারো মাসে প্রাণ নেই—সব যেন পুতুল, কলে কাজ করচে। এদের চাইবার কিছু নেই—বাড়বার আকাঙ্ক্ষা নেই। এরা শোকে জলচে, ব্যথায় নুয়ে পড়চে, তাচ্ছিল্যে শুকিয়ে যাচ্চে, তবুও এদের চৈতন্য নেই। এদের মুক্তি যে কবে, কেমন করে হবে, তা কে বলতে পারে?

যতই ভেবেচি, সংসারে ঢুকেচি বলেই ব্যক্তিত্ব ভুলব না—কিন্তু, জোর করে

যে, সব ভুলিয়ে গুলিয়ে দিচ্চে। চারিদিকে বাধা পড়ে প্রাণ আমার মুক্তির জন্যই হাঁপিয়ে উঠেচে। এমন করে কর্ত্তব্য পালন করতে আর আমার ভাল লাগে না।

আমাদের মেয়েদের উন্নতির সব চাইতে বড় বিঘ্ন দেখছি, তাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষাই মানুষের মনকে বাহির হতে টেনে এনে অন্তর্নিবিষ্ট করে। মেয়েরা যে নিজেদের কথা ভাব্‌বে, নিজেদের শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে—সে কিসের প্রেরণায় ?

শিক্ষিত গৃহস্থের মেয়েরা অক্ষর জ্ঞান হবার পরই ইস্কুলের সীমা মাড়ায় না কারণ, দশ বছর হতে না হতেই বিয়ের সাড়া পড়ে যায়। তখন হতেই পিতা মাতা পাত্রান্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, মেয়েকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে চান না।

বাঙালীর মেয়েদের শিক্ষা বলতে এখনো কেবল ততটুকু ভাষা জ্ঞানই বুঝায়, যাতে করে তারা শুধু চিঠি পত্র লিখতেই সক্ষম হয়। ডাক কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে পার্‌লেই হোল, এখন তা' পাঠ্যই হোক, আর অপাঠ্যই হোক।

বাঙালী যুবকেরাও বিবাহের পর বালিকা পত্নীদের নিকট হতে এই ধরণের চিঠি পেয়ে নিশ্চিতই খুব খুসী হন ; নইলে তারাই পারতেন মেয়েদের শিক্ষার দুরবস্থা ঘুচাতে। অবশ্য সবাই যে তুষ্ট নন, তার পরিচয় আজকাল মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, বিদ্রোহের খবর মাঝে মাঝে কাণে এসে পৌঁছে—কিন্তু সেখানে সমাজ আবার তার দণ্ড তুলে শাসনে প্রবৃত্ত হয়। এই সব দেখে শুনে, আমি মোটেও বুঝতে পারচি নে, কি করে কাজের সুবিধা হবে।

স্বামী লিখচেন যে, মেয়েদের অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কি করে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যাবে ?

সকল দেশেই এক একটা বড় পরিবর্ত্তনের সময় এমন কতগুলি পুরুষ নারী জন্ম গ্রহণ করেচে, যারা প্রচলিত বিধি নিয়ম অগ্রাহ্য করেই তাদের উচ্ছেদ সাধন করেছে। আমাদের দেশে তেমন নর-নারীর সংখ্যা না বাড়লে পরিবর্ত্তন আনা যাবে না। এ সম্বন্ধে তোমার মত জানতে উৎসুক রইলুম।

স্বামীর চিঠি প্রায় রোজই পাচ্ছি—ভালই আছেন। তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা তোমায় জানাতে লিখেচেন। তোমাদের বিস্তারিত খবর লিখো। ইতি,

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী

নীহার।

নীরবে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

আমি আর কব'না কথা।
এবার আমায় দাওগো তোমার
শান্ত নীরবতা!
যেমন তরু স্তব্ধ ভাবে,
সন্ধ্যা রবি অস্ত যাবে
শান্ত মধুর সুনীরবে
সন্ধ্যা আসবে যথা,
দাওগো এবার আমার বুকে
তেমনি নীরবতা!

আর লাগেনা ভাল আমার
হাটের কোলাহল,
নীরবে হোক বেচা কেনা
যেটুক কর্ম্মফল!
এবার আমার গোপন বঁধুর
দেখ্‌ব স্বরূপ মৌন মধুর,
নেত্রে শুধুই ফুটবে বিধুর
কিরণ সুনির্ম্মল,
আর লাগেনা ভাস আমার
হাটের কোলাহল!

কেনা বেচা সাঙ্গ,—সে যে
কোন্ সুদূরের কথা!
গুম্‌রে মরুক বুকে এবার
সাগর গভীরতা!

সকল দিকের বাঁধন খুলে,
তোমার দিকেই চোখটী তুলে'
আপন মনে করবে সে ভোগ
আপন মধুরতা,
দাওগো এবার একতারাটীর
ভুলিয়ে বাজে কথা !

কণ্ঠ আমার কুণ্ঠিত যে
কেবল কথা ক'য়ে,
এবার, কেবল ব্যথা করবে জমা
কথার কৃপণ হ'য়ে।
তোমার চরণ তলে ব'সে যবে
কথা বলার সময় হ'বে,
সেদিন তোমায় শোনাবে গো
মিশিয়ে তালে লয়ে,
সেই লগনের অপেক্ষাতে
রইব মগন হ'য়ে !

শাঙ্কর দর্শন কি স্ব-বিরোধি ?

[অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর]

আমাদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে যে সকল শিক্ষনীয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বের স্থান অতি নগণ্য। এজন্য প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রের হাতে-পড়া শিক্ষিত সাধারণের মনে ভারতীয় দর্শনাদি সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার থাকা খুব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা দর্শন—ন্যায়—বিজ্ঞানাদির অধ্যাপনা দ্বারা জ্ঞান-দানকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশের তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে কোনরূপ গুরুতর ভুল-ভ্রান্তির পরিচয় পাইলে বড়ই ক্ষোভের

কারণ হয়। অধ্যাপক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ লিখিত বিগত ফাল্গুন সংখ্যক 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত "সর্ব্ব-ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ—স্পিনোজা ও শঙ্কর" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া এই কথাটীই মনে হইতেছে। উক্ত প্রবন্ধে ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের দার্শনিক তত্ত্বের কিরূপ মর্ম্মগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং ঐ তত্ত্বালোচনায় কিরূপ বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছেন তার নমুনা লেখকের অনমুকরণীয় ভাষায় দিতেছি।

ধীরেন্দ্র বাবু বলেন:—(১) "মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যা স্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে। একদিকে জগৎ ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত 'কিছুর' প্রয়োজন হইতেছে, অন্যদিকে এই 'কিছু' অবোধ্য (irrational) সুতরাং জগৎ কারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে। * * ইহা (শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব) বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরে এক কল্পিত, abstract একত্ব।"

(২) "আর জীব! সে তো ব্রহ্মই! তবে যে পরিমাণে সে 'আমি ব্রহ্মত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই প্রমাণ হইতেছে সে ব্রহ্ম নহে।"

(৩) "আর ব্রহ্ম! যে জীব তাহা হইতে আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চির-বিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিল তখন ত কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্যখানে একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের কারণ মায়াফল ভক্ষণ জনিত বদ্ হজমি।"

উপরি উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল-ভক্ষণ হেতু শাঙ্কর দর্শনের বদ্‌হজমির ফল কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের দর্শন হইতে আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তার সঙ্গে স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া উক্ত দর্শনের যে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা রস-সাহিত্যের হিসাবে কৌতুক-প্রিয় এক শ্রেণী পাঠকের নিকট খুব উপভোগ্য হইবে। যাহা হউক প্রশ্ন হইতেছে:—

(১) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব ও মায়াবাদ কি প্রকৃতই পরস্পর বিরুদ্ধ? (২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? (৩) শঙ্করের ব্যাখ্যাত জগৎ-কারণ কি জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত? (৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য irrational?

(৫) সাধন-ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব-ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয় ?

শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মূল সিদ্ধান্তগুলির একটু আলোচনা করিলেই উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাইবে। শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি? তাহা নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, একমাত্র, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। এই ত গেল ঐ সম্বন্ধের 'না'র দিক। তার 'হাঁ'র দিক, তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই বেদান্ত বাক্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সৎ চিৎ,আনন্দ এই তিনটী কথা ব্রহ্মের বিশেষণ নহে, অথবা তাঁহার মধ্যে কোনরূপ স্বগতভেদ সূচনা করিতেছে না। যাহা সৎ বা অস্তিত্ব-স্বরূপ তাহাই স্বপ্রকাশ অতএব চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ, এবং যাহা স্বয়ং প্রকাশ তাহাই আনন্দ। অতএব সৎ = চিৎ = আনন্দ = ব্রহ্ম অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্ব।

ব্রহ্ম একমাত্র সৎ অতএব তিনি অনন্ত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, ভূমা। তিনি পারমার্থিক সৎ, তাঁহার সত্তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, কোনকালে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুপ্তি, তুরীয় কোন অবস্থায় বাধা নাই ; কারণ, তিনি অজ, অনাদি, বিক্রিয়া-রহিত। এক অদ্বিতীয়, অনন্ত, অবিক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী সত্তা স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বহু নামরূপে প্রতিভাত জগতের প্রকৃত অস্তিত্বও অস্বীকার করা হইল। তাই শঙ্কর প্রমাণ করিয়াছেন আমরা যাহাকে বাহ্য জড় জগৎ বলি, কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ দেহ বলি এবং সুখ-দুঃখ সংকল্প-বিকল্পাদি দেহ-ধর্ম্ম বলি, তাহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। পারমার্থিক সৎ তাহাই যাহা কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও অবস্থায় বাধিত হয় না, যাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বাধ (persistent)। বস্তুর এই নির্ব্বাধতা, স্বরূপের অব্যভিচার শঙ্করের মতে সত্তার লক্ষণ বা নিরুক্তি (definition) ; এবং এইরূপ বস্তু ব্যতীত অপরাপর সমস্তই মিথ্যা—এই কথাটী শাঙ্কর দর্শন বুঝিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

উপরোক্ত অর্থে এই দৃশ্যমান জগৎ সৎ নহে, কারণ ইহার পরিণাম আছে, অবস্থান্তর আছে। সুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থায় ইহা সাময়িক ভাবে বাধিত হইয়া থাকে, এবং মুক্তাবস্থায় ইহা নিঃশেষে বাধিত হয়। কিন্তু প্রাকৃত জীবের পক্ষে, যাহার পরমার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে জগৎ একান্ত অসৎ নহে, অপরন্তু, তাহার পক্ষে জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। কারণ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের

ব্যবহার চলিতেছে। তাই জগতের আপেক্ষিক, প্রাতিভাসিক সত্তা আছে—'বন্ধ্যা-পুত্র' বা কবন্ধের শিরের মত এই জগৎ তুচ্ছ উদ্ভট কল্পনামাত্র নহে। আবার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের যে পরিমাণে বাধ আছে সেই পরিমাণে জগতের বাধ হয় না। জাগরণ মাত্র স্বপ্নদৃশ্য অন্তর্হিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবসতি পর্য্যন্ত জগৎ-সত্তা নির্ব্বাধ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে স্বপ্ন-দৃশ্যের ও বিষয়-জগতের মধ্যে সত্তা বিষয়ে যে পার্থক্য তাহা প্রকারগত নহে, কিন্তু পরিমাণগত। স্বপ্ন যতকাল স্থায়ী স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থনিচয়ও ততকালই সত্য। আবার, জাগরণান্তে স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানলাভের পর অবিদ্যাকৃত নাম-রূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ-প্রপঞ্চ অদৃশ্য অসৎ হইয়া যায়—তখন একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্মই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হন। স্বপ্ন-দৃশ্য ও জাগ্রদৃষ্ট বিষয়-জগতের এই সাদৃশ্য,—ইহাদের সত্তা যে আপেক্ষিক কিন্তু পারমার্থিক নহে—ইহা শঙ্করাচার্য্য "ব্রহ্মসূত্রের" এবং উপনিষদের ভাষ্যে বহুস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা:—যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু ব্যবহারেষু অনৃত বুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে, বিকারানেব ত্বহং মমেতি অবিদ্যায়া আত্মাত্মীয় ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা।"—ব্রহ্ম-সূত্র ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১৪শ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য। পুনশ্চ—"জাগ্রদ্বোধাপেক্ষন্তু তদনৃতত্বং, ন স্বতঃ। তথা স্বপ্ন-বোধাপেক্ষঞ্চ জাগ্রদৃষ্ট বিষয়া নৃতত্বং ন স্বতঃ। * * * প্রাক সদাত্ম-প্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্ব্বং সত্যমেব স্বপ্ন দৃশ্যা ইবেতি।"—অর্থাৎ স্বপ্ন-দৃশ্য স্বপ্নাবস্থায় সত্য, কিন্তু জাগরণের পর জাগ্রৎ-জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় তাহা অসত্য। সেইরূপ জাগ্রদৃষ্ট বিষয় সকল স্বভাবতঃ অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় সত্য, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তৎকালীন জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় অসত্য। * * * অতএব সৎ ব্রহ্মাত্মৈক ত্ব বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্তই স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে সত্যই।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৫।৪ শাঙ্কর ভাষ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে প্রকৃত অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, এবং সেই হেতু অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; অতএব মায়াবাদের কল্পনাও (Theory) তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, অর্থহীন। জগৎ সৃষ্ট্যাদির সমস্যা ততক্ষণ—যতক্ষণ অদ্বৈত তত্ত্বাববোধের অভাববশতঃ জগতকে সৎ বলিয়া প্রতীতি থাকে। অতএব সুস্পষ্ট দেখা গেল যে প্রাকৃত অজ্ঞজনের পক্ষে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতের সত্তা আছে ইহা

অঙ্গীকার করিয়াই শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ দ্বারা ঐ জগতের উৎপত্ত্যাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং সেই পরমার্থতঃ সৎ, এক অদ্বিতীয় নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার কোনরূপ সংশ্রব নাই, এবং সেই জন্য "মায়া স্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব" অশুদ্ধ হইয়াছে—এই উক্তি সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি, তিনি জগতের বাহিরে কি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট,—এই সকল প্রশ্ন, 'বন্ধ্যার পুত্রবত্তা, অগ্নির শৈত্য, জলের উষ্ণত্ব প্রভৃতির আলোচনার ন্যায় হাস্য জনক।

অতএব এই দাঁড়াইল যে যতক্ষণ জগতের অস্তিত্ব-বোধ ততক্ষণই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ কি এই প্রশ্ন। তাই শঙ্কর ব্রহ্ম সূত্রের ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ২য় ও ৩য় সূত্রের ভাষ্যে এই বহু-কর্তৃ-ভোক্তৃ বিশিষ্ট, অচিন্ত্য রচনা নিয়ত কার্য্য কারণ যুক্ত জগতের কারণ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ ব্যতিরেকে জগতের যে ব্যাখ্যা অসম্ভব—সাংখ্যদের অচেতন প্রধান, বৈশেষিক প্রভৃতির পরমাণু সমূহ যে জগতের কারণ হইতে পারে না ; বৌদ্ধের শূন্যবাদও যে জগৎ-প্রপঞ্চের সুমীমাংসা দিতে পারে না—এই সকল বিষয় শঙ্কর এই সকল মতবাদ খণ্ডনচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব দেখিতেছি জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া শঙ্কর যখন ইহার সৃষ্ট্যাদির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াছেন তখন তিনি যে ব্রহ্মকে নির্গুণ নিরুপাধি বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন সেই পারমার্থিক একমাত্র সৎ-ব্রহ্মকেই সর্ব্বশক্তিত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই (যেমন উপনিষৎ সমূহে তেমনি) শঙ্কর-দর্শনে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এই দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে শঙ্কর দুইটী পৃথক্ ব্রহ্ম বস্তু স্বীকার করিতেছেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ—তাঁহাতে জগতের কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপ করা যায় না। কারণ, তত্ত্বতঃ জগতের সত্তা নাই—ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সত্তা। কিন্তু যতক্ষণ অবিদ্যাবশতঃ জগতের অস্তিত্ব বোধ ততক্ষণ সেই নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই আমরা ঈশ্বরত্ব নিয়ন্তৃত্বাদি উপাধির আরোপ করিয়া থাকি। "ব্রহ্মসূত্র" ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এই কথাই বিশদ করিয়াছেন। "তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-

শক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্ত সর্ব্বোপাধি-স্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্য—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপদ্যতে" —অর্থাৎ এই সকল অবিদ্যাকৃত উপাধি ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব উক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মার সকল উপাধি দূরীকৃত হইলে, পরমার্থতঃ তাহাতে নিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না।

অতএব জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়। এই সগুণ ব্রহ্মই তাঁর মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ-প্রপঞ্চরূপে অর্থাৎ নাম-রূপে ব্যাকৃত বলিয়া অবিদ্যাভিভূত জীবের নিকট প্রতিভাত হন। তাই, এই মায়াকেই জগৎ-প্রপঞ্চের হেতু, ইহার বীজ-স্বরূপ বলা যায়। তাই "অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া—মায়াময়ী মহাসুপ্তি যস্যাং স্বরূপ প্রতিবোধ রহিতাঃ শেরতে সংসারিনঃ জীবাঃ" বলিয়া শঙ্কর মায়ার বর্ণনা করিয়াছেন। এই মায়াশক্তি ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় সত্তা নহে—তাহা ঈশ্বরাশ্রিতা। এখানেই প্রধানবাদী সাংখ্যদের সঙ্গে ঈশ্বর কারণ-বাদীদের পার্থক্য। মায়াধীশ ও মায়া পৃথক নহে। কারণ, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে, আবার মায়াপ্রসূত জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য এবং সাংখ্যাদি সৎ-কার্য্যবাদিগণ স্বীকার করেন কার্য্য কারণে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। তাই জগৎও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং তৎ সৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জগতের ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব এবং জগতের ঈশ্বরাত্মত্ব উপদেশ করিতেছেন।

মায়াকে রামানুজ ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তি বলেন, কারণ রামানুজের মতে জড় জগৎ ও জীব নিত্য সত্য, ব্রহ্মেরই দুই প্রকার বা শরীর-স্বরূপ। কিন্তু শঙ্করের মতে জগৎ এবং উপাধি বিশিষ্ট জীব সৎ নহে। তাই তাঁহার মতে এই মায়া "অবিদ্যাত্মিকা—ইহা তত্ত্বতঃ কিছু সৃষ্টি করে না। কিন্তু তার আবরণী শক্তি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে। একমাত্র অনন্ত সৎকে বহুনাম-রূপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তাই মায়াকে—অঘটন ঘটন পটিয়সী বলা হয়। স্পষ্টালোকের অভাবে রজ্জু যেমন আমাদের নিকট সর্প বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ মায়া বা অবিদ্যা প্রভাবে জ্ঞান আবৃত হওয়ায় একমাত্র সৎ ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হন। অতএব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই ঈশ্বর অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্ম।

প্রশ্ন হতে পারে, আচ্ছা, মায়া ত বিদ্যার অভাব মাত্র নহে, ইহাকে আবরণী বীজ-শক্তি বলা হইয়াছে; তবে ইহার সত্তা আছে, এবং মায়া সত্ত্বাবতী হইলে তাহার কারণ কি? এবং তাহার বিনাশই বা হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন—মায়া "অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দিষ্টা" অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়া ইহাকে সৎ কিম্বা অসৎ কথা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। আবার, মায়া অনাদি;—একমাত্র সৎ ব্রহ্ম হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ তিনি অবিক্রিয়। কিন্তু অনাদি হইলেও মায়া অনন্ত নহে, ব্রহ্ম-জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত জীবের পক্ষে মায়া নিরস্ত হইয়া যায়। তাই এখানেও দেখা যাইতেছে যে মায়ার অনাদিত্ব স্বীকার সত্ত্বেও মায়ার অন্ত আছে বলিয়া তাহা সৎ নহে, অতএব শঙ্করের মায়াবাদ একদিকে ব্রহ্ম এবং অন্যদিকে মায়া নামক দ্বিতীয় সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে একমাত্র পারমার্থিক সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে এবং জগতের ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক, আপেক্ষিক সত্তা অস্বীকার না করিলে সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য অনাদি মায়া শক্তির কল্পনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মায়া অনাদি অথচ সান্ত, ইহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎ বলাও চলে না অতএব তাহা অবোধ্য যদি এই কথা বলিতে চাও, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। যাহা 'অনির্ব্বাচ্য' তাহা সুবোধ্য হইতে পারে না। তবে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধ-শক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। অতএব মায়াবাদ irrational বা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

শঙ্করের অদ্বৈত্য তত্ত্ব 'এক কল্পিত (abstract) একত্ব' কিনা এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই পাওয়া যাইবে। স্বরূপের অব্যভিচার অর্থাৎ চিরন্তনত্ব, ধ্রুবত্বই প্রকৃত সত্তার লক্ষণ। তাই চিৎ-স্বরূপ নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষে, ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু,—অপরাপর নামরূপ বিশিষ্ট সমস্তই অবস্তু। কিন্তু যাহারা অমার্জ্জিত-বুদ্ধি, স্থূলদর্শী তাহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহুধা বিভক্ত জড়, ও তদ্ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং অখণ্ড চিৎকে কল্পিত মনে করে। তাহারা অবিদ্যা বশতঃ বুঝিতে পারে না এই বহুরূপের প্রতীতি এক অরূপের অস্বীকার বা নাস্তিক্য বুদ্ধির (Negation এর) ফলমাত্র। তাই তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টা যখন সদ্বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'নেতি নেতি' বলিয়া

অসত্যের নিরাকরণ করেন তখন স্বভাবতঃই জড়বাদীর এই ধারণা জন্মে যে তিনি সমস্ত সৎ পদার্থের নিরাকরণ করিয়া এক কল্পিত অ-পদার্থের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু যদি কখনও জ্ঞানাঞ্জন-স্পর্শে আমাদের চক্ষুর আবরণটী অপসারিত হয় তখন রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় একমাত্র স্বয়ং জ্যোতিঃ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিতে পাইব। বস্তুতঃ অদ্বৈত তত্ত্বকে কল্পনা (abstraction) বলিয়া—যে ভ্রান্তি তাহা সূর্য্যের "পৃথিবী প্রদক্ষিণরূপ দৃষ্টি-বিভ্রমের সঙ্গে তুলনীয়।

তারপর, জীব-ব্রহ্মের অনন্যত্বের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তি এই যে, "যে পরিমাণ সে (অর্থাৎ জীব) আপনার 'আমি ব্রহ্মত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই প্রমাণ হইতেছে, সে ব্রহ্ম নহে !!!—জিজ্ঞাসা করি, ধীরেন্দ্র বাবুর এই প্রহেলিকাময়ী উক্তিটী কি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল ? তিনি কি 'সকল ছাড়িয়া' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ত্যাগের দ্বারা জীবের অ-ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ? যাঁহাদিগকে সভ্য জগৎ প্রকৃত ত্যাগী ও জ্ঞানী বলিয়া—যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানিয়া আসিতেছে সেই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষ্যই গ্রহণ করিব, না, আমারই মত অবিদ্যার দাস অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধ উক্তি মাত্রকে সত্য বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব ? "ত্যাগে নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়—ইহাই ঋষির সাক্ষ্য। এই অমৃতত্ব কি ?—যো বৈ ভূমা তদমৃতমাথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং—যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, অবিনাশী, যাহা অল্প তাহাই মর্ত্ত্য বা মরণশীল। এই 'ভূমা' কি, 'অল্প'ই বা কি ?—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং"—যাহাতে পদার্থান্তরের দর্শন-শ্রবণ ও প্রতীতি থাকে না অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম স্বরূপের প্রতীতি থাকে তাহাই—ভূমা, অনন্ত। আর যেথায় পদার্থান্তরের দর্শনাদি রহিয়াছে তাহাই অল্প অর্থাৎ সান্ত, পরিমিত।

"সাধন ভজন" দ্বারা ধীরেন্দ্র বাবু ঠিক কি বোঝেন খুলিয়া বলেন নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন প্রকৃত অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে উপাস্য উপাসকের কোন ভেদ নাই—অদ্বৈত-তত্ত্বের সাধক সদলবলে কোনরূপ বাহ্যিক পূজোপকরণ কিম্বা পুষ্পিত বাক্যাবলী, কিম্বা ভক্তিশতদলের অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উপাস্যের কৃপা লাভের চেষ্টা করেন না। পক্ষান্তরে তিনি

লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ও শমদমাদি সাধন সম্পদের ফলে চিত্তস্থৈর্য্য লাভের পর নির্জ্জনে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহম্" প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্ব-মূলক বেদান্ত মন্ত্রের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন দ্বারা সর্ব্বোপাধি নির্ম্মুক্ত আত্ম-স্বরূপ লাভ করেন। উপাধি-বিশিষ্ট-জীবের এই ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞানই অদ্বৈত-বাদীর মোক্ষ প্রাপ্তি। এই মোক্ষ যে কাল্পনিক নহে তার প্রমাণও লব্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞান ঋষিগণের মুখে শুনিতে পাই—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্।" "ব্রহ্মবেদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হইলেও, আমরা যেমন দেখিয়াছি—প্রাকৃত জনের পক্ষে তিনি সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তেমনি, তিনি সগুণ ব্রহ্মের কোন উপাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। বস্তুতঃ, শঙ্করের দার্শনিক তত্ত্ব কোনরূপ সাধন-প্রণালীকে অনাবশ্যক বলিয়া বর্জ্জন করে নাই,—অধিকারও যোগ্যতা ভেদে প্রতীকোপাসনা, ঈশ্বরোদ্দেশে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ, ভক্তিমূলক উপাসনা সমস্তেরই তিনি প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে এই সকল নিম্নতর সাধন প্রণালী দ্বারা পারত্রিক ভোগ অথবা ক্রম মুক্তি লাভ হইতে পারে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান সাধন দ্বারাই মানুষ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে। এখানেই অদ্বৈত দর্শনের বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা—ইহা একদিকে, নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মকে একমাত্র সৎ পদার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ একত্ব এবং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত অসত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে ; অপরদিকে, অদ্বৈতবাদ মায়া মুগ্ধজীব কি উপায়ে আপনার স্বরূপ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

আজ আমরা পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্ম-কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষিগণ অদ্বৈত দর্শনের এই পরম ঐক্য-তত্ত্ব, অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাইয়া সবিস্ময় শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যাকে অভিনন্দন করিতেছেন—"It (The true Vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect, of the "I" and the "It." This constitutes the unique character of the Vedanta, unique as compared with every other philosophy

of the world which has not been influenced by it directly or indirectly. If we have once grasped that synthesis, we know the Vedanta. And all its other teaching flows naturally from this one fundamental doctrine'.—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy.

আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যতকাল আমরা মূঢ়তা বসে অসৎকে সৎ, হেয়কে উপাদেয়, প্রেয়কে শ্রেয়, ভোগকে পরমার্থ, মৃত্যুকে অমৃত মনে করিয়া ভূমাকে ত্যাগ করিয়া অল্পকে আশ্রয় করিব ততকাল আমাদের সম্বন্ধে, "আগে ব্রহ্ম, পরেও ব্রহ্ম, মধ্যখানে এক বিকট স্বপ্ন" এই কথা বলাও চলিবে না ;— ততকাল আমাদের আদি-অন্ত-মধ্যে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্রই এক আদ্যন্তবিহীন বিরাট দুঃস্বপ্ন রাজত্ব করিয়া দুঃসহ দুঃখদাহে আমাদের অন্তরাত্মাকে জ্বালিতে থাকিবে। কারণ, মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কিরূপ নিদারুণ ভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।

বর্ষার গান

[শ্রীননিগোপাল ঘোষ]

(১)

ওগো নবীন দেয়া !
নেমে এস মোর বুকের পরে
গুরু গরজিয়া।
জেগে উঠুক হৃদয় খানি
শুনি তোমার ব্যাকুল বাণী
দূর ক'রে দাও সকল গ্লানি
ঘন বরষিয়া।
ওগো নবীন দেয়া !

(২)

তোমার হাতের বজ্রখানি
হান আমার শিরে,
তোমার চোখের আগুন দিয়ে
রাখো আমায় ঘিরে।
শক্ত ক'রে—সবল ক'রে
মনের কালো ময়লা দূরে,
বের ক'রে দাও মাঠের পরে,
সব কেড়ে নিয়া,
ওগো নবীন দেয়া!

(৩)

জুড়াও ধরার সকল জ্বালা
সরস প্রেমের স্পর্শে,
ফুটাও সবার প্রাণের মাঝে
মধুর তরুণ হর্ষে,
এস আমার নিবিড় কালো,
তোমায় আমি বাস্‌বো ভালো,
দেখাও মোরে অচিন্ আলো,
আজি চমকিয়া,
সেই আলোকে চিন্‌বো আমি
পারাপারের খেয়া,
ওগো নবীন দেয়া!

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]
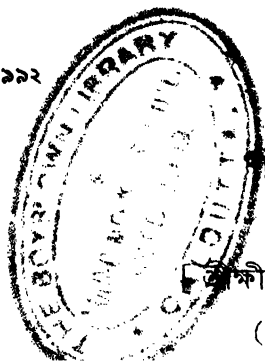
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৭

সেই তুমুল ঝড়ের ভিতরেও সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, বৃদ্ধ গঙ্গারাম গোস্বামী তানপুরাটি বাঁধিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া সবেমাত্র ভোরাই সুরের আলাপটি ধরিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাড়ীর বহির্দ্ধারের কবাটে ঘা পড়িল। আঘাতটা এত জোরে যে, ঝড়ের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার আলাপকেও চাপিয়া শব্দ বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিল। তানপুরা রাখিয়া বৃদ্ধ কাণ পাতিয়া বসিলেন।

আঘাত-শব্দের শেষে ডাক উঠিল—যথাসম্ভব উচ্চ নারীকণ্ঠ। শব্দ করুণতায় তাঁর ভোরের রাগিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। কোনও স্ত্রীলোককে ঝড়ে বিপন্ন অনুমান করিয়া, বৃদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের কবাট খুলিতে চলিলেন। দ্বারে হাত না দিতেই বাহির হইতে আবার ডাক উঠিল—

"দাদামশাই! দাদামশাই!"

বৃদ্ধের বিস্ময়ের একেবারে অবধি রহিল না।

"কে রে চারু?"

"দয়া করে' একবার দোরটা খুলুন।"

বৃদ্ধ দ্বার খুলিতেই, চারু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতবৎ পতিত হইল—একটিও কথা কহিল না।

"সত্যিই তুই! এই অসময়ে দুর্য্যোগে!—ব্যাপার কিরে চারু?"

চারু সেইরূপই মুর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া।

"কি হয়েছে বল্। আরে গেল, অমন করে' পড়ে' রইলি কেন? চারু, চারু!"

বারবার ডাকিয়াও যখন বৃদ্ধ চারুর মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন নিজে উপবিষ্ট হইয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তার বৃষ্টির জল এখনও ঢেউ খেলিতেছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া, তিনি তাহাকে উঠাইয়া সর্ব্বাগ্রে ঘরের মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন।

"আগে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন বলুন।"

"এখানে আমি কোনও কথা বলব না। আগে ঘরে আয়।"

বলিয়াই তিনি চারুকে কবাট বন্ধ করিতে বলিলেন। সে নড়িল না দেখিয়া, নিজেই তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া তার হাত ধরিয়া ঘরে আনিলেন এবং যে আসনে বসিয়া তিনি তানপুরায় সুর দিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে চারুকে দাঁড় করাইয়া, নিকটের একটা আল্‌না হইতে নিজের একখানা শাদা পাড় ধুতি আনিয়া বলিলেন—

"আগে ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল দেখি।"

"কাপড়ের দরকার নেই দাদামশাই, আমি গঙ্গাস্নান করতে চলেছি।"

"এই দুর্য্যোগে, এত ভোরে! তুই কি রোজই এমনি সময়ে গঙ্গাস্নান করে' থাকিস নাকি?"

"না দাদা।"

"তবে?"

"কদাচ গঙ্গাস্নান করি। এর আগে কবে করেছি মনে নেই।"

"তবে হঠাৎ আজ এ খেয়ালটা হ'ল কেন? আজ'তো বিশেষ কোন যোগেরও দিন নয়।"

হতভাগী চারু এই কথাতেই তার স্বভাবে ফিরিল, তাহার গভীর দুঃখ, গোঁসাইজীকে জানাইবার কি ছিল, ভুলিয়া গেল। হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"আপনার ও পুরোণো পাঁজিতে নেই, আমার এই নূতন পাঁজিতে যোগ লিখেছে। দাদামশাই! এখন পাঁজির পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেইটি আপনাকে করতে হবে, করতেই হবে।"

বলিতে বলিতে হাস্যময়ী আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার তার মাথায় হাত দিলেন।

চারু বলিতে লাগিল—অশ্রুপূরিত কণ্ঠে—

"নইলে, এই যে গঙ্গায় চলেছি, আর ফিরবো না।"

তখনও ঘরে যথেষ্ট অন্ধকার,—বৃদ্ধ চারুর মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু বুঝিতেছিলেন, মেয়েটা কোনও একটা বিপদে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। সে অভাগী যে কি, তার ব্যবসায়ে কত যে উৎপাতের অস্তিত্ব

সম্ভাবনা গোস্বামী মহাশয়ের জানা থাকিলেও এই দুর্দ্দিনে এরূপ অসময়ে কোনও একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় তাঁহার গৃহে এমন ব্যাকুলভাবে চারুর আশ্রয় লইতে আসাটা অতি বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া তাঁর বোধ হইল। কারণটা একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইলেও চারুর ব্যাকুলতা বৃদ্ধকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি একটু উচ্ছাসের সহিতই বলিয়া উঠিলেন।

"আরে গেল, অমন ব্যাকুল হ'লে কি হবে, কি হয়েছে আমাকে বল্।"

"আমাকে রক্ষা করুন।"

"কি হ'য়েছে না বুঝলে কি রক্ষা করবো ?"

"আমাকে আশ্রয় দিতে হবে।"

"পথে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করতে এসেছে ?"

"সারাপথের ভিতর একটা শিয়াল কুকুর পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি।"

"তাতো না পাবারই কথা। এ দুর্য্যোগে কি কোন প্রাণী বেরুতে পারে ? তবে—ঘরে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করেছে ?"

কি বলিতে গিয়া বলিতে অশক্ত চারু উত্তর করিল

"হুঁ।"

এই উত্তরেই যাহা বুঝিবার বুঝিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, একটু বিরক্তেরই মত

"তা আমি কি করে' রক্ষা করবো ? তোর যা হীন ব্যবসা, তাতে কত বেটা পাষণ্ড তোর ঘরে ঢুকে অত্যাচার করবে, আমি কি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব ? তোকে ভালবাসি বলে' কি, তোর ঐ নরকের ব্যবসাকেও ভালবাসি ? যা বেটি, চলে যা। ধ্যানটি সবে মাত্র জমে আসছে, এমন সময় এসে বাধা দিলি। দিনটেই আমার আজ দেখছি মাটী হ'য়ে গেল।"

বলিয়া বৃদ্ধ চারুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কাপড়খানা আবার আল্‌নায় তুলিতে চলিলেন।

এই স্নিগ্ধ উদার তিরস্কারে চারুর মনকে যে প্রফুল্ল করিয়াছেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। তিরস্কার করিয়াই কিন্তু তাঁহার মন কেমন একটা মূঢ় বিষণ্ণতায় নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনাকেই আপনি তিরস্কার করিয়া উঠিল। কি জানি কোন্ শুভক্ষণে এই অভাগিনী পতিতা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। সে ভালবাসা কেমন, কত, কি জন্য, উভয়ের মধ্যে কেহই বিচারে জানিতে সাহস না করিলেও মাঝে মাঝে এ উহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বহুদিন চারু না আসিলে

ব্রাহ্মণ নিজে গিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। এইরূপ মাঝে মাঝে আসিবার ফলে অতি অল্পদিনের ভিতরেই চারু সহরের মধ্যে বিশিষ্টা গায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে।

সেই স্নেহের তিরস্কার চারুকে প্রফুল্ল করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের হৃদয়কে পীড়িত করিতে তাঁর মনের তিরস্কারে যোগ দিল। কাপড় আল্‌নায় রাখিতে তাঁর হাত অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিলে চারুর যদি অসুখ করে? যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া তার গাহিবার শক্তির হানি হয়? অভাগিনীর লোক মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায়—তাঁর কাছে আশ্রয় লইতে আসিয়া সে সম্বলহারা হইবে? তখন, হাত, মন—ক্রমে চোখ সকলে একসঙ্গে তাঁকে বুঝাইয়া দিল—"মেয়েটাকে হঠাৎ এতটা তিরস্কার করা তোমার ভাল হয় নাই। মিষ্টবাক্যে তাকে বলিলেই ত হইত, আমি বৃদ্ধ মানুষ, ও সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর আমার থাকা উচিত নয়।"

কি জন্য চারু আশ্রয় মাগিতেছে, তাও ত ব্রাহ্মণের জানা হয় নাই। বুঝিলেন—মনগড়া একটা কারণ নির্ণয় করিয়া চারুকে তিরস্কার করাটা তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে।

কাপড়টা কাঁধে রাখিয়া গোস্বামী মহাশয় মুখ ফিরাইলেন।

বাহিরের ঝড় এখানেও তার বিপুল উল্লাস লইয়া খেলা করিতেছিল। সুতরাং মুখ ফিরাইয়া যখন তিনি চারুকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া বেশ একটু ব্যাকুলভাবেই ডাকিয়া উঠিলেন—

"চারু!"

দুষ্ট চারু উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সিক্ত বস্ত্রের সঞ্চালন-শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিয়াও, মমতার লীলাপ্রিয়তায়, শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই;—একটু আদরের সহিত তিনি বলিলেন,

"কি ভাই, রাগ করে' চলে' গেলি?"

"না দাদা, দাঁড়িয়ে আছি!"

গোঁসাইজী আর কোনও কথা না কহিয়া প্রথমে আলো জ্বালিলেন। জ্বালিতেই দেখিলেন, এক পা হাঁটুর উপর ধরিয়া অন্যহাতে দেওয়ালের কোণ আশ্রয় করিয়া, মেঝের দিকে মুখ,—দোরটির পার্শ্বে চারু এক অপূর্ব্ব অবস্থানে

দাঁড়াইয়া আছে। সে নীরব, কিন্তু তার ছোট চরণতল যে তাঁর কাছে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কত কি আবেদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

এরূপভাবে আলোক সেবিত একটা সুন্দর মেয়ের দাঁড়ানো দেখা বৃদ্ধের এ বয়স পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দেখিবামাত্র গোঁসাইজী কেমন একপ্রকার ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

"হাঁ ভাই, তোর পায়ে কি আঘাত লেগেছে?"

"বড়্ডো লেগেছে, বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে গেছে, পাথরগুলো সব খোঁচার মতন হয়েছে, পায়ের তলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত।—তাই দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ পা নিয়ে মা গঙ্গার কাছে কেমন করে' যাই। গেলেই নিস্তার পাই, তাও বুঝি আমার ঘটে উঠলো না।"

"তুই কি আমার কথায় রাগ করলি?"

"করলুম বই কি। তবে আমারও বলবার একটা ভুলে তোমার এই কথাগুলো শুনতে হ'ল। আশ্রয় চাওয়ার কথা বলাটা আমার কোনও মতে ভাল হয় নি। আশ্রয় আমি ত পেয়েছি। সেকি আজ? তবে নতুন ক'রে তোমার কাছে তা চাইতে গেলুম কেন?"

"কাপড়খানা পর।"

"তবে ওরকম করে' তুমি আমাকে তিরস্কার করলে কেন? তুমি নিজের দয়ায় উপযাচক হ'য়ে এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি কি, আমার ব্যবসা কি জেনেও দিয়েছ।"

"আগে কাপড় ছাড়্, তারপর আমাকে তিরস্কার কর্।"

"নইলে আমার মত হীন বেশ্যা তোমার চরণ ধূলোর ওপর মাথা রাখতে ভরসা করে?"

"আরে মর্, কাপড় ছাড়্, নইলে তোর সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।"

বলিয়াই চারুর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ তার গায়ের আঁচল উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

"এইখানা পরে' যা বলবার বল্, আমি বসে' বসে' শুনি। এই ঠাণ্ডায় গলায় যদি একবার সর্দ্দি জমে' যায়, তাহ'লে ও বীণার সুর আর কোনও কালে তোর গলা থেকে বেরুবে না।"

কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া মুক্তাবগুণ্ঠিতা ভূপতিতাঞ্চলা এই যুবতী দাদার

হাত হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারই সম্মুখে পরিবার উদ্যোগ করিল, তখন তাহার পাড় নেই দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—

"ও দাদা, এ কি কাপড়! এ আমি কেমন করে' পরবো?"

"আ মর্, তোর আবার সধবা বিধবা কি?"

চারু উত্তর না করিয়া বাম হস্তটা দাদার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

তার বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণ মুখের পানে চাহিলেন, অমনি গল্‌গল্ করিয়া চারুর চোখ হইতে জল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিছু বুঝিতে না পারিলেও বৃদ্ধও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতেই চারু বলিতে লাগিল—

"বাবা পাষণ্ডদের অত্যাচার হ'লে রক্ষা কর বলে' তোমার কাছে আসব কেন? তার অষুধ তোমার নাত্‌নীর কাছে আছে। যে বশীকরণ মন্ত্র তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তাতে সাপের মত খলও যে, সেও মাথা হেঁট করে' আমার পায়ের কাছে বসে' আপনাকে ধন্য মনে করে। আমি পাষণ্ডের ভয়ে এই দুর্য্যোগে জ্বালাতন করতে আসিনি—দেবতার উৎপাতে এসেছি। দাদা, সে যে মন্ত্রে বশ মানলে না। আরো বারো বৎসর পরে—"

বলিতে বলিতে আবার চারুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ চারুকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তার পার্শ্বে বসিলেন। চারুর এই রহিয়া রহিয়া ব্যাকুলতা বৃদ্ধের পক্ষে কেমন একটা যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু চাহিয়া থাকার বিষয় হইয়া পড়িল।

হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া চারু আবার বলিতে লাগিল—

"দাদা, এক যুগ পরে—আমি জানতুম মরে গেছে সে—আজ ঝড়ে আমার ঘরে উড়ে পড়েছে।"

ব্রাহ্মণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া চারু কথা বলিতেছে; কিন্তু ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে, বুঝিয়াও তিনি তাহা বুঝিতে সাহস করিলেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে একবার চারুর মাথাটা দেখিয়া লইলেন। দেখিবামাত্র তার সংশয় অনেকটা যেন দূর হইল। তিনি পূর্ব্বে চারুর মাথায় আর কখনও তো সিঁদুর দেখেন নাই!

"তোর মাথায় কি আগে সিঁদুর ছিল?"

চারু মুখ-টেপা হাসির সঙ্গে মাথা নাড়িল।

"তোর হাতখানা আর একবার দেখা দি কি?"

দুইটা হাতেই পরস্পরে বাঁধিয়া, কোলের উপর রাখিয়া চারু দাদামশাইএর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। কোন্ হাত তিনি দেখিতে চাহিতেছেন জিজ্ঞাসা না করিলেও, সে বাঁ হাতটা আবার তুলিয়া দেখাইল।

"এটাও তবে আজই পরেছিস্ বল্?"

চারুর মুখে হাসির রেখা বেশ একটু উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল—

"ভাগ্যিস দাদামশাই, ঘর-প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সিঁদুর চুব্ড়ি আনিয়েছিলুম!"

ব্রাহ্মণ চারুর কাপড়খানা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, এইবারে দেখিলেন।

"তাই ত রে, দিব্যি কুলবধূটি সেজেছিস যে—আমরাই মাথাটা যে ঘুরিয়ে দিলি!"

"তবু এখনও ঘোমটা দিই নি দাদা।"

"একখানা সরু লাল পাড় কাপড় আছে, এনে দিই?"

ব্রাহ্মণের বারবারের অনুরোধ আর চারু উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। তদ্দণ্ডে শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া আসন-প্রান্তে উপবিষ্ট হইল।

এইবারে গোঁসাইজী চারুর কাছে সে রাত্রির ইতিহাস শুনিতে চাহিলেন।

(১৮)

সন্ধ্যায় বাড়ীর বারান্দায় স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে তাহার ঘরে স্বামীকে রাখিয়া আসা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গানে ও সঙ্গতে উভয়ের ভিতর যেরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, চারু আনুপূর্ব্বিক তাহার 'দাদা'কে শুনাইয়া কথা শেষ করিল।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না। এমন আশ্চর্য্য মিলন-কাহিনী আখ্যায়িকারূপে পুরাণের অন্তর্গত হইলেই বুঝি তাঁর মনঃপূত হইত। স্তম্ভিতের মত বসিয়া, এক একবার কেবল তিনি সম্মুখস্থ তানপুরার তারে ধীরে অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন। ঘটনাটা তাঁর কাছে এতই বিচিত্র বোধ হইতেছে যে, একটা যে কোনও করুণ সুরে কাহিনীটাকে বাঁধিতে পারিলেই যেন এই গায়ক চূড়ামণির কাছে তার যোগ্য সম্মান প্রাপ্তি হয়!

ঘটনাটা বলিয়া চারুও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়াছে। সে রাত্রির ব্যাপারটা বলিবার সময়ে আরও কত যে তার পূর্ব্বজীবনের তীব্রকাহিনী তার কথার ভিতর দিয়া গোপনে তার মর্ম্মে আঘাত করিয়া গিয়াছে, কথা বলিবার

সময়ে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন কথাশেষে, সেগুলা ফিরিয়া অতি তীব্র জ্বালায় তার মর্ম্ম আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। সে বৃদ্ধের মুখের দিক হইতে চোখ নামাইয়া নীরবে সেই জ্বালা ভোগ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া অবশেষে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন কি করতে চাস্?"

"চাই ত অনেক রকম করতে, কিন্তু দাদা, আমার কি কিছু করবার আর অধিকার আছে?"

"তোর স্বামী—তুই ঠিক বুঝেছিস?"

"আমার নেশা-মাখা চোখ মনে করে' কি সন্দেহ করছেন?"

"সে তোকে চিন্‌তে পারলে না?"

"চিনবো চিনবো করছে, কিন্তু চিনতে সাহস করছে না।"

"আর তারে ধরবার দরকার কি চারু?"

"ধরবো না?"

"আমার তো মনে হয় ধরা উচিত নয়।"

"উচিত নয়?"

"তার সমাজ আছে।"

"সে ভয় আমি বড় করি না, দাদা! তার সমাজ আছে, আমার টাকা আছে। সমাজের কথা ছেড়ে আর কিছু বলবার থাকে ত বল।"

"সে হয় ত আর একটি বিবাহ করেছে।"

"না।"

"জেনেছিস?"

"সে আমায় বলে নি, আমি বুঝেছি। শুধু তাই বুঝেছি নয়, এটাও বুঝেছি—সে আপনারই মত একটি সাধু।"

"তা কি করে' বুঝলি?"

"তুমি ত আর আমার মত বেশ্যা হ'তে পার নি দাদামশাই, তুমি কেমন করে' বুঝবে? লোকের চোখ দেখে দেখে এ চোখ এত সায়েস্তা হ'য়ে গেছে যে, কারও মুখ-চোখের পানে চাইলেই তার ভিতরের খবরটা বলতে পারি। যাকে দেখলে বেশ্যার বুক কেঁপে ওঠে, সে সাধু না হয়ে যায় না।"

"তবে ত আরও গোলের কথা কইলি।"

"এই ত সবই আপনাকে বললুম। এখন কি করবো বলুন।"

"গঙ্গায় ডুবে মরবি, আর কি করবি।"

"তাতো করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু তাকে ঘরে রেখে চলে এসেছি। আমি ম'লে পাছে খুনের দায়ে তার হাতে হাতকড়ি পড়ে, সেইজন্য মরতে সাহস হ'ল না।"

ব্রাহ্মণ এমন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন যে, চারুকে বলিবার কথা আর যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। চারু কিন্তু তাঁর মুখ হইতে যা-হোক একটা কিছু শুনিবার জন্য জেদ ধরিল—

"সকাল হ'য়ে এল দাদা,—সত্যি করে' বল, এখন আমার কি করা উচিত।"

"আমি যে কিছু বলতে পারছি না চারু!"

"তবে আপনার আশ্রয় চাওয়াটা আমার মিছে হ'ল?"

"এতকাল নরকের ব্যবসা করে' পাকা হ'য়ে গেছিস, আমি কোন্ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোকে দিয়ে তার জাতটা নষ্ট করতে বলবো? পাপ তোর এতই অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে, দু'দিন পরেই আবার তুই যে বেশ্যা, সেই বেশ্যাই হবি। ঠিক থাকতে পারবি না।"

"পারবো না?"

"তুইই বল্ না—পারবি কি না।"

"পারবো দাদা!"

এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া, তাঁর কথার এইরূপ উত্তরে চারুর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ক্রোধ হইল। উষ্মা-কর্কশ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"ও ঝোঁকের মুখের কথা। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করবো?"

বলিয়াই তীব্র ভাষায় চারুকে তিনি এমন গোটা কতক গালি দিলেন যে, সেরূপ বাক্য চারু তাঁহার মুখ হইতে আর কখনও শুনে নাই।

কথাটা শুনিয়া চারু ক্রোধ অথবা দুঃখের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ ত দেখালই না, বরং গালি শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তিরস্কার করিয়াই ব্রাহ্মণের চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল, বিশেষতঃ তিরস্কারের উত্তরে চারুর হাসি শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন। যে হাসি স্ত্রীজাতির সাধারণ ভাবের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ-চিহ্ন, এ তা নয়। এটা একটা অভাগিনীর অনন্ত বিষাদ-পিষ্ট মাদকতা মাখানো রচা হাসি।

"তা হ'লে গঙ্গায় ডুবে মরাই দেখছি আমার কর্ত্তব্য।"

গোঁসাইজী এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অতি ধীরভাবে চারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি ?"

" 'কি' কি ? আমাদের জাতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, আমাদের দেশের ভাল কুলীন—তাঁর উপাধি চাটুজ্জে।"

"তা হ'লে ভাই, তোমাকে গাল দিয়ে আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।

"আমাকে গাল দিয়ে ?"

আবার চারু হাসিয়া উঠিল।

"কেন? আমি ত হীন চণ্ডালিনী,—তাই বা বলতে আমার সাহস কই? চণ্ডালেরও ত তবু একটা জাতের বাঁধন আছে, আমার তাও নেই।"

"জাতের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে বেশ ত আছিস চারু! কেন আর সে বামুনের ছেলেটাকে নরকে ডোবাবি ?"

"সে ইচ্ছা থাকলে, আজই তাকে ডুবিয়ে দিতে পারতুম। না দাদা, আমি নিজেই নরক থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলুম, আর সেই জন্যই আপনায় শরণাগত হ'তে এসেছিলুম।"

আর কোনও কিছু না বলিয়া চারু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"চলছিস্ নাকি ?"

"কি করবো ? আত্মীয় বলতে, আশ্রয় বলতে, এ অভাগীর এ পৃথিবীতে ছিলেন ত একমাত্র আপনি—।"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বৃদ্ধ চারুকে বলিলেন—

"তাতো বুঝেছি, কিন্তু এখনও তো বুঝতে পারছি না চারু, আমাকে কি করতে হবে। তোকে ঘরে নিতে কি তোর স্বামীকে অনুরোধ করবো ?"

"আর কিছু করতে হবে না, আপনি আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আপনার সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি আসি।"

"বাড়ী যাবি নাকি ?"

"সেখানে এখন আর কেমন করে' যাব ? রেতের অন্ধকারে কোনও এক রকম করে' এ পোড়ামুখ তাঁকে দেখিয়েছি। দিনে দেখাতে আর সাহস হচ্ছে কই ?"

বলিয়াই চারু চলিল।

"তবে কি গঙ্গায় ডুবতে চল্‌লি নাকি ?"

দোরের কাছে চারু উপস্থিত হইয়াছিল, 'দাদা'র কথা শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল—

"আর কেন পিছে ডাকেন দাদা ? আপনাকে আমি কোনও দিন মানুষ দেখি নি। চিরদিন যা দেখেছি, আজও আমি দেখ্‌ছি তাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাদামশাই, যখন নরকে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, তখন নারায়ণ আমাকে ভালবাসতো, আর যখন সেই নরক থেকে ওঠবার জন্য কাতর হ'য়ে আমি হাত তুললুম, তখন নারারণ আমার উপর বিরূপ হ'ল।"

"আরে মর্ যাচ্ছিস কোথা ?"

চারু উত্তর ত দিলই না, মুখও ফিরাইল না।

"তোর স্বামীর যে বিপদ হবে।"

একটু বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া চারু বলিয়া উঠিল—

"হবে কি না হবে, এর পরে কে জানতে আসছে। হয় ত কি করবো, সহরে এত স্থান থাকতে বেশ্যার দোরে সে আশ্রয় নিতে দাঁড়িয়েছিল কেন ?"

চারু ঘর ছাড়িয়া ঝড়ের মধ্যে আবার প্রবেশ করিতে চলিল। বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, চলিতে চলিতে চারু অন্ততঃ আর একবার মুখ ফিরাইবে। অনুমানটা মিথ্যা হইল দেখিয়া তানপুরা ছাড়িয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

(১৯)

ঘরের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, চারু বহির্দ্বারের কপাট খুলিয়া পথে নামিতেছে। সত্য সত্যই কি তবে সে মরিবার সঙ্কল্পে চলিয়াছে, না চরিত্রহীনার স্বভাবগত ছলনায় সে তাঁহাকে মরিবার ভয় দেখাইতেছে ?

শেষটা তাঁর মনে লাগিলেও, যখন চারু পথে পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহিরের দরজায় আসিয়া মুখ বাড়াইলেন। অনেকটা প্রকোপের হ্রাস হইলেও, তখনও বেশ প্রবল ভাবেরই ঝড়। বাহিরে ঊষার আলোর অনেকটা বিকাশ হইলেও, তখনও সেই সরু গলি পথজোড়া অন্ধকার। দুই একটা গ্যাসের আলো—যারা এখনও পর্য্যন্ত প্রাণপণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল—অন্ধকারটাকে এক একবার হাসাইতেছিল মাত্র। সেই হাসির বিকাশ-মুখে একবার মাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, চারু গলির প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

গোঁসাইজীও পথে নামিলেন, দ্বিতীয়বারের আলোক স্ফুরণে যখন চারুকে আর দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ব্যাকুল ভাবেই তার অনুসরণ করিলেন ;—বার্দ্ধক্যের সহায় একগাছা লাঠি লইবারও তাঁর অবসর রহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁর কাপড় জলে যেন ডুবিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, হতভাগা মেয়েটাও তাঁর মত স্নান করিতেছে।

গলির মুখে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সত্য সত্যই চারু গঙ্গার পথে চলিয়াছে। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন, চারু তার দাদাকে আশ্রয়ের কথা লইয়া তামাসা করিতে আসে নাই, সত্যই আশ্রয়লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে আশ্রয় কিরূপ, আর চাহিলেও এ সমাজ বহিষ্কৃতাকে কিরূপভাবে তিনি তা দিতে সমর্থ, সেটা না বুঝিতে পারিলেও তিনি অভাগিনীর মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, বহুকাল পরে নিজের পাপ-লীলার কেন্দ্রে স্বামীর অভবনীয় আবির্ভাব এ পতি-ত্যাগিনীর এতকালের ব্যর্থ জীবনটাকে এমন একটা তীব্র রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াছে যে, সে আর তাহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বামীর পাদস্পর্শে অভাগিনীর সমস্ত পাপের উপার্জ্জন দাবানলের মত উত্তপ্ত হইয়াছে। সে উত্তাপে তার বিলাসের যত্নে সেবিত অতি আদরের দেহ প্রতি পরমাণুতে দগ্ধ হইতেছে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন বুঝি অন্য কোনও উপায়ে তার সে জ্বালা জুড়াইবার উপায় নাই।

চারুকে ফিরাইতে তাঁর ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে যাহা ভাবিবার পরে ভাবা যাইবে, আপাততঃ মেয়েটাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌতূহলও উদ্দীপ্ত হইল। সত্য সত্যই কি চারু আত্মহত্যা করিতে সাহস করিবে? ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিতে গিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। চারুর কার্য্য এখনও যেন অভিনয় বলিতে তাঁর ইচ্ছা হইতেছে। আপনার অস্তিত্বের কোনও আভাস না দিয়া তিনি তাঁর অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

আহিরীটোলায় গোঁসাইজীর বাসা, গঙ্গাতীর হইতে তা অধিক দূর ছিল না। সুতরাং গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে চারুর বড় বিলম্ব হইল না। দুইটি বৃদ্ধা অনাথিনী স্ত্রীলোক মাত্র পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল। এক চারুর 'দাদামশাই' ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ সে দুর্য্যোগে তখনও ঘর হইতে বাহির হয় নাই।

বৃদ্ধারা পুরীযাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া পথ চলিতেছিল। বোধ হয়, তাহাদের পরিচিত অথবা আত্মীয় কেহ জাহাজে চড়িয়া তীর্থে গিয়াছে। সেই জাহাজ হয় ত সাগরের মাঝে ঝড়ে পড়িয়াছে। পড়িলে কি যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, সেই কথাবার্ত্তায় তাহারা তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল। সে জন্ম সে পথে চারুর নীরব অনুসরণে গোসাইজীর কোনও বাধা হইল না। তিনি সে পল্লীতে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই একরকম পরিচিত।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারু একবার নদীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধাদের কথা শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। আর একটু বেশী ফিরিলেই সে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইত। দেখিতে পাইত—বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর না দিয়াও যুবকের উদ্যমে পথ চলিতেছেন। দেখিলে বোধ হয়, আর সে অগ্রসর হইত না। তা হইলে তার কার্য্যকলাপও বুঝি বৃদ্ধের চক্ষে চিরদিনের জন্ম অভিনয়-রূপেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। কোন শুভগ্রহের কৃপায় সেটা হইল না।

চারু দাঁড়াইতে বৃদ্ধও দাঁড়াইলেন। দূর হইতেই দেখিলেন, বৃদ্ধারা চারুর সঙ্গে কি যেন কথা কহিতেছে। দেখিলেন, তারা কথা কহিয়া ঘাটে নামিয়া গেল, চারু দাঁড়াইয়া রহিল। এইবারে বুঝিলেন, অভিনয় নয় সত্যই চারু আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছে, সঙ্কল্পে বাধা পাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। হয় সে বৃদ্ধাদের উঠিয়া আসার অপেক্ষা করিবে, নয় সে অন্য ঘাটে যাইবে। বৃদ্ধের শেষ অনুমানটাই ঠিক হইল, চারু সে ঘাট ছাড়িয়া অন্ত ঘাটে চলিল।

আবার যেমন সে চোখের অন্তরাল হইল, অমনি যৌবনাবশিষ্ট সমস্ত শক্তি আরোপ করিয়া ভগবৎস্মরণে গোস্বামী মহাশয় চারুকে রক্ষার সঙ্কল্পে ছুটিয়া চলিলেন।

বাঁধা ঘাট হইতে অনেক দূরে, আঘাটায়, যেখানে কতকগুলা বড় বড় কাছিতে বাঁধা নৌকা তুফানের তোলাফেলায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চারু সেইখানে আসিয়া সর্ব্বনিম্ন তীরভূমিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় তুফান তার বিপুল উল্লাসের শেষ উচ্ছাস পুষ্পাঞ্জলির সৌরভের মত এই স্বাগতা গায়িকার দু'টি পায়ে মৃদু পরশে যেন মাখাইয়া দিল। অমনি সে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে—"ফিরে এস।"

মরিবার জন্ম ত প্রথমে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই। তা হইলে গোঁসাইজীর কাছে না যাইয়া প্রথমেই একেবারে গঙ্গাতীরে আসিতে পারিত।

পরিচয় দিবার জন্য উতলা হইলেও, দিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন নিরপরাধ স্বামীকে পরিত্যাগের পর তার দীর্ঘ পাপ-জীবনের কার্য্যগুলা এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া এমন ভীষণভাবে তার বুকটাকে আক্রমণ করিল যে, অভাগিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া আর সেখানে ঢুকিতে সাহস করিল না। বিশেষতঃ পুনঃ সাক্ষাতে স্বামীর মুখ হইতে কি কথা যে বাহির হইবে, তাহার ব্যবহারে সেটা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। পারিল না কেন, তাহার মন এমন একটা নিরাশার কথা তাহাকে শুনাইতে লাগিল যে, বুঝিতে গিয়া স্বামীর সৌম্য দৃষ্টি তাহার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হইয়া পড়িল।

অথচ তার পুরুষোচিত রূপ, তার কথা, গুণ, সর্ব্বোপরি তার আত্মরক্ষার পবিত্র চেষ্টা চারুকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, যদি সে স্বামীর মুখ হইতে চির-পরিত্যাগের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই গঙ্গার গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন এ পৃথিবীর আর কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া সে শান্তি পাইবে না। তাই স্বামীকে প্রতীক্ষায়' বসাইয়া সে গোঁসাইজীর কাছে পতির পুনঃপ্রাপ্তির উপায় জানিতে আসিয়াছিল। শুধু উপায় জানা কেন, আসিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া দিবার সাহায্য ভিক্ষা করিতে।

কিন্তু গোঁসাইজীর কথায় এবারে তার মনে যথার্থই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

তার ভবিষ্যৎ চরিত্র-বলের উপর একান্ত অবিশ্বাসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে যে কঠোর তিরস্কার শুনাইয়াছে, এক মৃত্যুর চিরনীরবতা ভিন্ন সে কথার দ্বিতীয় উত্তর নাই।

মরিতে কৃতসঙ্কল্প, এতক্ষণ বুঝি তার দেহাত্মজ্ঞান সুপ্ত ছিল;—সঙ্কল্পের প্রেরণায় সে যে কলের পুতুলের মত চলিয়া আসিয়াছে। পদতলে পথের পাথরের তীব্র বেধ, মাথার উপরে বৃষ্টির ধারা সর্ব্বদেহে প্রবল শীতল বায়ুর আক্রমণ—এতক্ষণ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গঙ্গাজল-তরঙ্গ তার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র যেমনি তার চৈতন্য ফিরিল, অমনি সে যেন শুনিতে পাইল—"ফিরে এস।"

"ফিরে এস।"—কে যেন পরপার হইতে বলিতেছে। বিষম বিস্ময়ে সে সম্মুখের নদীপরিসরের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া তার সিক্ত চক্ষু কেবল একটা অসীমতার আকার দেখিল মাত্র।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থানে সে দাঁড়াইয়াছে। জীবন তার পিছনে, মৃত্যু

সম্মুখে। তাকে আলিঙ্গন করিতে তার ভয় নাই। তার মৃত্যুর পিছন হইতে, ফিরিয়া আসিতে কে তাহাকে অনুরোধ করিল?

"ফিরে এস" কথার শেষে আর একটা আগ্রহসূচক আবেদন তার অন্তরাকাশে ভাসিয়া—"আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি এক যুগ ধরিয়া;—তুমি ফিরে এস।"

"ফিরে এস।" তাই ত তার স্বামী। যে তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিল। "ঘণ্টা হ'ক, দিন হ'ক, মাস হ'ক বছর হ'ক—একটা জন্মই হ'ক, তুমি ফিরে এস। অনেক কথা তোমাকে যে বলিবার রহিল।" সে না ফিরিলে যে তার বলা হইবে না! তাই কি তার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ বাক্য ঝড়ে চড়িয়া চারুর আগে আসিয়া নদীপারে তাহার অপেক্ষা করিতেছে?

ফিরে এস, ফিরে এস! তবে সত্য সত্যই যদি তাকে ফিরিতে হয়, সে কোথায় ফিরিবে—তার অসংখ্য ভুলের কাহিনীভরা বাসাঘরে, না অনন্ত বিস্মৃতির নিদ্রাপোরা পরপারে?

এবার তার মনে হইল, সত্যই যেন পরপারে এক শান্তিপূর্ণ গৃহে তার বাস ছিল, কেমন একটা ভুল করিয়া কিছুদিনের জন্য এপারে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ পারের যাতনা ভরা সুখের তাড়নায় অস্থির হইয়া যেমন সে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ঘরখানির শান্তি-শীতল প্রাণ পুনর্মিলন ব্যাকুলতায় তাহাকে ফিরিবার জন্য যেন অনুরোধ করিতেছে—"ফিরে এস। হ'ক না ফিরিতে একটা দীর্ঘ জন্ম, আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া, ওগো তুমি ফিরে এস।"

আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য আত্মঘাতীর একটা যে মত্ততা আসে, তাই বুঝি চারুর আসিয়াছিল, নহিলে সে অন্ততঃ একবার পিছনের দিকে চাহিত; তখন "ফিরে এস" কে বলিল অনুমান করিতে শুধু সম্মুখে চাহিয়া তাহাকে এমন একটা আকাশভেদী কল্পনার সাহায্য লইতে হইত না। তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, তাহাকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করিতে দাদামশাই সেই গড়ানো পিছল পথে তাহাকে ধরিবার জন্য তাঁর জরাক্লিষ্ট শরীরকে উত্যক্ত করিতেছেন।

কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অভাগিনী যখন গঙ্গার কোলের দিকেই অগ্রসর হওয়া স্থির করিল এবং অনন্ত দীর্ঘ পথের শেষে ঘরখানিতে ফিরিবার অপেক্ষায় বসা তার চিরপরিত্যক্ত প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত

হইবার সাহসটাকে অঞ্চলরূপে কোমরে বাঁধিতে লাগিল। অমনি সে শুনিতে পাইল—

"চারু বড় পড়ে' গেছি রে!"

বিপুল চমকে একটু অস্ফুট শব্দ করিয়া চারু মুখ ফিরাইল। গভীর নিদ্রার সহসা অবসানের মত শূন্য দৃষ্টিতে সে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমায় তোল ভাই, কোমরে লেগেছে—আমি উঠ্‌তে পারছি না।"

মৃত্যুর সঙ্কল্প চারু ভুলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া সে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"কি দাদা, আমি মরতে পারি কি না, দেখতে এসেছ?"

চারুর সাহায্যে দাড়াইয়াই গোঁসাইজী বলিয়া উঠিলেন—

"না রে, তুই বেঁচে থাকতে পারবি কি না, তাই বুঝতে এসেছি। আমাকে ঘরে নিয়ে চল্।"

"এমন লেগেছে, নিজে ঘরে ফিরতে পারবেন না?"

"এ গঙ্গাতীরে সে কথা কেমন করে' বলবো? তবে তোর কাঁধে ভর দিয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"আপাততঃ ঐ জলে, তারপর ঘরে।"

"গেলে কি আর ফিরতে পারবো?"

"আর ফিরতে দেব কেন?"

"কোথায় থাকবো?"

"আমার ঘরে।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"ক্ষণ কেন ভাই, তুই যদি চিরদিনের জন্য আমার কাছে থাকতে চাস—।"

"দাদামশাই, এ গঙ্গাতীর—ঝোঁকের মুখে আমার কথা মনে করে' একটু আগে আমাকে তিরস্কার করেছ'—বুঝে' বল।"

"সত্তরের ওপর বয়স, আমি ঝোঁকে বলিনি চারু"'

তুমি যে বলেছ, আমি খাঁটি থাকতে পারবো না।"

"এখন বলছি—পারবি।"

"দাদা, কোমরে কি তোমার বড় লেগেছে?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস?"

"তুমি আমার হাতটা ধরতে, আমি একটা ডুব দিয়ে নিতুম। বড় তুফান ভয়, হচ্ছে—পাছে ভেসে যাই।"

"চল্।"

চারুকে স্নানের সাহায্য করিতে গোঁসাইজী প্রথমে তাহার সাহায্যে নিজেই স্নান সারিয়া লইলেন। চারু বলিল—

"দাদা, এইবারে আমার হাতটা ধরুন।"

আকাশ পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু পরিষ্কার হইতে সুরু করিতেছে। মাঝে মাঝে অরুণ দেখা দিবার মত হইতেছে।

"আ-মর, ব্যস্ত হ'স কেন, দাঁড়া—আগে হাত বার করি।"

বলিয়াই পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া মধুর গম্ভীরধ্বনিতে এই গায়ক শ্রেষ্ঠ যেন গাহিয়া উঠিলেন—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং (ইত্যাদি)

দ্বিতীয় প্রণামান্তে গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া চারুর মাথায় প্রক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবতী অভাগীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নীরব হইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত নিদ্রিতদৃষ্টি গুরুর চরণপানে উপর নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার পর যে সব কথা, তাহা আধুনিক বস্তু তান্ত্রিকের শ্রুতিসুখকর হইবে না বুঝিয়া, বলিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। আসল কথা—ব্রাহ্মণ চারুকে স্নান করাইয়া সেই গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তাহাকে দীক্ষিতা করিলেন।

গুরুর মুখনিঃসৃত অভয়বাণী বালিকাকে যখন বুঝাইয়া দিল, তাহার পূর্ব্ব জীবনের জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত অপরাধ আজ গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া গিয়াছে, তখন তার দেহের প্রতি ধমনীতে রক্তবিন্দুগুলা যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পুলকাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে আবেগভরা কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

"দাদা, আমার সব পাপ ধুয়ে গেল?"

"যদি সনাতন ধর্ম্ম সত্য হয়, আর তোর সঙ্কল্প সত্য হয়।"

"গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা—আমার সঙ্কল্প সত্য।"

"তবে চল মা সরস্বতী, পুত্রকন্যাহীনের ঘরের নিষ্ঠুর শূন্যটাকে মমতার কোলাহলে ডুবিয়ে দে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিতে অবশিষ্ট জীবনের যষ্টিস্বরূপ করিবার জন্যই যেন চারুর স্কন্ধে ভর দিলেন।

তীরভূমি হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চারু একবার গোসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এবার থেকে আপনাকে কি বলে' ডাকবো ?"

"তোমার সঙ্কল্প যখন সত্য, তখন এই গঙ্গাজলে নারায়ণ তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে' দিলেন, তাও সত্য। তোমাকে তামাসা করবার সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল মা সরস্বতী !"

চারু বুঝিল, রাখী নরকে ডুবিয়া চারু হইয়াছিল, আজ আবার পতিতপাবনী গঙ্গায় ডুবিয়া সে স্বর্গে উঠিয়া সরস্বতী হইল। সে বলিল—

"বাবা, আজ থেকে আমাকে তোমার ঘরে দাসী করে' রাখ।"

"সে যা করবার ঘরে গিয়ে ঠিক করা যাবে।"

উপরে উঠিতেই চারু দেখিল, এইবারে দুই একটি করিয়া লোক পথে চলাচল করিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে সে আবার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিল।

ক্রমশঃ।

রুধির-রঙে ফোটা

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

রুধির-রঙে উঠ্‌লো যে গাছ ফুটি,
তোমার প্রভাত আলোর হরিৎ চুমায়
ভরিয়ে দিও তাহার অধর দুটী।
তোমার রসে তোমার আলোর ধারা
ভাঙ্গে যেন তাহার গোপন কারা।
সবুজ হ'য়ে উঠ্‌বে যখন হিয়া
তোমার তপন বুকের মাঝে নিয়া,
মলিন ক'রে দিও ;
সাঁঝ-নীলিমায় গোপন ব্যথাটুকু
শূন্য ক'রে নিঙ্‌ড়ে ধুয়ে নিও।

(২)

যে ফুল ফুটে উঠ্‌বে আমার গাছে,
গন্ধ তাদের সকল টুকুই তুমি
লুফে নিও তোমার নিজের কাছে।
এদের হাসির সকল মধু আলায়
ঢেকে দিও তোমার জোছন মালায়।
জমাট বাঁধা শিশির আঁখি-কোণে
ধুয়ে দিও বাদল-বরিষণে।
অনিল-পরশ ছায়
শান্তি দিও বুকের মাঝে টেনে
রৌদ্র-সহা মলিন কালো কায়!

(৩)

যে সব গীতি গাইবে পাখী ডালে,
পৌঁছে দিও কান্না হাসির মাঝে
তোমার গোপন সুরের তালে তালে।
তোমার হাওয়া-আলোর সকল খেলা
হারিয়ে দেবে আমার গাছের মেলা।
লাজ-ভরা তার সকল দেহই যেন
তোমার বুকে নতিয়ে পড়ে হেন!
বুঝ্‌তে দিও তাঁরে—
তোমার মুখের একটু হাসির দাগ,
তোমার আপন একটু আঁখি-ধারে।

———

অন্তরের পাগল

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

যখন গম্ভীর হয়ে দেশের ভাবনায় মাথাটাকে ব্যাথিয়ে তুলি—বড় কিছু পাই না, পারিও না। চেয়ে দেখি কেবল ঘন কালো—নিকষ কালো—গহন আঁধার, কেবল নিরাশা! সে তিমির ঘন কাদম্ব দুর্ভেদ্যবৎ! এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আকুলতা চঞ্চল আবেগ মদিরময়ী উত্তেজনা—সবই তার তুলনায় অতি হীন! একটী খদ্যোতদ্যুতি যেমন সারা অমানিশির আঁধারের কাছে কিছুই নয়—একটী আমি আমার দেশের অধঃপতনের কাছে কিছুই নই! কেমন যেন হৃদয়বৃত্তি আড়ষ্ট হয়ে যায়, কি যেন অস্পষ্ট অলক্ষিত নিষেধ শুনি—কে যেন মানা করে! তাই ত মাথার উপর দিয়ে ষোড়শ বৎসর কত ঝড় বয়ে গিয়েছে, কত ঝটকা উড়েচে কত মটকা ভাঙ ভাঙ হয়েচে কত অশনি সম্পাত করকা বৃষ্টি চলে গেল! হায় রে! এক দিনের মতও পার্লুম কই—ওই মত্ত মাতাল উতলা পবনের সঙ্গে কোলাকুলি কর্ত্তে, ওই এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল বৃষ্টির মাঝে তারই বিন্দুগুলির মত আপনাকে ভেঙে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিতে! সে ত হ'ল না!

কিন্তু আমার যে চরম তাই, যদিও জন্মাবধি নিষ্ঠুর বিষণ্ণতা মাতৃগর্ভের মতই আমায় ঘিরে রেখেছে? যদিও আপনার মধ্যে আপন স্বভাবের প্রেরণা যারে স্তরে স্তরে জমা কর্চ্চে তার মধ্যে অশান্তি উন্মত্ততার উপাদান এতটুকুও নেই, তার এতটুকুও একটী তরঙ্গ তোলবার মত আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষমতা হবে না, সে ফেলিয়ে না উঠে ঘনিয়ে উঠ্‌ছে—ফুটিয়ে তুলচে একটা নীথর ঘনায়িত ভাব যার ধূম পুষ্পের অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা দানা বেঁধে আমার সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে একাগ্র সম্পাতে আকর্ষণ করে রেখে দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌চে,—তবুও কিন্তু আমার চরম ওই ঝড়ের মধ্যে ওই বৃষ্টির মধ্যে! অবশ্য কেমন করে কি কর্ত্তে তা আমার অন্তর্য্যামী জানান নি।

অহেতু বলছি না! এই দেখে বলি যে আমার মধ্যে যে জিনিষটা কোনও যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, কোনও ভাবনা চিন্তায়ই হার মানে না, সেইই আমায় বড় করে আমার প্রবেশের জন্য বিশ্বহৃদয়ের দ্বার খুলে দেয়। আর যিনি হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পিত স্পন্দিত ধমনীগুলির মধ্যে ব'সে 'একটা নিজস্ব আমির জন্য হিতোপদেশ দিতে আসেন তাঁর গলার সাড়া পেলেই আমার অন্তরলোকের

অপ্সর-সভা ভেঙ্গে যায়! বিশ্বের কোনও দুয়ার খোলা পাই না। আপনাকে খুঁজেও পাই না।

অথচ এ ঝড় বৃষ্টি তা নয় যা বয়ে গিয়েচে, কেমন তাও জানি না! কেবল জানি সে এলে তার ঘূর্ণিপাকে উড়ে আমি হুহু করে চলে যাব!

এই যে বিষণ্ণচিত্তে বসে সম্মুখের গহন ঘন আঁধিয়ারা চিরে চিরে ঝলকে ওঠা বিজলি চমক দেখচি, শুনচি ঝঞ্জার দৌড়ে যাওয়ার পায়ের শব্দ বৃষ্টির ঝুপ্-ঝাপ্, সবে মিলে মিশে জড়ো হয়ে ওঠা অশ্রান্ত কল্লোল—এর সন্নিবেশ যেখানে নীবিড় হয়েচে সেখানে তাড়া করার মত আওয়াজ শোনাচ্চে যেন—হা—হা—হা—এমনি একটা উত্তেজিত রব।

কিন্তু বড় ফাঁকা ফাঁকা সে রব! ব্যথিয়ে তুলে যেন নিরেট করে ফেলেচি মাথাটাকে, তাকে সে ঘুরিয়ে দিতে পাচ্চে না! সে মাথা কেবল সাড়া নিচ্চে আর একজায়গার অনুভবের যেখানে আকাশের আঁধারের ধূমমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দানা বাঁধা পৃথিবীর মত অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলের আবছা কুয়াসার ধোঁয়ায় স্বচ্ছ আর একটা কি দানা বেঁধে উঠেচে! মাথা সাড়া নিয়ে জানছে ও হা হা হা—ওর মধ্যে এতটুকু জোর নেই! ওই ঝড়ে একটানা স্রোত এতটুকু নেই—আছে দমকা! দীর্ঘশ্বাসের মত দমকা! ও কিছু নয়। ও বারিপাত ও কা'কেও উপ্‌চে ভাসিয়ে দিতে পার্ব্বে না—ও ফোটা ফোঁটার কাজ নয়। সাগরকে নেচে উঠে মত্ত লহরে এখানে ছুটে আসতে হবে। হা হা হা! যা শুনচো কান পেতে শোনো সেটা একটা অশ্রান্ত হাহাকার!

তাই ত বলচি কিছুই হল না। গম্ভীর হয়ে দেশের ব্যথা ভাবতে গিয়ে কিছু পাই না, পারিও না। গম্ভীর হয়ে কিছুই কর্ত্তে পারলুম না। যত কাজ করেচি যত কাজ না করেচি সবই বৃথায় গেছে। ওই সম্মুখের আঁধার আর অন্তরের স্তম্ভন এ ছাড়া আর কিছুই সত্য করে পেলুম না।

অশান্ত হয়ে না বুঝে ভাবনা চিন্তার তোয়াক্কা না রেখে মেতে ওঠার মধ্যে সহসা পাড়ি দেওয়ার মধ্যে কোনও কূল কিনারার ভরসা ত দেখলুম না। আবার শান্ত হয়ে বুঝে ভেবে যে কোনও পরিণাম টেনে আনবার সম্ভাবনা আছে তাও দেখচি না।

আমার কাজের মানুষ রোখের মানুষ সে ক্ষয়ে দম আটকে লুটিয়ে পড়েচে, আমার জ্ঞানের মানুষ পাথর; গবেষনার মানুষ নির্ব্বাক। আজ তবে এ প্রহরে কার আসর সাজাব? শিল্পি কুশলী কলাবিৎ সকলেই যে দিশেহারা!

—তবে ডেকে তোল পাগলকে ! উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন পদ্ধতিহারা অকাজের পাগলকে আজ খোঁজ কর। চল পথে বাহির হই,—এ রণযাত্রাও নয় শোভা যাত্রাও নয় এ একেবারেই হেলাফেলা ছেলেখেলা ! এর হিসাব নিকাশ কেন নেই ! এ দুনিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির স্পষ্ট বোঝাপড়া যে ওর কাজ অকাজ সবই সমান, দুয়েতেই বেগার খাটা,— চল ভাই আনন্দ বাজারে মজা লুটি !

এই বার শোন ত কান পেতে, অন্তরে বাহিরে কি বেজে উঠেছে ?

কোথাও কোন উত্তেজনা শুনতে পাচ্চি না—হাহাকার কোথাও নেই। কি আছে ? ওই যে চারিদিক মাতিয়ে দিয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্চে—ও ত হাস্যধ্বনি ! হাঃ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

হয়েচে এইবার হয়েচে ! ওরে হওয়ার দু দিক মিলিয়েই ত দেখলুম। ভাল মন্দ সবই ফাঁকি ! হবি ত হওয়ার অতীত হ ; পাগল হয়ে পড়। কিসের দেশ কিসের কাজ কিসের উন্নতি ! সবই ধোঁকার টাটি ! আনন্দে মেতে যা পাগল হয়ে নেচে নেচে মজা লোট !

*　　*　　*　　*　　*　　*

এই যে জাতি আমাদের জাতি—গোঁড়ামীর বর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ সংবৃত করিয়া নাকি শত শত শত্রুর কবল এড়াইয়া এতদিন টেঁকিয়া আসিতেছে কে বলে এ জাতির উন্নতি চাই ? বিশ্বের দরিদ্র জাতিগুলি প্রাণের ভয়ে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পৃথিবী তোলপাড় করিয়া মরে- ব্রিষ্টিশারকে প্রপ্সার করিতে হয়, জার্ম্মাণকে কাল্‌চার করিতে হয়, কাহাকেও বাণিজ্য করিতে হয় কাহাকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় (দোহাই ! আইরিস, পোল প্রভৃতি হতভাগা জাতিগুলাকে লক্ষ্য করিতেছি, সোনার ভারতের কাহাকেও নহে) উন্নতি না করিলে তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই,—তাহারাই উন্নতি করুক ! বাঙ্গালীর উন্নতি ! ধোপের পর ধোপ টেঁকিয়া বরং উত্তরোত্তর ধোপ্‌দস্ত লেফাফা দুরস্ত হইয়া এ জাতি এমন বাঁচিয়া রহিয়াছে, এ জাতির উন্নতি ! যে বলে সে হয় ধর্ম্মদ্রোহী নয় ত সমাজদ্রোহী নয় ত অন্ততঃ রাজদ্রোহী ! বাঁচিবার জন্যই উন্নতি ; আমরা ধর্ম্মের বণীয়াদের উপর খাড়া বলিয়া টেঁকিয়াই বাঁচি ! আমাদের সত্য স্বতন্ত্র ! আমরা উন্নতিশীল নহি। বরং—নাম না দিলে অচল হয়ত, বলিতে পার,—আমরা রক্ষণশীল !

আমরা কাপুরুষ দুর্ব্বল এ কথা সত্য নহে। বরং আমরা এমন অসমসাহসী যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংবাদ ঠিক ঠিক পাইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

মানুষেরা আঁৎকিয়া আমাদের ভয়ে বাসাতেই মরিয়া থাকিত। এত ভয় পাইত যে প্লেগকেও সভ্যজাতিতে অত ভয় পায় না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Adventurer সে পোড়াজাতে নাকি হাজারে একজন পুরুষ তাহাই হইয়া থাকে আর তাহারাই জুটিয়া পুটিয়া ব্রিটীশ জাতিটাকে বিশ্বজয়ী করিয়া তুলিয়াছে! এ জাতি মধ্যে যে হাজারে নয় শত নিরানব্বুই তাহাই এ কথা যে দিন কোনও প্রচারক পৃথিবীতে প্রচার করিবেন সে দিন বসুন্ধরার কি মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

আমার কথাটা অবিশ্বাস যোগ্য বলিতেই পার না—মাত্র বলিতে পার বুঝিতে পারিতেছি না। সোজা কথা বুঝাইয়া দিতেছি। তবে জানিও শাস্ত্রবৎ অশাস্ত্র শ্রবণেও তর্ক চলে না। কারণ তর্কে হারিয়া গেলেই মুর্খ প্রমাণিত হইবে! তখন—মূর্খস্য- জানত?

কাপ্তেন স্কট উত্তর মেরু আবিষ্কারে ছুটিলেন, অজস্র অর্থব্যয় লোকক্ষয় আত্মপ্রাণ আহুতি, কিন্তু কেন? আমার ত মনে হয় আর কোনও উদ্দেশ্যই ইহাতে নাই কেবল একটা মানসিক অনুভূতিময়ী চমৎকার উত্তেজনা লাভ। মনুষ্যজাতির লাভালাভ ব্যবসা হিসাব তাঁহার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই খতায় নাই। এমনি কেহ আফ্রিকার নীবিড় অরণ্যে পশিয়াছেন, কেহ হিমলায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ জল প্রপাত ডিঙ্গাইয়াছেন। ভাবটা এই কাজের ফল যাহাই হউক এতবড় কাজটা যা শুনিলে লোকের দাঁতে দাঁত লাগিবে করিয়া ত ফেলি! এই ত চলিত কথায় Adventure। যতই জিনিষটা আজগুবি খেয়ালের ভিত্তিতে রচিত হইবে বাহাদুরীর মাত্রা ততই। যাহাই হউক, ওসব দেশে এমন লোক হাজারে একজন।

আর এ জাতে বিভিন্ন বয়সে যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নরদেহ মাত্রে থাকে তেমনি প্রতিজনে এক এক বয়সের এক একটা Adventure। নমুনা স্বরূপ জন্মটাই আগে ধরি। গর্ভধারিণীর মুখে তখনও স্তনন্ধয়ত্ব পরিস্ফুট, আত্মীয় স্বজনের লজ্জায় মুখ পুড়িয়া যাইবার কথা—কিন্তু শুনিয়া লোকের দাঁতে দাঁত লাগা চাই ত--তাঁহারা লঘু গুরু নির্ব্বিশেষে আনন্দে উন্মত্ত, কি? না আমাদের খুকি এখনি সবে বার উৎরেই সন্তানের মুখ দেখ্‌চে! মড়া বহিবার খাটিয়াটী কেবল আনা নাই নয় ত গৃহস্থের আর সকলই জোগাড় আছে। শুভ লগ্ন এলো অমনি যমে মানুষে টানাটানি! শুভধ্যায়াণী অন্তঃপুরিকারা ক্ষণে শঙ্খ ক্ষণে সানাই দুই-ই ফুঁকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এমনি একটা ঝড় বৃষ্টির

মধ্যে জন্মেই ত অবতার, সে তব্ আধ্যাত্মিক হিসাবে অকর্ম্মণ্য জড় জগতের ঝড় বৃষ্টি! এই সূক্ষ্ম ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জন্মে বর্ষে বর্ষে কত না শিশুর অবতার লগ্ন লাগচে,—ক্ষণ জন্মা পুরুষের অভাব আছে কি? তার পর ভালয় ভালয় যদি প্রসূতি সন্তান দুজন হল ভালই, নয় ত শুধু নবজাত অবতার সূতিকাগার হতে বার হলেন,—অভিভাবকে ডাক্তারে মাসকাবারি বন্দোবস্ত। **বাল্যলীলা**—নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে। বাঙ্গালী বাল্যাবস্থায় কেমন করে শিক্ষিত হন এই পাগলাম হিসাবে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে চোখের ওপর যেটা দেখা যায়—দিনে দিনে তাঁরা শশিকলার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকেন। আর বেশ জ্বল্ জ্বলে চোখে পড়ে, তাঁদের শিক্ষাদানের দোহাই দিয়ে অনেক বাবু প্রতিপালিত হন, গাড়ী ঘোড়া চড়েন, দু পয়সা জমিয়ে যান। এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে অনেক জামাজোড়া কেতাব খাতা জুগিয়ে একদিন সাক্ষাৎকার লাভ হয় যে কাল যে বালক ছিল আজ আর সে তা নেই। ডিগ্রের বাহবায় তার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়েচে, কপালে অনেকগুলো বলি চিহ্ন পড়ে গেছে! সে মানুষ হল কিনা হল বয়ে গেল, দেখা যায় সে বয়স্থ হয়েচে! যৌবন—যৌবনটা জীবনের মধু বসন্ত, পনেরো আনাই সেই মধুর ঝাঁঝে মিলিটারি। উন্মুখ প্রবৃত্তি যেখানে বাধা পাবে সেইখানেই বিষিয়ে আছেন। বাপ স্বার্থপর অথবা স্ত্রৈণ, মা শত্রু, ভায়েরা ভাগিদার। স্ত্রী পছন্দ মত চাল চলন কর্ত্তে পারেন তবেই, নতুবা ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় যত গালাগাল আছে একাধারে সব। জীবন লক্ষ্যহীন কাজকর্ম্ম সাফল্যহীন কথা বার্ত্তা অসংলগ্ন, কোন ও স্বাধীন অভিমত না থাকার যা ফল। পরিণত কাল—টেঁকিয়া থাকার তপস্যায় জীর্ণদেহ রুদ্ধশ্বাস, চল্লিশের এ পারেই অন্তিমের কাছাকাছি,—পশ্চাতেও এক অকর্ম্মার রেজিমেণ্ট। এমনি জন্ম লালন পালন শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রের উপর যাহাদের জীবনের ভিত্তি গাড়িবার প্রথা তাহাদের কল্পনায় গার্হস্থের স্বর্গসুখের চারিতালা প্রাসাদের প্লাণ কামড়াইয়া পড়িয়া থাক। একি কম অসমসাহসিকের কার্জ? কম দুর্গম পথে পাড়ি জমান? এমন আজগুবি খেয়ালে কোন জাত মজিতে পারে? এ জাত স্বচ্ছন্দে পুরুষাণুনামে এই প্রবাহে গা ভাষাইতেছে। দেখাও দেখি এতবড় বুকের পাটা ওয়ালা দোসরা জাত?

আমরা অলস দরিদ্র এমনও নাকি একটা অপবাদ আছে!—মূর্খে তাহা দিয়াছে। এতটুকু পর্য্যবেক্ষণ শক্তি থাকিলে এ কথা কেহ মুখে আনিতে পারে না! তার উপর স্বজাতি প্রীতি আমাদের মত কোনও জাতির নাই। অপরাপর

জাতি তাহারা ত নিজের জাতিটাকে বাড়াইবার জন্য জগৎ জোড়া করিবার জন্য কেবল একটু ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা যা করি যতখানি করি সে অলৌকিক! ওই যে পোষ্য প্রতিপালন ক্ষমতা একটী জন্মিবার পূর্ব্বেই আমরা পরম বৈরাগ্যের সহিত অমন চার পাঁচ ছয়টীকে পৃথিবীতে আনিয়া ফেলি, জাতির মু খ চাহিয়া জনসংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দিই এ আর কোন জাতির লোক পারে? আমরা অলস? অলসের কি এই রীতি! দুঃখের জগদ্দল বোঝাটাকে পরম মমতার সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া আমাদের মত কাহারা ধান্ধায় ফিরিতে পারে? আর মুহূর্ত্তের জন্যও কামাই নাই, ধান্ধায় অবিরত ফিরিতেছি? এর নাম কি আলস্য? যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকিত বুঝিতে আমাদের দুঃখ দারিদ্র প্রসূত নহে! আরও আমাদের এই বিরাট মন কতখানি রোমান্সে ভরা! ধান্ধায় গলদ ঘর্ম্ম সহসা একদিন দেখিতে পাই, সারাজীবনের সুখভোগ উপার্জ্জন সঞ্চয়ের ফলে দেহ পুষ্টি স্বস্তি ও মিতাচারের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবস্থার উপযুক্ত ব্যবসা কোনও দিনই করিয়া তুলিতে পারি নাই—সঙ্গতির মধ্যে জমিয়াছে ঋণ, আপনার দিক হইতে আর কোনও ভরসা নাই, কেহ এখন মুখের দিকে না চাহিলে চলে না অথচ পশ্চাতে আপনার হাতে গড়িয়া খাড়া করিয়াছি যাহাদের তাহারা এখনও আমারি অণ্ণজিবী। লজ্জা আসেনা ধিক্কার আসে না অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার সময়ও থাকে না—ফন্দি অঁাটিতে থাকি দুঃখের ধান্দায় হাড়িকাটে কেমন করিয়া তাহাদের গলা আটিয়া দিয়া যাইব অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া যাইব।

এ জাতির জন্য কাঁদিবার—ক্রুদ্ধ হইবার কি আছে? কবে কল্পনা প্রবণ শৈশবে কাহার কাছে শুনিয়া ভুল শিখিয়াছি, সেই চক্ষে এইখানকার অবস্থা দেখিয়া অধীর হইয়া উঠে! ওগো! পরের মাপ কাটিতে আমায় মাপিলে মাপে কেমন করিয়া সমান হইব? ছোট কি বড় দেখিলে আশ্চর্য্য হও কেন? এ জাতির গৃহ প্রাঙ্গন ভরিয়া ম্লানমুখ কঙ্কালসার পুতলীগুলি দেখিয়া তোমার হৃদয়ের করুণা তাহাতে করুণ রস ঢালিয়া দিতেছে! যিনি চিত্রকার তিনি জানেন এ আলেখ্য তাঁহার কল্পনা বস্তু বিভৎস রস।

আপন আবেগে উচ্ছসিত হয়ে তোমার কল্পনাবেগ হৃদয়ে যা জমায় সে আর একখানি নূতন ছবি আঁকিয়ে তুলতে! তোমার রস সেখানেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে! ওই শোন অন্তরের পাগল হিঃ হিঃ শব্দে হেসে তারই পট নির্দ্দেশ করচে। মা শুচ।

অনাদৃতা

[কাজী নজরুল ইসলাম]

ওরে অভিমানিনী!
এমন ক'রে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।
পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দুদিন এসেছিলি,
সকল-সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুল্‌বো তারে হায়!
আহা ভোলা কি তা যায়?
ওরে হারা-মণি! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী॥
অভাগীরে! হাস্‌তে'এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মত বেঁধে!
যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশীর সুরে
কইতে গিয়ে উঠলো দু' চোখ নয়ন-জলে পুরে!
না কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি গান সেই মু'খানি হায়
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই!
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনি নি?
ওরে অভিমানিনী!!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

দশম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষায় "উঠ্‌তে লাথি, বস্‌তে ঝাঁটা" বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহার অর্থ যে কি তাহা জেলখানায় দুই চারি দিন থাকিতে থাকিতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। একে ত আমাদের পরস্পরের সহিত কথা কহিবার জো নাই; তাহার উপর যেখানে আমাদের রাখা হইয়াছে সেখানে শুধু মাদ্রাজী আর ব্রহ্মদেশীয় লোক! কাহারও কথার এক বর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। সারাদিন ঠক্ ঠক্ করিয়া নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া যাও আর সন্ধ্যার সময় একটা অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে কম্বল জড়াইয়া পড়িয়া থাক। পুরা কাজ করিয়া উঠিতে পারিতাম না বলিয়া গালাগালি ও দাঁত খিচুনি প্রায়ই খাইতে হইত। কিন্তু উপায় নাই। একদিন সন্ধ্যার সময় গালাগালি খাইয়া মুখটী চুণ করিয়া কুঠরীর মধ্যে বসিয়া আছি এমন সময় একজন পাঠান প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কি হয়েছে?" আমি গালাগালি খাওয়ার কথা বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল—"দেখ, বাবু, আমি প্রায় পাঁচ বৎসর এই জেলে আছি। গালাগালি খেয়ে যারা মন গুমরে বসে থাকে তারা হয় পাগল হয়ে যায়, নয় ত মারামারি করে ফাঁসি যায়। ও সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল! খোদাতালার হুকুমে এমন দিন চিরকাল থাকবে না।"

চুপ করিয়া গালাগালি সহ্য করার অভ্যাস কস্মিন্‌কালেও ছিল না, কিন্তু পাঠানের মুখে খোদাতালার নাম সে রাত্রিতে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। মানুষ যখন সব আশ্রয় হারাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে তখন অগতির গতিকে তাহার মনে পড়ে। সেই জন্যই জেলখানায় দেখিতে পাই যাহারা দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড তাহারাও এক এক গাছা মালা লইয়া মাঝে মাঝে নাম জপ করে! আগে এ সব দেখিয়া বড় হাসি পাইত; তাহার পর মনে হইল ইহাতে হাসিবার কি আছে? আর্ত্তভক্তও ত ভগবানের ভক্তের মধ্যে গণ্য!

কিন্তু দুঃখের মাত্রা দিন দিন যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নূতন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আসিয়া যখন আমাদের ঘানিতে জুড়িয়া তেল পিষাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন তখন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ঝপ্ করিয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া

পড়া সহজ; কিন্তু দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরা তত সোজা নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন মানে ২৫ বৎসর; তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল যে এইরূপ কর্ম্মভোগ না করিয়া একগাছা দড়ি লাগাইয়া না হয় ঝুলিয়া পড়ি—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মরার জন্য যতটা দুঃসাহসের দরকার আমার বোধ হয় ততটা ছিল না। কাজে কাজেই যথাসাধ্য ঘানি পিষিয়া সরকারের তেলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলাম। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়াও ৩০ পাউণ্ড তেল পুরা করিতে পারিলাম না। হাত পা এমনি অবশ হইয়া গিয়াছে যে মনে হইতেছিল বুঝি বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাহার উপর সমস্ত দিন প্রহরীদের কাছে কাজের জন্য গালি খাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলারের নিকট লইয়া গেল। জেলার ত সুশ্রাব্য ভাষায় আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত লাইবার ভয় দেখাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিলাম তখন খাইব কি, দুঃখ ও অভিমানে পেট ফুলিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। একজন হিন্দু প্রহরীর মনে একটু দয়া হইল; সে বলিল—'বাবুলোক তকলিফমে হৈ; খানা জাস্তি দেও।" কথাগুলা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল। নিজের গলাটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এ সময় লাথি ঝাঁটা সহ্য করা যায়; কিন্তু সহানুভূতি সহ্য হয় না।

রবিবারেও কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। নীচে হইতে বালতি বালতি জল উঠাইয়া দোতালা ও তেতালার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। একদিন ঐরূপ পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম উল্লাসকর কিছু দূরে কাজ করিতেছে। কথা কহিবার হুকুম নাই, তবু কথা কহিবার বড় সাধ হইল। দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া উল্লাসের কাছাকাছি গিয়া তাহাকে ডাকিবামাত্র আমার পিঠের উপর গুম্ করিয়া একটা বিষম কিল পড়িল। পিছনে মুখ ফিরাইবা মাত্র গালে আর এক ঘুসি! মূর্ত্তিমান যমদূতসদৃশ পাঠান প্রহরী মহম্মদ সা এইরূপে সরকারী হুকুম তামিল ও জেলের শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

সেবার কিছু দিন এইরূপে কাটাইয়া ঘানির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু জেলার নাছোড়বান্দা। দিন কতক পরেই আবার ঘানিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমি তখন মোরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছি। একেবারে

সাফ জবাব দিয়া বসিলাম—"আমি ঘানি পিষিব না, তুমি যা করিতে পার কর।" জেলার ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। একটা কুঠরীতে বন্ধ রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাতকড়ি, বেড়ী ও কঞ্জি (penal diet) র ব্যবস্থা হইল। শেষে শরীর যখন নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল তখন আবার ছোবড়া পিটিবার অধিকার পাইলাম। কিন্তু ছোবড়া পিটিয়াই কি শান্তি আছে? প্রহরীরা বিশেষতঃ পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানেরা স্থির করিয়া লইয়াছিল যে আমাদের দাবাইতে পারিলেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। কাজেই তাহারা সর্ব্বদা আমাদের বিপদে ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকিত।. ছোটখাট খুটিনাটি লইয়া যে কত জনকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্বা নাই। একদিন কুঠরীর মধ্যে পায়ে বেড়ী দিয়া শুষ্ক ছোবড়া পিটিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মে ও কঠোর পরিশ্রমে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঘামের স্রোত ছুটিয়াছে ছোবড়া পিটিবার মুগুর মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া আমারই মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কুঠরীর বাহিরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রহরীকে দেখিয়া ছোবড়াগুলা ভিজাইবার জন্য একটু জল চাহিলাম। সে একেবারে দাঁতমুখ খিচাইয়া জবাব দিল—"না, না, হবে না, ঐ শুকনো ছোবড়াই পিটতে হবে।" আমারও মেজাজটা বড় সুবিধার ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জল না হয় নাই দেবে, কিন্তু অত দন্ত বিচ্ছেদ করছ কেন?" প্রহরী রুখিয়া দাঁড়াইল "কেয়া, গোস্তাফি করতা?" আমি দেখিলাম এখন আর হটিয়া যাওয়া চলে না। বলিলাম—"কেন, তুমি নবাবজাদা নাকি?" বলিবা মাত্র প্রহরী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলার হাঁসুলি ধরিয়া এমনি টান মারিল যে জানালার লোহার গরাদের উপর আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। রাগটা এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে লোকটা যদি কুঠরীর ভিতরে থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহার মাথায় মুগুর বসাইয়া দিতাম। কিছু একটা না করিলেই নয়, কিন্তু করিবই বা কি? শেষে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এমনি কামড় বসাইয়া দিলাম যে তাহার হাত কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত লইয়া সে জেলারের কাছে নালিশ করিতে ছুটিল কিন্তু রাস্তার মাঝখানে আমাদের বন্ধু একজন হিন্দু পেটি-অফিসর (peatty officer) তাহাকে কতকটা ভাল কথা বলিয়া কতকটা ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিল। প্রহরীদের সঙ্গে আরও দু একবার এইরূপ ঝগড়া হইয়াছে কিন্তু দেখিয়াছি যাহাদের নিকট তাহারা হারিয়া যায় তাহাদেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের

উপর নির্য্যাতন সব জায়গায়ই হয়, আর সে নির্য্যাতন পাঠানেরাই বেশী করে। কিন্তু পাঠানদের সহস্র দোষ সত্ত্বেও একটা গুণ দেখিয়াছি যে যাহাকে একবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, নিজের মাথায় বিপদ্ লইয়াও তাহার সাহায্য করে। তাহাদের মধ্যে নৃশংসতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অধিক। ধর্ম্মঘটের সময় জেলার আমাদের দাবাইবার জন্য আমাদের উপর পাঠান্ প্রহরী লাগাইয়া দিত কিন্তু পাঠান অনেক সময় বিশেষ ভাবে আমাদের বন্ধু হইয়া উঠিত। জেলে দলাদলির অন্ত নাই। প্রবল দলকে আপনাদের স্বপক্ষে রাখিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতাম।

হিন্দু মুসলমানের ভেদটা জেলখানার মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র হইয়া উঠিত। স্বধর্ম্মীদের উপর টানটা মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটু বেশী; সেইজন্য জেলের মধ্যে কর্ত্তৃত্বের জায়গা গুলা যাহাতে মুসলমানদের হাতেই থাকে এজন্য তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। অধিকন্তু নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা হিন্দুকে মুসলমান করিতে পারিলেও ছাড়িত না। কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাঁটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহেস্তে যে খোদাতালা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। আর কালাপানির আর্ত্তভক্তদের মধ্যে মোল্লারও অসদ্ভাব নাই। কাজে কাজেই হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মধ্বজীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া ঝগড়ি চলিত। একজন হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ঘানি পিষিতে যায় তাহা হইলে পাঁচ সাতজন মোল্লা মিলিয়া তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করে আর সে যদি মুসলমান হয় তাহা হইলে যে কিরূপ পরমসুখে দিন কাটাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রলোভন দেখায়। মুসলমানদের মত আর্য্যসমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাহারা দল হইতে বাহির করিয়া দিতেই জানে, নূতন কাহাকেও দলে টানিয়া লইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। এই দলাদলির ফলে আর কিছু হোক আর নাই হোক হিন্দুর টিকি ও মুসলমানের দাড়ী সেইখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা দেশে কস্মিনকালেও টিকি রাখে না তাহারাও কালাপানিতে গিয়া হাত দেড়েক টিকি গজাইয়া বসে আর মুসলমানেরা দুলিয়া দুলিয়া "আলীর

সহিত হনুমানের যুদ্ধ” “শিবের সহিত মহম্মদের লড়াই” “সোণাভান বিবির কেচ্ছা” প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরকালের পথের সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়। আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্ব্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙ্গালী। রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙ্গালী।

দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে যে দলাদলিটা শুধু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যেও দলাদলির অভাব ছিল না। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলাদলির বেশ পুষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা টলষ্টয়ের (Tolstoy) এর Resurrection নামক গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সে পুস্তকখানিতে বিপ্লবপন্থীদিগের মনস্তত্ত্বের কিরূপ সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা যে কত সত্য তাহা নিজেদের দলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বাস্তবিকই সাধারণ বিপ্লবপন্থীরা নিজেদের একটু বড় করিয়াই দেখে। একটু অহঙ্কার ও আত্ম-বিশ্বাসের মাত্রা বেশী করিয়া থাকে বলিয়াই হয়ত তাহারা কাজে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তাহাদের চরিত্রে যতখানি তীব্রতা থাকে ততখানি গভীরতা থাকে না। তাহারা সাধারণতঃ কল্পনাপ্রবণ ও একদেশ-দর্শী; এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই neurotic। রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে নূতন ছেলে আসিলেই আমি সন্ধান লইতাম যে তাহাদের পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে তিন পুরুষের মধ্যে কেহ বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়ুরোগের ইতিহাস পাইতাম। পুরাতন বন্ধুবর্গ হয়ত কথাটা শুনিয়া আমার উপর চটিয়া যাইবেন; কিন্তু ক্রোধের সেরূপ অপব্যয় করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ আমিও তাহাদের দলভুক্ত এবং আমার পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন।

বিপ্লবপন্থীদিগের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব জেলের বাহিরে কাজকর্ম্মের উত্তেজনায় অনেক সময় চাপা পড়িয়া থাকে, কিন্তু জেলের ভিতর অনুরূপ উত্তেজনার অভাবে তাহা নানারূপ নিরর্থক দলাদলির রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। কোন্ দল বেশী কাজ করিয়াছে, কোন্ দল ফাঁকি দিয়াছে; কোন্ নেতা

সাচ্চা আর কোন্ নেতা ঝুটা—এরূপ গবেষণার আর অন্ত ছিল না! এবং প্রায় প্রত্যেক দলই আপনাকে 'আদি ও অকৃত্রিম' বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত। এই প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টার সহিত প্রাদেশিক ঈর্ষা মিশিয়া ব্যাপারটাকে বেশ বীভৎস করিয়া তুলিত। জাতীয় সম্মিলন ও ভারতীয় একতার দোহাই দিয়া কত অদ্ভুত জিনিষ যে পাচার করিবার চেষ্টা হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানে সপ্তকোটী কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটী কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙ্গালী কবি লিখিয়াছেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার" সেই হেতু বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন পাঞ্জাবী আর্য্য-সমাজী নেতা তাঁহার বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করিবার আর কোন রাস্তা না পাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক!! এরূপ যুক্তির পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙ্গালী বিদ্বেষের ভাবটা কিছু বেশী প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপিত করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত—ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙ্গালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্ব্বল ও ভীরু—একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ— নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।

এই সমস্ত অন্তরবিরোধের ফলে বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মঘট বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। শেষে যখন ইন্দুভূষণ জেলের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল, উল্লাসকর পাগল হইয়া গেল সেই সময় কিছু দিনের জন্য অন্তরবিরোধ ভুলিয়া আমরা একজোটে কাজ করিতে পারিয়াছিলাম। নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে নিজেরা ধর্ম্মঘটে যোগ দিতেন না; দূর হইতে অপরকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মঘট বহুবার ভাঙ্গিয়া গেলেও শেষে সরকার বাহাদুরের আমাদের সঙ্গে একটা রফা করিতে হইয়াছিল।

তুমি যদি রও কাছে

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ।]

(গান)

(সিন্ধু বারোয়াঁ—ঝাঁপতাল)

সব দুখ মোর হবে শতদল
তুমি যদি রও কাছে !
জীবনের ভার কুসুমের হার
তুমি যদি রও কাছে !
আকাশের চাঁদ হাতে পাব আমি
তুমি যদি রও কাছে !
গোলাপের বন বুকে র'বে মোর
তুমি যদি রও কাছে !
মিটিবে গো তৃষা সুধা সরোবরে
তুমি যদি রও কাছে !
ডুবিব অতল অমৃতের হ্রদে
তুমি যদি রও কাছে !
পর্ণ কুটিরে রাজা হয়ে র'ব
তুমি যদি রও কাছে !
স্বরগ নামিবে এ ধরণীতলে
তুমি যদি রও কাছে ॥

নর-নারায়ণ।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

ভারত ভগবানের পাদপীঠ; এখানে তার রাজীব চরণ যুগে যুগে কতবারই না পড়েছে, কত বারই না সে এই দেশে চোদ্দপোয়া মানুষের আধারে আপনার রূপ জাগিয়ে জগত আলোয় আলো করেছে। আমাদের দেশ মাতা তাই জগন্মাতা মহামায়ার প্রতিমা, বিশ্বপতিকে সন্তানরূপে বার বার কোলে ধরে মা আমার শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি। তোমরা বলতে পার তবে এই আদ্যাশক্তির চরণে আজ শৃঙ্খল কেন? বলতে পার কি, আপন জননীকে বেঁধে ভগবানের একি লীলা? যার শুধু বঙ্গজোড়া প্রাণময়ীরূপ দেখেই বঙ্কিমচন্দ্র গেয়েছিলেন—

সপ্ত কোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্ত কোটী ভুজৈ ধৃত খরকরবালে—

সে মায়ের ভারতব্যাপী বিগ্রহের পদযুগে মানুষের দেওয়া তুচ্ছ লোহার শিকল!

তোমরা বুঝে রাখো যে সুরাসুর সংগ্রামে মা আজ বন্দিনী, তাই মা এমন ভাবে শৃঙ্খলিতা। এ সংগ্রাম মানুষের অন্তর-রাজ্য ভরে যুগ যুগান্তর আগে হয়েছিল, এবং এ যুদ্ধে সেই দিন মানুষের পরাভব যে দিন ভারতের মানুষ তার নিজের জীবনে দেবতার ভোগ্য অমৃত অসুরের হাতে দিয়ে ফেলেছিল। ভগবান যদি তোমার আমার ঘটে জাগেন আর এই দু'খানি চোখ মেলে ভাগবত দৃষ্টি যদি জগতকে একবার চেয়ে দেখে, তা হলে মানুষ বুঝতে পারে তার আত্মার বুকে কোথায় দেবতা আর কোথায় দানব। তখন সে বুঝতে পারে কেমন করে মানুষ এই গোপন দেবাসুর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে করে আপন বিশ্বময় মুক্তস্বরূপ হারিয়েছে, ভগবানের অনন্ত সত্যধন জ্যোতিঘন অঙ্গের মাঝে থেকেও ভগবানের আসুরী মায়ার হাতে কেমন করে আত্মসমর্পণ করে সে এই অহঙ্কারের দীন জড়পিণ্ড মানুষ হয়ে গেছে। তোমায় আমার সেই পরাজয়ের বেদনাই না মায়ের পায়ে শিকল হয়ে এমন নিদারুণ ভাবে আজ দেখা দেয়, আবার তোমার আমার সেই অন্তর নগরেই অসুর যে দিন দেবতার পায়ে পরাজয় পাবে, সেই দিনই ভাই তোমারও মুক্তি আর সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও মুক্তি। মানুষকে তার দীনতা থেকে অহঙ্কারের স্বার্থভরা বেদনা থেকে মুক্ত করতেই

ভগবতী বিশ্বমাতার এ বন্ধন স্বীকার, কারণ সন্তানের সত্ত্বায়ই তো মায়ের বিগ্রহ। তুমি অন্তরে যা হও মা যে তারই প্রতিমা হয়ে বাহিরে রূপ নেয়। সন্তানকে জাগাতেই মায়ের চরণে শৃঙ্খল এমন করে যুগে যুগে বেজে ওঠে; এবারও সেই লীলা, এবারও ভগবানের জ্যোতি ভারত ভরে নেমে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে মুক্তি কি ধন।

ঋক ও সামবেদের যুগে ভগবান একবার মানুষে নেমেছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠ আর এই রূপ রসের জগতকে কোলে করে তাঁর সোণার জ্যোতি সকল অনৃতকে সত্যময় করে দেখিয়ে সকল দ্বন্দ্বই মিটিয়েছিল। তার পর মানুষ সামঞ্জস্য হারাতে হারাতে উপনিষদের যুগে জ্ঞানের মাঝে আবার একবার সে সত্যকে ধরেছিল, বটে কিন্তু ভগবানের সে আবির্ভাব মানুষের আত্মার সকল ধাম ভরে অধঃ ঊর্দ্ধে রূপান্তর এনে তেমন করে আর হয় নাই; তবু সে জ্যোতি বড় কম নয়, তখনও মানুষ ছোটকে সান্তকে নিখিলের মাঝে, সকল খণ্ড সত্যকে অনন্ত সত্যের ছন্দে অমৃত করেই পেয়েছিল। তখনও জগত্ সে মানুষের চোখে সত্য বর্ণ সত্য গন্ধ সত্য রূপ সত্য নাম। তারপর পুরাণের যুগ। তখন আর মানুষের অতিমানব সত্ত্বা নাই, ভগবানের পূর্ণ হৈম জ্যোতি নিবে ম্লান হয়ে এসেছে, বিজ্ঞান সূর্য্যের জ্যোতি তখন পশ্চিম গগনের মেঘের গায়ে অস্তাচল চুড়ায় সোণার স্বপ্ন গড়েছে, তাই মানুষ তখন একত্বকে গৌণ করে ভগবানের বহুভঙ্গিমতা (multiplicity) তাঁর বিভূতি, তার সম্পদ, তার ঐশ্বর্য্যের পাগল। মানুষের সাধনা তখন সূক্ষ্মের স্তরে (psychic); সত্য-জ্ঞান-আনন্দ তখন নাম রূপের আধ-আধার আধ-আলোর গোধূলি রচনা করছে। বেদের যুগে ভগবান প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানে, উপনিষদের যুগে জ্ঞানে, পুরাণের যুগে মনে এবং তার পর বৈষ্ণব যুগে হৃদয়ের ভাব ও প্রাণের তরঙ্গ মিলিয়ে তাঁর জন্য প্রেম-সাধনা।

তাই দেখো ভগবান মানুষের অন্তর রাজ্যের সকল ধামই একে একে যুগে যুগে উজ্জ্বল করেছেন, খণ্ড ভাবে মানুষ দেবতা হতে শিখেছে। তাই এবার সমন্বয়ের যুগ, এবার অধো ঊর্দ্ধ উদ্ভাসিত করে পূর্ণ মানুষকে সকল সত্যে সকল অঙ্গে সকল ধামে পূর্ণ দেবতায় রূপান্তর করে ভগবান নামবেন, যত যুগ কেটে গেছে, তাদের তুলনায় এবার তাই পূর্ণ রাস! কিন্তু এই শেষ নয়, নিখিল রসের ঠাকুরের কি শেষ আছে, অনন্তে বিগ্রহ ধারণ কি কখন ফুরাতে পারে? দেহ প্রাণ মন নিয়ে এই তিন লোক পরিপূর্ণ করে ভগবান হয়েও মানুষ থামবে না; হয়তো এই প্রকাশকেই ধরবার আধার গড়তে, মর্ম্মের

দুয়ারের পর দুয়ার খুলে সকল কক্ষে প্রদীপ দিতে, সমস্ত জীবন সে আলোয় তুলে ধরে রূপান্তর করতে—ভগবানকে এমন করে মানুষের আত্মরাজ্যের পূর্ণ অধীশ্বর করতে কত যুগই কেটে যাবে। নূতন উর্দ্ধমূল জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে সমস্ত মানব জাতিকে সে নব বৈকুণ্ঠে নবীন রূপান্তরে তুলে নিয়ে তবে আনন্দ নগরে আবার জাগাবার বড় আয়োজন।

এ যুগের জন্যে এই ঢের; মানুষ ত্রিলোক জয়ী হয়ে, মনের পারে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যদি সেই প্রাণে মনে ভাগবত কর্ম্ম করতে পারে, এই জ্ঞানমুক্তের জগত যদি বিজ্ঞানমুক্ত হয় তা' হলে সে নব অভিব্যক্তি মানুষের সভ্যতা মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজ সাহিত্যে কলা সকল জীবনে কি ওলট পালটই না নিয়ে আসবে! একবার তা ভেবে দেখো যা এখন খণ্ড আছে তা পূর্ণ হবে, যা এখন দীন আছে তা ঋদ্ধ হবে, যা এখন মিথ্যা আছে তা বড় সত্যের মাঝে আপন ক্ষুদ্র সত্য খুঁজে পেয়ে বেদনা না এনে জীবনের আনন্দই ভরে তুলবে।

মানুষের ইতিহাস রাজা মহারাজা সম্রাট সেনাপতির জীবনী নয়, মানুষের ইতিহাস পররাজ্য বিজয়—পরধন লুণ্ঠনের বিবরণ নয়, মানুষের ইতিহাস মানুষের মাঝে ভগবান জাগবার ইতিহাস। সমস্ত জগতের ইতিহাস একত্র করে নতুন চোখে জ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে একবার পড়ে দেখো, দেখতে পাবে, নানা দেশ নানা জাতির জীবনের দলগুলি ফুটতে ফুটতে চলেছে একটি সহস্রদল পদ্ম রচনা করে। মানুষ আপনাকে মাধুরী থেকে নূতন মাধুরীতে সত্য থেকে নূতন সত্যে বৃহৎ হতে বৃহত্তর—বহুধা বিশ্বতোমুখ করে নিয়ে চলেছে।

মানুষ তার ক্ষুদ্র জীবনকে অনন্ত না করে ছাড়বে না, ছোট ছোট সকল সত্য সকল বেদনার সুখকে এক মহাসত্যে এক শিবসুন্দর আনন্দে সার্থক না করে বিরত হবে না। তোমরা মানব জলধির তীরে বসে ঢেউ গুণে গুণে অমন করে মহামূল্য জীবন খুইও না, ও ঢেউয়ের অনন্ত পাথার গুণে শেষ করতে কখন পারবে না। মানুষের পরিধি ভেঙে গণ্ডীর বাঁধন মুছে দিয়ে তার চোদ্দপোয়া আধারে একবার অনন্ত-ভুবন-দোলা গরিমা দেখবার চেষ্টা করো, তখন দেখবে যে ঢেউ গুণে উঠতে পারছিলে না তার অফুরন্ত জলভঙ্গ তোমারই বুকে নিঃশেষে গুটিয়ে এসেছে, তখন দেখবে মানব সূর্য্যের স্বর্ণমণ্ডল আকাশ ছেয়ে কেবলি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, উদয়া-চলের নীল কোলে এই এক মুহূর্ত্ত আগে যাকে থালার মত দেখেছিলে এই পর

মুহূর্ত্তেই তাই বুঝি দিঙমণ্ডল ব্যপে ফেলবার উপক্রম করে। এ ভাগবত আকাশেরও অবধি নাই আর তার বুকের মাঝে উদিত এ মানব সূর্য্যেরও প্রকাশ ফুরিয়েও ফুরাতে চায় না। যুগ আসে যুগ যায় মানুষকে সার্থক করে, ভুবনের পর ভুবন মহাশূন্তে ভেসে ওঠে এই নরনারায়ণ বিগ্রহে কি এক অসাধ্য সাধনের মানসে। সেই অসাধ্য সাধনের নাম ভগবানের বোধন, তারই বিগ্রহ নর, তারই উপাদান নারায়ণ, তাই তোমাদের জাতীয়তা বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল,—সব।

মাঝখানে

(শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক)

সংসার পিছে ডাকে নিশিদিন
আয় আয় হেথা কোলে;
আমারে পাগল করিয়া তুলেছে
কত গানে মধুবোলে।
সন্ন্যাস মোরে কত আশা দিয়ে
সুমুখ ধরিয়া টানে,
কত বিরাগীর আঁখি ঝরা গান
গেয়ে ফিরে দুটি কানে।
শুধু কেঁদে মরি, পারি না বুঝিতে
কোন্ দিকে এবে যাই,
ফুকারিয়া উঠি এদুটি পথের
মাঝখানে কিছু নাই;
ভাই বোন মোরে ডাকে, এস এস
আমাদের মাঝে হেথা!
আমারে ঘিরিয়া ভক্ত কেবলি
গেয়ে ফিরে প্রেম গাঁথা।
আমি মাঝখানে দাঁড়ায়ে শুধাই
উভয়ের পানে চাই,
ফুকারিয়া উঠি, এদুটি দলের
মাঝখানে কিছু নাই?

সুখের ঘর গড়া

(শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত)

দ্বাদশ অধ্যায়

সেদিন মহালয়ার ছুটী। শরৎ প্রভাতের সোনালী আলোতে ঘাট বাট-মাঠ যেন সদ্য স্নান করিয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। বেলা তখন সাতটা হইবে। শেওড়াফুলির ষ্টেশনে তারকেশ্বরের গাড়ীর একটা মধ্যম শ্রেণীর কামরার দরজার কাছে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভবানীপ্রসাদ গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগিনেয় পঞ্চাননের সঙ্গে গল্প করিতেছে। ট্রেণ ছাড়িতে এখনো একটু দেরী আছে। হাবড়া হইতে একটা ডাউনট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেণ এক রকম ভর্ত্তি। যাহারা দেরীতে আসিতেছে তাহারাই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গাড়ীর কামরায় কামরায় উঁকি মারিয়া অগ্রপশ্চাৎ ছুটাছুটী করিতেছে। যাহারা আরামে আগে হইতে স্থান করিয়া বসিয়াছে তাহারা প্লাট্ফরমের উপর ধাবমান আরোহীদের ব্যতিব্যস্ততা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করিতেছে। কেহ যদি কোনো কামরায় উঠিবার ভাব দেখাইতেছে অমনি জানালার পাশে উপবিষ্ট লোকেরা দরজা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ভিড়ের আপত্তি তুলিয়া স্থানাভাব জানাইয়া দিতেছে; তথাপি যে জোর করিয়া ঢুকিতে চাহিতেছে তাহাকে খুব মুরুব্বীআনা সুরে "কোন ক্লাসের টীকিট"? জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। পাঁচ দশ মিনিটের জন্য যে স্থানের মায়া তাহাতে যেন তারই চিরজীবনের মৌরসী-সত্ব আছে এমনি ভাব দেখাইয়া ঝগড়া বাধাইতেছে।

ডাউনট্রেণ আসিল। তারকেশ্বর লাইনের যারা যাত্রী তাহারা ছুটাছুটী করিয়া গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ করিল। পুনর্ব্বার সেই অভিনয়। বিজয়ও এই গাড়ীতে বাড়ী যাইতেছে। একটী বুড়ী নিজ অবহ জীবনভারের চেয়ে এক দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া, দুর্ব্বল হাতে একটী ৮।৯ বছরের মেয়েকে টানিতে টানিতে ভিড়ের চাপে ও গোলমালে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বিজয়কে সম্মুখে দেখিয়া কাতরভাবে বলিল—"বাবা এটা হরিপালের গাড়ী?"

বি। হ্যাঁ তুমি কোথা নাম্‌বে? হরিপালে?

বু। হ্যাঁ বাবা, দেও বাবা গাড়ীতে তুলে—

'এস' বলিয়া বুড়ীর হাত ধরিয়া বিজয় যেখানে ভবানী ও পঞ্চু গল্প করিতেছিল

সেই গাড়ীর কাছে আসিল। উঁকি মারিয়া দেখিল গাড়ীতে স্থান আছে। বিজয় বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার কি থার্ড ক্লাসের টিকিট?'

বু। হ্যাঁ বাবা!

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সমস্ত গাড়ীতেই ভিড় ঠাসা। তিল ধারণের স্থান নাই। গাড়ী খুঁজিবারও সময় নাই। বিজয়ের ভাবিবার অবসর নাই। বিজয় মুহূর্ত্তের জন্য অনিশ্চিত হইল। পঞ্চুর সঙ্গে বিজয়ের মুখ চেনা-চিনি ছিল। সে বলিল "আপনি তো হরিপালেই নামিবেন? আসুন এই গাড়ীতে ওদের নিয়ে

বি। ওদের যে থার্ডক্লাসের টীকিট?

ভ। তা হোক্ ওঠান ওদের—

একজন মধ্যবয়সী আরোহী ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—'উঠান তো বল্লেন মশাই? বসবে কোথা? জায়গা কই?—তার কথায় কান না দিয়া বিজয় অপরিচিত ভবানীর আশ্বাসে গাড়ীতে বুড়ীকে তুলিল। ভবানীও উঠিল। বুড়ী ভাবিতেছিল রেলের কর্ত্তৃপক্ষরা তাকে যদি নামাইয়া দেয় বা জরিমানা লয়? ভবানী তার মনভাব বুঝিয়া বলিল—আমার সেকেণ্ডক্লাসের টীকিট আছে তোমার ভয় নেই।"

বি। ওরা যে দুজন?

ভ। সে আটকাবে না।

আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিজয় বুড়ীর জন্য স্থান খুঁজিতে লাগিল।

আপত্তিকারী সেই আরোহীটী যাইবেন গোটা কয়েক ষ্টেশন দূরে। ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু তিনি পোঁটলা পুঁটলী, ঝুড়ি, ব্যাগ, ছাতা-লাঠী, ছিপ প্রভৃতি নিজস্ব তৈজস-সম্ভার একখানা বেঞ্চের আধখানা জুড়িয়া সাজাইয়াছেন, বাকী আধখানায় পারিপাটী রকমের একটী শয্যা রচনা করিয়া তামাকু সজ্জায় মন দিয়াছেন। এ যেন এই গাড়ীতেই জীবনের বাকীকয়টা দিনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বুড়ীকে লইয়া বিজয় সে গাড়ীতে উঠিবে শুনিয়া আগেই যাত্রী মহোদয় আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তার পর বিজয় যখন এ বেঞ্চে স্থান না পাইয়া সম্মুখের বেঞ্চের দিকে নজর দিল তখন যাত্রীপুঙ্গব পা দুটা ছড়াইয়া দিয়া বাকী স্থান পুরণ করিয়া কলিকা হইতে চোখ তুলিয়া অত্যন্ত ব্যাজার কণ্ঠে বলিলেন —এখানে জায়গা কোথা মশাই?

বি। এই যে এতটা? একটু পা গুড়িয়ে বসুন—আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো?

যাত্রী। আপনার গরজ! তুললেন কেন?

বি। যাবো কোথা বলুন? ভিড় যে—? জিনিষ গুলো বাঙ্কে রাখুন না—

যা। মন্দ কথা নয়, আপনি কেন বাঙ্কে বসুন না?

বি। মানুষ বসবার জায়গায় জিনিষ পত্র রাখবার তো নিয়ম নেই?

গতিক দেখিয়া বুড়ী বলিল "থাক বাবা আমি নীচেই বসছি, বস্ তুমি—আর কতক্ষণই বা বাবা! কাস, থুথু, হুকার জল সিক্ত গাড়ীর মেঝেতে বুড়ি বসিতে গেল। পঞ্চু উঠিয়া বলিল—"সবলে পাইবে রত্ন তর্কে বহুদূর" বুঝেছেন বিজয়বাবু? অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়"—বলিয়াই বুড়িকে ধরিয়া পঞ্চু যাত্রীপুঙ্গবের পাশে বসাইল। এবং তার তৈজসপত্রগুলা টান মারিয়া বাঙ্কে তুলিয়া দিয়া বিজয়কে বলিল—"বসুন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, দেশ বুঝে আচার—অত ভালমানষি কেন? ভবানী হাসিতেছিল, বলিল "এইতো কথা! দেখছিলাম মজা"—যাত্রীপুঙ্গবের ক্রোধে কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া সতেজে বলিল—আমার জিনিস সব যে টেনে ফেলে দিলেন?

প। দিইনি ফেলে, যথাস্থানে রেখে দিয়েছি তামাক খান, ঠাণ্ডা হন, অকারণ গরম হবেন না, এখানে পানিপাড়ে মেলে না—

যা। আ- আমি ভাড়া দিইনি?

ভ। একজনের দিয়েছেন। সমস্ত বেঞ্চটা রিজার্ভ করেন নি তো? আপনার বোচকা বুচকির চেয়ে এই বুড়ো মানুষটার আরামের প্রয়োজন বেশী—

প। মশাই মাল গাড়ীতে আপনার যাওয়া উচিত ছিল আধমণ ফ্রির বদলে দেড়মণ চালিয়ে নিয়েছেন দেখছি যে?

যা। সে কথার আপনার কি মশাই?

প। আমার নয় বলেই আর কিছু করতে পারলাম না, গার্ড সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছি—

ভ। মহাশয় যাবেন কোথা?

যাত্রী মহাশয় রাগিয়া বলিলেন "তোমার সে খোঁজে কাজ কি বাপু—তুমি কি জেলার ফৌজদার?" পাশেরই একজন বলিল—"তে"—

ভ। ও হরি! আমি ভেবেছিলাম রামেশ্বর সেতুবন্ধ! যে রকম আয়োজনের বিরাটপর্ব্ব! গাড়ী শুদ্ধ ছেলেবুড়া হাসিয়া উঠিল। যাত্রী বেচারী দেখিল তিনজন সহুরে কালেজী নব্যযুবা ২২।২৪।২৬ এমনি সব সোমত্ত বয়সের।

বিশেষ পঞ্চুর ষণ্ডা গোণ্ডা জোয়ান আড়েবহরে বিপুল দেহখানা ভাবিবার বস্তু বটে।

প। মহাশয়ের নিবাস কি এই গাড়ীতেই? কতদিন থাকা হয়েছে?

পাশের কামরা শুদ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। যাত্রী দেখিল উত্তর দিলেও গ্রহ, না দিলেও গ্রহ! অগত্যা ভাবিয়া ও মনে মনে রাগিয়া বলিল "আপনারা ভদ্রলোক তো?"

প। এতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গদোষে মশাই ধাত বদ্‌লে গেছে—

বিজয় ও ভবানী হাসিয়া চোখ টিপিল—পঞ্চু চুপ করিল। যাত্রী বেচারীর কল্‌কের আগুন ধরিল না কিন্তু মেজাজের আগুন খুব ধোঁয়াইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। কেবল বুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এই মাগী সরে বস্, যে গায়ে গন্ধ তোর। আচ্ছা গ্রহ বটে, বেশী ভাড়া দিয়েও নিস্তার নেই"—

প। দেখ্‌লেন ভবানীবাবু আমার কথার হাতে হাতে প্রমাণ? পাঁচ মিনিটের জন্যে আমরা গরীব লোকের গন্ধ সহ্য করতে পারিনি আমরা দরিদ্রের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দি—আপনি বলেন গরীবকে বুকে টেনে না দিলে তাদের জন্য—

ভ। (হাসিয়া) আমার হার বটে! ভাল কথা একদেশের লোক অথচ জানা-শুনো নাই এ ভারি লজ্জার কথা (বলিয়া ভবানী বিজয়ের দিকে তাকাইলেন)

পঞ্চু ভবানীর মনোভাব বুঝিয়া বিজয়ের সঙ্গে ভবানীকে পরিচিত করিয়া দিল। ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'বিজয়বাবু, ইনি আমাদের জমীদার রায় মহাশয়ের ভাইপো, heir apparent, crown prince—'

ভ। থাক্ থাক্ খুব হয়েছে ওবল্লে গাল দেওয়া হয় পঞ্চু!

প। আর ইনি লোকনাথ বাবুর ছেলে, ভোলাবাবুর ভাইপো, মুখুজ্যে পাড়ায় বাড়ী লোকনাথ বাবুর—হৌসের মুচ্ছুদ্দী ছিলেন তা ছাড়া নিজেও একজন মারচেণ্ট ছিলেন।—

বি। একই গ্রামে বাড়ী এই পর্য্যন্ত! জন্মে অবধি দেশে একাদিক্রমে একমাস থাকিনি, আর মোট অবস্থিতি ছ মাসেরও বেশী নয় বোধ হয়—

ভ। তা হলে আর চেনা হবে কি করে?

বি। ছুটীতে বাড়ী যাচ্ছি আমার মা ও ভগ্নিরা ওখানে আছেন, তাঁদের গ্রাম বেশ লেগেছে—

ভ। আপনার ?

বি। খুব ভাল লেগেছে ; মনে হচ্চে ঐ খানে গিয়ে বাস করি—

ভ। করলেই হয়—

বি। চাকরী বাকরী যে হয়েছে পরম বাধা—

প। ওটা মিথ্যা ওজর। বাসস্থান কর্ম্মস্থান আলাদা করা যায় না ?

বি। তা আর যায় না (ভবানীকে) আপনি কলকাতার ?

ভ। আমি পড়ি, এবার আমার ফিফ্‌থ ইয়ার—

প। বিজয় বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর খুব চটেছেন তাই বিদ্যাজননীকে ছেড়ে লক্ষ্মীকে বাণিজ্যের মধ্যে খুঁজতে বেরিয়েছেন—(বিজয়কে) হাঁসছেন যে—ঠিক্‌না ?

বি। আমি অন্যকথা ভাবছি—এক গাঁয়ের লোক আমরা আমাদেরই বাপ-খুড়োরা পরস্পরকে পাতানো খুড়ো জ্যাঠা মামা মেসো: বলে ডাকাডাকি করতেন আর আমরা তাঁদেরই ছেলেপুলে আজ পরস্পরকে বাবু 'আজ্ঞে পরাজ্ঞে'—বলে আলাপ করে ভব্যতা রক্ষে করছি ! হয় তো আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক কিছু আছেই অথচ দুজনে কিছু জানিনি !—

ভ। ভয়ানক ঠিক কথা বিজয়বাবু বাস্তবিকই বটে। আচ্ছা এখন হতে তুমি আমি আরম্ভ করা যাক—

প। সে আমাদের দুজনে, আপনার বেলায় প্রয়োজ্য নয়। কেননা আপনি হলেন 'হুজুর জমিদার প্রবলপ্রতাপ' আবার পঞ্চ শ্রীযুক্ত !—

তিনজনই খুব হাসিল। সেই ধূমপায়ী যাত্রী পুঙ্গব আড়চোখে আড়চোখে ভবানীকে দেখিল।

ভ। দেখ পঙ্কু, আমাকে লজ্জা দিওনা, বিশেষ এই সভার মাঝে আমিতো বলিছি ভাই পদ্মপত্রে জলের মত জমীদারের ভাইপো হয়েও ঐ বাড়ীতে থাকি মাত্র। আমার প্রবল প্রতাপের কিছু পরিচয় পেয়েছ ভাই ? আমাকেও তুমি ঐ বলে দুষবে ? স্কুলের ভাবটা কি ভুলে গেলে ?

প। আচ্ছা গাঁয়ের বাইরে তাই বলা যাবে। খাস মহালের চৌহদ্দীর মধ্যে নয় ভাই। তাহলে তোমার খুড়ো শ্রীযুত রতনরায় মহাশয় আমাকে কোতল করে বস্‌বেন ? বলবেন ব্যাটা টীকিধারী ভিখারী ভট্টাচাজ্জির আস্পর্দ্ধা দেখ।

এই বলিয়া পঙ্কু সহাস্যে নিজের টীকিটাকে সাদরে সগর্ব্বে টানিয়া খাড়া করিয়া দেখাইল—

ভ। আরে রামো! এত বড় টীকি কবে হলো? সে কালেতো ছিলনা? বাস্তবিকই একটা আস্ত anachronism! নয় কি বিজয় বাবু—

প। Sufferance is the badge of our tribe!

বি। কেন? এর মানে কি?

প। নয় কি? এর জন্যে আমাদের কত বিদ্রূপ ঠাট্টা সইতে হয়?

যাত্রীপুঙ্গব ভবানীকে প্রবল প্রতাপ রতনরায়ের ভাইপো এবং ভবিষ্য জমীদার জানিয়া যেন কেমন হইয়া গেল! সে সভয় নেত্রে তার দিকে তাকাইয়া রহিল! কারণ হইতেছে যাত্রী মহাশয় রতন রায়ের মাছমারী মহালের নতুন ছোট নায়েব! সারেংপুর হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া বেচারী কাজে জয়েন্ করিতে যাইতেছে। পথে এই ফ্যাসাদ! নিজের বেফাঁস উক্তি ও বেসামাল মেজাজের কথা ভাবিয়া বেচারী কোঁচকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। নানা ভবিষ্য ভয়ে তার আত্মাপুরুষ উদ্বিগ্ন হইল!

এমন সময় গাড়ী—ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। একজন মিঞা সাহেব বদনা ও বুচকী লইয়া পঙ্কুদেব গাড়ীতে উঠিল। তাহার পরনে একটা লালছিটের লুঙ্গী মাথায় জরীকাজ করা টুপি, গায়ে একটা বেগুনি রং এর কুর্ত্তি। মেহেদি রঙ্গে রঞ্জিত পাকা দাড়ী। মিঞা সাহেব স্থানাভাব দেখিয়া এ দিক ওদিক তাকাইতেছে, এমন সময় ভবানীপ্রসাদ বুড়ীকে সরিতে বলিয়া তাহার ও যাত্রীমহাশয়ের মধ্যস্থ স্থানে আগন্তককে বসিতে বলিল। যাত্রীবেচারী দ্বিরুক্তি না করিয়া বিছানা গুটাইয়া কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মিঞা সাহেব বসিলেন।

প। বুড়ীর গায়ের গন্ধ ঘুচ্‌লো বটে কিন্তু প্যাজের গন্ধ জুটলো। খোঁচা খাইয়াও যাত্রী পুঙ্গব নিরুত্তর। বন্ধুত্রয় কিছু বিস্মিত হইল। খানিক পরে নায়েব যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল সাহেব আপনার কোন ক্লাসের টীকিট্?'

সা। যে কেলাসে উঠিছি বাবু!

বন্ধুরা উত্তর শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিল। যাত্রী বেচারী দমিয়া গেল। কোনো মতে পেচক মুর্ত্তি ধরিয়া কোণ ঘেসিয়া বসিয়া সে তার হিন্দুত্ব বাঁচাইয়া অকষ্টবন্ধে বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

আধুনিক যুগের যন্ত্রপাতি কল-কারখানা আমাদের অনেক উপকার ঢের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সাথে মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস নষ্ট করিয়া দিতেছে যাহার অভাব আর কিছু দিয়াই পূরণ হইতে পারে না। কাজকর্ম্ম করিতে হইলেই মানুষ লইতেছে যন্ত্রের সহায়, অর্থাৎ মানুষ ব্যবহার করিতেছে না নিজের হাত পা চোখ কাণ অথবা ব্যবহার করিতেছে ততটুকু যতটুকু দরকার যন্ত্রটাকে চালাইবার জন্য। ফলে মানুষের অঙ্গের ইন্দ্রিয়ের আছে যে সব স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না, অনভ্যাসের অথবা বিপরীত অভ্যাসের দরুণ সে সব শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে। সিষ্টার নিবেদিতা এক জায়গায় বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়েরা খাওয়ার সময় যে কাঁটা চামচ ব্যবহার করে সে জন্য তাহাদের আঙ্গুলে দেখা যায় কেমন একটা কাঠ কাঠ আড়ষ্ট ভাব, একটা স্ফূর্ত্তির—expressionএর—অভাব; আর ভারতবর্ষের লোকেরা যে হাত লাগাইয়া খায় সেজন্য তাহাদের আঙ্গুলগুলিকে বোধ হয় কেমন সজীব, সেখানে পর্ব্বে পর্ব্বে ধরা দিয়াছে খেলিয়া উঠিয়াছে যেন একটা ভাবের সজীব প্রকাশ। কথাটি যতই কবিত্বময় হউক না, ইহার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই তাহা একেবারে বলা চলে না। আজ-কাল ইস্কুলের ছেলেদের দেখি প্রত্যেকের চাই এক-একটা "ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্স"—একটি সোজা লাইন আঁকিতে গেলে তাহাদের দরকার হয় "রূল" "সেট্‌ স্কোয়ার"; শুধু-হাতে কি রকমে যে নির্দ্দোষ সরল রেখা টানা যায়, পরিষ্কার বৃত্ত আঁকা যায়, তাহা আমাদের ছেলেরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। কুমারেরা পুতুল গড়ে, স্বর্ণকারেরা গহনা তৈয়ার করে, তাঁতীরা সুতা কাটে কাপড় বোনে কেমন সহজে আঙ্গুল খেলাইয়া চোখের নিরীখ দিয়া; সে জায়গায় আধুনিক শিল্পীর দরকার কত থার্ম্মোমিটার, ব্যারোমিটার, মাপজোপ করিবার জন্য আরও কত কি যন্ত্রপাতি। কিন্তু এই আজকালও কাঠের উপর চীনা মিস্ত্রীর হাতের কাজ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই, তার পাশে কলের কাজ আমাদের চোখে ধরে না। কত দিক দিয়া যে যন্ত্রপাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে

অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর পুস্তকাদি তৈয়ার করিবার প্রচার করিবার বিপুল সুবিধা আমাদের হইয়াছে। আগে একখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে কত সময় ও কত প্রয়াস দরকার হইত, আর এখন ব্যাপারটি কত সহজ কত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে; আগে যেখানে একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে পাওয়া যাইত, এখন সেখানে সহস্রখানি—আবার তাহাও কত রকম চেহারায়—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়। ছাপার হরফ উপকার করিয়াছে আমাদের ঢের, কিন্তু তাহা একটা জিনিষকে তাড়াইয়া দিয়াছে—যাহাতে বাহিরের স্থূল উপকার থাকুক বা না থাকুক, ছিল মানুষের অন্তরের রসায়ন। সুন্দর হস্তলিপি (caligraphy) বলিয়া যে একটি বিদ্যা বা কলা ছিল, আধুনিক কালের লেখার দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আগে এক একখানি গ্রন্থ গ্রন্থমাত্র ছিল না, তাহা ছিল এক একখানি চিত্রসংগ্রহ বা ছবির 'এল্‌বাম্‌'। আজ কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে যন্ত্রের সহায়ে, যন্ত্রের কৃপায় চলিতে হইতেছে; যন্ত্র যদি পরীক্ষা করিয়া মাপিয়া ঠিকঠাক করিয়া না দিল, তবে আর আমাদের চলা হইল না। যন্ত্র-বিহনে আমরা অসহায় জড়পিণ্ড—দারুভূতো মুরারি!

কল-কারখানার প্রাদুর্ভাবে সমাজে যে অসামঞ্জস্য যে নূতন নূতন ধরণের অন্যায় অত্যাচার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য কিরূপে নষ্ট হইতেছে, নৈতিক অবনতি কিরূপে ঘটিতেছে—সে সব কথা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা বিষয়টি দেখিতে চাই আরও একটু ভিতরের দিক হইতে, আমরা বলিব আরও গভীরতর একটা অনিষ্টের কথা। মানুষের প্রকৃতিটাই যে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রবৃত্তির—অন্তঃকরণের, বহিঃকরণের—উল্লাস যে স্তিমিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ধার যে মরিয়া যাইতেছে, জমাট আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে, প্রাণের সলিল সচ্ছল স্বচ্ছন্দ গতির পরিবর্ত্তে যে দেখা দিয়াছে জড়ের ধরিয়া বাঁধিয়া চলা—ইহাই ত মূল সমস্যা ইন্দ্রিয়ের আছে একটা সহজ শক্তি তীক্ষ্ণ অনুভূতি অটুট সন্ধান, সে কথাটা আজ আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেই প্রায় আসে না। সজাগ ইন্দ্রিয় যে কতখানি অব্যর্থভাবে চলে, জিনিষের উপর অবলীলাক্রমে কতখানি দখল আনিয়া দেয়, তাহা আমরা আর কল্পনাও করিতে পারি না। বৈদিক ঋষিরা তাই ইন্দ্রিয়দিগকে বলিতেন দেবতা; কিন্তু 'আলোকের যুগে' আমরা আর দেবতায় ভোগ দেই না, দেবতাকে মানিই না। দেবতা আজ নাই, আছে শুধু শালগ্রাম

—কর্ম্মের, ব্যবহারের অভাবে হাত পা সব পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে অথবা বিকর্ম্মের, অপব্যবহারের ফলে ভোঁতা হইয়া ঠুঁটো হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কলে জিনিষ যে তাড়াতাড়ি হয়, মোট পরিশ্রমের লাঘব হয়; আমরা সময়ের মূল্য যে বড় বেশী বুঝিয়াছি আর আমাদের প্রয়োজনও যে হয় বিস্তর দ্রব্যসম্ভার কাজেই কল ছাড়া উপায় নাই। উপায় থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি যে তাড়া-হুড়া করিয়া জিনেষের উপর জিনিষ আমরা স্তূপ করিতেছি বটে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ খুব কমই পাইতেছি। সৌন্দর্য্য জিনিষটি যে প্রাণের রং; প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রেমস্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যে জিনিষ গড়ি নাই তাহাতে সৌন্দর্য্য পাইব কিরূপে? তবুও সুন্দর জিনিষ পাই বা না পাই, তাহাও না হয় না দেখিলাম; কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হইতেছে মানুষের নিজেরই—তাহার ইন্দ্রিয় তাহার প্রাণ নির্জ্জীব অক্ষম অসহায় হইয়া পড়িতেছে। আস্তে আস্তে যন্ত্রের উপর আমরা এতখানি নির্ভর করিয়া ফেলিয়াছি যে নিজের অঙ্গের নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর সহজে আমাদের ভরসা হয় না; সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় পাছে ভুল করিয়া ফেলি, প্রতি নিমেষে কলকাঠি হাতড়াইয়া বেড়াই, তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার সাথে মিলাইয়া মিলাইয়া চলিতে চাই। কিন্তু এ প্রশ্নটা মনে উঠে না, এই কলকাঠি যন্ত্রপাতি কাহার বিভূতি কাহার ঐশ্বর্য্য, কে উহাদিগকে গোড়ায় সৃষ্টি করিল? ইন্দ্রিয় অন্ধ নয়, জড় নয়—সে কেবল ভুল করিয়া বেড়ায় না। ইন্দ্রিয় আত্মস্থ পুরুষেরই মত—সে জানে কোথায় কোন্ ভাবে কি করিতে হইবে। সাহসে ভর করিয়া যদি ইন্দ্রিয়কে মুক্ত করিয়া দিতে পারি তাহার সহজ পথে অবাধে চলিতে, তবে অবিলম্বেই প্রমাণ পাইব ইন্দ্রিয়ের আছে কি অদ্ভুত প্রতিভা। সেই মানুষই বাস্তবিক ততখানি প্রতিভাবান্ যিনি যতখানি যন্ত্রপাতির অত্যাচারের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, আপন ইন্দ্রিয়কেই সজাগ শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। তাজমহল কি যন্ত্রপাতি দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল, একটি বৌদ্ধবিহারে কতগুলি ক্রেন কতগুলি ইঞ্জিন আর কতগুলি কি লাগিয়াছিল তাহা কেহ জানে না, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্" তৈয়ারী করিতে আজকালকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যত বিপুল যত রকমারি সাজসরঞ্জাম লাগাইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও সেখানে লাগে নাই।

যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া, যন্ত্র ব্যবহার করিতে জানে বলিয়া মানুষ, মানুষ—সত্য কথা; কিন্তু যন্ত্র ততক্ষণই মঙ্গলকর যতক্ষণ সে যন্ত্রমাত্র। কিন্তু

আমরা দেখিতেছি যন্ত্রটা সব সময় আর যন্ত্র থাকে না, সে হইয়া উঠে যন্ত্রী; মানুষ যন্ত্রের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া হইয়া পড়ে যন্ত্রেরই অঙ্গ। এ অবস্থায় মানুষের সে সজাগ কর্তৃত্ব, সচেতন শক্তিপ্রয়োগ আর থাকে না; মানুষ অনুভব করে না যে সেই জিনিষকে সৃষ্টি করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সে কাজ করে বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহাকে দিয়া কাজ করান হইতেছে মাত্র—সে চলিতেছে না, চালিত হইতেছে। সে কর্ত্তা নহে, করণ মাত্র। সে হারাইয়া বসে নিজত্ববোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মবোধ। মানুষ আর যন্ত্রকে চালায় না, যন্ত্রই চালায় মানুষকে। আধুনিক যুগেও আমাদের জগদীশচন্দ্র জড়-বিজ্ঞানেরই ক্ষেত্রে এমন সফল হইয়াছেন, তার কারণ তাঁহার মধ্যে আছে যন্ত্রের নয়, একটা যন্ত্রীর ভাব—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছেন এইজন্য যে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সব এমন সহজ সাধাসাধি যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আছে একটা সজাগ নিরালম্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উহাই তাঁহার যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলির মধ্যেও এমন সরলতা সরসতা—পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছে। (প্রবাসী—শ্রাবণ)

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

তার পর একদিন এক সময়েই আমার দুই গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—একজন আমার আত্মতত্ত্বের গুরু, আর একজন আমার পরতত্ত্বের গুরু। একজন আমার পরম একত্বের আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছে আর একজন আমার পরমানন্দের জন্য ডাক দিয়েছে এবং এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আবার এক সঙ্গে এই দুই তত্ত্বের দুই গুরুকেই একই নিমেষে কাছে পেলাম। কেমন করে? বলছি—

আমি হাসির কথা শুনে সেই রাত্রেই বড় বাগানে যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। তাই খুব সকালে উঠেই, মুখ হাত ধুয়ে সাধু দর্শনের উপযুক্ত বেশে বড় বাগানে চলে গেলাম। আশা ছিল এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ সেখানে যায় নি। আমি বাগানের গেট্ ঠেলে প্রবেশ করে আগে দেখে নিলাম,

যে দিক থেকে মেয়েদের আসার সম্ভাবনা সে দিকটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা। কাউকে দেখতে পেলাম না—ভরসা হল কেউ নেই। সাহসে ভর করে এগুতে লাগলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখি বাগানের মধ্যেই সন্ন্যাসী ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পাথরের মূর্ত্তি। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে—কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বৈরাগ্য কি এত সুন্দর! ব্রহ্মচর্য্য কি এত জ্যোতিষ্মান!

এরই মধ্যে কি আমায় খুঁজছে কেউ? এই এমন আগুনের মধ্যে কি আমার মত পতঙ্গের অস্তিত্ব থাকতে পারে? যিনি এর মধ্যে আমায় খুঁজছেন তাঁর না জানি কিসের চোখ! তিনি জানি আমায় কি চোখে দেখেছিলেন!

আমি দেখতে দেখতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সন্ন্যাসী ফিরেও চাইলেন না—তখন ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে গোটাদুই ফুল রেখে প্রণাম করতেই তিনি ফিরে না চেয়েই বল্লেন, 'কোন্ হো বাচ্ছা?' কি জানি কেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ময় ভুখা হুঁ! সন্ন্যাসী দূর আকাশ হতে চমকে চোখ নামিয়ে বল্লেন, 'ক্যা বোলা?'

'একি! কে তুমি? তুমি সত্যানন্দ না? তুমি এখানে এ বেশে?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধু আমায় অমনি জড়িয়ে ধরলেন। অমনি আমার ভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে প্রেমের জোয়ার ঠেলে এল। আমি কেঁদে ফেল্লাম! তুরিয়ানন্দও কেঁদে ফেল্লেন,—তাঁর সন্ন্যাসীগিরির একটুও অবশিষ্ট রইল না।

তখন আমরা দু'জনে বাগানের এক কোণে পালিয়ে গেলাম—পাছে এই মিলন আর কেউ দেখে। যেখানে দুটো কামিনী গাছে আর জুঁই গাছে জড়াজড়ি করে ফুলে ফুল, রঙে রঙ, গন্ধে গন্ধ মিশিয়ে উষার বাতাসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তাদেরই আড়ালে বসে কত কথাই না কইতে লাগলাম। কি কথা? নাইবা তা বল্লাম, তাতে তোমাদের কিছু আসবে যাবে না। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমরা দুজনে অনেক কথা বল্লাম বটে, কিন্তু আমি যে এখানকার কে কেবল সেই কথাটাই এর কাছে ভাঙ্গলাম না। কেন জান? এইজন্যে, যে আমার তুরিয়ানন্দ যেন আর সেই তুরীয়তে নেই বলে মনে হয়েছিল। তাই ভাঙ্গতে পারলাম না। দেখলাম আমার পরম মায়াবিনী যেন তাঁর কোমল মায়ায় এই পরম সন্ন্যাসীর মনটাকেও বেশ আচ্ছন্ন করে এনেছেন। যেন এই মহাত্যাগীর বৈশাখী আকাশে আষাঢ়ের প্রথম মেঘ সঞ্চায়

হয়েছে। আমি তাই সানন্দে বল্লাম, 'দেখলে ভাই এই রসের দেশে রসের আকাশ বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তোমারও মনটা ভিজে উঠেছে।''

তুরিয়ানন্দ চমকে উঠে বল্লেন, 'তাই নাকি? তা হবে, বিষয়ের সংস্পর্শে এলে বিষয়ের ছাপ পড়বে বৈ কি। কিন্তু ভাই এইটাই কি তোমার ধারণা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মনটা একেবারে সাহারার মতই শুষ্ক? যারা সর্ব্বদা রসের সাগরে ডুবে থাকে তাদের মন বাইরে বজ্রের মত কঠোর মনে হলেও আসলে ফুলের চেয়ে নরমই!'

আমি হেসে বল্লাম, 'তাই নাকি! এ মত পরিবর্ত্তন কবে হ'তে হ'ল? যাক ভাই, আর তর্ক নয়, এখন দুটো নিজের কথা বল শুনি।

তুরিয়ানন্দ খুব জোরে হেসে উঠলেন, 'আমার আবার কথা! কোনো কথা নেই ভাই, তার চেয়ে তোমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা আরও বল— আমি তাই শুনি! তুমি এখানে কেন, তাই আবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।'

আমি কথা আরম্ভ করেছি, এমন সময় হঠাৎ তুরিয়ানন্দকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আমিও চমকে ফিরে চাইলাম। তারপর কি দেখলাম! সেই প্রভাতের সমস্ত জমাট শোভা আমাদের পাশে ফুলের থালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি দেখলাম। মানুষ এত সুন্দর! ধন্য আমি যে এই রূপরাশি দেখতে পেলাম! ধন্য আলো! ধন্য বায়ু! ধন্য আকাশ! আর ধন্য সেই ফুলের বনের মধুর গন্ধ! সবাই তাকে ঘিরে ধন্য হল!

মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই ফুলের থালাটী সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে, নতজানু হয়ে বস্‌ল। তার পর ধীরে ধীরে একটা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলে। তার সন্ন্যাসী ছাড়া জগতে আর কেউ যে থাকতে পারে তাই যেন তার মনে হয়নি। সন্ন্যাসী কোনো কথা কইলেন না। মূর্ত্তি শেষে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'আপনি এখানে, আমি অনেকক্ষণ আপনার আসনের কাছে অপেক্ষা করছিলাম।'

সমস্ত প্রভাতের আকাশটা যেন গানের সুরের মত বেজে উঠ্‌ল। আমি সেই স্বররাশি দুই কান দিয়ে পান করলাম, উঠে সম্মান দেখাবার সময়ই পেলাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম, যেন সমস্ত জগতের যত রূপ, যত মাধুর্য্য ছিল, যত মন্ত্র-তন্ত্র, জপ-তপ ছিল, সমস্তই ভক্তি হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নেমে এসেছে। যেন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত পূজাই আবার দিকে দিকে, লোকে লোকে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বল্লেন, 'এই এঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ইনি আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

উর্ম্মিলা দেবী এইবার চমকে উঠে আমার দিকে চাহিলেন! তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, 'স্বামীজি, এখন আমি তবে যাই; এঁরা যে এখন আসবেন তা জানতাম না! আমি যাই।''

তুরিয়ানন্দ ব্যস্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, 'না না—তুমি যাবে কেন? উনি উর্ম্মিলা দেবী, ওঁকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। আর তুমিও এঁকে দেখে লজ্জিত হয়ো না—ইনি আমারই স্বজন!'

উর্ম্মিলাদেবী এগিয়ে এসে আমাকেও প্রণাম করলেন, একখানি শরৎ-প্রভাতের পথভোলা মেঘ হঠাৎ ভুলে বুঝি আমার কাছে নুয়ে এল, ছুঁয়ে গেল—বিন্দু বিন্দু বর্ষেও বুঝি গেল! আমি সে প্রণামের মধ্যে ঢুকে কোথায় কোন দ্যুলোকের আলোকের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

উর্ম্মিলাদেবী নত বদনে বল্লেন, 'আমি ওঁকে চিনি, উনি আমাদের প্রিয়বাবু ম্যানেজার। আসুন আপনারা, আসন পেতে রেখেছি, এখনি এঁর মা আসবেন, হাসি আসবে, আমার মাও আসবেন।'

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, বল্লাম, 'এখন আমি যাই আর এক সময় আসব। তখন সব কথা হবে।'

সন্ন্যাসী তবু আমার হাত ছাড়লেন না।

উর্ম্মিলাদেবী তখন রাণীর মত গৌরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'সাধুর ইচ্ছার কাছে সংসারের কর্ত্তব্য অনেক ছোটো, এখন আপনার যাওয়া হবে না।'

আঃ বাঁচালে! দেবি, সাধুর ইচ্ছাই হোক, আর যাঁরই ইচ্ছা হোক, তোমার ইচ্ছাই আমার সব। আমার সমস্ত অস্তিত্বই যে এখন তোমার। এই যে এঁর ইচ্ছাকে অবলম্বন করে আমাকে তুমি চাইলে, এই আমার পরম লাভ। তুমি এতদিন পরে তোমার ইচ্ছা আমায় নিজমুখে জানিয়েছ—আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম! তোমার এই ইচ্ছাটুকুর জন্যই যে আমি এই এতকাল ধরে বেঁচে আছি।

সন্ন্যাসী আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনেই বসাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি মাটীতে বসলাম। তুরিয়ানন্দ বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ভাই, এমনি করেই কি আজ হতে তোমায় আমায় পার্থক্য রেখে চলতে হবে?'

আমি বল্লাম, 'যার যেখানে স্থান তার পক্ষে সেই স্থানই শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানের অপমান করলে তার নিজেরই অপমান হবে; আমার মাটীতেই স্থান, আমি এই মাটীর অপমান করতে পারব না।'

সন্ন্যাসী নিজের আসনে গিয়া বসিলেন। উর্ম্মিলা দেবী তাঁর ফুলের সাজি হতে ফুলগুলি তুলে আসনের সামনে সাজিয়ে রেখে দিয়ে, আবার একবার প্রণাম করলেন। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বুঝলাম আমার উপর তাঁর সঙ্কোচ ভাব দূর হয় নি। তাই এই অবসরে মৃদুস্বরে বল্লাম,—'ভাই, আমি এখন এঁদের চাকর! এঁদের সামনে বেশী সম্মান দেখালে আমাকেও বিপদে ফেলবে, এঁদেরও মুস্কিলে ফেলবে। আর একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমার সম্বন্ধে কোনো কথা এঁদের বল না। কেন ঐ কথা বলছি পরে বলব, এখন নয়। তুমি কেবল এইটুকু অনুরোধ রেখো যে, এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর কথা বলে আজন্ম সাধুসেবিকা এঁদের মনে অকারণে আমার ওপর একটা ঘৃণা জন্মিয়ে দিও না। এঁদের চাকরী করি, তবু চাকরের যা সম্মান তা হ'তে এঁরা আমায় বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু আমার পূর্ব্বের কথা শুনলে এঁরা হয় ত ঘৃণা করবেন। সে ঘৃণা সহ্য করা কঠিন হবে।

তুরিয়ানন্দ বল্লেন, 'যোগভ্রষ্ট! কে বল্লে তুমি যোগভ্রষ্ট! তুমি আপন যোগে ত ঠিকই আছ। তোমার মধ্যে সেই প্রথম দর্শনের সময়ও যে নারীত্বের আভাষ পেয়েছিলাম, তাই ত' এখন পূর্ণত্বের দিকে চলেছে দেখছি। আমার দিকটাই যে একমাত্র যোগের দিক তা যে আর মানতে পারছি না। মনে হচ্ছে তোমার দিকটাও ত হ'তে পারে।'

আমি কথা শেষ করবার জন্য বল্লাম, 'তা যা হয় হোক, এখন তুমি কিছু বলতে পাবে না। আমি চল্লাম। দেখো তুমি এখন আমার বিষয় সম্পূর্ণ নীরব থেকো। আমার এই অনুরোধটী রেখো ভাই, দোহাই।'

আমি চলে এলাম—কিন্তু কেমন যেন হয়ে এলাম। পাগল হয়ে? হবে।

(ক্রমশঃ)

[স্বরাজ—কাহার রাজ ? বা, কোন্ রাজ ?]

[শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল]

(১)

যিনি যাহাই বলুন না কেন, দেশের লোকে যে কি চান, ইহা এখনও বলা যায় না। কংগ্রেস স্বরাজের সুর তুলিয়াছেন। তাই স্বরাজ কথাটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা অতি অল্প লোকেই এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা নাকি, অনেক স্থলেই স্বরাজ কি, এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস-কমিটির সহকারী-সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি যে, নানা স্থান হইতে, কন্‌গ্রেসের প্রচারকগণ, এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর চাহিয়াছেন।

যদি সত্য সত্যই দেশের লোকে স্বরাজ কি বস্তু ইহা না বুঝেন, তাহা হইলে, এই স্বরাজের নামে তাঁরা এমনভাবে মাতিয়া উঠিতেছেন কেন ? ইহার উত্তর সহজ। নানা কারণে, দেশের লোক একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পেটে অন্ন নাই। গায়ে বস্ত্র নাই। রোগে ঔষধ নাই। পথে ঘাটে ইজ্জত নাই। মানুষ যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে জীবন-ধারণ সম্ভব ও সার্থক হয়, তার অভাব পড়িয়া গিয়াছে। এ অভাব কখন্, কিসে দূর হইবে, তারও কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে, বক্তাগণ, আর সংবাদপত্রে লেখকেরা, সকলেই প্রায় একবাক্যে কহিতেছেন যে, আমাদের স্বরাজ নাই বলিয়া এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। স্বরাজ পাইলেই, এ দুঃখ দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং, স্বরাজ এমন একটা কিছু, যাহা লাভ হইলে পরে, ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র, বর্ষার আচ্ছাদন, আর সংসার-পথে ইজ্জত রাখিবার উপায় হইবে। লোকে এইমাত্র বুঝিতেছে। আর, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহাই যথেষ্ট। স্বরাজের নামে, তাহাদের অন্তরে একটা অভিনব আশার সঞ্চার হইতেছে। এই জন্যই তাঁহারা, স্বরাজ যে কি বস্তু, ইহা না বুঝিয়া এবং না জানিয়াও, এই স্বরাজের আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

স্বরাজের নামে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছেন, ইহা একদিকে শুভলক্ষণ বটে। কিন্তু এরূপ উৎসাহ, এরূপভাবে, কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে ধরিয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত বস্তু আশ্রয় দিয়া, এ উৎসাহ ও আশাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ না করিতে পারিলে, পরিণাম বিষময় হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

হতাশ রোগীর যে অবস্থা, দেশের সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিলে, রোগমুক্তির যখন আর আশা বুদ্ধি বিবেচনায় মানুষ খুঁজিয়া পায় না, তখন তন্ত্র-মন্ত্র টোট্‌কা-ফুট্‌কা, যে-যা-বলে, তাই আঁকড়াইয়া ধরে। আমাদের লোকেরা তাহাই করিতেছেন।

উকিল মোক্তারেরা যদি নিজেদের ব্যবসায় ছাড়েন, তবেই স্বরাজ পাইব, বা স্বরাজের পথে অগ্রসর হইব। বস্‌। অমনি একদল স্বরাজ সেবক উকিল মোক্তারদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। অনেক উকিল মোক্তারও দেখিলেন যে, দেশের লোকে যখন অমন করিয়া চাহিতেছেন, তখন, কিছু দিনের জন্য, ব্যবসা'টা না হয় নাই বা করা গেল। তাঁরাও ব্যবসা স্থগিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজের দেওয়া উপাধি ছাড়িলে স্বরাজ লাভের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং দেশের লোকে উপাধিধারীদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। উপাধি-ধারীদেরও কেহ কেহ উপাধি ছাড়িলেন। যাঁরা ছাড়িলেন না বা ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁরা, কোথাও বা একরূপ সমাজচ্যুত, আর দেশের সর্ব্বত্রই লোক-চক্ষে হেয় হইতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ সরকারের সংস্পৃষ্ট স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়ুয়া বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভ হইতে পারিবে। সুতরাং এ চেষ্টাও চারিদিকে হইতে লাগিল। বহু পড়ুয়া স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিল। অনেকে আসিল, ভাল পড়া হইবে এই লোভে পড়িয়া; কেহ কেহ আসিল, পড়া চুলোয় যাক্‌, দেশ যাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এমন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প লইয়া।

চরকা কাটিতে শিখিলে ও ঘরে ঘরে চরকা চালাইতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। একথা শুনিয়া, চারিদিকে 'চরকা' 'চরকা' ডাক পড়িল। ছেলেরা কলম ছাড়িয়া চরকা ধরিল। যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া, তাস পিটিয়া বা দাবা ঠেলিয়া দিন কাটাইতেছিল, অথবা যাহারা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইতেছিল, তারা জীবনের একটা লক্ষ্য ও কর্ম্ম পাইল ভাবিয়া চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

তারপর আদেশ হইল—এককোটী লোককে কন্‌গ্রেসের সভ্য করিতে পারিলে, আর এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। অমনি লোকে তার চেষ্টায় লাগিয়া গেল।

কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না—এ সকলের একটি বা পাঁচটি বা সকল-গুলিতে মিলিয়া যাহা লাভ হইতে পারে, তাহাকে স্বরাজ বলিব কেন?

আর এ সামান্য প্রশ্নটা লোকের মনে উঠিল না এইজন্য, যে, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা তলাইয়া বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। সাধ্য নির্ণয় হইলে পরে, লোকে স্বভাবতঃই সাধনার সফলতা বা নিস্ফলতার সম্ভাবনা বিচার করিয়া থাকে। বিচার করিবার অধিকার, তখন তাহাদের জন্মে। যেখানে সাধ্য নির্ণয় হয় নাই,' সেখানে লোকে সাধনার বিচার করিবে কি করিয়া, তাহা জানে না ও বুঝিতে পারে না। এখানে চোখ বুজিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে যাঁরা একটা নিরবচ্ছিন্ন, আরাম, আনন্দ বা শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া হায়রাণ হয়েন, তাঁদের জীবনে এরূপ প্রায়ই ঘটে যে, তাঁরা, প্রাণের জ্বালায়, যে-যা-বলে তাহাই করিতে যান্। ইঁহাদের প্রাণের জ্বালাটা, অনুভবের বস্তু বলিয়া, সত্য। এই জ্বালা নিবারণের ইচ্ছাটা, স্বাভাবিক বলিয়া, অত্যন্ত আন্তরিক সন্দেহ নাই। কিন্তু তারপরে যাহা কিছু সকলই অবধৌতিক। সকলই হাতুড়িয়া; অন্ধকারে ঢিলছুড়া। দশটার মধ্যে কখনও বা আকস্মিক ঘটনা যোগে, একটা লাগিয়া যায়; অধিকাংশ সময়, কোনটাই বা লাগে না। তবু যে ইঁহারা যা-শুনেন তাই ধরিতে যান, ইহার অর্থ এই যে, ইঁহাদের প্রাণের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা যন্ত্রণার মাঝখানে কোন্ উপায়টাতে আরামের সম্ভাবনা কতটা, এ সকল বিচারের অবসর ও শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

আমাদের বর্ত্তমান "স্বদেশী" বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই ঘটিতেছে। লোকের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা যন্ত্রণার মাঝখানে, তাহাদের বিচার যুক্ত করিবার অবস্থাও নয়, অবসরও নাই, প্রবৃত্তিরও অভাব সুতরাং, যাহা বলা যায়, তাঁহারা তাই করিতে প্রস্তুত। ত্রিতাপ-জ্বালায় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন; দেশের জনসাধারণে সেইরূপ নানা দুঃখকষ্টে অধীর ও হতাশ হইয়া, অত্যন্ত শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিয়াছেন।

এ অবস্থাটা বড় ভাল। কিন্তু দেশের লোকে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অবিচারে 'নেতৃবর্গের" নির্দ্দেশ নিষ্ঠা-সহকারে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে এই সকল নেতার দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। যে, বিচার-বিবেচনা না করিয়া, কোনও দিন আমার উপদেশ বা অনুরোধ গ্রহণ করিবে না, জানি, তাহাকে, মনে যখন যে খেয়াল আসে, তাহাই বলিতে পারি।

আমি যেটা নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া কষিয়া দিলাম না বা দিতে পারিলাম না, জানি যে, সে তাহা তাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া খুব করিয়া কষিয়া লইবে। যাহা সত্য, যাহা সম্ভব, যাহা সঙ্গত, তাহাই গ্রহণ করিবে, যাহা মিথ্যা বা সত্যাভাস মাত্র, যাহা অসম্ভব বা অসঙ্গত, তাহা সে আপনিই ছাঁকিয়া, ছাটিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যে আমার কথা বেদ-বাক্যের মতন মানিয়া চলিবে জানি বা বুঝি, তাহাকে এরূপ খাম-খেয়ালি-ভাবে উপদেশ দেওয়া যায় কি? সে যখন আমার কথা কষিয়া দেখিবে না, তখন তাহাকে সে কথা কহিবার আগে, আমাকে ভাল করিয়া কষিয়া দেখিতে হয়। না করিলে—"অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধ যেমন অন্ধকে চালায়, আমিও তাহাকে সেই রূপই চালাইব না কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্যই একবার একজন ধর্ম্ম-প্রচারককে কহিয়া ছিলেন—"আমার ভুলভ্রান্তি যাই হউক না কেন—ঈশ্বরের নিকটে সে জন্য আমি তোমা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইব। আমি নিজেই কুপথে চলিয়াছি। তোমরা আরও দশজনকে ভুল পথে চালাইতেছ। তাদের দণ্ডের ভাগীও তোমাদের হইতে হইবে।"

২

নেতারা যাহাই উপদেশ করিতেছেন, সরলপ্রাণ জনসাধারণ বিনা-বিচারে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া, নেতৃত্বের দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের বিপদও ঘনাইয়া আসিতেছে। যদি জনসাধারণে ক্রমে ইহা বুঝেন ও দেখেন যে, তাঁহারা যার জন্য, অমন ভাবে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া ছুটিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গেল না এবং যখন তাঁহারা এটি বুঝিবেন যে, অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ নেতৃগণ তাঁহাদের বিপথে বা কুপথে চালাইয়া আনিয়াছেন, তখন, কেবল নেতাদেরই নেতৃত্ব যাইবে, তাহা নহে, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এতটা সময়, শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার উপরে পর্য্যন্ত লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে। আবার যে সহজে দেশহিত-কল্পে এমনভাবে লোকের সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না।

সকল সাধনাই যে সিদ্ধিলাভ করে তাহা নহে। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনাই যে আমরা যতটা আশু-সিদ্ধির আশা করিতেছি, ততটা সত্বরে সিদ্ধিলাভ

করিবে, ইহা না-ও বা হইতে পারে। সিদ্ধিলাভ যে হবে না, এমন ভাবি না হবে নিশ্চয়, ইহাই বিশ্বাস করি। এবিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় নিষ্ঠা সম্ভবে না। তবুও, সিদ্ধি ত আর আমাদের হাতে নয়। সিদ্ধিদাতা, বিধাতা। তাঁর সকল কামনা ও সকল কর্ম্মই বিশ্বতোমুখী, বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিশ্ব-বিধানে যখন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ আবশ্যক হয়, তিনি তখনই তাহাকে সিদ্ধিদান করেন। সুতরাং আমি যতটা শীঘ্র, বা যে আকারে আমার ইষ্টলাভ হউক, চাহিতেছি, বা হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, ততটা সত্বর বা সেই আকারে যে তাহা লাভ হইবেই, এমন কথা একেবারে ঠিক করিয়া বলা যায় কি? সুতরাং, স্বরাজ-সাধনার সিদ্ধিও বিধাতার হাতে; আমাদের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছা যখন হইবে, তখনই সিদ্ধি পাইব। এখনই যে পাইব, অমন ত কথা নাই।

কিন্তু সিদ্ধিলাভ হউক বা না হউক, সাধকের শ্রদ্ধা যদি "কোমল" শ্রদ্ধা না হয়—অর্থাৎ, এ শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র (অর্থাৎ, অতীতের অভিজ্ঞতা) এবং যুক্তি (অর্থাৎ, মানব-চিন্তার নিত্য-সূত্র) সঙ্গত হয়, শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা যদি এই শ্রদ্ধা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সাধ্যবস্তু সাধকের অনুভবেতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে, সিদ্ধিলাভ যতই দূরে যাউক না কেন, সাধন কালে যতই বাধা বিপত্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে শ্রদ্ধাও বিচলিত হয় না, সাধনাও শিথিল হয় না।

কিন্তু সাধক যেখানে যুক্তি-বিচার না করিয়া, কিম্বা যুক্তি-বিচারের অবকাশ না পাইয়া, অথবা যুক্তি-বিচার করিয়া পথ চলিতে গেলে যে কাল-বিলম্ব অনিবার্য্য, কিম্বা শ্রম-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, গুরুর অনধিগত-অর্থ উপদেশের অনুসরণ করেন, সেখানে, সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ না হইলে, নিরাশ্বাসের নাস্তিক্য দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন সাধ্য সম্বন্ধে হতাশ্বাস এবং গুরু সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিয়া, তাঁহার সকল সাধনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনার গুরুগণ এই মোটা কথাটা কি দেখেন না, বা, ভাবিয়া বুঝিবার অবসর পান না?

(৩)

লোকে একটা কিছু চাহিতেছে। লোকের একটা গভীর, দুর্ব্বিসহ অভাব-বোধ হইতেছে। এই অভাবটা কেবল অন্নবস্ত্রের নয়। অন্নবস্ত্রের অনটন ত

আছে-ই ; এ অনটন একেবারে নূতনও নয়। এ অনটন যাদের এখনও শূন্যের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায় নাই, তারাও একটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এই একটা কিছু যে কি, সকলের আগে নিজে ইহা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে হইবে ; পরে জনসাধারণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া, সাধ্য-বস্তুকে তাহাদের চক্ষের উপরে উজ্জ্বলরূপে ধরিতে হইবে। যতদিন না ইহা হইতেছে, ততদিন এই স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধি-পথে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না।

পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের উপরে অবিচার, এই দুইটি বিষয়ের উপরে আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। মুসলমানেরা খিলাফৎ-সমস্যা সকলে বুঝুন্ আর নাই বুঝুন, তাঁদের ধর্ম্মের উপরে একটা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে, ইহা বুঝেন। এই জন্য অনেক মুসলমান খিলাফতের নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের প্রেরণা ধর্ম্মের ; স্বাদেশিকতার নহে। একথাটা অস্বীকার করা কঠিন। সুতরাং, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যতই সহানুভূতি করি না কেন, এই প্রেরণার দ্বারা যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, এমন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ লোকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই এখনও এই নূতন জাতিটা যে কি, ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, ইহা বুঝেন না।। সুতরাং, তাঁহারা, স্বরাজ-টাকে যে কি, ইহাও ভাল করিয়া এখনও ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

আর এই স্বাদেশিকতার প্রকৃতি এখনও সকলে বুঝেন নাই বলিয়া, স্বরাজ সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। এমন হিন্দু স্বদেশ-ভক্তের কথা জানি, যাঁহারা সত্যই, ভারতের নূতন যুগে, পুনরায় একটা হিন্দু-রাজ্যের আশায় বসিয়া আছেন। কবে আবার হিন্দু, সসাগরা ভারতের একছত্র অধীশ্বর হইবে, ইঁহারা সেই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্বরাজ বলিতে ইঁহারা হিন্দুরাজ বুঝেন। এই "স্বরাজ"-রাষ্ট্রপতি হইবেন, হিন্দু। এই স্বরাজ্যে, প্রজা হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করিবে। হিন্দু-রাষ্ট্রে, হিন্দুসম্রাটের অধীনে, পুনরায় ভারতে "সনাতন" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, হইবে ; আবার হিন্দু-আচার প্রবর্ত্তিত হইবে ; হিন্দু সাধনার প্রকট-মূর্ত্তি স্বরূপে, ভারতের সমাজ, বিশ্ব-সমাজে আপনার উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া বসিবে।

সেইরূপ, এমন মুসলমানও আছেন, যাঁহারা মোস্লেম-সমাজের লুপ্ত বৈভব, হৃত-গৌরব, নষ্ট-প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভারতে পুনরায় মুসল-

মানের রাষ্ট্রীয়-আধিপত্য দেখিতে চাহেন। ইঁহারা স্বরাজ বলিতে মুসলমান-রাজ বুঝেন। রুম্ হইতে চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত এখনও মোস্‌লেম-সমাজ বিস্তারিত রহিয়াছে। কিন্তু, এ সকল মোসলেম-রাজ্য দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষে যদি আবার একটা মুসলমান প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে, সমগ্র মোস্‌লেম-সমাজকে সখ্য-বদ্ধ করিয়া, একটা বিরাট সর্ব্ব-মোস্‌লেম-সংঙ্ঘ বা Pan-Islamic federation গড়িয়া তোলা একেবারে অসাধ্য হইবে না। কিছু দিন হইতে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত মুসলমানদিগের অন্তরে এই ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, ইঁহারা যে ভারতে একটা মোস্‌লেম-রাজ প্রতিষ্ঠা হউক, এরূপ ইচ্ছা করিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। এ সকল মুসলমানই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মুসলমান আগে ভারতবাসী পরে—Muslims first, Indians next। অর্থাৎ, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহার উপরে। এ সকল কথা আমার কল্পিত নহে। স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ হইতেই, ভারতের সর্ব্বত্র এমন বহুতর লোকের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় এবং আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, যাঁহারা এদেশে আবার একটা হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ইহা তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শুনিয়াছি এবং এই কথা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্কও করিয়াছি। আর মুসলমান নেতৃবর্গের কথায় এবং আচরণে, কখনও বা তাঁহারা প্যান-ইসলামের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের সকলের না হউক, অন্ততঃ অনেকেরই ভারতে স্বরাজ্যের লক্ষ্য, ইংরাজ-রাজ্যের স্থলে, আবার একটা মোস্‌লেম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখা।

তারপর, হিন্দু-মুসলমানের কথা ছাড়িয়া, দেশে যে সকল দেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়াও এ কথা বলা যায় না যে, "হিন্দুমুসলমান মিলিয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে" তাহার প্রকৃতি যাহা, সেই প্রকৃতির অনুযায়ী যেরূপ রাজ, সেই-রূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই, দেশের এই বর্ত্তমান অশান্তি জাগিয়াছে। এ সকল দেশীয় রাজ্যেও, ইংরাজই প্রকৃত রাজা, দেশীয় রাজারা স্বল্পবিস্তর সাক্ষীগোপাল হইয়া আছেন। স্বরাজ বলিতে ইঁহারা যদি কিছু বস্তু বুঝেন, তাহা হইলে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-তন্ত্র শাসন-শক্তিই বুঝিয়া থাকেন।

সর্ব্বশেষে, ইংরাজ যাঁহাদের হাত হইতে মোগলের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া,

বর্ত্তমান ব্রিটীশ রাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পশ্চিমে শিখ ও দক্ষিণে মাহারাষ্ট্রী—ইহারাও যে একেবারে সে পূর্ব্ব আশা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাই বা বলি কি করিয়া ? সুযোগ পাইলে যে, ইঁহারা নিজেদের ভাঙ্গা-স্বপ্ন আবার গড়িয়া উঠুক, ইহা চাহিবেন না, মানব-প্রকৃতির বিচারে এরূপ বলা যায় না।

আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই ধাঁধাঁ লাগে, আমরা যে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছি, সে স্বরাজ কার "রাজ" ?

সাধ্য নির্ণয় না হইলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে কি ?

নব্যভারত

রূপান্তর

শুধু ভক্ত ত যথেষ্টই আছে, চাই সত্যের মানুষ, যোগের মানুষ, নূতন যুগের মানুষ, যাহারা আপনার ভিতরেই দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছে, উৎসর্গ যাহাদের কোনও প্রতীক বা প্রতিমূর্ত্তির চরণে নয়—একেবারে অনন্তের কাছে, সত্তার অনিবার্য্য আবেগেই যাহাদের জীবনে সাধনা দিনে দিনে স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে—এরূপ মানুষের ভিতর দিয়াই ভাগবত মহিমা জগতে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয়—উহাদেরই উৎসর্গ সত্য এবং ভাগবত—এরূপ নিখুঁত উৎসর্গের মানুষ লইয়াই জগতে বিরাট ও অলৌকিক সৃষ্টি সম্ভব হইয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে, যোগ-জীবনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে সকলকেই—এ পরিবর্ত্তন একদিনের কার্য্যও নয়, একদিনে হইবারও নয়—গোল এই পরিবর্ত্তনের পন্থা ও প্রক্রিয়াগুলি লইয়াই—অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তনই কত কঠোর ও দুরায়ত্ত, তিল তিল করিয়া মানুষ-ভাবগুলির পরিশোধন ও রূপান্তর পূর্ব্বক দিব্য ভাবগুলির স্ফুরণ করিয়া তুলিতে হয়, যোগের দর্শন ও কথা বড় মধুর, সাধনা কঠিন, বুদ্ধি (intellect), ভাব (emotion), ইচ্ছা (will)—তিনটী ত উৎসর্গ করিতেই হইবে, কিন্তু ঐখানেই পরিসমাপ্তি নহে, বুদ্ধি, ভাব, ইচ্ছার আমূল উৎসর্গ-শেষে প্রাণ—(vital being)এর উৎসর্গ চাই—উৎসর্গ পূর্ণ হইলেই বিজ্ঞানময় কোষের খেলা খুলিতে আরম্ভ হইবে। এই বিজ্ঞান প্রকাশ না হইলে (vital being) উৎসর্গ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, অন্তঃকরণকে যোগময় করিবার সাধনা বরং সহজ, অনেকেই অনায়াসে লইতে পারে, কিন্তু এই প্রাণের গ্রন্থীপর্ব্বে আসিয়াই বিষম ঠেকাঠেকি বাধিয়া যায়—কর্ম্মক্ষেত্রে অতি ঘনিষ্ঠহৃদয় সাধকগণের ভিতরেও অশান্তি ও গণ্ডগোল

ফুটিয়া উঠে—এ অবস্থায়, একজনের সাধন অবস্থার সহিত আর একজনের সাধনাবস্থার প্রায়ই মিল দেখা যায় না—ভিতরে একটা নিগূঢ় ফল্গুসূত্র অনুভবে থাকিলেও, সে অনুভূতি খুবই সূক্ষ্ম, কারণেরই আভাস-তরঙ্গ, বাহিরে তাহার রেখাটিকে টানিতে গেলেই পদে পদে কুণ্ঠা ও সংঘর্ষই সৃষ্টি হয়, প্রতীকার বিজ্ঞানের সম্যক ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফুরণ—তাহার জন্যই চাই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পে প্রাণের আত্মাহুতি।

অগ্নিতাপেই প্রাণের শুদ্ধি বিধান হইবে। এই প্রাণক্ষেত্র (vital plane) এ শুদ্ধি আসিলে বাকীটুকুর জন্য বিশেষ সংগ্রাম করিতে হয় না। আমাদের সাধারণ প্রাণক্ষেত্র বড় ক্ষুদ্র, বড় সঙ্কীর্ণ, সামান্য ভোগে সেই জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠে, ছোট ছোট ব্যাপারে কামড়াকামড়ি লাগাইয়া দেয়, এই প্রাণশক্তি পুষ্ট হইলেও আবার বিপদ আছে, যেমন ইউরোপের জীবনে ঘটিয়াছে। আত্মস্বার্থ আত্মভোগের জন্য জগতের বুকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে, vital ভোগের হাত এড়াইয়া উঠিতেই হইবে, ভোগ সমস্যার চরম নিষ্পত্তির উপায়ই হইতেছে প্রাণকে উপরে তুলিয়া দিব্য প্রাণে (divine vitality) প্রতিষ্ঠিত হওয়া। "ভোগঃ যোগায়তে" মন্ত্র শুনিবামাত্র যদি vital ভোগের কথাই বুঝিয়া লই, বিষম ভুলেই পড়িতে হইবে—ত্যাগ ভোগ লইয়া অনেক কিছু গোলমাল হইয়া গিয়াছে, উপরের ভোগ, উহা বিরাট অসীম, সমস্ত হীনবৃত্তি এখানে একেবারে তলাইয়া যায়, এইখানে আসিয়া শান্তি না পাইলে পূর্ণ সমতা সম্ভব হইবে না, অগাধ সমতার উপরেই আসল দিব্য ভোগের প্রতিষ্ঠা। এই উপরের ভোগ না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের ভোগে প্রাণের শুদ্ধি আসে না, আসিবে একটা অবসাদ (Exha ustion)—অবসাদশৈথিল্য শুদ্ধিও নয়, সংযমও নয়। এই কথায় আবার নিগ্রহ বৈরাগ্যের কথা বুঝিলেও ঘোরতর ভুলেই পড়িতে হইবে—ভূয়ঃ এব তে তমঃ—সত্য সমাধান ত্যাগেও নাই, ভোগেও নাই ; যোগে, উৎসর্গেই প্রাণশক্তি নির্ম্মল ও উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিবে। ভোগ্য বিষয় ও ভোগবৃত্তি সবটুকু কালীশক্তিকে অর্পণ (offer) করিয়া করিয়া গেলে, ক্ষিপ্রবেগে কালী সমস্ত অশুদ্ধতাগুলি গ্রাস করিয়া ফেলেন, নীচের মাধ্যাকর্ষণ হইতে সাধকের প্রাণকে উদ্ধার করিয়া উপরের এক দিব্য আকর্ষণের মধ্যে তুলিয়া ধরেন—ভগবান যখন প্রাণের শাসনরশ্মি স্বহস্তে ধরেন, তখনই আসে দিব্য আত্মসংযম, প্রাণের অশুদ্ধ ভোগাধি-কারকে উপরের আনন্দে ডুবাইয়াই তিনি সাধকের জীবনে রূপান্তর transformation বিধান করেন।

কাম, কাঞ্চন কিছুই নিছক মিথ্যাবস্তু নয়। ভিতরে একটা নিগূঢ় সত্যই উহারা লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই গূঢ় সত্যটিকেই উদ্ধার করিয়া ধরিতে হইবে। প্রাণ নিজের ধর্ম্মে যখন এই তৃপ্তি খুঁজিতে যায় তখনই তাহা ভুল হয়, প্রাণের মূল স্বভাবটিকেই ত আমূল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষ এই রহস্যটুকু জানে না। লালসার রিরংসার তাড়নাকেই সার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া মোহোন্মত্ত হইয়া যায়, মন বুদ্ধির নির্ণীত সামাজিক বিধি নিষেধের নিগড়ে বাঁধিয়াও যে সংযত ভোগতর্পণ, তাহাতেও আসল ও চরম নিষ্পত্তি কিছুই হয় না—মানুষের সমাজনীতি বিবাহবন্ধন, যৌন নিয়ম—এ সব শাসনবৃত্তির একটা প্রয়োজন নাই তাহা নহে; কথা এই, ইহাতে মানুষের প্রাণের আসল মুক্তি ত নাই—পশু যে সেই পশুই রহিয়া গেল কেবল তাহাকে আষ্টে পৃষ্টে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিলেই সব হইল না—বরং তাহাতে কিছুই হইল না বলিতে হইবে। কঠোর ত্যাগপন্থী নীতিবাদী প্রাণকে নিষ্পীড়ন, নির্য্যাতন, হত্যা করিতে উৎসুক—সমাজ তান্ত্রিক ততখানি অসমসাহসিক নয় বলিয়া একটা আপোষেরই (compromise) পক্ষপাতী—কিন্তু আপোষ বা সন্ধি সমাজ জীবনে আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—শাসনে সংযমে মানুষের আসল স্বভাব পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই হয় নাই, হিংস্র বন্য পশু একটু মার্জ্জিত ও সভ্যভব্য (refined, cultured) গৃহ পশুটি সাজিয়াছে মাত্র—প্রাণে মূল ধর্ম্ম সমানই আছে, মন বুদ্ধির সরমে প্রাণ একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে—এইটুকু মাত্র।

আর এক পথ আবিষ্কৃত করিয়াছিল, ভারতের তান্ত্রিক সাধক। তান্ত্রিক গোড়া হইতে সন্ধি করিতে গররাজি হইয়াছে—প্রাণ, তুমি ভোগ চাও, আচ্ছা ভোগই গ্রহণ কর,—যত ইচ্ছা, যত সাধ, প্রাণ পুরিয়া সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার অধিকার দিলাম—ভোগই যোগায়তে—ভয় লজ্জা কুণ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়া পূজার উপচার সংগ্রহে তান্ত্রিক ভোগরাণীর তর্পণে অগ্রসর হইয়াছিলেন—উৎকৃষ্ট ভোজ্য পানীয়, উৎকৃষ্ট আরাম বিলাস, উৎকৃষ্ট রমণী—বীরতান্ত্রিক কোথাও বিমুখ হয় নাই—তন্ত্রের শক্তিসাধক সিদ্ধকাম হইয়াছিল কি না, কে জানে,—ভিতরের আসল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃত ভোগের পূর্ণতর্পণে ভাগবত ভোগ-ধর্ম্মটিকেই—মুক্ত ভোগ, দিব্য ভুক্তিকেই উদ্ধার করিয়া তোলা - মন বুদ্ধির সরম কাটাইয়া প্রাণের উদাত্ত ভোগের মধ্যে একটা মস্ত ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাণের আপনার গভীর ভিতরে তাহার মূল স্বভাবের

সত্য উদ্ধার—সে বোধ হয় একেবারেই হয় না, হইবার নয়, তাই ভারতের তান্ত্রিক সাধনারও চরম পরিণাম কুশলপ্রদ হয় নাই।

প্রকৃতির সাধারণ যে স্তর, তাহাকেই ঠাকুর বলিয়াছিলেন কামরাধা; মানুষের সাধারণ জীবনে যে প্রাণশক্তির খেলা, উহা এই কামরাধারই ভোগ, ইহাই আদি ও মূল, কারণ এই আদি রসেই ত রসলীলার প্রতিষ্ঠা। এখানে সাধক প্রাণ-প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, বলিতেছে পুরুষ ভোগ করিতেছে প্রকৃতিকে, কিন্তু আসলে প্রকৃতি, প্রাণ-শক্তিই ভোগ করিতেছে প্রকৃতির বস্তু রাজিকে (object); পুরুষ সুপ্ত, মায়াচ্ছন্ন, প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রকৃতিরই ভোগ—উহা ভোগ নয়—ব্যভিচার। এই ব্যভিচারকেই মোহোন্মত্ত মানুষ ভোগ বলিয়া আত্মপ্রতারণা করে। কৌশলী যোগী প্রাণ-বৃত্তি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লন, প্রাণ-বৃত্তিটি একটী উপায়, যন্ত্র, (means or instrument) মাত্র—যোগী যন্ত্রের সহিত identification আত্ম-অধ্যাস করেন না, পরন্তু অন্তরের সূক্ষ্ম প্রদেশে উঠিয়া শক্তির, প্রকৃতিরই সহিত আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন, হৃৎকমলে ভাবময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, পূজা করেন, ইহাই কালী সাধনা, তন্ত্রের শুদ্ধ মাতৃসাধনা—অথবা আরও নিগূঢ়তর যোগাবলম্বনে স্বয়ং কালীরূপা আপনাকে অনুভব করিয়া, প্রেমরাধারূপে ঊর্দ্ধস্থ বিজ্ঞানময় আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে রত হয়েন। ইহাই বৈষ্ণব জগতের সখী সাধনা মাধুর্য্য সাধনার মূল মর্ম্ম—সাধক এখানে প্রকৃতিভাবের ভাবুক—প্রেমিকা রাধিকার সহচরী সখী, অথবা শ্রীরাধিকা স্বয়ং-ই।

লীলার ক্ষেত্র—প্রাণ ও হৃদয়। প্রাণে কামনার খেলা, প্রেমের পবিত্র মধুর লীলা হৃদয়েই অনুভব করিতে হয়—হৃদয়ই রাসমঞ্চ, রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ—প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনধাম। এই বৃন্দাবনে আনন্দের ডাক (call of Ananda) মুরলী কণ্ঠে নিত্যই পরিশ্রুত—ভক্ত প্রেমিক তাহা গূঢ়কর্ণে শ্রবণ করেন, আকুল হৃদয়ে বীণাবাদকের সন্ধানে গোপন অভিসার করেন, শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপ সূক্ষ্ম নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া অপূর্ব্ব পুলকে উল্লসিত হন, অপরূপ লীলারঙ্গে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের তুষ্টি বিধান করেন। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ—এ বাঁশী সত্য, বাঁশীর অশ্রান্ত করুণ প্রাণমন উদাস-করা পাগল করা ডাক ও সত্য—কারণ বাঁশীর বাদক যিনি তিনি যে সত্যেরও সত্য, বিজ্ঞানময় পরম পুরুষ, বিজ্ঞানেরও ঊর্দ্ধে যে পরম তুরীয় ধাম, গোলক—

সেই আনন্দলোক হইতেই দূরাগত এই মোহনসঙ্গীতচ্ছন্দ তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে—হৃদ্‌মঞ্চে যুগে যুগে চির নূতন রূপে রসে গোপ গোপিকাকে প্রেম-লীলায় মাতাইয়া তুলিতেছে। প্রেমের তাপে বিরহের জ্বাল দিয়া দিয়াই ভোগকে তপঃশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আসক্তি যখন সম্পূর্ণ অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, রস যখন সাধনার জ্বালে হইয়া উঠিয়াছে ঘনঘনীভূত, একটুও তারল্য তাহাতে আর নাই, গভীরগূঢ়, অমৃততুল্য অপূর্ব্ব রসায়ন ও সত্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই পাইয়াছি—নিকষিত হেমতুল্য দেবদুর্ল্লভ নিত্য প্রেম—নিত্য রাধায় প্রতিষ্ঠা তখনই জীবনে ধ্রুব ও সার্থক। সেই-ই আসল ও প্রকৃত রূপান্তর।

—প্রবর্ত্তক

নারায়ণের নিকষমণি

রূপম্

"রূপম্" দ্বিতীয় বৎসরে পড়েছে, এবৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পেলাম। "রূপম্" অজন্তা যুগের বাণীর আশীষ নিয়ে বেঁচে থাক ও আমাদের অন্ধ চোখের কাছে খাঁটি ভারতের গোপন মর্ম্মটুকু শিল্প কলার দিক দিয়ে খুলে খুলে দেখাক তা'তে দেশের আত্মা যদি আবার ডুব দিয়ে শক্তির মূলে কখন আবার যায় আর নতুন ঋষি প্রেরণায় ভারতের জীবন সত্য ধ্যানের কল্পলোক দেখে পাথরে কুঁদে ও রঙের তুলিতে রচে দেখায়।

কলাজ্ঞান হারা দেশে চিত্র-কলার কথা বলাই বিড়ম্বনা; এদেশে গভীর কথার শ্রোতা দু'চারটি মাত্র আছে, বিশেষতঃ চিত্রকলার সম্বন্ধে। সবাই চিত্র মানে বোঝে ফটোগ্রাফ অর্থাৎ প্রকৃতির নিখুঁৎ নকল। প্রকৃতি রাণীর সৃষ্টি সম্পদের কেউ নকল করতে পারে কি না জানিনে, করলেও তা বোধ হয় নকল ছাড়া আসল খুব কমই হয়। কবিতা যেমন ঘটনার বর্ণন মাত্র নয়, বস্তুর মাঝে কবি যেমন ভাবকে ধরে দেখায়, অনন্তকে রূপ দেয়, সকল মাধুরীর আধার ও আশ্রয় সেই জগত বঁধুর অঙ্গখানি অবগুণ্ঠন টেনে চকিতের জন্য দেখিয়ে তার ব্যক্ত মাধুরীর আর কুল রাখে না, শেষ রাখে না; চিত্রকলার কবিও তেমনি। রূপ ও রেখা তার হাতের অক্ষর মাত্র সেই অক্ষরে সে ভাবের মূক অমর প্রাণকে মুখর করে,

রূপের পেছনে যে সত্য ফুটি ফুটি করছে, মানুষের মুখে গাছের পাতায় মন্দিরের চূড়ার কারু মহত্বে তাই ফুটিয়ে তোলে।

মানুষের অন্তর ধামের জ্ঞান-লোক বা ভাব-লোক থেকে প্রেরণা পেয়ে যে চিত্র, যে সাহিত্য, যে ভাস্কর-কলা হয় তা' নিকৃষ্ট থাকের জিনিষ; প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পী নিজের ভিতরে ভাগবত ধামের দুয়ার খুলে সেখান থেকে সৃষ্টি করে অনুপমকে রূপ দেয়। চিত্রকলা জীবনের নকল করে না, জীবন গড়ে; জীবনের অর্থ বিষাদ করে তোলে না, জীবনকে নিবিড় করে সার্থক করে। সে হিসাবে চিত্র বা ভাস্কর কলা বা কবির কবিত্বও ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদের দেশে সেই কলার কবি ছিল এবং এই নব জাগরণের শুভ উষায় তারা আবার এসেছে। নন্দলাল তাদের একজন। এবার রূপমের প্রথম সংখ্যায় নন্দলালের অনেকগুলি ছবি আছে, যথা, গোড়ায় প্রচ্ছদের পরেই শিবের শান্ত ধ্যান স্তিমিত রূপ এবং তারপর শিবের শোক, "শিবের বিষপান," "শিব তাণ্ডব" "নীরবতার কবি" এই কয়টি ছবি আছে। এ ছবিগুলির মাঝে যে গরীমা, মহত্ব, শান্তি ও জ্ঞান বিধৃত দেবত্ব দেখান হয়েছে তা' য়ুরোপে বা অন্য কোন দেশের চিত্রকরের চিত্রে নেই। মাইকেল এঞ্জেলো যে মহত্ব আঁকতেন তা প্রাণের ও জড় দেহের গরীমা। পাশাপাশি রবিবর্ম্মার অনুকরণে আঁকা বিশ্বনাথের ছবি দেখানয় ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ যেন উপমায় উজ্জ্বল ও প্রকট হয়ে উঠেছে। রবি বর্ম্মার শিষ্যের আঁকা এ ছবি যেন যাত্রার সাজা শিব। দেবত্ব বা মহত্ব তো নাই-ই, শান্তি বা ধ্যান মগ্নতাও নাই বরঞ্চ প্রাণহীন দীনতা ও ক্ষুদ্র মানবতার প্রতিচ্ছবি।

অবনীন্দ্রনাথের "মহাকালের মন্দিরে" অনুপম বস্তু। নন্দলালে যা' আছে তা ছাড়া অবনীন্দ্রে কবিপ্রতিভা আরও বহুভঙ্গিম ও ব্যাপক; অবনীন্দ্র ঠিক নন্দলালেরই গুরু। তারই পাশে ধুরন্ধরের আঁকা "নাচওয়ালী"র চিত্র বড় বীভৎস দেখিয়েছে। সমরেন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধেও কয়েকটি ছবিতে দেখিয়েছেন যে, কি করে য়ুরোপের ভাব ভারতীয় চিত্রে ঢোকে। এই প্রবন্ধে পঞ্চম ছবিটির দোলায় ও তার পিছনের রূপ দু'টিতে কোন য়ুরোপীয় ভাব আমরা পাই নাই, তবে দোলার সামনে দাঁড়ান প্রথম রূপটিতে কিছু আছে।

এ সংখ্যায় James Cousin এর "Four degrees of art"—"কলার চারটি তারতম্য" সব চেয়ে উপাদেয় প্রবন্ধ; অসীতকুমার হালদারের ধারাবাহিক প্রবন্ধের এ অংশটুকু চিত্রকলার আঁকবার বিষয় আধুনিক হবে কি

পৌরাণিক হবে তাই নিয়ে লেখা। শ্রীঅরবিন্দের Renaissance of India থেকে রূপমের এ সংখ্যার শেষাংশে কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের "রাসলীলায় প্রাণের গতি রাসের ভাব মগ্নতায়ও বেশ মধুর নর্ত্তনে রূপ নিয়েছে; প্রতি সখীই আপন পাশে এক একটি কৃষ্ণরূপ পেয়েছে প্রতিজনেই ভাবছে "একা আমারই বুঝি রাস-সখা কৃষ্ণ, এমন ভাগ্য বুঝি আর কারু হয় নি।" সমস্ত ছবিটিতে নৃত্যের গতি মুখর না হয়েও দুলছে, আনন্দ শান্তির মাঝেই মাতিয়েছে, সব ব্যাপারটাই যেন ধ্যান জগতের আনন্দ নিথরতায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু এ ছবি নন্দলালের বা অবনীন্দ্রের হাতে পড়লে না জানি কি হ'তো। অবনীন্দ্রের "কাজরীর" গভীরতা অনুপম বর্ণসম্পদ ও নৃত্য মাধুরী এ ছবিখানিতে এসেও আসে নি, তার কারণ নূতন চিত্রকরেরা ভারতীয় কলার বাহিরের নৈপুণ্য ও বিশেষত্ব বজায় রাখতে একটু সজ্ঞানে ব্যস্ত। নূতন ভারতীয় চিত্রকলা ভবনের নবীন চিত্রবরদের মধ্যে আর একটি ভাব ঢুকেছে সেটি হচ্ছে বস্তুতন্ত্রতা বা realism। রিয়্যালিজম পাশ্চাত্যের কলার প্রাণ, ছোট ছোট প্রতিভার শিল্পীরা তাঁদের চিত্রে বেশি বেশি বস্তুতন্ত্র হ'লে সেই সূত্রে বিদেশী প্রভাব ধীরে ধীরে কলার প্রাণঘাত ঘটাতে পারে। বস্তুতন্ত্রতা নিয়েও ভারতের কবি থাকা অবনীন্দ্রের মত আর কারু পারা সহজ নয়। ক্ষিতীন্দ্রের ছবিতে বস্তুতন্ত্রতা নেই বটে, কিন্তু তাঁর technique বা শিল্পনৈপুণ্য ও mannerism বা ভঙ্গী সহজ লীলায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়েও হয় না, একটু কষ্টকল্পিততায় সুচারু দেখায়! চিত্রের আত্মা সাজগোজ বসন ভূষণে ঢাকা পড়ে যায়।

বিপরীত

[শ্রীমতীলীলা দেবী]

কালোর চাইতে সুন্দর কার অরির চাইতে প্রিয়,
তৃণের চাইতে বড় কেবা—সে যে বিশ্বে অতুলনীয়!
অন্নের চেয়ে মধুর কি আছে, বিপদের চেয়ে হিত,
ত্যাগের চাইতে ভোগ কই, আর হারার চাইতে জিৎ!
দুরন্ত ঐ শিশুর চাইতে, সুনন্দ কোথা আর?
কলঙ্ক চেয়ে যশ পাই তাই হাসে চাঁদ অনিবার!
বিরহের চেয়ে নিবীড় মিলন মিলনের মাঝে নাই;
বন্ধুর মত শত্রু কোথায়—চির বন্ধন তাই!

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]   [আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

আগমনী

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস মা নবনী-হৃদয়া জননী মণিমঞ্জুষা করে,
হরষ ধারায় সরস করিয়া এস মা বরষ পরে ॥
এস   শারদ গগন মগন করিয়া শুচি জ্যোছনার বানে
বন-প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘন তরুণিমা দানে।
এস   প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ—
এস   গুঞ্জনে ভরি' কুঞ্জ—
কল   কুজনে ভরিয়া নমেরুকুলায়, রঞ্জিয়া জলধরে ॥

এস   পয়স্বিনীর আপীন ভরিয়া মধুর গোরস রসে,
নিঃস্বের গৃহ শস্তে ভরিয়া, বিশ্ব ভরিয়া যশে।
এস   পুষ্প ভরিয়া গন্ধে—
চারু   মঞ্জুতা মকরন্দে—
এস   হ্রদ-সরোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে ॥

এস   নদনদী ভরি মীন-বৈভবে, কান্তার ভরি কাশে—
তরুলতা ভরি ফল-গৌরবে, তড়াগ ভরিয়া হাঁসে।
ভরি'   শালি-সম্পদে ক্ষেত্র—
স্নেহ   করুণায় ভরি নেত্র—,
এস   মুখরিত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে ॥

এস শিশুর আস্য হাস্যে ভরিয়া, লাস্যে আঙিনা ভরি,
নব স্বাস্থ্যে ভরিয়া শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ জড়তা হরি'।
মাগো বিতরি' অন্ন-স্তন্য—
কর সন্তানগণে ধন্য—
এস বিশ্বম্ভরা সন্তাপহরা বঙ্গের ঘরে ঘরে ॥

সত্য ও সৌন্দর্য্য বোধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শুক্র সন্ধ্যায় যে সত্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, ভাবের পর ভাবের রূপ দিয়া প্রাণের যে গতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা ত শেষে ব্যাকুল হৃদয়ের অশ্রুবর্ষণে, নির্ব্বাক অন্তরের সৌম্য সমাধিতে লয় পাইয়া গিয়াছে,—জ্ঞানের কথায়, সত্যালোচনায় ইহাতে ধরিবার বুঝিবার কি আছে? যে নিভৃত আনন্দ ইহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, গতির দিকে ছাড়া তাহার সম্যক উপভোগ আর কেমন করিয়া হইতে পারে? কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতার প্রত্যেক অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও তাহার এই আভ্যন্তরিক গতিটা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানব-মনের যে সূক্ষ্ম গতি, প্রাণের যে অব্যাহত স্ফূর্ত্তি ভাষার মধ্য দিয়া রূপে, রূপের মধ্য দিয়া ভাবে স্বতঃই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে সঙ্গীতে, ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা কাব্য-রচনারই অনুরূপ। কবির মনের স্বচ্ছন্দ গতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংস্কার হইতে স্খলিত হইয়া নিজের বেগেই ধাবিত হয়, সত্য এবং তথ্য ইহাকে সংযত করিলেও রুদ্ধ করিতে পারে না। কবিতার এইরূপ একটী অন্তর্গূঢ় স্বাভাবিকত্ব আছে। এবং ভাবের গভীরতা অথবা প্রজ্ঞালব্ধ দৃষ্টি যতই থাকুক না কেন, কবি যদি তাঁহার কবিতায় ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিক গতিটা ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন, তাঁহার মনের গতি যদি—তাঁহার কাব্যে স্বতঃ স্ফূরিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার কবিতায় সৃষ্টির আনন্দ পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক

জীবনের আড়ষ্ট ভাব কবিতায় নাই, জ্ঞানার্জ্জনের কষ্টসাধ্য চেষ্টা হইতে ইহা সম্ভূত নহে, কল্পনার উদ্দাম চাঞ্চল্য ইহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা আজি কালি এত যে সমাদৃত—তাহা তাঁহার তত্ত্বালোচনার জন্য নহে। যুক্তির আলোকে এ সব তত্ত্ব এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এত মর্ম্মস্পর্শী কারণ সমস্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া প্রকৃতির মূলে চিন্ময় শক্তির যে সাক্ষাৎ অনুভূতি তাঁহার হইয়াছে—তাহার সরল সুন্দর স্বাভাবিক ভাব ব্যঞ্জনা আমরা পাই তাঁহার কাব্যে। বাহিরের সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সত্য ও সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ করে, তাঁহার এক একটী কবিতায় ভাবের গতির মধ্যে যেন তাহা ধরা পড়িয়াছে এবং জগতের চঞ্চল প্রকাশের ভিতর দিয়া অধ্যাত্ম চেতনার প্রসারিত সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের জন্য প্রতিভাত হইতেছে। সেই একই কারণে রবীন্দ্রনাথও বড়, তিনি মরমী কবি বলিয়া নহে,—তাঁহার অধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনার জন্য নহে,—কারণ ইহারাও আধ্যাত্মিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা,—তিনি বড়, কারণ তাঁহার কবিতায় সমস্ত তত্ত্ব ও সত্যের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য স্পর্শ করিয়াছেন। সাহিত্যে তত্ত্ব ও সত্য মিথ্যা, ভাব ও সৌন্দর্য্যই সত্য—সৌন্দর্য্যকে গভীরতা দিবার জন্যই সত্যের প্রয়োজন। আমাদের তত্ত্ব ও সত্য আজ আছে কাল নাই, ইহারা তখনই নিত্য যখন ভাবের সহিত বিজড়িত হইয়া সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত, সে কালের কত শত সত্য বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আজও ভারতের হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে।

সেইজন্য কোনও একটী উৎকৃষ্ট কবিতা গদ্যে পরিণত করিলে তাহার অন্তর-শ্রী থাকে না এবং অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। প্রত্যেক অংশ সমগ্রের মধ্যে নিহিত, এবং সমগ্র ভাবটী প্রত্যেক অংশে প্রতিফলিত। কবিতা যেন নিয়তির নিগড়ে বাঁধা, সৃষ্টির রহস্যে ঢাকা, প্রাণের স্পন্দন হইতে কেমন করিয়া যে ইহা ভাষা, ভাব ও রূপের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জোর করিয়া কবিতা লেখা চলে না। সত্য এবং তথ্যকে কল্পনায় ফলিত করিলেও তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য নহে, যদি প্রাণের অনুভূতি না থাকে, যদি মনের স্বচ্ছন্দ বিলাস আপন মাধুর্য্যে আপনি বিমোহিত না হয়। ইংরাজ-কবি পোপের ত সত্যের

কোনও খাঁটুতি ছিল না, কল্পনারও প্রাচুর্য্য ছিল—কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আজ কোথায়? এবং তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গৃহীত হইত, আর তাঁহার আধুনিক আধ্যাত্মিক গবেষণা আমাদের হৃদয়ে এত নৈরাশ্যের সঞ্চার করিত না। যে গভীর অনুভূতি কবিকে পাগল করিয়া তুলে, তাহা সব সময়ে তাঁহার নিজের নিকটেই পরিস্ফুট হয় না। কস্তুরী মৃগের ন্যায় নিজের সৌরভে নিজে মত্ত হইয়া কবির মন গতিমুক্ত হইয়া যায়। কত মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক, কত ছন্দোবন্ধে কত আকারে ও ইঙ্গিতে তিনি সেই সৌরভকে ধরিতে চেষ্টা করেন,—প্রাণের বেদনা কথায় আধস্ফুট হইয়া প্রাণেতেই মিলাইয়া যায়, তাঁহার মনের তুষ্টি কিছুতেই হয় না, ব্যাকুলতা ব্যাকুলতাই রহিয়া যায়। সেই জন্য কবিতার যেন শেষ নাই, ইহার কথা বলিয়াও বলা হয় নাই। ইহা যে ভাবের রেখাপাত করিয়া চলে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যে আলোকের স্পন্দনের মত প্রাণ হইতে প্রাণে চিরকালই স্পন্দিত হইতে থাকে। অনুভূতি মূলক * কবিতাকে জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ সুস্পষ্ট করা যায় না; এবং সামাজিক নীতিবাদ্ তাহাতে খাটে না। এই শ্রেণীর কবিতা আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সুপরিচিত হয় নাই বলিয়া ইহা লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বাস্তবিক অনুভূতি মূলক কবিতা কোনও দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া জনসাধারণের উপভোগ্য নহে। ইহা চন্দ্রালোকের স্বচ্ছ আবরণের মত বাস্তবের সুস্পষ্টতার উপর অলৌকিক কিরণ সম্পাতে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। কবির সত্য যতই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে, যতই ইহা অনুভূতির বিষয় না হইয়া জ্ঞানের বলিয়া বোধ হয়,—কবি যখন তাঁহার বিষয়কে ভিতর হইতে না দেখিয়া বাহির হইতে দেখিবার চেষ্টা করেন, ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারের, স্থির নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের,—সমভূমিতে আনিয়া ফেলেন ততই তাঁহার কাব্য গদ্যের রূপান্তর হইয়া পড়ে। এমন কি যখন কোনও কবিতায় একটা সুনিশ্চিত মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তখনও সেই কাব্যের উৎকর্ষ উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের উপর ততটা নির্ভর করে না, এই উদ্দেশ্যকে ঘেরিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে যে ভাবের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, যতটা ইহা তাহার উপর নির্ভর করে। কোন

* Romantic Poetry অনুভূতিমূলক কবিতা। আমি আমার "সাহিত্যে অনুভূতি" নামক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কেন ইহাকে বাঙ্গলায় অনুভূতিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে এবং কেন Classical Poetry কে আদর্শ প্রধান বলা উচিত।

কবির আদর্শ কত উচ্চ ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা অথবা সমালোচনার উদ্দেশ্য প্রায়শঃই নিরর্থক কারণ আদর্শের উচ্চতা সব সময়েই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক নহে। আদর্শ-হিসাবে রামায়ণ—'ওডেসি' অপেক্ষা বহু উচ্চ মনে করিলেও বাল্মিকী হোমার হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় না কিম্বা কেবল আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া রবীন্দ্রনাথকে মাইকেল হইতে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। একদিকে যেমন উদ্দেশ্যবিহীন কবিতা শুধু কল্পনার খেয়াল,—পাগলের প্রলাপোক্তির মত বোধ হয় আর একদিকে তেমনই আদর্শকেই এক মাত্র মাপকাঠি ধরিয়া কাব্যের বিচার করিলে তাহাকে নীতি শাস্ত্রের সহিত একত্র করিয়া দেখিতে হয়। প্রকৃত কাব্য-সৃষ্টিতে একটী নির্লিপ্তভাব আছে,—ইহাতে ভোগ বিরতিরও আভাষ পাওয়া যায়। জ্ঞান ও চেতনার সংঘাতে কবির মনে যে অনুভূতি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহার উপর তাঁহার যেন কোনও হাত নাই; সে নিজের ইন্ধন নিজেই জোগাড় করিয়া লয়। অধ্যাত্মসত্তার গভীরতার মধ্যে ভাষা ও ভাব তাহার সহিত আপনিই যুক্ত হয়। একটী কণাকে কেন্দ্র করিয়া স্ফটিক যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে গড়িয়া উঠে, তেমনই করিয়া সেই—অনুভূতির চতুর্দ্দিকে ভাব-সম্পদ সৃষ্ট হয়। সত্য ও সৌন্দর্য্যকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জ্ঞানের দ্বারা জমাট করিলে কাব্য রচিত হয় না।

আমার মনে হয় এই জন্য রবীন্দ্রনাথের আজিকালিকার কবিতায় জীবনী-শক্তির হ্রাস উপলব্ধি হইতেছে। যে প্রাণের বেগে, অনুভূতির খরস্রোতে একদিন তাঁহার কবিতা উথলিয়া উঠিয়া "আকুল পাগল পারা" জগৎ প্লাবিত করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহার যেন আর সে শক্তি নাই,—এখন তাহার সার্থকতা জ্ঞানে ও তত্ত্বে। যেখানে তাঁহার কাব্যের মূলে অনুভূতি বিদ্যমান, সেখানে ভাষা ও কল্পনার সামঞ্জস্য, ভাব-ব্যঞ্জনার স্বাভাবিকত্ব একটী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা সমস্ত অস্পষ্টতা ও চাঞ্চল্য সংযত করিয়া তাঁহার কবিতাকে একটী দিব্যশ্রী প্রদান করিয়াছে। কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভা মুখ্যতঃ অনুভূতিমূলক এবং তাঁহার কাব্যের ভাব ও ভাষা, রচনা-ভঙ্গী বা প্রকাশ-প্রণালী অনুভূতি-ব্যঞ্জক, অর্থাৎ অনুভূতির ধারা অনুসরণ করিয়া ইহারা স্বভাবতঃই স্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি তাহা না বুঝিয়া জ্ঞানের কথা, দর্শন-তত্ত্ব সেই একই প্রণালীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন; একথা ভুলিয়া যান যে জ্ঞানের প্রকৃতিই এই, যে ইহাকে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিতে হয়;- ইহা যুক্তির কার্য্য কারণ পরম্পরার অপেক্ষা রাখে,—জ্ঞানকে কল্পনার আবছায়ায়

ফেলিলে অথবা রূপকের অস্পষ্টতায় ঘেরিলে তাহা অনুভূতিতে পরিণত হয় না,—তখন তাঁহার রচনাতে দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাবের উৎপত্তি হইয়া এমন একটী অস্বাভাবিকত্ব আসিয়া পড়ে যে পাঠকের মন স্বতঃই তাহা হইতে প্রত্যাকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলে যেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠে এবং সহজেই বোধগম্য, মূলে তাহাদিগকে তেমন স্পষ্ট ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য অনুবাদে অনেকটা ঢাকা পড়ে। কিন্তু তাঁহার অনুভূতিমূলক কবিতাগুলি অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইলে, তাহাদের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়, মূল ভাবটীর ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে,—জ্ঞানের কথা যত সহজে অনূদিত হইতে পারে, অনুভূতির কথা তত সহজে হয় না।

ভাবের সৌন্দর্য্য, প্রকাশের স্বাভাবিকত্বের উপর নির্ভর করে। এবং আমাদের দেশের অবস্থাই এমন যে আমাদের সাহিত্য-রচনার মধ্যে স্বতঃই যেন একটী প্রকাশের বিকৃতি আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই যদিও মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ তাহা হইলেও এই প্রকাশের রীতি বহুল পরিমাণে পাঠক সমাজের রুচি ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লেখক যে শুধু নিজের অন্তর্গূঢ় আনন্দের প্রাচুর্য্য হইতেই লিখেন তাহা নহে,—তাঁহাকে অনবরতই এইটী কাল্পনিক পাঠককে তাহার মনের সম্মুখে শ্রোতা ও বিচারকরূপে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। সাহিত্য রচনা একাধারে সৃষ্টি ও সমালোচনা। সাহিত্যিক স্রষ্টাও বটে, সমালোচকও বটে, যে অনুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হ'ন,—ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহাকেই আবার বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার কল্পিত পাঠকের রুচি ও আদর্শ অনুসারে একটু ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিতে হয়। কবির অনুভূতির সম্পূর্ণতা কখনই কাব্যে প্রতিফলিত হইতে পারে না। সাহিত্যে আমরা যাহা পাই তাহার সমস্তটাই লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নহে। কালের গতি দুই দিক দিয়া লেখককে চালিত করে। একদিকে যেমন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ এই গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর একদিকে তেমনই এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, রুচি ও অবস্থা একটী বিশেষ রীতির মধ্যে আনিয়া ফেলে। যেখানে এই দুইটীর মধ্যে যত সামঞ্জস্য আছে, সেখানে লেখকের রচনা তত স্বাভাবিক ;—ততই আমাদের মনে হয় যেন স্বয়ং কাল লেখকের হইয়া তাঁহার

লেখনী চালনা করিয়াছেন ; সাহিত্যের কথা কালের স্বাক্ষী-রূপ হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য এক এক যুগের সাহিত্য এক একটী বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং কালের গতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যকে ঠিক বুঝা যায় না। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশৃঙ্খলতা ও অনেক সময়েই যে প্রকাশের বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহার একটী কারণ এই যে, লেখকের নিকট এখন পর্য্যন্ত সেই কল্পিত পাঠকের মূর্ত্তিটী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পাঠকের রুচি ও আদর্শ কি? প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে আমাদের দেশে কোনও নূতন সভ্যতা অথবা আদর্শের সূচনা সর্ব্বজন সমাজে এখন পর্য্যন্ত সংক্রমিত হয় নাই।

সমগ্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা দীক্ষা অথবা চিন্তা প্রণালী যদি এক না হয়,—সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আদর্শ প্রবর্ত্তিত থাকে,—তাহা হইলে সাহিত্য-রচনা সহজ স্বাভাবিক ও সরল হইতে পারে না। আবার ইহার উপর যদি লেখকের মনের অন্তরতম প্রদেশে জাতীয় জীবনের গৌরব-বোধ অথবা অতীতের প্রতি সভক্তি প্রণতি না থাকে,—যদি জীবনের দৈন্য তাঁহাকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলে যে তিনি নিজের মধ্যে নিজে সোয়াস্তি না পান্,—তাঁহাকে অনবরতই অন্য দেশের সাহিত্য ও সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিতে হয়,—তাহা হইলে সেই কল্পিত পাঠক লেখকের মনের অগোচরে বিদেশী সমালোচকে পরিণত হইয়া যায়,—তখন তিনি বুঝিতে পারেন না ভিতরকার যে সূত্রটী তাঁহার সাহিত্য-চেষ্টা সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে,—তখন সে সাহিত্য কেন্দ্রভ্রষ্ট, অসংযত ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। এইরূপ সাহিত্য যে সবসময়েই বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ প্রয়াস-লব্ধ তাহা নহে, বরং ইহা তাহার উল্টাও হইতে পারে। ইহার মধ্যে কেমন যেন একটু উৎকট দেশীয়তার ভান আসিয়া পড়ে—দেশীয় বিশিষ্টতাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া, সংযমের সীমা ছাড়াইয়া, ভণ্ডতাপসের রূপে বিদেশীর নিকট প্রতিভাত হইতে চায়, এইরূপ সাহিত্য ও শিল্পে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না কারণ ইহা অন্তরের সরল অভিব্যক্তি নহে। এবং এই ভাবটী আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে ও শিল্পে যে দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের বিশিষ্টতা, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিদেশীর নিকট ফলাইবার একটী উগ্র আকাঙ্ক্ষা, একটু অভিনয়-প্রয়াস ইহাতে লক্ষিত হয়। যে অভিনব বেশে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে দেখা দিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার

আধুনিক সাহিত্যেরই প্রতিকৃতি। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যে তাঁহাকে মরমী কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—সেই গৌরবেই তাঁহার আত্ম-গৌরব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। নিজের উপর অবিশ্বাস, আত্মার প্রতি উপেক্ষা সাহিত্যের কল্যাণকর হইতে পারে না। কিপলিং, মেটারলিঙ্ক্ অথবা টুরগেনেভের সমকক্ষ হইলেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা হয় না, তিনি যে আমাদের অনেকের কাছেই নোবেল প্রাইজের বহু উর্দ্ধে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি তিনি অন্তরের সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া চির-মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জগতের নিকট যাইতে হইবে না, জগৎ আপনিই তাঁহার নিকটে আসিবে। সাধারণ লোকের পক্ষে না হউক, কবির পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ— তাঁহার গৌরব মুখ্যতঃ স্বদেশে, বিদেশে নহে। অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের আজি কালিকার রচনায় 'রস' পাওয়া যায় না। এ গুলিতে সত্যের গভীরতা আছে, কল্পনার কমণীয়তাও যে নাই তাহা নহে, কিন্তু ভাবের গতি নাই। তিনি সত্যের হেঁয়ালি রচনা করিতেছেন,—রূপকের সাজ পরাইয়া দিতেছেন,— অধ্যাত্মজীবনের মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। তাঁহার সাহিত্য-জীবনে যেন পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িয়াছে—নৈতিক ও মানসিক আড়ষ্টতা কাটাইয়া ভাবের যুক্ত প্রবাহে তিনি নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না। যাঁহার অনুভূতি একদিন শুক্লসন্ধ্যার সৌন্দর্য্যে অশ্রুবিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল, গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্য সাক্ষী করিয়া যিনি তাঁহার প্রাণ প্রকৃতিকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, কত জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠিয়া তাঁহার জীবন-কুঞ্জ এক অজানিত রাগিনীতে ভরিয়া দিয়াছিল, সাগরের খোলা হাওয়া বহিয়াছিল,— আজ তাঁহাকে কিনা অধ্যাত্ম কবিতার অলীক মোহে মুগ্ধ হইয়া, বিদেশী পাঠকের সাময়িক চিত্তাকর্ষণের জন্য, বৈষ্ণব-কবিতার বিকৃত অনুকরণে অথবা মেটারলিঙ্কের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

যেদিন হইতে তিনি পশ্চিমে সমাদৃত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার কবিত্বের উৎস শুকাইয়া আসিতেছে। অনুবাদে যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাণের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার এখন কার কবিতাগুলি যত সহজে অনুবাদ করা চলে, আগেকার কবিতা তত সহজে অনুবাদ করা যায় না, কারণ সে গুলিতে ভাষা ও ভাবের সহিত প্রাণের যোগ আছে। বাস্তবিক

তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতা দিয়া পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হয়েন নাই। যে সব কবিতায় পাশ্চাত্যে ভাবেরই প্রতিধ্বনি, অথবা যাহাতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার একটা বিকৃতি দেখা যায়,—সে গুলিই—সেখানে সমধিক প্রশংসিত হইয়াছে। যাঁহার অপূর্ব্ব অনুভূতি একদিন তাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে লইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মানস-প্রতিমা নিত্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া অন্তরের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া দিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রতিভা আত্মবিস্মৃত এবং পাশ্চাত্যাভিমুখে ধাবিত! আমাদের জাতীয় জীবনের এমনই অভিসম্পাত যে বর্ত্তমানের পাওয়ানাটুকু চুকাইয়া লইতে গেলেই ভবিষ্যৎকে হারাইয়া বসিতে হয়! আমরা এখন যাহা দিয়া আমাদের প্রতিভার নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি কালের সাক্ষী হয়ত তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে! পরের মুখের দিকে তাকাইয়া সাহিত্য-রচনা হয় না, কারণ ইহা অনুভূতির কথা, মরমের ব্যথা। সাগরের পরপারে যে সুদূরের সভ্যতা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, আমাদের কণ্ঠস্বর ,তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই স্বাভাবিকত্ব হারাইয়া ফেলে। কারণ সাহিত্য আমাদের অন্তরতম সত্য, ইহাতে মৌলিকতা থাকিলে, ইহার স্বদেশে প্রতিষ্ঠাই সময়-সাপেক্ষ, বহুকাল চর্চ্চার পরে ইহার বিদেশে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হইলে চাই জ্ঞানের স্বচ্ছ দৃষ্টি, অধ্যাত্মচেতনার মেঘমুক্ত জ্যোতিঃ যাহাতে হৃদয়ে সমস্ত সত্য প্রতিভাত হইয়া ত্রিকোণাশ্রিত স্ফটিকের মধ্যে সূর্য্যরশ্মির মত বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় জগতের মন মোহিত করিতে পারে। সত্যানুভূতি যত বাড়িতে থাকে, আমাদের সমস্ত সত্তা স্পন্দিত করিয়া সাহিত্যও তত শব্দে ধ্বনিতে রণিত হইয়া, হৃদয়ের উচ্চস্বরগ্রামে প্রাণের মুক্ত মূর্চ্ছনায় মিলাইয়া যায়। তাই অনুভূতি ও ছন্দে ধর্ম্মে ও সঙ্গীতে সাহিত্যের উৎপত্তি। যে ওঙ্কারধ্বনি ভারতে একদিন উঠিয়াছিল, তাহা যেন এক বিরাট সত্যানুভূতির নির্ব্বাক স্পন্দন,—সাহিত্যের অন্তররূপ!

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সাহিত্যের চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সহিত যেন একটু অন্তরের যোগ আছে এবং ইহা একাধারে এই দুইটীর যত কাছে যাইতে পারে ততই উৎকর্ষলাভ করে। সাহিত্যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়া শব্দের সাহায্যে তাহাকে রূপে ফলাইবার চেষ্টা করা হয় এবং সে বিষয়ে ইহা চিত্রকলার অনুরূপ। এই রূপ-মাধুর্য্য সাহিত্যে যত থাকে তত তাহার চমৎকারিত্ব। আবার অপর পক্ষে সত্যানুভূতির গভীরতার দরুণ প্রাণের যে আবেগ,—ভাবের এই গতিকে ভাষার ঝঙ্কারে পরিণত করাও সাহিত্যের

একটী অংশ এ বিষয়ে ইহা সঙ্গীতেরই অনুরূপ জ্ঞান, চিত্রকলা ও সঙ্গীত, এই তিনের পবিত্র সঙ্গমই সাহিত্যের পুণ্যতীর্থ। এই তীর্থোদকে স্নাত হইলে সাহিত্যের যে নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে, তাহা যেন এক অব্যক্ত আদর্শের জ্যোতি সূচিত করে,—কোন দূর স্বর্গের আভাষে হৃদয়ে পুলক সঞ্চার হয়। একদিকে যেমন অমূর্ত্ত সত্যকে শব্দ-বিন্যাসে রূপে ফলাইতে হয়, মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত করিতে হয়, আর একদিকে তেমনই ভাষার ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে সেইরূপকে লয় করিয়া প্রাণের আবেগে পরিণত করিতে হয়।

এইজন্য কোনও বিদেশীয় সাহিত্যের শিল্পহিসাবে চর্চ্চা এত কঠিন। বহুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের দেশে অধীত হইতেছে কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ সাহিত্যকে আমরা রূপ দিতে না পারি, অথবা ইহাকে সঙ্গীতে, নাট্যে উপভোগ করা আমাদের পক্ষে যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এ সাহিত্যের ভিতরকার সঙ্গতি, অন্তরের স্বরূপ আমাদিগের নিকট সম্যক স্ফুট হইবে না, ইহা কেবল শুষ্কজ্ঞান রহিয়া যাইবে, আমাদের চিত্তকে সরস করিবে না। আমরা ইংরাজী কবিতা পড়ি এবং মনে করি বুঝি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা দিয়া কবিত্বের মাধুর্য্য ধরা যায়। মিল্টনের কাব্য আমাদের নিকট বক্তৃতা, শেলীর সঙ্গীতের বিগলিত ধারা আমাদের নিকট শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা। ইংরাজী সাহিত্য পড়িবার সময় ভাবের সঙ্গে সঙ্গীতের ও রূপের যে সূক্ষ্ম যোগ আছে তাহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। বিদেশী রচনার উৎকর্ষ বুঝিতে গিয়া আমরা সমালোচকের গবেষণায় ব্যথিত হইয়া পড়ি, কারণ ভাষার যে অনুভূতি লইয়া সাহিত্য-সমালোচনা হইয়া থাকে, যে ভাব ও ছন্দোমাধুর্য্য ইহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সংলিপ্ত, ইংরাজী ভাষার সেই অনুভূতি আমাদের অনেকেরই হয় না। এ ঠিক সাহিত্য-চর্চ্চা নহে, সাহিত্যের শরীর-বিজ্ঞানের চর্চ্চা। সেইজন্য আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা এতই হাস্যাস্পদ ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত! ইংরাজী সাহিত্যের যে সমালোচনা বাঙ্গালীর নিকট হইতে বাহির হয় তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনও প্রকাশ নাই, কতকগুলি পাশ্চাত্য সমালোচকের মতামত একত্রিত করিয়া আমরা আমাদের কৃতিত্ব জাহির করি। এইরূপ বিদ্যায় কি কেহ মানুষ হইতে পারে? ভাষা ত আমাদের পোষাক নহে,—যেমন ইচ্ছা ছাঁটিয়া লইব, যখন ইচ্ছা ছাড়িয়া দিব,—ইহা যে মানব-মনের, সমস্ত অধ্যাত্মজীবনের দেহ,—রূপে অভিব্যক্তি। ইহার

ভিতরে যে প্রাণ, সেই প্রাণ যিনি ধরিতে না পারিয়াছেন, ইহার বাহিরে যে সত্য, সেই সত্যও তাঁহার নিকট পরিস্ফুট হইবে না,—এ কেবল ছায়াকে কায়া বলিয়া উপলব্ধি করিবার নিষ্ফল প্রয়াস্ !

ভাষার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, বর্ণনার চমৎকারিত্ব, এবং শব্দের রণন মধুর মন্দ্রে ধ্বনিত করিবার শক্তি বাঙ্গলায় মাইকেলের যত আছে, বোধ হয় আর কাহারও তত নাই। মাইকেল কল্পনাকেই আবাহন করিয়াছিলেন, এবং কল্পনাদেবী তাঁহাকে আপন বরপুত্র করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় যেন কেবল স্বপন বাতাসে বপন করিয়াছেন, তাঁহার বাসনা-বাঁধনে কিছুই ধরা পড়িতে চাহেনা ;—তিনি এতই আবেগভরে প্রাণপণে ঝঙ্কার দেন যে তাঁহার বীণার তার বুঝি ছিঁড়িয়া যায়, তাঁহার আশার তরণী যেন কূল পায় না—রূপ অরূপের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আর মাইকেল যখন একবার অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিয়া ফেলেন তখন সেইরূপের দিকটাই বিশিষ্ট করিয়া ফুটাইতে চান্, তাহাকে স্ফুটতর করিয়া কত ভাবেই যে দেখেন বলা যায় না। কিন্তু ভাষার যে ইঙ্গিতে ও ঝঙ্কারে রূপের সৌন্দর্য্যকে কেবল ক্ষণিকের প্রকাশ বলিয়া বোধ হয়,—সমস্তরূপের পশ্চাতে ভাবের যে গভীর ব্যাপ্তি,—তাহা বড় অনুভব করিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ যে কি, মানুষ তাহা বুঝে না, বিশ্লেষণে তাহা দেখান যায় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আত্মানুভূতি থাকিবে, ততদিন আমরা সৌন্দর্য্যের ভিতরে একটা ভাবের আভাস্,—সত্যের একটা নির্ম্মল ভাতি,- সন্ধান করিয়া ফিরিব,—শুধু বাহ্যপ্রকাশ লইয়া আমাদের আত্মার তুষ্টি হইতে পারে না। মাইকেল এই বাহ্যপ্রকাশেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন,—কোনও নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে যান নাই। বাল্মিকী কিম্বা হয়ত মিল্‌টনের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন,—তাহাকে রূপে ধরিতে তাঁহার এতই উল্লাস, যে সেই মাদকতায়, রূপের সেই মোহে,—তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা সম্যক জাগ্রত হয় নাই। মাইকেলের কল্পনাশক্তি, তাঁহার ভাষা কখনও মধুর কখনও গম্ভীর, তাঁহার চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা, দুকুল প্লাবিনী বর্ণনা,—এ সমস্ত বিষয়েই মেঘনাদবধ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় ; এবং তাহার গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালই ধ্বনিত হইবে। কিন্তু মাইকেলের কার্পণ্য তখনই অনুভূত হয়, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি,—এ সব কিসের জন্য ? এই যে রণসজ্জার দুন্দুভিনাদ,—কালমেঘাবৃত অম্বরে বিজুলীচমকের মত বীরাঙ্গনার এই যে রুদ্রমূর্ত্তি, এই যে সীতা-সরমার

করুণ কাহিনী,—দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র-সৈকতে মেঘনাদের অন্তিম শয্যার হৃদয়াবরুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস,—একি কেবল কল্পনার মায়ামরীচিকা? কোনও গভীর সত্যের মধ্যে যদি সৌন্দর্য্যের প্রকাশ না হয়, কবি যদি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বোধ লইয়া ঋষিপদ-বাচ্য না হইতে পারেন, তবে তাঁহার কবিতার সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যেরই এমন একটা মহীয়সী শক্তি আছে যে সে অজ্ঞাত স্বর্গের রাগে হৃদয় রাঙিয়া তুলে, মনের গুপ্তকোণে অশ্রুত দৈববাণী ভাষায় গুঞ্জরিয়া উঠে;—কিন্তু যে আভাসে ও ইঙ্গিতে, যে শিশির-স্নাত অমল শোভায় হৃদয় পুলকিত করে,—তাহা যেন জ্যোৎস্নার আধআলো জাগরণ, সত্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ তাহাতে না পড়িলে তাহার স্বরূপ প্রাণে পরিস্ফুট হয় না। ভাব ও সৌন্দর্য্য সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে স্বপ্নলোকের সত্তাহীন মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না—ইন্দ্রিয়ের পুলকে প্রাণে দাগ পড়ে না।

গোপন কথা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

কইব ভাবি কতই কথা, কাছে পেয়ে ব'ল্‌তে নারি কিছু,
কেঁদে মরি চোখের আড়াল হ'লে,
চাইতে গিয়ে মুখের পানে, হ'য়ে আসে নয়ন দুটি নীচু,—
কঠিন মোরে ভাবিসনি তা ব'লে;
সুধান যবে হাতটি ধরে, 'মনোমত নইকি তোমার আমি,
যোগ্য তোমার নই কি আমি মোটে?'
সরম ধরে অধর চেপে, হয় না বলা 'আমি তোমার, স্বামি'!
নীরবে প্রাণ চরণ-তলে লোটে।
জানিস্ তোরা যতই রাগি, যতই করি ভারি গলার স্বর,
সবি আমার লোক-দেখানো—ছল,
নয়তো তাঁরে তোরা যখন ডাকিস্ ব'লে 'ওগো, দিদির বর'
হৃদয় বলে 'আবার ফিরে বল';

দিসনিক' ভাই আড়ি ক'রে, কপট কোপের করি বলে ভান,
তোদের কাছে নেইত কিছু ছাপা,
চতুরতায় যায় কি প্রাণের লুকিয়ে রাখা সবার বড় দান,
স্নেহের কাছে প্রেম কি থাকে চাপা?

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তিন বন্ধুতে আবার আলাপ আরম্ভ করিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল?'

প। আইন-ভঙ্গ করছেন! 'আপনাদের' না 'তোমাদের'? আলাপ হচ্ছিল গাঁয়ের প্রজাদের দুর্দ্দশা—জমীদারদের কর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন বিনি খরচায় বিনি ক্লেশে গরীবের দুঃখ দূর করছিলাম আমরা অন্ততঃ আমি ভবানী সত্যই একটা হাতে কলমে কাজ করেছে—কি জান? ওদের মাছমারী মহালে এক গুণধর নায়েব—কি নামহে ভবানী? পতিতপাবন, হ্যাঁ ইনি খুব প্রবল প্রতাপে প্রভুর কাজ করছিলেন—দুচার ঘর প্রজার বাসোচ্ছেদ গৃহদাহ প্রভৃতি কাজে তাঁর প্রতাপের মাত্রা এতই বেড়ে ওঠে যে ভবানী বলে কয়ে খুড়োকে দিয়ে তার জবাব করে দিয়েছে নতুন এক নায়েব আসছে—এসেছে না হে?

ভ। আজকাল মধ্যেই আসবে—

প। ইনি আবার কেমন হবেন তা জানিনি! তুমি তাকে চেন?

ভ। শুনিছি খুব দক্ষ,তবে কিসে দক্ষ কাজে কলমে দেখলে বোঝা যাবে—

যাত্রী মহোদয় ওরফে এই নুতন নায়েব বাবু ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতেছিলেন। বিবর্ণমুখ খানা ব্যাচারী জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে ধানের ক্ষেত ও নীল আকাশের দিকে ঘুরাইয়া রাখিল। কলিকার আগুন কলিকায় নিবিয়া গেল।

প। দেখ ভবানী তুমি এবার হতে মাঝে মাঝে incognito হয়ে মহালে বেড়াতে যেও বাস্তবিক তোমারও তো ভাই কর্ত্তব্য সেটা—

ভ। নিশ্চয়! তবে কি জান—থাক্ সে কথা—

গাড়ী যাত্রীপুঙ্গবের গন্তব্য ষ্টেশনে আসিল। ব্যাচারী তাড়াতাড়ি বোঁচকাবুচকি লইয়া নামিতে ব্যস্ত হইল। বন্ধুরা ধরাধরি করিয়া জিনিষগুলা নামাইয়া দিল। পঞ্চু বলিল "মহাশয় আবার আসছেন কবে?

নায়েব বাবু উত্তর না দিয়া ভিঁড়ে মিশিয়া গেলেন। ঘামদিয়া তার জ্বর ছাড়িল কিন্তু দুর্ভাবনার ভূত ছাড়িল না। যাত্রা করিবার সময় কাছারী বাড়ীর চালে টীকটীকি ডাকিয়াছিল ও বুড়া গোমস্তা হাঁচিয়াছিল সেটা তার মনে পড়িল।

ভ। (বিজয়কে) আপনি ক'দিন দেশে থাকবেন?

বি। হয় দুদিন; না হলে একেবারেই থেকে যাব—

ভ। তার মানে?

বি। একটা কারণ ঘটেছে, মোট কথা হয়তো চাকরী করবো না—দেশে চাষ বাস করলে কেমন হয়?

প। অনভ্যাসের ফোঁটা হলে কপাল চড়্ চড়্ করবে—

বি। চেষ্টা করা মন্দ কি? অভ্যাস হতে কতক্ষণ?

প। চাষ করতে হলে ভিতরে বাইরে চাষা হতে হবে। চাষা মানে uncultured boor নয় কৃষক কৃষিজীবি—

বি। বাঙ্গালী মধ্যবিৎরা তো হাজার বছরের চাষী; দুপুরুষেই না হয় চাকরে বাবু হয়েছে—চাষী বলতে আমি বলছি genlteman farmer নয় কি ভবানী বাবু?

ভ। বটেই তো—?

পঞ্চু হঠাৎ সুর সহকারে গান হাকিল:—

আদম যখন ঠেলতো লাঙ্গল ইভ্ ঘোরাতো চরকা
বংশ গুমর যার যা যত ঐ খানেতেই ফাঁকা
বাবা ঐ খানেতেই ফাঁকা—

বি। বাঃ পঞ্চু বাবু আপনার খাসা গলাতো?

প। গদলী বল-সাধু ভাষা বলবে।

ভ। গদলী কি?

প। কলা যদি কদলী হয় তবে গলা কেন গদলী হবে না?

বন্ধুরা এমনি করিয়া হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতে লাগিল। গাড়ী আসিয়া হরিপালে থামিল। বন্ধুরা নামিয়া গেলেন। বুড়ী ও তার

নাৎনিটীকে বিজয় সাবধানে নামাইয়া দিল। টীকিট দেবার সময় ভবানী ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া বুড়ীর ও তার নাৎনির উপরি দেনা ভাড়া মিটাইয়া দিতে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার ভবানীকে চিনিত। সম্ভ্রমের সহিত বলিল "না না ও কেন? এমন কত যাচ্ছে, আস্‌ছে—যেতে দেন।"

ভ। না মাষ্টার মশাই—তা হয় না; একটা পয়সায় আমি গরীব হয়ে যাব না, আর রেলকোম্পাণী যে বড় লোক হয়ে যাবে তাও হবে না। তবে কথা হচ্চে যে আইন বাঁচিয়ে চললে—

প। সব দিক রক্ষা হয়—এস এখন।

মাষ্টার মহাশয় অগত্যা একটা রুসিদ দিয়া এক্‌সেস্‌ ভাড়া লইলেন।

ভবানীর জন্য পালকী ও লোকজন লইয়া নিবারণ বকসী নামে একজন কর্ম্মচারী ষ্টেশনে হাজির ছিল। ভবানী পালকীতে উঠিল না, পঞ্চুর দিকে তাকাইয়া বলিল "এই তো ক্রোশ দেড়েক—চল তিন জনে হেঁটে যাই কি বল—বিজয় বাবু?

বি। আমাদের তো অপ্‌সন নাই যেতে হবেই—আপনি পারবেন? (হাসিয়া)

ভ। কেন আমি কি কোমলাঙ্গিনী পর্দ্দানশিনী? বড় লোকের বাড়ীর ছেলে হওয়া কি হাঙ্গাম! তারা যে না লোকের দোষ নেই--চলুন বেশ খোলামাঠ পাকা ধানের গন্ধ আস্‌ছে—হু হু বাতাস, বাঃ কি সুন্দর!

এই বলিয়া তিন বন্ধু মাথায় চাদর জড়াইয়া চলিতে উপক্রম করিবেন, এমন সময় নিবারণ বকশী হুজুরের কোমলপদ পল্লবের ভবিষ্য অবস্থা কল্পনা করিয়া সভয় সকাতর কণ্ঠে বলিল:—

"আপনি কেন হেঁটে যাবেন? পাল্কী তো আছে বৌ রাণী মা (নয়নতারা) আমায় বকবেন যে?—"

ভ। না বকবেন না আমি হেঁটেই যাব, তোমরা দয়াময়ীর বাজারে গিয়ে অপেক্ষা কর না পারি তখন পাল্কীতে চাপবো—

নিবারণ অগত্যা কিছু কিছু পাল্কী লইয়া চলিল। তিন বন্ধু মাঠে গিয়া পড়িল। ধান জমির আল ভাঙ্গিয়া কিছু কিছু চলিতে লাগিল। ভবানী কথা পাড়িল—

কলকাতার ধোঁয়া-ধুলো ভরা বাতাসে আর গ্রামের এই তরতরে হালকা বাতাসে কত তফাৎ তা নিশ্বাস টেনেই বোঝা যাচ্ছে নয় কি?

বি। তা আর বলতে? কিছু দিন থাকলেই বেশ বোঝা যায় যে—

প। পিলে পিভারের সঙ্গে পল্লী বাতাসের কি নিবিড় ঘনিষ্ট আত্মীয়তা! বিজয় ও ভবানী খুব হাসিয়া উঠিল।

ভ। কবি যখন গান তৈরি কল্লেন—

পল্লী আমার জননী আমার! আমার জন্ম-জন্মের দেশ!

প। একি মা তোমার মলিন বসন পিঁচুটী নয়ন রুক্ষ কেশ?

ভ। পঙ্কুর মত কুসন্তান আর দুটী নাই·নিজের দেশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ! আচ্ছা, কবি ও কথা লিখে কি অতি স্তুতি করেছেন বল্‌তে চাও?

প। যে কবি লিখেছিলেন তিনি কখনো পাড়া গাঁয়ে পা দেন নি আর তিনি কলকেতার তেতালার ছাতে বিলাতী ফুলের টবের পাশে বসে চাঁদনি রাতে ওটী লিখেছিলেন—তিনি মিছে কথা লিখেছেন—দাদা যে থাকে সম্বৎসর পাড়া গাঁয়ে—

ভ। আমিতো ছিলাম—

প। তোমার কথা ছেড়ে দাও নবনী ভোজন করে ফুলেল তেল মেখে দুগ্ধফেন বিছানায় শুয়ে রুইমাছের মস্তকভোজন করে অমনি থাকৃতে পাল্লে তো? তা ক'জন পারে? যাচ্ছ তো বিজয় বাবু দেখবে, এইতো মড়কেশ্বরী দেবীর busy season ঘরে কেমন উৎসব লেগে গেছে! সে কালের গল্পে শোনা যায় রাজা মাত্রেরই একটী ছদ্মবেশ ধরা রাক্ষসী রাণী থাকতো। সে দিনে মনমোহিনী রাত এলেই হাতীশালের হাতি ঘোড়া সালের ঘোড়া খেতো। এই ম্যালেরিয়াটী আমাদের সেই রকমের রাক্ষসী রাণী ছমাস দেশের মাটীর ভিতর লুকিয়ে থাকে ছমাস বেরিয়ে এসে চামুণ্ডা বেশে শ্মশান লীলা লাগিয়ে দেয় তখন দেশময় মরারই কি একটী নেশা চেপে যায়!—

বলিতে বলিতে পঙ্কুর উজ্জল চোখ দুটা যেন জলে ভরিয়া উঠিল; কণ্ঠস্বর তীব্র হইতে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ভবানী ও বিজয় পঙ্কুর কথার সত্যতা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিজয়ের এমন অভিজ্ঞতা নাই তবে কল্পনায় সে সে-চিত্র আঁকিতে পারিল।

পঙ্কু চুপ করিলে, আর কেহ কোনো কথা কহিল না। নিজে নিজে নিজ্ অন্তরের সেই বর্ণনার সত্য ছবি আঁকিতেই ব্যস্ত। অসাবধানে চলিতে চলিতে ভবানীর পা আল হইতে পিছলাইয়া মুচড়াইয়া গেল। পিছনে বিজয় ছিল ধরিয়া না ফেলিলে ভবানী পাশেই সজলধানবনে পড়িয়া যাইত। পঙ্কু বলিল খুব লেগেছে?

ভ। না

প। বলেইছিতো দাদা অনভ্যেসের ফোঁটা! (উচ্চস্বরে) ও বক্‌শী মশাই পাল্কী আনতে বলো।

বক্‌শী ব্যস্ত হইয়া কাহারদের ডাক দিয়া পাল্কী আনিতে হুকুম করিল। নিকটে একটা বট গাছ তলায় পঞ্চু ভবানীকে বসাইয়া তার পায়ের সেবা আরম্ভ করিল। ভবানীর বড় লজ্জা হইল। আধ ক্রোশ না আসিতে আসিতে এমন রসভঙ্গ হইবে সে ভাবে নাই। বাধ্য হইয়া সে পাল্কীতে চাপিয়া আগে যাইতে বাধ্য হইল! ভবানী পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল "একেবারে গিয়ে নেউগী ঘাটে নাম্‌বো, তোমরা সেই খেনে এস—"।

বিজয় ও পঞ্চু সরকারী সড়কে উঠিল। মাটীর রাস্তা খুব চওড়া। গরুর গাড়ীর যাতায়াতে স্থানে স্থানে চাকার চাপে কাটিয়া গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। দুধারে ধানের ক্ষেত, যতদূর চোখ যায় ততদূর কাঁচাপাকা ধানেভরা। তারি বুকে দূরে কাছে ছায়াশীতল বনবেষ্টিত ছোট ছোট গ্রামগুলি সমুদ্রের উপর ছড়ানো দ্বীপখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। দুইবন্ধুতে কথা চলিল।

প। ব্যাচারী বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে—

বি। লেগেওছে খুব বোধ হয়?

প। সভ্যমানুষের কিন্তু লাগার চেয়ে লজ্জাটাই বেশী কষ্ট কর—

বি। জমীদারের ছেলের মত তো চাল চলন নয়?

প। এইটেই আমাদের এখন পরম সান্ত্বনা ও আশ্বাসের কথা।

বি। কেন?

প। জনের পর রিচার্ড-রাজত্ব যে জন্যে কামনা করেছিল লোকে—

বি। আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, কিন্তু কেউ যদি আপনার পরিচয় আমার কাছে চায় তা দিতে পারব না—আমি কি অজ্ঞ! সহরে আজন্ম বাস করে কুনো হয়ে গিইছি। দেশের এমন সব রত্নদের পরিচয় জানিনি! সত্যি, বড় লজ্জার কথা—

প। (হাসিয়া) খুব জহুরী তো আপনি। আমি যে রত্ন তা জেনে ফেলেছেন? তবে পরিচয় শুনুন;—"আমি শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা, পিতা ঈশ্বর গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উপস্থিত নিবাস চেতলা গ্রামে মাতুলালয়ে; মাতুল শ্রীহরকালী তর্কসিদ্ধান্ত, ভিক্টোরিয়া টোলের ন্যায়ের অধ্যাপক। মদীয় জননী দেবী জীবিতা। শর্ম্মা দেশের টোলে প্রায় অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির

সঙ্গে কুস্তি কসরৎ করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কৈশোরে রাজধানীতে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করতে আরম্ভ করেন। এখনও তাই চল্‌ছে; সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যাও লাভ হচ্চে। সত্যি ভাই আমার ঝোঁক না হলে আমাকে জন্মটা কাল ব্যাকরণের লোহার কড়াই চিবিয়ে মরতে হতো! খুব বেঁচে গেছি, ভাই—ভাব দেখি একবার, ৮ 'বছর ধরে 'সহর্ণেঘঃ স্তুভিঃতুশ্চ চাকে-টপ্‌' এই-ই করছি! এদিকে বাঙ্গলায় লিখছি সপরিবার সহ, 'কুশল সংবাদ প্রাপ্তি হইয়া, গঙ্গাস্তীর!—

বি। আপনার মামা বুঝি ইংরাজী পড়ার খুব পক্ষে?

প। খুব! বলেন,—'জ্ঞান আবার দিশি বিলিতি কি? জ্ঞান হাওয়া জলের মত; খাঁটী হলেই হলো; যাতে মানুষের মন বাড়বে, যে জ্ঞানে জীবনে কাজ দেবে তাই অর্জ্জন করতে হবে; তিনি দুঃখ করেন—কতকগুলো বাজে অকেজো কথার চালাকি শিখে জীবনটা নষ্ট করলাম! ছেলে পুলে যেন ও ভুল না করে। তাইতো মশাই বেঁচে গেছি।

বি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের দর্শন ও কাব্য সম্পদ খুবই সুভোগ্য।

প। তা কে ভোগ করতে মানা করেছে? শাঁস খেতে হবে বলে ছাল ছোবড়া চিবোনা থেকে আরম্ভ করতে হবে তার কি কথা আছে?

হঠাৎ উভয়ের কথা থামিল। অদূরে একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে। গাড়ীর চাকা মাটীতে পুঁতিয়া গিয়াছে। গাড়ীতে ধানের বস্তা ঠাসা বোঝাই। একটা গরু নন্‌কোঅপারেশন ব্রত লইয়া জোয়াল হইতে ঘাড় সরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাষী গাড়োয়ান বোঝাই বস্তার উচ্চাসন হইতে প্রাণপণে তাহাকে ঠেঙ্গাইতেছে। এবং তাহার জীব-কৌলিন্যের একমাত্র সনাতন চিহ্নস্বরূপ ল্যাজটিতে ঘনঘন নির্ম্মম মোচড় দিয়া চতুষ্পদ ব্যাচারীর উর্দ্ধপুরুষ ও অন্তঃপুরিকাদের সহিত নানারূপ নিকট সম্বন্ধ পাতাইয়া তিরস্কার তাড়না করিতেছে; কিন্তু গো বেচারী প্যাসিভ রেজিষ্টান্‌সের চরম ধৈর্য্য দেখাইয়া বাঙ্গালীকে লজ্জা দিতেছে। সে অনড় এবং অচল।

বন্ধুদ্বয় দূর হইতে অবলাজন্তুর প্রতি এই উৎপীড়ন দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইল। পঙ্কু তাহার বিপুল মাংসল দেহখানা সঞ্চালিত করিয়া প্রথমে গাড়োয়ানকে বলিল—"তুমি কি রকম লোক হে? ব্যাচারীজন্তু পারছে না, আর তুমি তাকে নির্দ্দয়ভাবে মারছ? নিজে চাকা ঠেল না?"

গাড়োয়ান প্রথমটা থতমত খাইয়া কথায় কাণ না দিয়া প্রহার চালাইতে লাগিল। পঞ্চু তার ছড়িটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে টান দিয়া নামাইল; এবং বিজয়কে যোগ দিতে বলিয়া চাকা ঠেলিতে আরম্ভ করিল। দুইজনের সমবেত চেষ্টায় চাকা উঠিল। চাষা তখন গরুকে জোয়ালে ঠিক করিয়া গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়োয়ান একটী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিদ্বারা সাহায্যকারী বাবুদের খাতির করিয়া বিনা বাক্যে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুই জনে দয়াময়ীর বাজার পার হইয়া চলিল। বেলা তখন ১১টা হইবে।

অশ্রু

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

আঁখিবারি,—আঁখিবারি, ওরে আঁখিবারি!—
কেমন লগনে তোরে কি ভাবি বিধাতা রে,
সৃজিয়া সাজায়ে দিল আঁখে সারি সারি!
দুখে সুখে মিশাইয়া
করুণা মাখায়ে দিয়া,
নিভৃতে বসিয়া তোরে শান্তি মাঝে ডারি
গড়েছিল এক মনে ওরে আঁখি-বারি!

ওরে আঁখি-বারি ওরে শান্তির কণিকা,
হৃদিমাঝে চূর্ণকরা দুখ-ধূলিকায়
ঢেলে দিস্ সুশীতল পীযূষ রেণুকা,
উদ্দাম সিন্ধুর প্রায়
হিয়া মাঝে, শান্তি-ছায়
ধৌত করি' রেখে যাস্ দুখ—কুহেলিকা।
ওরে আঁখি-বারি তুই শান্তির কণিকা!

নয়নে উথলি' যাক্ ছল ছল ছলে
হিয়া হ'তে কাড়ি' নিয়া দুখের বীজাণু
গগনে ছড়ায়ে দিস্ পবন হিল্লোলে,
তোহার তরুণ গায়
দুখ যে তরলি' যায়,
গলিয়া মিশিয়া তোর তপত পল্বলে
সমাহিত হয় যত দুখের কল্লোলে।

উঠরে ফুটিয়া মোর আঁখি তারকায়
শতে শতে বিন্দু বিন্দু ওরে আঁখি-বারি;
দুখ যে লাগিয়া আছে আমার হিয়ায়
প্রক্ষালি' সে দুখ রাশি
ফুটায়ে শান্তির হাসি
রজনী বিগতে ফুটা স্নিগধ উষায়
ওরে আঁখি-বারি সুখ-রশ্মির রেখায়।

গঙ্গ দুটী বহি মোর ওরে আঁখি-ধারা
মন্দাকিনী-স্রোত সম আয় বেগে নামি'
প্রলেপি হৃদয়ে যত জ্বালা রুদ্ধ-করা।
স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত
প্রীত শীত রুদ্ধ চিত
তোহার প্রভাবে হবে রুদ্ধ হৃদি-কারা।
ওরে ও কল্যাণ-ময় ওরে অশ্রু-ধারা!

জগতজুড়ে ইঙ্গিত

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

আজ কাল মানুষ জড়বাদের মায়া কাটিয়ে উঠে যে এক নতুন সত্যময় জগতের সম্মুখীন, সেকথা নানাদিক্ দিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে। য়ুরোপের জড়বিজ্ঞান এখন শুধু জড় বা শক্তিরই কথা বলে না, আরও অনেক দূর যায়। জগতটা যে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের প্রকাশ, তা' একরকম অভ্রান্ত বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম জগতের অনেক ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষায় লেগেছেন। মানুষ যে জড়ের গণ্ডীতে এতটুকু দীন হয়ে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ভোগের ক্ষুদ্রতায় নিঃশক্তি হয়ে পড়্‌ছিল, এবার বুঝি সে স্রোত ফিরলো। অনন্তের ব্যক্ত স্বরূপের প্রতি পরমানুটির বুকেও অনন্তই বিরাজিত, পূর্ব্বে যে পূর্ণেই মূর্ত্তিমান তা' একবার বুঝতে পারলে মানুষের দেবজীবন ফিরে আসবে; তার সভ্যতার ভিত বিশাল সত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন রূপ নতুন ঋদ্ধি ও বিচিত্রতায় ভরে উঠবে।

য়ুরোপ বাহির থেকে খুঁজে খুঁজে অন্তরের রাজ্যে এগিয়ে চলে; য়ুরোপের মনের গতি—প্রকৃতির ধারাই এই রকম। তাই সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সত্য ধরতে সহজেই তাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সে ভুল অচল হয়ে তাদের জীবন পঙ্গু করতে পারে না, ভুল কেটে যায়, কারণ তাদের জ্ঞানের সংযম ও সত্য পিপাসা Scientific spirit অসীম। যোগ শক্তিতে (spiritual powers) তারা বহির্ম্মুখী জাতি বলেই বড় দীন, এ শক্তি আমাদের দেশে অনেক আধারে স্বভাবতঃই আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সত্য আবিস্কারের প্রেরণা আমাদের মধ্যে নাই। এই দুইটি একাধারে যার মধ্যে প্রকাশ পাবে সেই মানুষই পরা বিজ্ঞান জগতের সত্যের ছন্দে বাহিরকে বেঁধে দেবে।

ফ্রান্সের (Le Martia) ল মাৰ্ত্যা কাগজে এই সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা হুবহু অনুবাদ করে দিলাম।

"দিনে চল্লিশবার করে বলো, যে আমি সব রকমে ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাচ্ছি, তা' হলেই তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবে।" এই হচ্চে নান্সি সহরের ফরাসী ডাক্তার মুসিয়ে ফুএর শাস্ত্র। এই বিধান অনুসারে সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন। মুশিয়ে ফুএ একজন অদ্ভুত মানুষ; ফ্রান্স, ইংলণ্ড

এমন কি এমেরিকা থেকে যে সব রোগী তাঁর কাছে আমে তাঁদের তিনি চিকিৎসাই মাত্র করেন না, তিনি করেন তার চেয়েও অনেক বড় একটি ব্যাপার; এক মুহূর্ত্তেই তিনি তাদেরই নিজের নিজের রোগের ডাক্তার বানিয়ে ফেলেন। এই সৌম্য শুভ্রকেশ উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধ তাঁর চিকিৎসা প্রণালী আমাদের কাছে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর আশার অন্ত নাই। "আমি বিশ বৎসর থেকে এই যে auto-suggestion অভ্যাস করছি, এ সত্যটির বল অভাবনীয়। আমি যে ব্যাধি বা পীড়ার চিকিৎসক সে ধারণা তোমরা মনে আদৌ করো না, পীড়ার চিকিৎসক বলে কোন জিনিষই জগতে নেই। লোককে আমি auto-suggestion দিয়ে নিজেই নিজের সব রকম ব্যাধীর চিকিৎসা করতে শেখাই। কিন্তু অনুগ্রহ করে সব কথার গোড়ায় আমাকে একটি বিশেষ সত্যের ওপর তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দাও। লোকে কিন্তু এ সত্য এখনও তেমন স্বীকার করতে চায় না। লোকে যাই-ই বলুক না কেন, ইচ্ছাশক্তি (will power) আমাদের চালায় না, চালায় কল্পনা শক্তি (imagination)। আমাদের মধ্যে দু'টি সত্তা আছে, একটি সচেতন (conscient)—যেটি হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাশক্তির নিয়ামক; আর একটি হচ্ছে অচেতন (inconscient) যেটি আমাদের কল্পনাশক্তিকে চালায়। এখন এই দুইটির মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয় তবে কল্পনা শক্তি চিরদিন জয়ী হয়। মাটির উপর যদি একখানা দশ মিটার (metre) লম্বা ও ২৫ মিলিমিটার চৌড়া তক্তা পাতা যায়, তা' হলে তার উপর দিয়ে সহজেই তোমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পার। এখন মনে কর যে তক্তাখানা একটা বিরাট গহ্বরের উপর পাতা আছে; তা' হলে তোমরা আর একপাও অগ্রসর হ'তে পারবে না। এর অর্থ তোমাদের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তোমাদের কল্পনাশক্তি। তুমি চাও কিন্তু পার না। লোকে ইচ্ছা-শক্তির চর্চ্চার কথাই প্রায় বলে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় কল্পনা শক্তিকে কি রকমে কি ভাবে চালাতে হয় তাই জানা বেশী দরকার। মনে রেখো আমাদের ভিতরের অচেতন সত্তাটিই আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে চালায়। সুতরাং যদি ঠিক ঠিক কল্পনা করা যায়, যে, আমাদের প্লীহাটি অথবা পাকস্থলীটি তাদের কাজ ভাল রকম করছে তবে সেই কল্পনার জোরে নিশ্চয়ই তাদের কাজ তারা ভাল রকম করবে। এটা ধ্রুব সত্য।"

auto-suggestionএর শক্তি দেখাবার জন্যে মুশিয়ে কুএ তাঁর রোগীদের কাছে এই সহজ পরীক্ষাটি করেন। তিনি তাদের জোর করে মুঠো বন্ধ করে

হাত লম্বা করে দিতে বলেন ; তারপর বলেন, "ভাব, মুঠো আমি খুলতে চাই কিন্তু পারি নে।" রোগী শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা ভাবে আর সত্য সত্যই আঙ্গুল খুলতে পারে না। মুশিয়ে ফুয়ে তখন আবার বলেন "ভাব,এখন পারি ।" রোগী তৎক্ষণাৎ সহজেই মুঠো খোলে। তাঁর উপদেশ এই যে "auto-suggestion অভ্যাস খুব সহজ জিনিষ, রোজ সকালে ও বিকেলে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করবে আর মনকে একাগ্র করবে। পর পর কুড়িবার মনে মনে বলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দড়িতে কুড়িটা গেরো গুণে যাবে (mechanically), যে, "রোজ রোজ আমি সব রকমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছি।"

মুশিয়ে ফুয়ে অবশ্য স্বীকার করেন যে তিনি সব রকম রোগ সারাতে পারেন না। কিন্তু তাঁর রোগীরা যে সব রোগ নিজেরাই সারিয়েছে তা' খুব অদ্ভুত রকম ব্যাপার। কয়েকজন দুরারোগ্য দুষ্ট ব্রণ (cancer) আরোগ্য করেছে, দু'জন যুবতী মেয়ের ন্যাড়া মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে। এক জন মহিলা এই auto-suggestion দিয়েই তাঁর দাঁত তুলে ফেলেছেন, অথচ কোনই কষ্ট পান নি আর কয়েক second এর মধ্যেই রক্তস্রাবও বন্ধ করতে পেরেছিলেন। অনিদ্রা রোগে এ ওষুধের মার নেই। সময়ে সময়ে আমার এখানে বাস্তবিক ভেল্কির কাণ্ডই (miracle) ঘটে। একজন বৃদ্ধা চাষীর মেয়ে কত বৎসর ধরে হাঁটতে অপারগ ছিল। তাকে নাকি সহরে গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ফিরে কিন্তু সে হেঁটে নিজ গ্রামে চলে গেছে।" মুশিয়ে ফুয়ে এই ভেল্কির ব্যাখ্যা এই ভাবে দেন, "মেয়েটির সত্যি সত্যিই পক্ষাঘাত হয়েছিল, পরে তার অজ্ঞাতেই রোগটা সেরে যায়। কিন্তু অভ্যাসের ফলে সে মনে করতো, যে, তার পক্ষাঘাত তখনও আছে। সেই জন্যেই auto-suggestion এমন সহজে ও অবিলম্বে কার্য্যকরী হতে পেরেছিল।" auto-suggestion এর উপর মুশিয়ে ফুয়ের অসীম বিশ্বাস। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করছেন যে এর দ্বারা মৃত্যুকে জয় না করতে পারলেও বার্দ্ধক্যকে অবশ্যই জয় করা যাবে। নিজের ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ করা যাবে এবং শুধু তাই নয়, মা যেমন চাইবে সন্তানও ঠিক তেমনই মানসিক ও শারীরিক গুণ নিয়ে জন্মাবে। কিন্তু যদি "দেখি পারি কিনা" এ কথা বললে চলবে না, বলতে হবে, "সন্তান নিশ্চয় এই রকমই হবে।"

তাঁর হাজার হাজার শিষ্যরা মুশিয়ে ফুয়েকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে বিশ্বাস করে ; কিন্তু তিনি সরল ভাবেই বলেন যে তিনি সামান্য নগণ্য মানুষ।

মুশিয়ে ফুয়ে যে তত্ত্বকে কল্পনাশক্তি নাম দিয়েছেন তা' প্রকৃতপক্ষে Faith বা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুয়ের শক্তি আছে কিন্তু জ্ঞান খুব বিরাট নয়, তাই তিনি ব্যাপারটি তলিয়ে বুঝতে গিয়ে বড় গোল বাধিয়েছেন। ভোগ পাগল বহির্ম্মুখ মানুষের এই স্বভাব ; বুদ্ধি ও মনের গণ্ডীর মাঝে সে সব তত্ত্বের রহস্য খুঁজে মরে। বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব করে, কারণ মানুষের হৃদয়ের শক্তি এই বিশ্বাস তার সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অনন্তের মাঝে তার সত্তার দুয়ার খুলে দেয়। "আমি এতটুকু" "এই আমার সীমাবদ্ধ শরীর" "এই এই আমার সামর্থ্য, তার বেশী নেই" এই রকম সব জড়বুদ্ধি আমাদের সত্তার সকল ধামের সংযোগ ছিন্ন করে রাখে। মানুষ একবার সংস্কার মুক্ত হতে পারলেই শক্তি জ্ঞান আনন্দ শান্তি সবই তার অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে বইতে পায় ; বিশ্বের জ্ঞান ও শক্তি অন্তরে স্বতঃই আসে। যোগ মানে মানুষের মন বুদ্ধির সংস্কার ভাঙা ও অনন্তের মাঝে মানুষকে মুক্ত ও বিধৃত করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস খণ্ডভাবে তাই করে, কিন্তু শক্তিমান ফুয়ের সঞ্চিত বিশ্বাসের তরঙ্গ দুর্ব্বল রোগীর চিত্তে সঞ্চারিত হয়েই তারা এত সহজে বল পায় ; ফুয়ের মত শক্তিমানের কাছে না গেলে আপন ঘরে বসে রোগীকে বহু আয়াসে বহু সাধনায় শক্তি সঞ্চয় করে তারপর সাফল্য পেতে হবে।

ফুয়ের পাশ্চাত্য মন কিন্তু এ কথা মানতে চায় না, যে, এক মানুষ থেকে অপর মানুষে শক্তি বা তত্ত্ব সঞ্চারিত হতে পারে। তাই পক্ষাঘাত গ্রস্থা রোগিনীর বিষয়ে তাঁর অমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের বল অনেক, কিন্তু তার সঙ্গে জ্ঞান না খুললে সে বিশ্বাস বৃহৎ জীবনে কার্য্যকরী হয় না, পঙ্গু হয়ে থাকে এবং অশুদ্ধ আধারে মনের বাসনাময় মানুষে সহজেই জগতের অহিতকর হতে পারে।

পশ্চাত্য মনের সত্য অনুসন্ধিৎসার ফলে জড় ও সূক্ষ্ম জগতের অনেক সত্যের প্রকাশ ক্রমে হচ্ছে ; কিন্তু যোগশক্তির অভাবে পরা জ্ঞান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তার গতি বড় এলোমেলো ও হাস্যকর। দি ফোরামের (The Forum) ১৯২১ সালের মার্চ্চের সংখ্যায় রিচার্ড এল্ গার্ণার (Richard L. Garner) কল্পনায় ভাবী মানুষের যা' ছবি এঁকেছেন তা' এমনি সত্যমিথ্যার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। তিনি বলেন, "আহার কমে গিয়ে মানুষের গলনালী ক্ষীণ হয়ে যাবে। প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ এখনকার চেয়ে ঢের সহজে নিজের খাদ্য পাক করতো। এখন আহার যেমন জটিল ও ভোগ্যবহুল ব্যাপার রোগও তেমনি

বেড়েছে। ঝোনা নামক বাদামে দেহ পোষণের সার ঘনীভূত ভাবে আছে, এই সব দেখে মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি গুলি বা বড়িতে সার একত্র করে আজ কাল কৃত্রিম খাদ্য তৈয়ারী করছে। এখনই desiccated soups ও নানা রকম মাংস ও দুগ্ধ-সার পাওয়া যায়, এক রকম আগেই হজম করা predigested সহজপাচ্য খাবারও বাজারে দেখা দিয়েছে; এখন তা' রোগীতে খায়, পরে সুস্থ মানুষেরই তাই আহার হবে। ভবিষ্যতের মানব জাতির মধ্যে উৎসবে নিমন্ত্রণে ভূরিভোজনের ঘটা থাকবে না, যে ঘরে নিমন্ত্রিতরা বসবে সেই ঘরে ফুলের তোড়া থেকে সুধার সার (ambrosial proteides) সুগন্ধে বাতাস ভরে রাখবে। মানুষের স্নায়ু স্পর্শ করে এই সুধাসার আনন্দে সকলকে মত্ত করবে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি সাধনও করবে; নূতন দৈহিকশক্তি সম্পন্ন শক্তিমান মানুষ সেই সার দেহে আকর্ষণ করে নেবে।

কথা বলতে গিয়ে শ্রোতার কানের কাছে শব্দে ঝড় না তুলে সে যুগে মানুষ telepathy বা ভাব সঞ্চার শক্তিতে বহুদূরের মানুষের সঙ্গেও সচ্ছন্দে কথা বলবে। শরীরের বহু রোগ জয় হয়ে যাবে, আহার সহজ হওয়ায় প্রাণ শক্তির অপচয় স্বতঃই নিবারণ হবে। দূরস্পর্শ ও দূরশ্রুতির মত অনেক শক্তিই মানুষ অর্জ্জন করে দেহে ও মনে সুন্দর ও শক্তিমান হ'য়ে উঠবে। আকাশবাণী ও দিব্যগীত তার নূতন কর্ণে সদাই বাজবে, বহু নূতন বর্ণ ইন্দ্রধনুর শোভায় জেগে চোখের তৃপ্তি সাধন করবে। নিমন্ত্রিত মানবমণ্ডলী পুষ্পাবৃত চক্ষে সুধাসার গ্রহণ করিতে করিতে এইরূপ দিব্যগীত ও দিব্য জ্যোতির বর্ণ ধনুতে আনন্দ পাবে।"

গার্ণারের এই স্বপ্ন-জগত অধিকাংশই কল্পনার আতিশয্য ও খেয়ালের গাঁজাখুরি ব্যাপার। মানুষে অনন্ত শক্তি লীন আছে তা সত্য, হয় সবই; কিন্তু সত্য দেহ কিম্বা জীবনকে পঙ্গু করে না, আরও পূর্ণ করে। শুধু রোগ কেন মৃত্যু অবধি মানুষ জয় করতে পারে। অরবিন্দ—বলেন, "রোগ যখন বাহির থেকে আসে তখন প্রথমে তাকে সূক্ষ্ম ও প্রাণ শরীরেই ধরা যায় ও সে অবস্থায় তা সহজেই নিবারিত হতে পারে। মানুষ স্থূল দেহের জ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই হারিয়ে রোগের আক্রমণের কাছে অসহায় হয়ে আছে।" যে বৈজ্ঞানিক এডিশন বিতারা খবর, টেলিফোন, ইত্যাদির আবিষ্কর্ত্তা তাঁরা তিন পুরুষে মিতাহারী ও দীর্ঘজীবি ছিলেন। মিতাহারের ফলে তাহার ঠাকুরদাদা ১২০ বৎসর অবধি সবল সুস্থ কর্ম্মট দেহে বেঁচে থেকে জীবনের সব সাধ পূর্ণ হওয়ায় দেহ ধারণে বিরক্তির জন্য সহজে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

জগত ভরে এইভাবে মানুষের অভিব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই মানুষকে যে অভিসারের পথে বের করে তার চরণ দু'টিকে যে কুঞ্জ অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে তা' আত্ম-রতির অভিসার, সে কুঞ্জও তার গহন আনন্দময় আত্মলোকের কুঞ্জ। মানুষ এবার আপনাকে নিঃশেষ করে পাবে, নিজের স্বরূপের সহজ বিকৃতির মাঝে অটল আসন নেবে, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে তা' উজ্জ্বল, স্বভাবের আনন্দে তা' বিপুল বিশ্বময়, শক্তির শান্ত পূর্ণতায় তা' অবলীলায় সৃষ্টিমুখর।

এ যুগান্তরের আভাস জগতজুরেই এসেছে। সকল দেশেই এই বাণী বহন করে আত্ম-জ্ঞানী সাধক চক্র গড়ে ভাগবত আসন রচনায় রত। জার্ম্মাণীতে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-অন-মেনের কাছে ডার্ম্‌ষ্টাডে (Darmstadt near Frankfrot-on-Main) কাউণ্ট কৈসারলিং (Count Keyserling) তাঁর জ্ঞান-পীঠ বা School of wisdom খুলে বসেছেন। তাঁর প্রভাব জার্ম্মাণীতে এখনি প্রবল হয়ে উঠে নব-জার্ম্মণী নির্ম্মাণের কাজে বহু তরুণ স্ত্রী পুরুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। ঐহিক ভোগী কৈসারলিং এখন কবি ও দার্শনিক, তাঁর প্লেটো কনফিউসিয়স বুদ্ধ ও ক্যাণ্টের ভাব থেকে আহরিত নতুন সত্য তরুণ জার্ম্মণীর নিকট জীবনের নতুন ভিত্তি, নতুন ছন্দ এনে দিতে চায়। গত যুদ্ধে বহু রাজ্য ও সম্পদ হারিয়ে আজ সে দেশের তরুণেরা জড়বাদ ও পশুশক্তির ওপর আস্থা হারিয়েছে এবং আত্মার অন্তর্লোকে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছে।

চীন দেশেও জেন (Zen) সম্প্রদায়ের এক শক্তিমান যোগী কঠোর তপস্যা করে আজ এই অধ্যাত্ম সভ্যতার নতুন ভিত দেবার জন্য প্রচার ও সাধনা আরম্ভ করেছেন; তারও চারিদিকে চীনের চিন্তাশীল যুবক ও নারীরা একত্র হচ্ছে। চীনের ভবিষ্যত যে এই দলের হাতে তা' ক্রমশঃই জগতে প্রকাশ হবে; এখন নীরব নির্ম্মাণের যোগমগ্ন অবস্থা চলেছে।

ভগবানের নবজগত নির্ম্মাণের ভাগবত মানুষ গড়ার বহু ইঙ্গিত বহুদিক থেকেই নিত্যই আসছে; চারিদিকে এতকালের অসাধ্য যা' তাই অলৌকিক ব্যাপারে সিদ্ধ হয়ে শক্তির ব্যাপক রাজ্য মানবনেত্রের কাছে খুলে যাচ্ছে। সুকারি (Tsukeari) জাপানী যোগী, তাঁরও মুশিয়ে ফুয়ের মত অলৌকিক বিশ্বাসের বল আছে। তাঁর ব্যবস্থা মতে চলে ২৫১৩ জন মেয়ের মধ্যে ১৯০৮ জন ইচ্ছাশক্তির বলে পুত্র সন্তানের মা হয়েছে। সুকারী বলেন, অন্তঃসত্বা হবার দেড় মাস পর থেকে নিত্য গর্ভিণীকে মনে মনে খুব বিশ্বাসের জোরে ভাবতে হবে, যে, "আমি পুত্র সন্তান কোলে পাব।" তা' হ'লেই মায়ের

মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এ সকলই মানুষের অমানুষ শক্তির ইঙ্গিত। মানুষ মন বুদ্ধির চেয়েও ঢের বড় বড় শক্তিতে শক্তিমান, সে খণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয়।

মানব জাতি বহুবার বহুদেশে পশুর প্রাণপ্রবণ জীবন ছাড়িয়ে হৃদয়ের ও মনের অনুশীলনে জ্ঞানের সভ্যতা গড়েছে। বিবেক বিচার ও জ্ঞানেতে উঠেই মানুষ প্রকৃত মানুষ এই উঁচু ভূমি থেকেই প্রাণ ও দেহের পশুপ্রবৃত্তি ও অন্ধ-জীবন অতিক্রম ও আয়ত্ব করা যায়। দেহ থেকে বুদ্ধি ও জ্ঞান অবধি ওঠা নামাই মাত্র এত দিনের মানব ইতিহাস। আজই যে আমরা এই জ্ঞান গর্ব্বের জীবন ভিত গড়েছি তা' নয়, অনেকবারই গড়ে গড়ে হারিয়েছি। তার নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে কত জায়গায়ই না আমাদের চোখের সামনে ব্যক্ত হয়ে পড়ছে।

Martres-de-Vayre জেলার Clermont Ferrand থেকে ২৫ মাইল দূরে আঠার শতাব্দির আগেকার রোমান গল জাতির কবর বেরিয়েছে। তা' যখন প্রথম খোলা হয় তখন তার মধ্যে সুন্দরী যুবতীর রূপললাম দেহ বসন ভূষণ পাদুকায় সাজান ও নিখুঁৎ অবস্থায় পাওয়া যায়। এতকালেরও কোমল মাংসের লালিমাও তার নষ্ট হয় নি। বাহিরের বাতাস ও সূর্য্যতাপের সংস্পর্শে কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সে অনুপম দেহ ধূলা হয়ে কঙ্কালাবশেষ রেখে ঝরে যায়। কাছে কোথায় কার্বনিক এসিডের উৎস থাকায় এ সকল শরীর এমন নিখুঁৎ ভাবে কাল প্রভাব কাটিয়েও টিঁকে ছিল। সেই যুগের গলদের তৈয়ারী জুতার কারুকার্য্য নাকি অতি অনুপম, সমাধীতে যে সব ফুলদান, চুবড়ি, বাসন-পত্র পাওয়া গেছে তা'তে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষ কত যুগেই না আমাদেরই মত উন্নত ছিল। তাই বলি মানবের জ্ঞানগর্ব্বিত এ মানস সভ্যতা বহু পুরাতন। মনেরও উপরে মানুষের আর এক বৃহত্তর সত্বা আছে, যুগে যুগে সাধকেরা যোগবলে সেই ভূমিতে উঠে জীবনকে রূপান্তর করবার প্রয়াস করেছেন। যুগে যুগে সেই ভাগবত ভূমি হতে জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির জ্যোতি নামিয়ে এনে সাধকেরা বহু ভঙ্গিম মানব সত্বার এক এক ধাম আলোয় আলো করে গেছেন; এ সকলই ছিল নব-মানব গড়বার প্রেরণা, মানুষকে তার পূর্ণ বৈচিত্রে সকল সত্বায় রূপান্তর করে ভাগবত জীবনে সার্থক করবারই ক্রম ইতিহাস। এ যুগে সকল অতীত যুগের সেই অভিব্যক্তি ও রূপান্তরকে একই আধারে সামঞ্জস্য দিয়ে ভগবান মানুষকে দেবতা করেই গড়বেন। জগতকে সে বাণী শুনতে হবে, আজ হোক কাল হোক সত্যের যুগ প্রেরণা সফল না হয়ে ফিরবে না।

বাঁধনহারা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

আজকে আমার হৃদয়-বীণে
মীড় টেনেছে তারে তারে,
হৃদয়-বীণার সুরে সুরে
মন নেচেছে বারে বারে।
বাঁধন টুটে প্রাণ জেগেছে
ভুল ভেঙেছে ভয় ভেগেছে
মুক্তি এসে ডাক দিয়েছে
আমার প্রাণের দ্বারে দ্বারে।
এতদিনের ঘুমের আবেশ
কাট্‌ল আজি নয়ন হ'তে,
মুক্তি পেলাম ব্যর্থ কাজের
অলসরাজের এ দাস খতে।
হঠাৎ আজি নয়ন খুলে
উঠ্‌ল পরাণ হর্ষে দুলে
বাহির হ'লাম সকল ভুলে
যাত্রী নবীন জীবন পথে।
দুর্ব্বলতা কাঁদে কোথায়
অত্যাচারের পাষাণ বুকে,
দুঃখীদীনের রক্ত ধারা
শোষণ করে করাল মুখে।
ভা'য়ে ভা'য়ে করছে হেলা
খেলছে সদাই মরণ খেলা
হিংসাদ্বেষের পঙ্ক-মেলা
স্বার্থ-শকুন হাসছে সুখে।

পিষ্ট দুখে ক্লিষ্ট যা'রা
তা'দের বোঝা বইব শিরে,
তা'দের পায়ে লুটিয়ে দেব
অর্ঘ্য দিব হৃদয়টীরে ;
স্নান করায়ে নয়ন জলে
বিজয়মালা দিব গলে
পরাজয়ের মর্ম্মতলে
জয়শ্রীটি আসবে ফিরে,
সমাজের এই বন্দীশালের
সকল শিকল খুলতে হ'বে
মরণের ভয় ভুলেরে আজ
জীবন দোলায় দুলতে হ'বে,
পিছের কথা মিছে গাওয়া
সামনে কেবল এগিয়ে যাওয়া
কাঁদন-ভরা ভিক্ষা চাওয়া
সকলি আজ ভুলতে হ'বে।
প্রাণের ধারা বাঁধন-হারা
ছুটবে জগৎপ্লাবন করে'
আলোর গানে প্রেমের তানে
সকল আঁধার দিবে ভরে'।
মায়ের মুখে ফুটবে হাসি
প্রাণে প্রাণে বাজবে বাঁশী
জীবন-মরণ পাশাপাশি
চলবে হাতে হাতে ধরে'।

খেয়ানী

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১)

হরি খেয়া দিত

ছোট নদী, অগাধ জল তাহাতে প্রখর স্রোত। নদীর অনতি দূরে পল্লীতে হরি থাকিত। সে সেই সকালে বৈঠা আর লগী লইয়া নৌকায় যাইত, দুপুরে ঘরে আসিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিত, আবার নৌকায় গিয়া বসিত। এই তার কাজ। হরি একলা মানুষ,—কোন দায় চিন্তা তার ছিল না। দিনমানে নৌকায় বসিয়া মানুষজন পার করাই তাঁহার কর্ম্ম ছিল। খেয়া দিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই হরির দিন গুজরাণ হইত। পয়সা জমাইবার চিন্তা তাহার ছিল না। পয়সা জমাইবার কথা উঠিলেই হরি গান ধরিত—

যখন ছিলাম মা'র উদরে
অন্ধকার ঘোর কারাগারে—(হায় রে)
তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে
কে আমায় বাঁচালে—

সুতরাং কেহ হরিকে আর সে প্রশ্ন করিত না। কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—"ছ'মাস ছ'মাস বেয়ারাম হয়ে যদি পড়ে থাক"—হরি গায়িত,—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে, হরে কালভয় হবি পার, ভবজলধি।"

হরি খেয়া দিত, কেহ তাহাকে কড়ি দিত, কেহ পয়সা, আধলা দিত; কেহ ধান চাউলের বার্ষিক চুক্তি করিত। কেহ কেহ কড়ির কড়ার করিয়া পার হইত, পরে কড়ি দিত না, আবার আসিত, আবার পার হইত এবং কড়ি দিতে ভুলিয়া যাইত। এই দলের মধ্যে ভদ্রলোকেরই আধিক্য। দেশের ভদ্রলোকেরা যাহা পরিপাক করিতে পারেন, সাধারণে তাহা পারে না।

হরি অক্ষমের নিকট পয়সা লইত না। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা ভিক্ষুকের নিকট কখনো কড়ি চাহিত না। ইহারা পয়সা সাধিলে সসম্ভ্রমে জিভ কাটিত।

হরির বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। তাহার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, ভাবে ঢলঢল সরল মুখখানি, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান কেশদাম

দেখিলে হরিকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। তাহার সরল সুমিষ্ট কথায় সবাই মুগ্ধ হইত। হরির সুমিষ্ট গলা ছিল,—অনেক সময়ই গান করিত, যে শুনিত, সেই আরো শুনিবার জন্য দাঁড়াইত। হরি তাহা লক্ষ্য করিত না, হয় ত একটা বেশ জমাট গান—মধ্যখানেই শেষ করিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। হাসিটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল।

হরি কাহাকেও উঁচু কথা কহিত না। পান বা তামাকের নেশা তাহার ছিল না। হরির কোন শত্রু ছিল একথা কেহ বলে না। সে সুখ দুঃখেরও ধার বড় ধারিত না। বাজে কথায়, বাজে দরবারে, তাহাকে কদাচিত পাওয়া যাইত। সমাজের বিচার, পঞ্চায়েতী কারবার, নিস্কর্ম্মার তর্ক, গাঁয়ের সই সালিশীর ছায়ায়ও হরি পা দিত না। সে নৌকায় বসিয়া গান গায়িত,—

বাহাত্তর বছরের পাড়ি,
বেলা আছে দণ্ড চারি,
কেমনে হইবে পার (মন আমার)

কখনো বা বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস বিহ্বলে গায়িত,—

দিন যাবে দিন রবে না,
দীনের দিন যাইবে হরি,
রবে কেবল ঘোষণা।

কোনদিন বা হরি ভরসার সুরে গায়িত—

এ ভব সাগর, হবে বালুচর
হাটিয়া হইব পার (নামের গুণে)।

(২)

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজী হরির নৌকায় পার হইয়া যাইতেন। বাবাজীর উপর হরির অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি নৌকায় আসিলে হরি নিজের আঁচল দিয়া খানিকটা জায়গা ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসাইত। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিত,—"প্রভু একটু দয়া করতে হচ্ছে।" বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেন,—হরি হাঁ করিয়া শুনিত। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত। কোনদিন বাবাজী গায়িতেন,—

"তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

দিয়া, মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে

... ...

দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।"

জীবন চক্রবর্ত্তী নৌকায় ছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি বাবাজী "হরি ছেড়ে যে তারা বুলি—"

সহাস্যে বাবাজী কহিলেন—সবই এক য়ে বাবা—সবই এক। মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বলে গেছেন—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবাই আমার এলোকেশী
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।"

ভেদজ্ঞান ছেড়ে দাও বাবা!

বাবাজী গান ধরিলেন—

দূরে যাবে সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ
শত শত শত বেদ, তা'রা আমার নিরাকারা।"

চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

(৩)

বাদ্দীদের অনেকই ছিল গরীব। তারা হাট বাজারে দোকান লইয়া যাইত। পাড়ার বৌঝিদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশী তারা বেসাতি লইয়া গাঁয়ে যাইত। এ রীতি এখনো এ দেশে আছে। তখন একটু বেশী ছিল। বেশী রকম ঠেকায় পড়িলে সোমত্ত মেয়েরাও গাঁ করিত। তখন দেশে আইনের কড়াকড় না থাকিলেও মানুষের দেহে প্রচুর শক্তি ছিল, দৃষ্টি সরল ছিল, ধর্ম্মের দিকে একটিবার চাহিয়া সকলেই কাজ করিত। তখন পাপের শাসন ছিল বেজায় কড়া আর ধর্ম্ম ছিলেন সহস্র চক্ষু। মানুষ ছোট বড় সবাই ধর্ম্ম আর পাপ দুটার ভয়ে তটস্থ থাকিত। রাস্তা ঘাটে মেয়েদের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

তখন মেয়েরা আবশ্যক মত গাঁয়ের হাটেও বেসাতি লইয়া যাইত। একধারে একটু পাশ কাটিয়া একটু জড় সড় হইয়া তাহারা বসিত। সেখানে ক্রেতারা প্রয়োজন মত যাইত ভিড় করিত না। সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত।

যে সব মেয়েরা বেসাতি লইয়া ওপারে যাইত, তারা একটু সকাল সকাল আহারাদি করিয়া দিনমানের জন্য বাহির হইত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠী স্বজনের নিকট সে পারের কড়ি লইত না।

মেয়েরা সন্ধ্যার আগেই ফিরিয়া আসিত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া আনিত। পটুলি আসিত সকলের পরে, সে তার আয়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইত প্রহরী স্বরূপ। তার ভরা যৌবন ফুটন্ত চাঁপার রূপ তাহার একাকী যাওয়া ভাল বোধ হইত না। বুড়ী বেশী হাটিতে মজবুত ছিল না, কাজেই গাঁ ঘুরিয়া আসিতে পটুলির বিলম্ব হইয়া যাইত। সন্ধ্যার সূর্য্য যখন আধখানা নদীর ঐ পশ্চিমের মাথায় ডুবিয়া যাইত, তখন পটুলি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া মধুর কণ্ঠে গায়িত—

"হরি, দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো—
পার কর আমারে—"

হরি পটুলিকে পার করিয়া আনিত। পটুলি নৌকায় পশরা নামাইয়া গায়িত—

"আমি দীন ভিখারী, নাই গো কড়ি
দেখ ঝোলা ঝেড়ে।"

হরি স্মিতমুখে কহিত, পটুলি, তোরা যে আমার নায়ে পার হয়ে দুটা পয়সা করিস এই আমার পুণ্যি। এই আমার বাপ দাদার আশীর্ব্বাদ। আমি কড়ি চাই না—দরকার কি? তারপর গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইল—

"সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।"

পাড়ে আসিয়া পটুলি হাত মুখ ধুইত। হরি নৌকা বাঁধিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে তুলিয়া দাঁড়াইত। পটুলি ছিল তার শেষ পারের যাত্রী। পটুলিকে সন্ধ্যাবেলা একাকী নদীর ঘাটে ফেলিয়া যাওয়া হরি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিত না। কারণ তাহার শুনা ছিল "সন্ধ্যার বাতাসে ভর করিয়া নানা দুষ্টু জিন পরী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই-ইত ভদ্রলোকের মেয়েদের হিষ্টিরিয়ার বেরাম হয়।"

হরি পথে গায়িত—

"তারা কোন অপরাধে এদীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।

(৪)

পাড়ার গণেশ আসিয়া ডাকিল— 'হরিদা—ও হরিদা—কি কর—"বলিতে বলিতে সে আঙ্গিনায় উঠিয়া আসিল।

হরি তখন তুলসী তলায় ধূপ দীপ দিয়া একমনে নাম জপিতে ছিল,—কোন উত্তর দিল না। গণেশ আসিয়া তুলসী তলায় গড় করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

আপন কার্য্য শেষ করিয়া হরি গণেশকে লইয়া ঘরে গিয়া বসিল।

গণেশ কহিল "এখন কি করবে দাদা?"

"কি আর করব—তুমি বস খানিকটা গল্প গুজব করি বা কীর্ত্তন গাই! রামায়ণটাও পড়তে পারি। তার পর যদি মন রোচে চাট্টি চাল চড়াব—আর মালসী গাইব।"

"আচ্ছা দাদা, তুমি নিত্যি দিন রেঁধে খাও—একটা বিয়ে কর না কেন?"

"দরকার কি?"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গণেশ কহিল—"বল কি দাদা, বিয়ের দরকার নাই?—আশ্চর্য্যি করে দিয়েছ কিন্তু। আচ্ছা একটীবার ভেবে দেখেছ?"

"ভাবি নি—ভাববার মতন কারণও পড়ে নি।"

"আশ্চর্য্য কথা বটে—কোন দিন এটা ভাব নি?"

"একবার ভেবেছিলাম পনর বচ্ছর আগে—যখন মা ছিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে একবার কথাটা মনে উঠেছিল। সহসা মা চলে গেলেন,—কথাটাও পাথর চাপা রইল। আর মনেও উঠে নি।"

"যাক্—একটীবার ভেবে দেখ না কেন?"

"কেন ভাই। সখ করে জীবন ভরা একটা নীরস গোলামীর চেয়ে স্বাধীন বন বিহঙ্গের মত গেয়ে দিন কাটিয়ে দিই—এটা কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়?"

"এই গোলামী স্বীকার ক'রেই ত দুনিয়ার জীব বিয়ে করে আস্ছে—তাই রীতি।"

"তা দেখেই আমার হুঁস হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা দাদা, বিয়ে না কর—দেখে শুনে একটা কণ্ঠি বদল টদল করে নাওনা।—রাঁধা বাড়ার হেঙ্গামাটা একটু বাঁচবে।" গণেশ অনুকূল উত্তরের ভরসায় আশ্বস্ত ভাবে হরির মুখ চাহিল।

হরি তেমনই সরল উত্তর দিল—"ভায়া তোমার মতলব এই—যে একটা মুখবাঁধা বোঝা ঘাড়ে রাখ্‌তেই হবে—তা সেটা সোনায় ভর্ত্তিই হউক আর মাটী ভরাই হোক—এই ত?"

"তবে মেয়ে মানুষ জন্মায় কেন ?"

'অত ভাবি নি দাদা। আমি আমার বিবেচনায় যা আসে—তেমনই ভাবে কাজ করি—যুক্তি তর্কের ধারেও যাই না ; কারণ সেটা আমার ধাতে সয় না।"

"আচ্ছা দাদা, তোমার রামচন্দ্রজী ত সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।" বিজয়ী বীরের মত গণেশ হরির মুখে দৃষ্টি সংযোগ করিল।

হরি দিব্যি সহজ স্বরে কহিল—"তাই ত প্রভুর আমার জীবনভর চক্ষের জল শুকাল না। তাঁর জীবনে কি দুঃখের ওর ছিল রে ভাই ?"

গণেশ হতাশ ভাবে কহিল—"নিত্যি দিন রাঁধা, দুঃখু হয় না ?"

গণেশের কথা শুনিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—"মেয়েরাও ত রাঁধে।"

গণেশ দুই ঘাট চড়াইয়া কহিল—"মেয়েদের ত সয়—ওইই ত ওদের কাজ। কথায় বলে মেয়ে জন্ম।"

হরি ততক্ষণ গান ধরিয়াছে—

"দিয়ে মায়াবেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে"

গণেশ মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

(৫)

নিঝুম দুপুর বেলা, মাঠে মানুষ নাই! পশুপক্ষী পাতার আড়ে চুপ—বাহিরে রৌদ্র অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। এ হেন সময় হরি ভাত চড়াইয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটী
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল—"

দুয়ারে দাঁড়াইয়া পটলি জিজ্ঞাসা করিল—"কি গেরস্ত, এখনো খাও নাই ?"

"এই হলো আর কি।"

'পটলি সহানুভূতির স্বরে কহিল, এই ভয়ানক গরম, সাম্‌নে আগুন—বাইরে মাটীপোড়া রোদ—এত কষ্ট কি পুরুষের সয় ?"

হরি বিস্ময়ের সহিত কহিল—"বলিস্ কি পটলি—আজ খুব গরম বুঝি,—ইস্ সত্যিই ত গা-ময়, ঘাম ঝরছে।—তা এ সময় রাঁধতে পুরুষের যা কষ্ট মেয়েদেরও ঠিক তেমনি হয়,—না ?" এই বলিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পটলির নিটোল গাল দুখানি রাঙা হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, মেয়েদের ওসব সয়। কারণ মেয়েদের ত এই কাজ। হরি ততক্ষণ ভাতে কাঠি দিয়া ভাত টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছে,—

"আর, বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই
ফণী ধরে খাই হলাহল।"

পটলি দরজার পাশে পিঠ ঠেকাইয়া এক দৃষ্টিতে হরির ভাতরাঁধা দেখিতেছিল।

হরি একখানা কাল পাথরের থালায় ভাতগুলি ঢালিয়া লইল। পটলি গালে হাত দিয়া কহিল, "একি করেছ,—মাথা না মুণ্ডু। কতকগুলা পুড়ে গেছে কতক গলে গেছে, আর কতকগুলা আধা চাউল। এ নাকি মানুষে খায়?"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে পটলির মুখের দিকে চাহিয়া সহজ স্বরে হরি কহিল—"পেটে আগুন থাকলে সব হজম হয় পটলি! আর আমার নিত্যি দিন খেয়ে এ রকমটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"তরকারী কি রাঁধবে!"

"আজ একটু নুন আর তেল মেখেই এইগুলো উঠাব।"

আবার সেই হাসি হাসিয়া হরি বাম হস্তে তেলের তাড়ি নামাইয়া লইল।

পটলি কহিল "তুমি বারান্দায় বাতাসে একটু বসো, আমি এক লহমার মধ্যে খানিকটা তরকারী রেঁধে দিই।" পটলি দু পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

হরি ততক্ষণ ভাতের উপর টাটকা তেল খানিকটা ঢালিয়া নুন লঙ্কা মাখিতে আরম্ভ করিল এবং আনন্দিত মনে বিল্ব প্রমাণ গ্রাস মুখে তুলিয়া দিল।

পটলি বিরক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

(৬)

তখনো ফরসা হয় নাই। হরি বিছানায় শুইয়া "রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায়" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতেছিল। সহসা বাহিরে পটলি খুব তাড়ার কণ্ঠে ডাকিল—"ও গেরস্ত, গেরস্ত—ওঠো দিকিন শীগ্‌গীর!"

"কে, পটলি?"—রঘুনাথায় নাথায়—

"আরে ওঠোই শীগ্‌গীর! জমিদার বাবুদের বাড়ীর ছোট বউর বায়না আছে, এক্ষুণি যেতে হবে—ওঠো শীগ্‌গীর!

"উঠি—দাঁড়া—" "রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং" পাঠ করিয়া হরি ধীরে সুস্থে দরজা খুলিল। পটলি ততক্ষণ গুণ্‌গুণ্ স্বরে গাইতে ছিল—

"তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা
ডাকি হে তোমারে।"

"কি পটলি এত ভোরে বেসাতি মাথায় চল্লি কোন দিকে ?"

"রায় বাবুদের ছোট বউ যাবেন বাপের বাড়ী! তাঁর ফরমাস জিনিষগুলি আজই দেবার কথা—তিনি তাড়া দিয়েছেন—তাই।"

"তিন মাইল পথ এই সকাল বেলা যাবি, তোর ঝি কোথা রে ?"

"সে খেয়া ঘাটে গিয়ে বসে আছে, চল গীগ্‌গীর।"

হরি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া তুলসী তলা লেপিয়া ফেলিল। তারপর একটু ধূপ জ্বালাইয়া তুলসী প্রণাম করিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে লইল। পটলি আগে আগে গুনগুণ গাইতে গাইতে চলিল—"বড় দয়ার আধার সে কর্ণধার পারের কড়ি চায় না।"

হরি খাইতে বসিয়াছে—দুপুর উৎরে যায়—সহসা পটলি আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। ভিজা কাপড়,—অঞ্চল কোমরে জড়ানো! পিঠে দীর্ঘ কেশদাম বাহিয়া জল ঝরিতেছে। পটলি কাঁপিতেছিল।

বিস্ময়ে শিবনেত্র হইয়া হরি জিজ্ঞাসা করিল, পটলি নৌকা এ পাড়ে যে—"তুই এলি কি করে ?"

"সাঁতার কেটে এসেছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে হরির গলা অবধি কাঠ হইয়া গেল। স্ফূর্তি নদী সাঁতারে পার হইতে সাহস করে, হরি ছাড়া তেমন ব্যক্তি ত এ তল্লাটে কেউ নাই। "পটলি ভাগ্যিস্ ডুবে মরিস্ নি!"

ডুবে মরার পথেই গিয়েছিলাম। প্রায় আধমাইল ভাঁটিতে উঠেছি। মর্লেও দুঃখ যেতো না। তোমাকে বলতে বেঁচে এসেছি।"

"এর অর্থ কি পটলি ? হয়েছে কি ?"

"আমি বাঘের মুখে পড়েছিলাম। দিন রাতের কর্ত্তা, ধর্ম্মের মালীক ঠাকুর আমায় রক্ষা করেছেন! তুমি এখন বিবাহ কর—

"ব্যাপার খানা কি পটলি বাঘ কোথায়!" হরির হাত ভাতেই সংযুক্ত রহিল। তাহার খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"শোন। আজ ক'দিন থেকে রায়দের বাড়ীর ঝি মেঘার মা আমার জিনিস পত্রের ঘনঘন ফরমাস দেয়"। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। ছোটবাবু এসে আমার সামনে দাঁড়ান, দর কসাকসি করেন। আজ ছোটবাবুকে দেখিনি।

মেঘার মা অনেক বলেকয়ে আমায় তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে বলে ছোটবাবু নাকি আমার জন্য"—পটলি আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরির চক্ষু গরম হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তারপর তারপর"—

চক্ষু মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় পটলি কহিল "আমি ভাবলাম বড়লোকের বাড়ীর কথা—বিপদ ঘটতে বেশী সময় লাগবে না। তাই তাড়াতাড়ি মেঘার মার বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। কদমতলার জঙ্গলের ধারে এসে দেখি ছোটবাবুর ঘোড়া নিয়ে একজন দাঁড়ালো। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সেই পথ ছেড়ে সাহাপুরের পথ ধরলাম। হঠাৎ চেয়ে দিখি জঙ্গলের ধারে ছোটবাবু আর দুটা পেয়াদা। বাবুর হাতে বন্দুক। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছেন। পেয়াদা দুটা আমার দিকে আস্‌তে লাগল। আমি তখনি প্রাণপণে ছুট্‌তে ছুট্‌তে নদীতীরে এসেছি। আমার জ্ঞান ছিল না। জানি না কোথায় সেই বেসাতি কোথায় বুড়ীটা।"

হরি গর্জ্জন করিয়া কহিল "দেশে এ পাপও ঢুকেছে—উচ্ছন্ন যাবেরে সব উচ্ছন্ন যাবে। এ পাপ ত দুনিয়া সয় না! হাঁ—তারপর?"

"তারপর নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে এসেছি। ভাবলাম তোমায় ব'লে এর বিচার করাব। আমি জানি তুমি লাঠী ধর্‌লে এ দেশে এমন লেঠেল নাই যে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়। তুমি যাও—ইতরের বিচার কর।"

হরি উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্ক ভাবে পাতের ভাতগুলি কুকুরের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া আঁচাইতে গেল। একাকী কি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল মধ্যে মধ্যে "ছোটবাবু বড় পাপ—সাবধান" শোনা গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া—লগী বৈঠা লইয়া হরি নৌকায় গেল। তাহার মেজাজ ক্রমে একটু নরম হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ হরি বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস কণ্ঠে গায়িল,

"হরি তুমি বিচারের মালাক
আমি শুধু দেখব লীলাখেলা।"

পরদিন পটলী যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌লে তবে ঐ পশুটার বিচারের?"

"কি আর কর্‌ব?"

"একদিন রাতে কেন ওর বাড়ী লুটকরে মাথা ভেঙ্গে দাও না। না হয় যেমন তোমার মতলব ঠাহর হয় তাই কর।"

"আমি কেন পটলি বিচার করে নিজে আর একজনের বিচারের অধীন হতে যাব? বিচার কর্ত্তা ভগবান ছোটবাবুর বিচার কর্ব্বেন—তিনি অতবড় রাজ্যেশ্বর—রাবণের পর্য্যন্ত বিচার করেছিলেন।"

(৭)

পাড়ায় গুরুদেব আসিয়াছেন। বিকাল বেলায় বাগ্দীরা মেয়ে পুরুষে জমায়েৎ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে কত কাহিনী শুনে। রাম রাবণের কথা, রাধাকৃষ্ণের বৃত্তান্ত, অভিমুন্যর বীরত্ব—কত গল্প তাহারা শুনিয়া আনন্দ ও পুণ্য লাভ করে! বাগ্দীরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। দুই একজন মাত্র ছেলে বেলায় বাবাজী ঠাকুরের আখড়ায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হরিই ছিল সেরা পড়ো। সে রামায়ণ পর্য্যন্ত সুরকরিয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু নদী পার হইতে লোকের দুঃখ দেখিয়া হরি প্রায় সারাদিন নৌকায় কাটাইত। কাজেই তাহার মুখে রামায়ণ শোনা কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটিত, গুরুদেব আসায় পাড়ার পিপাসু নরনারী কত পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাইতেছে। তাহাদের আনন্দের আজ:ওর নাই!

সেদিন সকালবেলা পরাণমণ্ডলের আঙ্গিনায় সকলেই গুরুদেবের "ছিচরণ" দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে। পুরুষরা গুরুদেবের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়াছে, মেয়েরা কেহ রোয়াকে, কেহ বেড়ার সামনে বা পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এদের তেমন আব্রুর আটকা নাই! ঘরের মেয়েরা পুরুষদের অনতিদূরেই বসিয়া পুণ্যকথা শুনিবার জন্য আকিঞ্চন করিতেছে।

এমন সময় হরি ভূমিষ্ট হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"কে, হরি! এসো এসো বসো; তা ঘর সংসার করেছ—না তেমনই আছ?'

নাথু সর্দ্দার কহিল আজ্ঞে কর্ত্তা ঐ আমাগোর দুঃখ। গাঁয়ের মাঝে ঐ একটা মানুষ, তার কি দুর্ম্মতি হলো, বিয়েথা কর্লে না; তবে কর্ত্তা ধূলো দিয়েছেন আপনাগোর আজ্ঞা কেউ না শুনে ত পার্ব্বে না—''

গুরুঠাকুর হরিকে ঘর সংসার করিতে আদেশ দিলেন, ভাল পাত্রী দেখার ভার পাড়ার "মাথা উঁচা" সর্দ্দারগণ গ্রহণ করিল। কিন্তু হরি যোড় হাতে মিনতির সুরে কহিল "দোহাই কর্ত্তার শ্রীচরণের। আমি বেশ আছি, আমার সুখ

শান্তি নষ্ট করবার আজ্ঞা করবেন না। আমায় দুঃখের বোঝা বইবার মুটে বানাবেন না। আমি বিয়ে কর্ত্তে পারব না স্পষ্ট বলে দিলাম কর্ত্তা দোহাই।”

পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকেই হৈ চৈ করিয়া উঠিল! আ সর্ব্বনাশ গুরুবাক্য।

হরি সকলকেই মিনতি জানাইল। গুরুর পায়ে কত নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিল না। ঠাকুর আজ্ঞা করিলেন “চতুর্থ দিনে বিবাহের লগ্ন আছে, তোমরা মেয়ে দেখ, আমি বিবাহ দিয়ে তবে যাব।” সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

হরি অগত্যা রুখিয়া দাঁড়াইল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল “সেকি কথা! আমার স্বাধীনতার ভার তোমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছ কেন গো! আমি স্বয়ং রামচন্দ্রজীর হুকুমেও আমার কথার অন্যথা করতে রাজী নই—”

গুরুদেব কয়েকঘাট নামিয়া হরিকে বিবাহের আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় পাড়ার একদল মেয়ে বৌ ঝি আসিয়া ঠাকুরের পায়ে গড় করিয়া তফাৎ দাঁড়াইল। এই দলে ছিল পটলি।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিধবা মেয়েটী কার রে—

ভোলা যোড় হাতে নিবেদন করিল—“কর্ত্তা এটী পরাণমণ্ডলের মেয়ে। দশ বছরে নগাঁয়ের সাধু সর্দ্দারের ছেলে মাধুর সাথে ওর বিয়ে হয়, দুমাস না যেতে যেতেই তার কপাল পুড়ে গেল! আজ আট বছর ধরে মেয়েটা—আঃ কি কষ্ট কর্ত্তা! মেয়েটা কণ্ঠি বদলও কর্লে না আবার বিয়েও কর্লে না—”

গুরুজী আনন্দে কহিলেন, বেশ এক কাজ কর। দেখে শুনে মেয়েটীর বিয়ে দাও। তোমাদের ত বিধবার বিয়ে হচ্ছেই। আহা মেয়ে ত নয় যেন মা দুর্গা। রাজার ঘরে জন্মালে ঠিক হতো। আয় ত মা আমার কাছে—”

পটলি আবার আসিয়া গুরুদেবের পায়ে প্রণিপাত করিল। গুরুজী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন “মা ভগবানের কৃপায় তোর দুঃখ দূর হোক আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—”

পটলি নতমুখে দাঁড়াইয়া কাপড়ের যে স্থানটা হাতে উঠিল—তাহাই পাকাইতে লাগিল।

গুরুজী সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ওহে একটা কাজ কেন কর না —হরির সঙ্গেই ত পটলির সম্বন্ধ হতে পারে। বাঃ বেশ হবে। সোণায় সোহাগা—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! যেমন বর তেমনি মেয়ে।”

পটলির মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল। সে ধীর পদক্ষেপে কোথায় সরিয়া গেল। উপস্থিত জনগণ একবাক্যে গুরুজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। পরাণ মণ্ডলকে গুরুজী মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরাণ জোড়হাতে কহিল "—কর্ত্তা, হরি আমার ছেলের মত! তাকে মেয়ে দিতে আর কথা কি? আপনি দিন করুন,—আমি হরিকে মেয়ে দিব। কেমন হরি—"

হরি যে কোন সময় উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

(৮)

সেদিন সবাই নিত্যকার মত বেসাতি লইয়া গ্রামে গেল। গেল না কেবল পটলি।' তার মনটা আজ ভাল ছিল না; সে তার সইয়ের ঘরে মটকা মারিয়া পড়িয়া রহিল।

গুরুদেব বাড়ী ফিরিবার পথে হরির নৌকায় অনেকক্ষণ বসিলেন। হরিকে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। কহিলেন,—"বাপু, তোমরা শিষ্য—তোমরাই আমাদের ভরষা। তোমরাই আমাদের সম্পত্তি তোমরা বিয়ে কর্লে দুটা পয়সা আমাদের হয়—তোমাদের বংশ থাক্‌লে আমাদের আশা—বুঝলে বাপু—"

হরি মাথা নোয়াইয়া নৌকা বাহিতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন! ঠাকুরজী অপর পারে গিয়াও নৌকায় বসিয়া হরিকে বৃথা সাধ্য সাধনা করিতেছেন। এমন সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গান ধরিলেন—

"বৃন্দাবনের ধূলোয় কবে গড়াগড়ি দিব—
ব্রজের রজে লেপি অঙ্গ
যমের আশা কর্‌ব ভঙ্গ
শ্যাম ত্রিভঙ্গে দিবানিশি মহানন্দে নেহারিব।"

হরি কহিল—কর্ত্তা ও পারে লোক দাঁড়াইয়া—ওঁকে পার কর্ত্তে হবে।

অগত্যা গুরুজী নামিয়া গেলেন। হরি যেন অন্ধকার কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তির আনন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

বাবাজী নৌকায় উঠিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"পরে হবে রে ঘোর অন্ধকার
আয় কে যাবি ভব নদীর পার—

ওরে দিন থাকিতে চল সে পথে
করিগে পারের যোগাড়"

হরি কথা কহিল না—বাবাজী পার হইয়া গেলেন।

পটলি দুই চার বার জল লইতে আসিয়াছিল, বড় অন্যমনস্ক। কাহারো সহিত কথাটীও কহে নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিল,—হরি আজ দুপুরে বাড়ী যায় নাই,—রাঁধাবাড়া হয় নাই,—সুতরাং আহারাদিও ঘটে নাই। পটলির গা জ্বালা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হরি বাড়ী গিয়া তুলসীতলার কাজ সারিয়া দীপ নিবাইল। পটলি তাহার সই তুফানীর ঘরে বসিয়া দেখিল হরির ঘরে আলো নেই। তখন সে সইকে ধরিয়া পড়িল—"সই, মানুষটা সারাদিন উপোসী—বোধ হয় কিছু খাবে না। তুই যা কিছু খাবার দিয়ে আয় না।"

তুফানী সকালবেলার ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল;—সে পটলির গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—"ইস্ ভারী দরদ দেখছি যে! কথায় বলে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

পটলি তুফানীকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—"তুই মর্ বাঁদী।"

"তাতে তোর লাভ লোকসান কি? আর আমি মলে তোর মনের ঠাকুরকে খাবার দিয়ে আস্‌বে কে?"

"যাঃ—"

"যাব—যাব—যাব—ত্রিসত্যি কর্লাম। বাপরে—একটু তর সইছে না। যাব ত, কিন্তু ওযে খাবে তার প্রমাণ? খাবারই বা কি নিয়ে যাব?"

"তোর ঘরে চিড়ে টিড়ে নেই কি"

"হাঁ, চিড়ে আছে আর একছড়া মোটা কলা আছে—তাই নিয়ে যাই। কিন্তু খাবে কি?"

গিয়ে বলিস—"ওগো তোমার তুলসী দেবতার মানস এনেছি—নিবেদন করে দাও।" নিবেদন হয়ে গেলে বলো "প্রসাদ লও,—সে ফেল্‌তে পারবে না।"

তুফানী কলসী হইতে চিড়া বাহির করিতে করিতে কহিল" তোর এত বুদ্ধিও যোগায়? আচ্ছা সই চল্ না, তুইও থাবি।"

"না, আমি ওদের বাড়ী রাতকাল কেন যাব? তুই যা। আমায় হয় ত এক্ষুণি মা ডাক্‌বে।"

তুফানী সের তিনেক চিড়া আর গণ্ডা পাঁচেক কলা লইয়া হরির আঙ্গিনায় গিয়া ডাকিল—"দাদা ও দাদা—ঘুমিয়েছ না কি ?"

"কে রে—তুফানী ?" হরির স্বর একটু ভার ভার।

"হাঁ দাদা, প্রদীপটা জ্বাল ত দেখি।"

"কেন রে ?"

"আর কেন ? আজ তোমার তুলসী তলায় কিছু মানত ছিল,—সেটা ভুলেই গেছিলাম। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখ্‌লাম কি—ইস্‌ এখনো গা কাঁটা দিয়ে উঠে—"

হরি চক্‌মকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বাহিরে আসিল। তুফাণী তুলসী তলায় চিড়া কলা রাখিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

হরি নিবেদন করিলে তুফাণী এক চিম্‌টী চিড়া কপালে ছোঁয়াইয়া কহিল "দাদা, তুমি তুলসীর প্রসাদ গ্রহণ কর,—আমি চল্লাম।"

"তুফাণী—তুফাণী—"তুফাণী ততক্ষণ ঘরে চলিয়া গিয়াছে। পটলিও ঘরে গিয়া নিশ্চিন্তে শয়ন করিল।

(৯)

পরদিনও বেলা আড়াই প্রহর উৎরে গেল, হরি ঘাটে নৌকায় বসিয়া ভাঙ্গা স্বরে টানিতেছে—

"আর কি ছার মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না"

পটলি দু'দিন বেসাতি নিয়া গাঁয় যায় নাই,—তার শরীর নাকি ভাল নয়। কিন্তু দশবার ঘাটে জল নিতে আসিয়াছে। হরির মধুর কণ্ঠ আজ ধরা ধরা—শুনিয়া পটলির কষ্ট হইল। খানিক এদিক সেদিক করিয়া দু একবার কাশিয়া পটলি কহিল—"বলি আজ কি খাওয়া দাওয়া নাই,—বেলা যে যায়।"

"বেলা যায় ?—অ্যাঁ—কি বল্‌লি পটলি বেলা যায় ? এতক্ষণ আমায় হুঁস ছিল না—তুই বড় সময় মত এসেছিস্‌—হাঁ আমিও তৈরি হয়ে নি—বেলা যায় এ খেয়াল ত আমার ছিল না—! এখুনি যাচ্ছি—কি কর্‌তে পারি দেখি গিয়ে !"

পটলি কথাগুলা শুনিয়া অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল। হরি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল—যাহারা পারে গিয়াছে, তাহাদের আবার আনিতে হইবে ত ?

পটলি সন্ধ্যা বেলায় জল নিতে আসিয়া শুনিল, হরি গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল—

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন,
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন"

পটলি কলসীতে জল লইতে লইতে কহিল,—"বাড়ী যাবে না?"

"হাঁ—যাব—" হরি ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিল। পটলি আগে আগে যাইতেছিল—সে শুনিতে পাইল হরি উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছ,—

"আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ তায়—
ভুলিয়ে মোহমায়ায়—হারায়েছ—তত্ত্বজ্ঞান।"

পটলি আঙুল মট্‌কাইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল ঐ মড়া বাবাজীটা এই সব বাজে গান শিখায়। যত কুজ্ঞান—ঐ মড়ারই পরামর্শ।

রাত্রিতে হরি পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বেড়াইয়া গল্প করিয়া আসিল। গণেশ কহিল—"হরিদা আজ ত তোমার সেই হাসিটা দেখ্‌ছি না।" হরি কোন উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে সকলেই শুনিল হরি গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহার দরজার বেড়ায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল, মোটা মোটা হরপে লিখিয়া হরি তাহার যা কিছু গুরুদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে।

পট্‌লি তুফানীর বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল দেখিয়া তুফানী বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। পটলি ঠোঁট উল্টাইয়া ভাঙ্গাস্বরে কহিল মড়া বৃন্দাবনে গেছে ঠিক। আর যেন কারো সেখানো যাবার সাধ হ'তে নাই। মড়া যাবি ত আর যে যে যেতে চায় তাদের নিয়েই যা—

ক্রমে প্রকাশ পাইল হরি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। শুনিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী গান ধরিলেন,—

"আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
যারা, পিছে এল আগে গেল, আমি রৈলাম পড়ে।"

(১০)

কৃষ্ণদাস বাবাজী আর গুরুজীর সঙ্গে গাঁয়ের অনেক স্ত্রী পুরুষ বৃন্দাবনে চলিয়াছে। নকড়ি, ভোলা, পরাণ, সাধুর মা, গুণী, তুফানী,—পট্‌লি সবাই বৃন্দাবনের পথে। কৃষ্ণদাস বাবাজী মনের আনন্দে মধুর হরি নামকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অসংখ্য যাত্রী বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছে।

যমুনার তীরে তীরে অগণিত চটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীরা—সেই সকল চটীতে বাসা করিয়া রহিয়াছে। স্নান, দান, গান, গল্প কোলাহলের অবধি নাই।

বিকাল বেলা পটুলি আর তুফানী এই সকল চটীর যাত্রীদিগের মধ্যে বেড়াইতেছিল। তুফানী নানা গল্প হাস্য পরিহাস করিয়া পটলিকে মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটা কথাও বলিতেছিল। পটুলি একটু চিন্তান্বিতা একটু গম্ভীর। তুফানী কহিল—"সে বৃন্দাবনে কোথাও আছে, এসেছে আট দশদিন আগে,—"

"ওগো ওদিকে যেওনা—ওলাউঠা গো—নিশ্চয় ওলাউঠা! আহা কোন্ অভাগীর পুত গো, না জানি কোন অভাগীর সোয়ামী! অমন সোনার বরণ যেন কেমন হয়ে গেছে।—সঙ্গে কেউ নেই গো—"

পটুলি কাণ পাতিয়া কথাগুলা শুনিল। তার বুকের হাড়গুলি যেন খড়্ খড়্ করিয়া নড়িয়া উঠিল—দম আট্‌কিয়া আসিল। তার ইচ্ছা হইল,—তুফানীর সঙ্গ ছাড়িয়া একবার লোকটাকে দেখিয়া আসে।

সেই জনসমুদ্রের মধ্যে পটুলির আশাপূর্ণ হতে বিলম্ব হইল না। সে কোমরে আঁচল জড়াইয়া—আকুল আগ্রহে সেই কলেরাক্রান্ত রোগীর চটীতে প্রবেশ করিল। তখন রোগী অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছে, পটুলি বাহুবেষ্টনে আপন বুক বাঁধিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল হরি!

বড় যোগাড় যন্ত্র করিয়া পটুলি গুটী ত্রিশেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একটা খাটুলী আর একজন চিকিৎসক সংগ্রহ করিয়া আনিল। তারপর অনন্য কর্ম্মা হইয়া রোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিল।

এদিকে চটীতে চটীতে কলেরা লাগিল। কে কার সন্ধান লয়। পটলি রোগীর ঘরে বসিয়া আছে। পরাণ বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া আছাড় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সকলে দেশে যাত্রা করিল। তুফানী দেশে গিয়া কহিল—যে ভয়ানক মারী লেগেছিল ওর মধ্যেই পটুলি মরে গেছে।

হরি আরোগ্য লাভ করিল। কে তাহাকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিয়াছে,—তাহা সে জানিল না। কে তাহাকে বৃন্দাবনে, এই কোঠায় এই বিছানায় আনিয়াছে, কে তাহাকে পথ্য দিতেছে—কিছুই জানিল না। একটা কথা শুধু তাহার মনে পড়ে,—কে যেন তাহার মরণশয্যার পাশে বসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিত "শ্যাম ত্রিভঙ্গ না দেখে তুমি মরবে না।" সেই কণ্ঠ যেন পটলির।

(১১)

"বাবাজী! ও বাবাজী!"

"কা'কে ডাক্‌ছেন?"

"আপনাকে।"

"আমাকে? আমি ত বাবাজী নই—তাই উত্তর দিতে গৌণ করেছি। মাফ করবেন। কেন ডাক্‌ছেন আমাকে?"

"এই পাশের ঘরে একটী মেয়ে মানুষ রুগ্না—সে আপনাকে একটীবার দেখ্‌তে চায়।"

"আমাকে? আপনি ভুল কর্‌ছেন বাবু।"

"ভুল করিনি গো—ভুল করিনি। উনি আপনাকেই ডাকছেন। আসুন একটীবার—লোকটা মরতে যাচ্ছে"—

"শ্রীহরি শ্রীহরি—দেখুন মহাশয়, আমায় মাপ করুন আমি যেতে পার্ব্ব না—আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।"

"সাধু পুরুষ, আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু শ্যাম ত্রিভঙ্গ তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন না। পথে চটীতে যখন বিসূচিকায় মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েছিলে, তখন কে অনিদ্রায় অনাহারে দিন রাত্রি তোমার শুশ্রূষা করেছিল? কার অর্থে তোমার ঔষধ পথ্য চলেছিল? কার অর্থে মানুষ তোমায় মাথায় করে এখানে এনে রেখেছে? কার অর্থে এখানে তোমার খরচ চল্‌ছে? সাধু পুরুষ, অনিয়মের সঙ্গে যুদ্ধ করে সপ্তাহ পরে সেই করুণারূপিনী মা আমার মৃত্যু শয্যায়! আজ তুমি তাকে একটী বার দেখা দিতেও রাজী নও, আশ্চর্য্য! তোমার এক এক খানা হাড় খুলে দিলেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আজ দুদিন শ্যাম ত্রিভঙ্গ দেখে জীবন সার্থক কর্‌ছ কার প্রসাদে? আমি তোমার চিকিৎসা করেছিলাম, বুঝেছিলাম করুণাময়ী মা তোমার কেউ হবেন। পরে জান্‌লাম তিনি তোমার কেউ নন! আমার চোখের ঠুলি খুলে গেল। ত্রিশ বৎসর চিকিৎসা করেছি,—অর্থ উপার্জ্জন ঢের করেছি,—এ পুণ্য দৃশ্য দেখে আমি নূতন মানুষ হয়ে তাকে মা বলে ডেকে পবিত্র হয়ে গেছি। আজ দু সপ্তাহ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মাকে বাঁচাতে পার্‌লাম না। আজ দু সপ্তাহ প্রতি মুহূর্ত্ত মা তোমার সংবাদ শুন্‌ছেন। তুমি নিজে হেঁটে গোবিন্দজী দর্শন করেছ শুনে মা হেসে এক আনন্দের নিশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন। তার পর হতেই তাঁর জীবনী শক্তি কমে আস্‌ছে। সাধু পুরুষ—সেই মাকে দেখা দিতে তোমার আপত্তি?—"

হরি কুণ্ঠিত হইয়া যোড়হাতে কহিল, "অপরাধ করেছি মহাশয়, চলুন তাঁকে দেখে আসি।"

"আপনি আমার জীবন দিয়েছেন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করেছেন, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি—একটীবার চক্ষু—"

রুগ্না চক্ষু মেলিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল "তোমার পা তুলে আমার মাথায় ঠেকাও—"

হরি জিভকাটিয়া কহিল এমন আদেশ কর্‌বেন না। আপনি হয়ত আমায় জানেন না। আমি জাতিতে বাগ্‌দী।

"আমায় চিন্‌লেনা আমি পটলি। দাও আমার মাথায় তোমার পা, তুমি আমার উপাস্য দেবতা—দাও তোমার চরণামৃত—একবিন্দু, প্রাণ শীতল করি।"

'পটলি! তুই আমার জীবন দানকরে আজ নিজে মর্‌তে পড়েছিস্। একটু থাক্—আমার ঘরে গোবিন্দজীর নির্ম্মাল্য, চরণামৃত আছে এনে দিচ্ছি।"

পটলি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। খানিক পরে হরি চরণামৃত আনিল পটলির মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল "পটলি এমন অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে তোর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল? পটলি অন্ধের জননীর মত তুই যে চিরদিনই আমায় সজাগ পাহারা দিয়ে আস্‌ছিস্ তা আজ বুঝতে পেরেছি। মার কথা মনে বড় পড়ে না! আজ মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তোকে মা বলে ডাক্‌ছি মা—মা—"

পটলি চক্ষু মুদিয়া শুনিল—তারপর কহিল "দাও গোবিন্দজীর চরণামৃত আমার মুখে! খেয়ানী হরি, আজীবন সকাল সন্ধ্যায় খেয়া নৌকায় নদী পার করে দিয়েছো, আজো আমায় পার করে দিচ্ছ। আজীবন তোমার অনুসরণ করে চলেছি! গুরু তুমি আমার! গুরু, আজ বড় আনন্দ বড় শান্তি। এখন নামগান একবার শোনাও যা পথের শেষপর্য্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে দেয়।"

হরি পটলির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া প্রেমানন্দে গাইল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

চিকিৎসক হরিকে ডাকিয়া কহিল, "উঠুন, মা চলেগেছেন।" সম্মুখের পথদিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে হরে কালভয়, হবি পার ভব জলধি।"

পূর্ণতা

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

ঝ'রে গেছে ফুল ধ'রেছে বৃন্তে ফল
শিখর হইতে নেমেছে নদীতে ঢল
কুসুমের প্রেম, ফল-রসে ভরপুর,
বিলাস হলো যে মঙ্গল সুমধুর।
অধীর নিঝর শান্ত, তটিনীতে
মায়ের মূরতি চটুলা নটিনীতে।
ভালবাসা আজ চাহেনাকো সম্ভোগ
তুমি যদি আমি—কেমনে কাহাতে যোগ ?
শ্যাম ভেবে ভেবে রাধা হ'য়ে গেছে শ্যাম
প্রেমের মাঝারে হারা হ'য়ে গেছে কাম !

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল তাহার মোট কথা এই যে 'আমাদের ১৪ বৎসর কালাপানির জেলে বদ্ধ থাকিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা বাহিরের কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীর মত পোষাক পরিতে পারিব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি ও হাতকাটা কুর্ত্তা না পরিয়া কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্ত্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকার পাইব। অধিকন্তু ১০ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্ম্মঘটে

যোগ না দিই বা জেলের কর্ত্তাদের সহিত ঝগড়া না করি তাহা হইলে ১০ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কি না! জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া ৮ হাতি মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল; হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল আর আমি হইলাম ঘানি-ঘরের মোড়ল। প্রাতঃকালে ১০ হইতে ১২ টার মধ্যে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া লইবার কথা; কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া লওয়া অসম্ভব দেখিয়া আমরা সাধারণ ভাণ্ডারা (পাকশালা) হইতে ভাত ও ডাল লইতাম; শুধু তরকারিটা নিজেদের মনোমত রাঁধিয়া লইতাম। রন্ধন বিদ্যায় হেমচন্দ্রের ওস্তাদ বলিয়া নাম-ডাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাংস, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন, তবে সোজাসুজি তরকারি রাঁধিতে যে আমাদের চেয়ে বেশী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটা মোচা পাইয়া বহুকাল পরে মোচার ঘণ্ট খাইবার সাধ হইল। কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয় তাহা ত জানি না। মোচার ঘণ্ট রাঁধিবার জন্য যে প্রকাণ্ড কনফারেন্স বসিল তাহাতে রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। বারীন্দ্র বলিল—"আমার দিদিমা হাটখোলার দত্ত বাড়ীর মেয়ে এবং পাকা রাঁধুনী, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" হেমচন্দ্র বলিল—"আমি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী রান্না শিখে এসেছি, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক তখন আমরা স্থির করিলাম যে মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদাদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম, হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন তখন তাঁহার রন্ধন বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্বন্ধে আমারও একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজের ফোড়ন কি রে বাবা? এযে বেজায় ফরাসী কাণ্ড! কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল তখন

আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ! খাইবার সময় হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de-cuisine বটে!" দিদিমা আমার এমনটী রাঁধিতে পারতেন না।" হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ! তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী। দিদিমা যা করে গেছেন তা আর বদ্‌লাতে চাও না।" মোচার ঘণ্ট যে দিন রন্ধনের গুণে মোচার কাবাব হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিন কতক পরে একবার সুক্ত রাঁধিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু সুক্ত রাঁধিবার সময় কি কি মসলা দিতে হয় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গেল। হেমদা' বলিলেন যে তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্সচার ফেলিয়া দিলেই তাহা সুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণীরা পাঁচখণ্ড পাকপ্রণালী কোলে করিয়া রাধিতে বসেন তাঁহারা সুক্ত রাধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে।

রাঁধিবার জন্য আমরা জেল হইতে কিছু কিছু তরকারী লইতাম, তবে তাহার মধ্যে চুবড়ী আলু ও কচুই প্রধান। কাজে কাজেই বাজার হইতে মাঝে মাঝে অন্য তরকারী আনাইয়া লইতে হইত। সরকার বাহাদুরের নিয়মানুযায়ী আমরা মাসিক বেতন পাইতাম বারো আনা। আমরা শারীরিক দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের প্রত্যেককে বারো আউন্স করিয়া দুধ দিয়া তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ মাসিক আট আনা কাটিয়া লইতেন। বাকি চার আনার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিছুদিন পরে জেলের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া বারীন্দ্রের উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় আর হেমচন্দ্রকে বই-বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব উহাদের প্রত্যেককে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দিবার জন্য চিফ-কমিশনারের অনুমতি চান। পাঁচ টাকার নাম শুনিয়াই চিফ-কমিশনার লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েদীর মাসিক ভাতা পাঁচ-টাকা! আরে বাপ! তাহা হইলে ইংরেজ রাজ যে ফতুর হইয়া যাইবে! অনেক লেখালিখির পর মাসিক একটাকা করিয়া বরাদ্দ হইল। যথা লাভ!

ক্রমে ক্রমে আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটী ছোট পুদিনার ক্ষেত দেখা দিল; তাহার পর দুই চারিটা লঙ্কা গাছ, এক আধটা বেগুন গাছ ও একটা কুমড়া গাছও আসিয়া জুটিল। এ সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া জেলার মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসিত; কিন্তু সুপারিনটেন্‌ডেন্টের মনের এক কোণে আমাদের উপর একটু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেন না। জেলারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিতেন—'এরা যখন চুপ্‌চাপ করে আছে, তখন এদের আর পিছু লেগো না।' এরূপ দয়া প্রকাশের কারণও ঘটিয়াছিল কর্তৃপক্ষের আটঘাট বন্ধ রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেশের খবরের কাগজে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহাদের মেজাজটা প্রথম প্রথম বিলক্ষণই উগ্র হইয়া উঠিত; কিন্তু শেষে অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন যে কয়েদীকেও বেশী ঘাঁটাইয়া লাভ নাই।

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইবার প্রবলতর কারণ জর্ম্মানীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিবার অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তাদের মুখ যেন শুকাইয়া গেল। কয়েদীদের তাড়া করিবার প্রবৃত্তি আর বড় বেশী রহিল না। অষ্ট্রীয়ার রাজ-পুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারী নগরীর ২০ মাইলের মধ্যে জর্ম্মান সৈন্যের আগমন সংবাদ সবই আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া পাইতেছিলাম। শেষে যখন এমডেন আসিয়া মাদ্রাজের উপর গোলা ফেলিয়া চলিয়া গেল তখন ব্যাপারটা আর সাধারণ কয়েদীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। ইংরেজের বাণিজ্য ব্যাপারের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহা কয়েদীদেরও বুঝিতে বাকি রহিল না। আগে পিপা পিপা নারিকেল ও সরিসার তৈল পোর্টব্লেয়ার হইতে রপ্তানী হইত, এখন সে সমস্তই গুদামে পচিতে লাগিল। জেলে ঘানি চালান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে কয়েদীর নিকট হইতে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (war loan) করা হইতে লাগিল তখন পোর্টব্লেয়ারে গুজব রটিয়া গেল যে, ইংরাজের দফা এবার রফা হইয়া গিয়াছে। জেলের দলাদলি ভাঙ্গিয়া গিয়া শত্রুমিত্র সবাই মিলিয়া জর্ম্মানীর জয়, কামনা করিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে আরম্ভ করিল। জর্ম্মানীর বাদসা নাকি হুকুম দিয়াছে যে সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে! সাহেবদের আরদালীরা আসিয়া খবর দিতে লাগিল যে আজ সাহেব সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, কাল সাহেব না খাইয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল

ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা জুটিয়া গেল। কেহ বলিল পীরসাহেব স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে ১৯১৪ সালে ইংরেজের ভরা ডুবিবে, কেহ বলিল এ কথা ত কেতাবে স্পষ্টই লেখা আছে! মোটের উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই একই আলোচনা চলিতে লাগিল।

কয়েদীদের মনের ভাব শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও অগোচর রহিল না। ইংরেজ যে যুদ্ধে হারিতেছে না একথা প্রমাণ করিবার জন্য জেলের সুপারিন্টেনডেণ্ট আমাদিগকে বিলাতের টাইমস পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়িতে দিতেন। কিন্তু টাইম্‌সের কথা বিশ্বাস করাও ক্রমে দায় হইয়া উঠিল। টাইম্‌সের মতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রত্যহ যত মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, মাস কতক পরে তাহা যোগ দিয়া দেখা গেল যে তাহা সত্য হইলে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের জর্ম্মানী পার হইয়া পোলান্দে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল; অথচ, পোলাণ্ড ত দূরের কথা, রাইন নদীর কাছাকাছি হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ কয়েদীরা ইংরাজের স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিত। কর্ত্তারা যে মিথ্যা খবর ছাপাইয়া তাহাদের পট্টি দিতেছে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না!

নূতন নূতন যে সমস্ত কয়েদী দেশ হইতে আসিতে লাগিল, তাহারা নানা-প্রকার অদ্ভুদ গুজব প্রচার করিয়া চাঞ্চল্য আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক দল আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে তাহারা বিশ্বস্তসূত্রে দেশ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে এমডেন পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে গুজবটা মিথ্যা! তাহারা যে ভাল লোকের কাছে ও কথাটা শুনিয়াছে! শ্রুতির চেয়ে প্রত্যক্ষটা ত আর বড় প্রমাণ নয়!

ক্রমে পাঠান ও শিখ পল্টনের অনেক লোক বিদ্রোহের অপরাধে পোর্ট-ব্লেয়ারে আসিয়া পৌছিল। তাহাদের কেহ কেহ ফ্রান্স, কেহ বা মেসো-পোটেমিয়া হইতে আসিয়াছে। পাঠানদের মুখে মুখে এনভার বে'র দৈব শক্তি সম্বন্ধে যে সব চমৎকার গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা শুনিয়া কয়েদীদের বুক আশায় দশ হাত হইয়া উঠিল। এনভার বে তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলে নাকি খোদার কোদ্‌রতে তোপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি আবার নাকি পুষ্পীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন মুলতান সরিফে আসিয়া

অচিরে জগদ্ব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানীর বাদশাও নাকি কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে!

এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া কয়েদীদের বিদ্বেষভাজন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও ফল নাই দেখিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম। তবে যথাসম্ভব সত্য ব্যাপার জানিবার জন্য সংবাদ পত্র জোগাড় করিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গদর দলের শিখেরা পোর্টব্লেয়ারে কয়েদ হইয়া আসিবার পর পাছে জেলের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, সেই ভয়ে জেলে পাহারা দিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পল্টন আমদানি করা হইয়াছিল। বিলাতী পল্টনের মধ্যে আইরিস অনেক ছিল। আর' তাহারা যে ইংরেজের বিশেষ শুভার্থী ছিল তাহাও নয়। সুতরাং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তা' ভিন্ন নূতন নূতন যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী আসিতে লাগিল তাহ'দের নিকট হইতেও দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। এমডেন ধরা পড়িবার পরে একটা গুজব শুনিয়াছিলাম যে ঐ জাহাজে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের একটা প্ল্যান ছিল; বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনরূপ আক্রমণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল ও দুই চারিটা তোপেরও আমদানি করা হইয়াছিল।

পোর্টব্লেয়ারে মিলিটারী পুলিসের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদের মধ্যে শিখও যথেষ্ট। পাছে গদর দলের শিখেরা মিলিটারি পুলিসের সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়, এই চিন্তায় পোর্টব্লেয়ারের কর্ত্তারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ভয়ে জেলের ভিতরকার শিখদিগের উপর তাঁহাদের ব্যবহার বেশ একটু কঠোর হইয়া দাঁড়াইত। একে ত আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদিগের রুটি ও মাংস খাওয়া অভ্যাস; জেলের খোরাক খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না; তাহার উপর মাথায় লম্বা লম্বা চুল ধুইবার জন্য সাবান বা সাজিমাটী কিছুই পায় না। শেষে যখন তাহাদের উপর ছোট ছোট অত্যাচার সুরু হইল তখন তাহাদের মধ্যে একজন (ছত্র সিং) ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বেচারীকে তাহার ফলে দুই বৎসর কাল পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধর্ম্মঘটও পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু যে সকল নেতারা শিখদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন তাঁহারাই কার্য্যকালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া

গেল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করেন কিনা তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ।

অকরুণ পিয়া

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশী।
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি॥
পথিক ব'লে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি॥
তখন মোদের কিশোর বয়েস যেদিন হঠাৎ টুট্‌লো বাঁধন্,
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ-জোড়া শুন্‌ছি কাঁদন্!
সেই কিশোরীর হারা-মায়া
ভুবন ভ'রে নিল কায়া,
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি'॥

মনস্তত্ত্বের দিক

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথা হচ্চে—

পাশ্চাত্য দেশে যেখানে মুখের বুলি—Perish secrecy! Tear off veils! Banish all reserve between the sexes! সেখানেও কাজের ধারাটুকুর বেলায় মেলামেশা অবাধে চলে না। মেলামেশা বারণ নয় এই পর্য্যন্ত,—না চলবার কারণ যথেষ্ট আছে। সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এমন ভাবে

সাজান যে ও জিনিষটা আছে স্থূল চোখে দেখায় মাত্র। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কার্য্যতঃ নেই। অবশ্য সমাজের নিম্নস্তরের কথা স্বতন্ত্র। সে কোন্ দেশেই বা নয়!' ইংলণ্ড জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের আভিজাত্য শ্রেণীর ঘরে ধরাবাঁধা আমাদের দেশে ভদ্র ঘরেরই মত।

প্রাচ্যের ব্যবস্থাটা অনেকটা' যেন্ পাশ্চাত্যের উল্টো। এ দেশের অবস্থাটা যেন কড়ায় কড়ী কাহণে কাণা। "মুখের বুলির ভিতরে ছুঁচ গলে না বটে,— ব্যবস্থা এমন আঁট সাঁট।" কাজের বেলায় কিন্তু হাতি গলে যায়,—অভ্যাস এত শিথিল। যাঁরা জিনিষটা বুঝতে চান তাঁদের unbiassed হয়ে এই কলিকাতারই গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে বলতে পারি।

গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া ব্রাহ্মর উদাহরণটা সামাজিক অভিমত হিসাবে দিচ্চি না। symbol হিসাবেই দিচ্চি। খুব unbiassed হয়েই দিচ্চি। একেবারেই উদাহরণ মাত্র।

আমাদের দেশে ত বটেই, পৃথিবীর সকল দেশেই তাই,—মানুষ এতদিন যেন পূর্ব্বপুরুষের জমান টাকার মত পূর্ব্ব যুগের সঞ্চিত কর্ম্মে বাঁচছিল,—সে সঞ্চয় এইবার ফুরিয়েছে। এতদিন সত্য সত্যই কোনও দেশে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবার কোনও দায় হাজির হয় নি। মেয়েরা অনেক দেশেই বাইরে এসেছে কর্ম্মে ভিড়েচে, হয় সখ নয় ভাবের প্রেরণা, যা হোক এই রকম একটা কিছুতে। এখনকার অবস্থা আর তা নয়। ঠিক আজিকার পৃথিবীতে যদি নিখিলেশকে বিমলার কাছে ঘরে বাইরের হিসাব দিতে হয়, সম্ভবতঃ তাকে বলতে হবে—ঘরে তুমি আমার জন্য যা করচ এ সামান্য কিছু, আমিও তোমার জন্য যা কর্চ্চি যৎসামান্য মাত্র। বাইরে তুমি এর চেয়ে অনেক কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে,—আমিও পার্ব্ব। আর পরস্পর তা না কর্লে আমরা বাঁচতেও পার্ব্ব না। দিনকাল এমন পড়চে।

সংসারটা মেয়ে পুরুষের লেন দেন নিয়ে বাণিজ্যের নিয়মেই চলচে এ কথা অস্বীকার করে তর্ক করা গায়ের জোর ফলানরই সামিল। বাণিজ্যে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের বলি বেণিয়া। ইংরাজ যে জাত বেণিয়া সে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি। সম্প্রতি সংবাদ এসেচে যে "বিলাতে নারী আর একটি নূতন অধিকার লাভ করিলেন। স্থির হইয়াছে, এখন হইতে তিন বৎসর পরে তাঁহারা বিলাতের সিবিল সার্ব্বিসে পুরুষের ন্যায় প্রবেশাধিকার পাইবেন।"

অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁরা সে দেশের পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। আরো ঠিক হয়েছিল যে পুরোহিতের কাজ বিচারকের কাজ আর এই সিবিল সার্ব্বিস তিন ছাড়া অপর সকল কাজই তাঁরা কর্ত্তে পার্ব্বেন। সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিসও মঞ্জুর হয়ে গেল। কালে কালে ও দুটোও মঞ্জুর হবে না কে বলতে পারে? বেণের বুদ্ধি ঠক্‌বার চিহ্ন নয়। ইংরাজ জাতি ভাবোচ্ছাসে কিছু চালাবার বান্দা নয়। ইংরেজের ঘরে যখন চলে গেল তখন বুঝতে হবে ওর ভিতর আব্দার নেই ধাপ্পা নেই আছে খাঁটি নিরেট যোগ্যতা। মেয়েরা উপযুক্ত সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকতে এ মঞ্জুর হবার কথা নয়, সন্দেহ মিটেই তবে মঞ্জুর হয়েচে। আরো একটা কথা আছে। যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েচে, হলেই বা। যোগ্যকে তার উপযুক্ত আসন দিতে সংসার কি হাত ধুয়ে বসে আছে নাকি? কাজের সঙ্গে কাজের একটা বেতন আছে। কাজটা করা যত শক্তই হোক সে লোভটা ছাড়া আরো শক্ত। বেণের লোভও খুব অতিরিক্ত। এই লোভের সঙ্গে সেখানে কি রকমে মিটমাট হল?. বেণিয়া কি সেখানে আপনার জাতিধর্ম্ম ছেড়ে হঠাৎ সুবিচারের অবতার হয়ে উঠেচে! আমাদের ঘরে পুরুষদের কথাটা নিয়ে একটু ভাবতে অনুরোধ করি। মনে থাকে যেন movement এবং agitation এর ক্ষেত্রে এতদিন তাঁরা রূপক হিসাবে মেমসাহেবদের সতীন ছিলেন। কর্ত্তাটী সুবিচারের কলার কাঁদি কি না তাঁরা ত জানেনই।

সত্য কথা এই এখানেও ব্যবসার কার্য্য নির্ব্বাহ (Transaction) হয়ে গেছে। কেমন, না অর্থটা যদি সম্পদ হয় কর্ম্মও একটা সম্পদ। অর্থের মত তারও একটা হিসাব পদ্ধতি (economy) আছে। তারই নীতি অনুসারে সেখানে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে মেয়েদের কর্ম্মক্ষমতা এই সব কাজে লাগালে Nation এর কর্ম্মক্ষমতা আরো অনেক কুলিয়ে যাবে। যোগ্যতায় গ্রেটব্রিটেন উচিয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারটা হঠাৎ এমন পরিষ্কার হয়ে উঠলই বা কেন? হঠাৎ হয় নি। বাইরের বায়ুমণ্ডল উষ্ণতায় ৫০° ডিগ্রি হতে ৪০° ডিগ্রিতে নেমে পড়ে শরীরকে ঐ ১০° ডিগ্রির উপযুক্ত বেশী তাপ সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন করে নিতে হয়। এই জ্ঞান ও এই ব্যবস্থা ঠিক এমনি করেই হয়েচে, হঠাৎ হয় নি। ব্যাপার এমনটা দাঁড়িয়ে পড়েচে যে বাইরের জগৎ ডিগ্রি কতক বেকে নির্ম্মম হয়ে গ্রেটব্রিটেনকে চেপে ধরেচে। সেই ডিগ্রিকতকের উপযুক্ত যোগ্যতা সঙ্গে উৎপন্ন করে না নিতে পালে গ্রেটব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না।

বিলাতের এই সংবাদটুকু আমি উদ্ধৃত করেছি বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক বসুমতী হতে। তার কারণ, কাগজটীর মন্তব্যটুকু আমার কাজে লাগবে। মন্তব্য এই যে অধিকার টুকুকে নারীর ন্যায্য অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েচে। আনন্দের সংবাদ বলেও স্বীকার করা হয়েচে। অবশ্য ভারতের নারীর এতখানি অধিকার ন্যায্য কিনা সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, সে উল্লেখের প্রয়োজনও বুঝি না। এ অধিকার লাভে উপযুক্ত হলে নারীর এ অধিকার লাভ ন্যায্য আর পুরুষের পক্ষেও সেটা আনন্দের সংবাদ এ স্বীকৃতিটুকুও আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এমন সংবাদ ভারতের নারীকে যোগ্যতা উপার্জ্জনে উৎসাহ দিতে পারে। আমি দৈনিক বসুমতীকে এইটুকুর জন্যই ধন্যবাদ দিচ্চি। পাটেল-বিল প্রভৃতি ব্যাপারের সময় প্রতিবাদ পক্ষেই দৈনিক বসুমতীর স্থান, সেটা রক্ষণ শীতলার পরিচয়—আবার circulation 16000 Daily এটাও লোক প্রিয়তার পরিচয়। সুতরাং রক্ষণশীল সমাজের অনেকেরই কল্যাণ কর্ম্মে নারীর যোগ্যতা উপার্জ্জন চেষ্টা মতের অনুকুল দাঁড়াইয়াছে বসুমতীর মন্তব্যে আমার এইটাই যেন মনে হল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে—বাঁচতে হলে এখন প্রত্যেক জাতিকে নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে, গ্রেটব্রিটেন উপস্থিত এটা বুঝেচে এর ব্যবস্থা কর্চে—মেয়েদের নূতন অধিকার দান সেই সঙ্গেই হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেরও সঞ্চিত কর্ম্ম ফুরিয়েছে তা সত্য—নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তে হবে তাও প্রত্যক্ষ—এখন বোঝা আর ব্যবস্থা করা এইখানটাতেই নাকি ঠেকে গেছে। আমরা বুঝ্‌ছি—বুঝে ত এখনও কিছু ঠাহর কর্ত্তে পারি নি সেটা কি? ব্যবস্থা বড় সোজা ব্যাপার নয়। একবার কবে ব্যবস্থা হয়েছিল সে কত মুনি ঋষি এসে তবে।

গ্রেটব্রিটেনের বোঝা এখনও শেষ হয় নি; কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। বোঝার ভুলের দরুণ ব্যবস্থার ভুল হয়ে গেলেই যে জাত যাবে এমন ভয় তারা করে না। বলে তখন ঠিক বুঝলে ব্যবস্থাটাও না হয় শুধরে ঠিক করে নোব।

ব্যবস্থা ত হয়ে গেল যে মেয়েরা ঐ সব কাজ কর্ব্বে—কেন?—না তাদের বুদ্ধি ও বৃত্তিতে চমৎকার ওসব কাজ কুলিয়ে গেছে! এখন ও সব কাজ কর্ত্তে হলে ত মেয়েদের অবাধে মেলামেশা কর্ত্তে হবে। পুরুষে পুরুষে যেমন মেয়ে পুরুষেও তেমনি একটা অবাধ অক্ষুণ্ন স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে হবে। মেয়ে পুরুষ উভয়েরই বৃত্তিতে বুদ্ধিতে ওটাত বর্ত্তমান [illegible] কুলিয়ে

যায় নি। সে রকম মন হলে আজ পর্য্যন্তও সামাজিক বিধিব্যবস্থা কার্য্যতঃ মেয়ে পুরুষে অবাধ মিলনের অন্তরায় খাড়া রেখেছে কেন? ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্ম সঞ্চয়ার্থ যে সব ব্যবস্থার প্রচলন কর্ত্তে হয় তাতে অবাধ মিলন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে—আবার অবাধ মিলন চালাতে গেলে তার উপযুক্ত একটা মনস্তত্ব না হলেও নয়। প্রাণের দায় ঠেকেচে। বিধি ব্যবস্থা চাইই। আবার সেই দায়কে সর্ব্বস্ব করে মনস্তত্বের উপযোগীতা অস্বীকার কলে'ও চলে না। সে ভাবে চলতে গেলে সমাজের জোট এমন পাকিয়ে যাবে এমন সব সমস্যার উদয় হবে যে সে সব সামলান অসম্ভব বল্লেই হয়।

এই যেমন আলোচনা করচি এমন আলোচনা সেখানে হয় নি। সেখানে নূতন কিছু চালিয়ে দেওয়া হয়েচে আর সেই নূতন কিছু চলবার জন্যে নূতন কিছু শেখাবার ব্যবস্থা হচ্চে। মনে কেমন একটা জোর, হবেই। হা হতোস্মি ভাব একবারেই নয়। খোঁচ খাঁচ যা দেখচে বীরদন্তে বলচে—ও বেঁক কুঁদের মুখে সিধা হবেই। এই সমস্ত কারণে Sex-instruction এখন বিলাতী আসর জমাচ্চে মন্দ নয়। সেখানে London University Conference on Education বসলেও তাতে এ আলোচনা দূষ্য নয়। সে আবার আধ্যাত্মিক আলোচনা হলে বাঁচতুম! সম্প্রতি নাকি একটা প্রবল আলোচনায় স্থির হচ্ছিল—early education in Sex-biology and sex-psychology was the child's best and only safeguard. অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান ছেলেদের খুব অল্পবয়স থেকে শিখিয়ে রাখলে তাদের বিপদের ভয় সবচেয়ে কেটে থাকে।

অর্থাৎ এ বিষয়ে নিজের ভালমন্দ আর দুনিয়ার কাণ্ড কারখানা জেনে ছেলে মেয়ে ঝানু হয়ে থাক। মানুষের ইচ্ছাটার স্বাভাবিক গতি ত ভালরই দিকে। সব জিনিষ অবাধে জানিয়ে রাখলে অবাধে ছেড়ে দিতে দোষ কি?

আমরা কিন্তু এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রুচি প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্ব না! ছেলে মেয়ে গুলোকে এঁচোড়ে পাকিয়ে তুললে তাদের মন্দথেকে রক্ষা করা হবে এ যুক্তি পরিপাক করা আমাদের কর্ম্ম নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আর একরকম বলে। সে যাই হউক, তাঁদের ও কথাটাও তাঁদের দেশে নূতন নয় তাঁদেরও বোঝার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ওই দিকে আছে। মানুষের ইচ্ছার স্বাভাবিক গতি ভালর দিকে। এই জ্ঞানের ওপর তারা মানুষকে অবাধে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষও সেখানে খুব সতর্ক, কোন্‌টা কি বুঝে বুঝে আপনার

পায়ের ওপর ভর করে এগোয়ও বৈকি! মন্দকে তারা ভয় করে না, আমরা যে ভাবে ঘৃণা করি তাদের ঘৃণাটাও ঠিক্ সে ভাবের নয়। তারা সাহসের সঙ্গে জোর করে মন্দকে নিংড়ে তার থেকে ভালকে বারকরে নেয়। তাদের মনস্তত্ত্ব আর আমাদের মনস্তত্ত্বে তফাৎ আছে।

দেখ না কেন আমরা জানি-না কি অতি নিকৃষ্ট জাতিয় সুখ পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মানন্দেরই আভাষ। কিন্তু কি তাই বলে বলচি যে নিকৃষ্ট সুখকেই মেনে নাও সেই ক্রমশঃ উৎকৃষ্টে উঠবে। ঠিক ঠিক জেনেও বুঝে চলবার চেষ্টা থাকলে ঐ ভালর দিকে ইচ্ছার যে স্বাভাবিক গতি আছে সে আভাষকে প্রকাশ পর্য্যন্ত পেঁৗছে দেবেই। আমরা ত, তা বলি না, আমরা বলি শেষ যখন উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্টের ভিতর দিয়েই উৎকৃষ্টে পৌছাতে হবে এমনও কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই তখন কিসের জন্য আমরা নিকৃষ্টকে স্পর্শ কর্ত্তে যাব। তাকে এড়িয়ে কি উৎকৃষ্টে হাজির হওয়া যায় না? আবার নিকৃষ্ট যখন আছে তাকে এড়িয়ে চলবার মুখে হঠাৎ তার সামনে পড়বারও সম্ভাবনা আছে।

আমরা নিকৃষ্টকে এড়িয়ে চলি তাই এত ধরা বাঁধা—সে হঠাৎ এসে পড়লে চেপে যাই, চুপে চুপে তাকে ঝেড়ে ফেলি তাই গেরোর মুখেও ফাঁস রাখতে হয়। ওরা নিকৃষ্টকে ধরেই তার ভিতর দিয়ে উৎকৃষ্টে পৌছাতে চায় তাই নিকৃষ্ট যাতে নিকৃষ্টই দাঁড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে ওদের দিনরাত নিকৃষ্টকে ঠেলতে হচ্চে। আমাদের ধরাবাঁধা নিয়মে আছে আবার নিয়মের অনবরত ব্যতিক্রমও আছে। ওদের নিয়মে ধরাবাঁধা নেই কিন্তু কাজে দিনরাত ধর্ ধর্ চলেচে। এই জন্যে আমাদের মুখের কঠোরতা কাজের বেলায় শৈথিল্য দাঁড়িয়ে যায়। ওদেরও মুখের উদারতা কাজের সময় বেহদ্দ সঙ্কীর্ণতা হয়ে পড়ে। মনের স্তরে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর শ্লেষ করি ঘৃণা করি কিন্তু মনের উপরের যে স্তর—সেখানে উভয়েই একস্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

মন একই মানুষের যখন আজ এক, কাল আর হয় অথচ মানুষ সেই মানুষই থাকে তখন মন ছাড়া যে আমাদের মধ্যে আর একটা কিছু আছে—তার ওপরে আর একটা স্তর আছে সে আর বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নাই। জিনিষটা কি না বুঝলেও জিনিষটা যে আছে তা বেশ বোঝা যায়। যে মেয়ে পুরুষের মিলন নিয়ে পৃথিবীতে এত ধরাবাঁধা এই মনের স্তর ছাড়িয়ে উঠলে সেই মেয়ে পুরুষের মধ্যে অবাধ মিলন ত তুচ্ছ কথা—অভেদ মিলনও

মানিয়ে যায়। মনের স্তরের ওপরের যে জ্ঞানদৃষ্টি তাকেই বলে দূরদর্শন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

বিলাতে মেয়েদের যতখানি অধিকার দেওয়া হল তাতে তাদের আর্থিক স্বাবলম্বন আসবে নিশ্চয় সুতরাং একটা বড় নিকৃষ্টের সম্ভাবনাকে সে বন্ধনমুক্ত কর্ল,—আমাদের মনস্তত্বের দিক দিয়ে ভাবলে আমরা তাইই মনে করি বটে কিন্তু তাদের মন দিয়ে তারা নিকৃষ্টের সম্ভাবনাটাকে উৎকৃষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়াই মনে কর্চে। জানচে বটে যে নিকৃষ্ট জুড়ে বসবার চেষ্টা কর্লে তাকে খুব বড় ধাক্কাই দিতে হবে, সে ধাক্কা দেওয়াও তাদের স্বধর্ম্ম সিদ্ধ। আর যদি প্রয়োজন হয় তার জন্য যা উপকরণ সেও তাদের হাতের কাছে আসবেই। তখন তারা মরবে না বা অধঃপাতেও যাবে না।

বাহিরের জগতের নির্ম্মমতা আমাদের Freezing-point একেবারে নাকি 32. Fahrenheit এ চেপে ধরেচে। এই ইজিপ্সিয়ান মমিবৎ অবস্থাতেও আমাদের স্নায়ুজাল আন্দোলিত হতে আরম্ভ করেচে। ডিগ্রিকতক যোগ্যতা না উৎপন্ন কর্লে আর চলচে না। অর্থ সম্পদ ত বহুদিন হতেই অনর্থ বলে মাটিতে গেড়ে বসেচি তার ওপর দিয়ে এখন বিলেতী exchange এর আদরের জল গড়িয়ে আমাদের মান মর্য্যাদা সব ধুয়ে নিয়ে চলেচে। দেহে প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুক্ ধুক্ কর্চে কর্ম্ম সম্পদ হারাতে হারাতেও যেটুকু বজায় আছে সেটুকুর হিসাব কর্ত্তে বসে ক্ষমতার পরিমাণ খতাবার সময় মেয়েদের দরকার পড়বে কি না কে বলতে পারে? কেন না যোগ্যতা উৎপন্ন কর্ব্বার সময় আমরা যে আমাদের মনস্তত্ত্ব সঙ্গত পদ্ধতি ছেড়ে অন্যপথ বাছতে যাব তাতো মনে হয় না। অমঙ্গলকে এড়িয়ে চলবার মত অযোগ্যতার হেতু যত কিছু বুঝবো সে গুলোকে কেটে ছেঁটে উড়িয়ে দোবার উৎসাহই আমাদের প্রবল হবে। চলতে চলতে নিকৃষ্টের সঙ্গে মারামারি আমাদের অভ্যাসেই নেই। পথ আগে নিরঙ্কুশ করে নিয়ে তারপর অযোগ্যতাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে থাকলেই যোগ্যতা আসবে, এমনি ধারা সনাতন যুক্তি ছাড়া নূতন কিছুই আমরা ভাবতে পারব না।

মেয়েদের মধ্যে যদি অযোগ্যতার হেতু থাকে তাদের ডাক নিশ্চয়ই পড়বে! নিকৃষ্টকে ঠেকিয়ে রেখে অযোগ্যতাকে উড়িয়ে দেবার কড়া তাগাদা—মেয়েদের উপলক্ষ্য করে বেশ একটা সমস্যা নিয়ে আসবে। তখন সেই সমস্যার কারা সমাধান কর্ব্বে—মেয়েরা নিজেরা করে নেবে না পুরুষরা করে দেবে—

নূতন কতকগুলা অধিকার মেয়েরা পাবে কি মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা আরো কতকগুলো বেশী অধিকার পাবে—এসব চোখ চেয়ে দেখবার। বুঝে ত সব হবে।

আমাদের দেশে মেয়েরা কোথাও মেশে না, কিছু করে না, কিছু যে পারে তাও সর্ব্ববাদী সম্মত নয়—তারা জানেও না কিছু। সবগুলোই অযোগ্যতার হেতু; সুতরাং তাদের এই সমস্ত গুণ নির্ব্বিবাদে যেমন ছিল তা অতঃপর থাকতে পাবে না। পথ নিরঙ্কুশ কর্ব্বার জন্য কেবলি কেটে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে। আবার মেয়েরা যদি হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে মর্দ্দানি দেখিয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষা ছেড়ে দেয়, সত্যই যদি এজলাসে মেজেষ্টর হয়ে বসে অথবা দারোগা হয়ে তদন্তে যায়, বৃদ্ধের কিশোরী বধূ তাঁরমুখের বিগত যৌবনের অলৌকিক রূপবৃত্তান্ত অবিশ্বাস কর্ত্তে আরম্ভ করে অথবা কেরাণীর স্ত্রী তিনি সাতটা সাহেবকে ভেড়া করে রেখেচেন সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতে থাকে, তা হলেও নিকৃষ্ট এসে পড়ে, এগুলোকে যেমন করে হোক এড়িয়ে যেতেই হবে।

জেঠাই মা দিদি মা বরং কিঞ্চিৎ লজ্জাশীলা হয়ে আধ ঘোমটা টানা অবস্থায় সভা সমিতিতে রীতিমত একপাশে বসে সাহেবদের যেমন করে হোক বুঝিয়ে দেবেন রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েরাই সজাগ রেখেচে, কলকারখানা হাট বাজার প্রভৃতির এক একটা অন্তঃপুর তৈরী হয়ে বিলাতী ও বিদেশী শিল্পের সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে প্রবল বেগে প্রতিযোগীতা চলবে, কোলের ছেলেটীকে কোলে করে আর তিন চারটীর গোলমাল থামিয়ে প্রকাণ্ড সংসারের হেন্‌শেল ঠেলতে ঠেলতে বৌ ঠাকরুণ একটা রাষ্ট্রীয় সমিতির শাখা গঠন করে ফেলবেন, টুনি পুচি খেদি খোকাকে ধরে মায়ের কাজকর্ম্মে যোগাড় দিয়ে পুতুলের বাক্স বগলে নিয়েই বারোটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত বুড়ো পণ্ডিতের স্কুলে হাজিরা দিয়ে ন দশ বছর বয়সের মধ্যেই সাক্ষাৎ স্বরস্বতী হয়ে উঠবে ঠিক এম্‌নিটা কে এসে করে দিতে পারে তার অপেক্ষায় পথচেয়ে বসে থাকা অথবা কেমন করে হতে পারে সেই আলোচনায় মাসিক পত্রিকা বোঝাই করে ফেলা যে রাস্তা ধরতে চাইচে তাতে চলে আর আমরা কি কর্ত্তে পারি?

আমাদের বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বে এইত ব্যাপার? মনের স্তর ছাপিয়ে ওপরে ওঠা আমার তপস্যা। হয়ত বোঝা ভুলও হতে পারে তা যদি হয় তবে এ প্রবন্ধকে কৌতুক বলে ধরে নেবেন। তবে নিবেদন অতি সকাতরেই, জানবেন—আপনাদেব মনটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন।

রাজা-সন্ন্যাসী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তুমি যে আসিয়াছিলে বসন্তের দুরন্ত পবনে
ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
প্রাণের দারুণ ব্যথা জানাইল অশান্ত স্বননে
সমস্ত আকাশ ;
মুহুর্মুহু দিকে দিকে ছড়াইয়া তপ্ত পথধূলি,
আকুলিয়া প্রাণ,
আসন্ন বৈশাখী মাঝে মিলনের বসন্ত-বিলাস,
করি অবসান,
তুমি যে আসিলে দ্বারে রুদ্ররূপে সন্ন্যাসীর বেশে
হে নব অতিথি,
গৈরিক উত্তরী তব অকস্মাৎ বিতথ পরাণে
জাগাইল ভীতি ;—

তোমার অভয়শঙ্খ বারম্বার অম্বুদ-নিনাদে
গৃহাঙ্গন তলে
আহ্বান করিয়া নিল একে একে সর্ব্বহারা প্রাণ
আপনার বলে,
তোমার পিঙ্গলজটা ভস্মমাখা সর্ব্বদেহে দিল
মেঘের আভাস,
অঙ্গে বিচ্ছুরিত তেজ যেন কাল-বৈশাখীর বুকে
বিদ্যুৎ-বিলাস,
কণ্ঠে-তব হাড়মালা দীনতার আতিশয্যে দুলি,
হে রুদ্র ভৈরব,
দুর্ব্বল আঁখির আগে খুলে দিল আপন গৌরবে
অচিন্ত্য বৈভব !

তোমার নয়ন হ'তে দিব্য দৃষ্টি মেলিয়া চকিতে
করি সাবধানী,
বিলাস-বধির কর্ণে শুনাইলে ওগো মহাপ্রাণ,
কি উদাত্ত বাণী,
ধূলিম্লান জীবনের স্তরে স্তরে ফুটাইয়া ফুল
করুণ ইঙ্গিতে,
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র ভরি দিলে শুধু আত্মভোলা
মধুর সঙ্গীতে,
মোহাবিষ্ট পরাণের অন্ধকূপে হে সাগ্নিক ঋষি,
তব মন্ত্র-লিখা
বিশ্বহিত সাধনার মহাযজ্ঞে জ্বালি দিল আজ
হোমবহ্নি-শিখা !

তখন বুঝিনি আছে শূন্য এই হৃদয়ের মাঝে
তব প্রয়োজন,
রচি নাই অর্ঘ্য তাই করি নাই তোমারে বরিতে
কোন আয়োজন !
শত জন্ম বসে বসে গেঁথেছি যে বরমালাখানি
আছে তাহা আছে,
কারে ত পারিনি দিতে বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে
যে এসেছে কাছে,
আমার এ শুষ্ক মালা আচম্বিতে পুষ্পে পুষ্পে
উঠিবে বিকাশি
তুমি যদি পর গলে তব মহা-মহিমায় শুধু
হে রাজা-সন্ন্যাসী !

চিঠির গুচ্ছ

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত]

দুই দফা

(৯)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

তোমার অবস্থা জেনে বড়ই ব্যথা পেলুম। সত্যই ও ও রকম্ জীবন যাপন করা বড়ই শক্ত ; বিশেষতঃ তোমার আমার মত লোকের পক্ষে, যারা জীবনটাকে একটু বড় করে দেখতে চায়। তোমাদের সমাজের মেয়েরা ছেলেবেলা হতেই ওই ধরণে অভ্যস্ত হয়ে যায় বলেই তেমন্ কোন অসুবিধা বোধ কেউ করে না। এ কথা পূর্ব্বে তোমায় বলেচি।

এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমাদের সমাজের মেয়েদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? আমার মনে হয় সব চাইতে আবশ্যকীয় বিষয় হচ্চে শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষাপ্রচার কল্লে পুরুষের সহায়তা তোমাদের আবশ্যক, অথচ পুরুষ যদি তোমাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না করে, তা' হলে তোমরা কি করবে? অজ্ঞানতার অন্ধকারের মাঝে চুপটি করে বসে থেকে জীবন কাটিয়ে দেবে? তা' যদি কর, তা হলে আত্মহত্যার সমান-ই পাপে তোমরা লিপ্ত থাকবে।

তোমাদের পুরুষেরা যদি তোমাদের মুক্ত করে দিতে না চায়, তা' হলে তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েদের নিয়ে একটা দল গড়তে হবে, যারা আপনাদের ছোট-খাট দাবী-দাওয়া বিসর্জ্জন করে চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে দেশের ভগ্নীদের দুঃখ দূর করবার জন্য। তারা নিজেদের উপবাসী রেখেও মুক্তিরবাণী প্রচার করবে, যার উদাত্ত-সুর গৃহপ্রাচীর ভেদ করে অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারী-দের প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে—তাদের টেনে নিয়ে আসবে, আলোর মাঝে, আনন্দের মাঝে, জীবনের সত্য পথের-ই উপর।

তোমাদের এই প্রচেষ্টা, বিদ্রোহের সামিল বলেই, তোমাদের সমাজ ঘোষণা করবে—পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ কর্‌চ বলে তোমাদের উদ্দেশে গালি

বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু শান্তির ঘুম-পাড়ান গানে তোমরা মুগ্ধ হয়োনা।—ও শান্তির যে কোনই মূল্য নেই, তা আগে তোমায় একবার বলেচি।

আমাদের দেশকে ত তোমরা স্বাধীনতার লীলাভূমি বলেই জান। কিন্তু আমাদের দেশের লোকই কি পরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করবার বাসনা জয় করতে পেরেচে? দাসজাতিকে মুক্ত করে দিয়েচে বলে ব্রিটিশ পুরুষ যখন বিশ্বে আপনার ন্যায়পরায়নতার পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল তখনো আপনার দেশের নারীকে চেপে দাবিয়ে রাখতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেছিল না। নারীর বড় হবার পূর্ণ হবার, আকাঙ্ক্ষা কোন মতে সইতে না পেরে তাদের নির্য্যাতনই করেছিল। তাই বাধ্য হয়ে অনকত নারীকে পুরুষের আধিপত্য অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। অবিরাম সংগ্রামে তারা সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছিল। আপনাদের শক্তি প্রয়োগে তারা পুরুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, নারী উপেক্ষার সামগ্রী নয়,—খেলবার পুতুল নয় -বিশ্বে তার স্থান ঠিক পুরুষেরই পার্শ্বে।

সত্যের কাছে অসত্যকে চিরদিনই মাথা নোয়াতে হয়—পুরুষের পৌরুষ-গর্ব্বও তাই টিকল না;—সে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পুরুষ তোমাদের গতির বিঘ্ন ঘটালে তোমাদেরও এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

বিবাহের পর প্রথম যে চিঠিখানা তুমি আমায় লিখেছিলে, তাতে তুমি আমায় জানিয়েছিলে যে, তোমার ব্যক্তিত্ব তুমি কখনো বর্জ্জন করবে না। কিন্তু আজ তোমার অজ্ঞাতসারে সে ব্যক্তিত্ব যে চাপা পড়েচে, তা কি বুঝতে পারনি? আজ যে নিজেকে শুকিয়ে মারবার কথা তুমি লিখেচ, ওটা কি তোমার দৈন্যের পরিচায়ক নয়? কেন তুমি স্বামীকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ কচ্চ যে, জীবন তোমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেচে?

অত্যাচার যারা করে, তারা যেমন নিজেদের অন্তর দেবতাকে অগ্রাহ্য করে, তেমনি অত্যাচার যারা সয়, তারাও সেই দেবতার অবমাননা করে। এ দুটোই মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে থাকে। তুমি নিজে যে সত্য উপলব্ধি করেচ, কিসের আশায়, কোন প্রলোভনে তা বর্জ্জন করে নিজেকে ছোট করে রাখবে? নিজেকে ছোট করে রাখাকে আমি মনের দাসত্ব বলি। ও ভাব পরিহার করতে না পারলে অন্যকে ত মুক্ত করতে পারবেই না, নিজেকে পর্য্যন্ত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলবে।

পরিবারের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য রয়েচে, তা যদি দ্বিধাহীন হয়ে পালন

করতে পারতে, মিশতে যদি সক্ষম হতে কচি-কচি মেয়েদের সঙ্গে ঠিক সমবয়সীর প্রাণ নিয়ে, মন খুলে যদি যোগ দিতে পারতে অন্তঃপুরের মহিলা মজলিশে—তা' হলে আমি আজ তোমার কাণে বিদ্রোহের মন্ত্র জপে দিতুম না, কারণ সেইটেই বুঝতুম তোমার সত্যিকার স্থান। কিন্তু তা' না হয়ে তুমি যখন জানিয়েচ যে তোমার বুকে ব্যথা পেয়েচ, তোমার অন্তরের করুণ আর্ত্তনাদ যখন আমার কাণে এসেও পৌঁছিয়েচে, তখন আমি মনে করচি, ওখানে তোমাকে বেশীদিন রাখলে তোমাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করা হবে। যে-টা তোমার কাছে মিথ্যা, জোর করে সে-টা চালাতে চাইলে তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

বিয়ে করেচ বলেই কেন তুমি অ-কেজো হয়ে যাবে? যে সব মেয়েরা তোমার কাছে এসে সমবেত হয় তাদেরই শিক্ষিতা করে তোল—তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টভাবে মিশতে চেষ্টা কর। তাদের যা বলবার আছে তা' বলে নিঃশেষ করতে দাও। ও সম্বন্ধে আলোচনা না করে তারা থাকতে পারে না—আর কিছুই যে তারা পায়নি! তাদের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হলে, ক্রমে তারা তোমায় তাদের ব্যথার কথাও জানাবে, তখন তুমি যদি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, তা' হলেই তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে। তাদের অভাব আছে অনেক, বুকে সঞ্চিত রয়েচে প্রচুর বেদনা—সে-সব ভুলতে তারা তোমারই সাহায্য চাইবে। এমনি করে শেষটায় দেখো তোমার কাজের আর অন্ত থাকবে না এবং সে কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারলে তোমাদের নারীর অবস্থা অনেকটা উন্নত হবে।

সত্যিই ভাই, আমার বড় ইচ্ছা করে তোমাদের দেশের এই সব বালবধুদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করি—তাদের হাব-ভাব চাল-চলন নিশ্চিতই দেখবার ও জানবার বিষয়।

তোমাদের দেশের যুবকদের সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি শুধু বিস্মিত হই এই ভেবে যে, পুতুলের মত পত্নী পেয়ে কি করে তারা তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে? যৌবন কি পূর্ণতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তাদের চিত্ত নাচিয়ে তোলেনি? সকল রকম বন্ধনের প্রতি কি তাদের আন্তরিক ঘৃণা নেই? এ-সকলের যদি অভাব থাকে, তা' হলে তোমাদের নারীর অবস্থার চাইতে পুরুষের অবস্থা কোন মতেই উন্নত বলা যায় না। প্রাণের স্পন্দন যদি থেমে যায়, তা' হলে সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গ পচে উঠবেই।

ফ্যানি চলে গেছে। তাকে বিদায় দেবার দিন যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়ে তেমন আমোদ পাইনি।

বাগানের উত্তর কোণের সেই কুঞ্জটা, যেখানে নিরালা বসে তোমাতে আমাতে কত রকমের কথা হোত, সেটা এখন একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েচে—কেউ সে-দিকে যায় না।

আমি মাঝে মাঝে একা গিয়ে সেখানে বসি, সেখানকার গাছগুলো আর ফুলগুলো যেন হাওয়ায় তোমার খবর পেয়ে চুপি চুপি আমায় বলে দেয়। তাদের স্পর্শে আমি আরাম পাই, পুলকিত হই।

আর একটা খবর আছে; সেই যে শুকনো লম্বা পাইন গাছটা, কোনমতে তার কঙ্কাল খাড়া করে করে দাঁড়িয়ে ছিল—যাবার আগের দিন দুপুর বেলায় সেটাকে দেখিয়ে তুমি বলেছিলে—"বুকে এক রাশি আগুন নিয়েও বাইরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেই বেঁচে আছে—" তারও, শুনে তুমি খুশী হবে, দগ্ধ-দেহের সমস্ত কদর্য্যতা দূর হয়ে গেছে ফুলেভরা কতগুলি লতার আলিঙ্গনে। আজ তার বুক দিয়ে আর নৈরাশ্যের হা-হুতাশ বেরুচ্চে না—আর সেও হেসে হেসে কত ভাবে ভঙ্গিতে বাতাসের কাণে কাণে কত কথাই কয়। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বুড়োর এই রঙ্গ দেখি। তোমারই—এভি।

(১০)

স্নেহের ঠাকুর-পো,

সাত বছর পরে বাপের বাড়ী এসেচি, তাই নিয়ম-কানুন ভুলে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত কেবল মা আর ভাই-বোনদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্চি। তোমার চিঠির জবাব দিতে সেই জন্যই দেরী হয়ে গেল। নীহারের একা থাকতে হবে শুনে কনক স্বেচ্ছায় কলকাতায় চলে এসেচে। কাজেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তুমি নরেশকে অত ভালবাস বলেই নীহারকে কনক এমন আপন করে নিয়েচে? নীহারের এতটুকু অসুবিধা যেন কনকের বুকে শেল-বেঁধা বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

এখানে এসে তিন দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েচি। তাদের বাড়ী বসে তার দুঃখ-বেদনার কথা কিছুই শুনতে পারিনি—কারণ, তার ভাই-বউরা কড়া পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। কাল গৌরী নিজেই এসেছিল—এর জন্য গঞ্জনা সইতে হবে জেনেও। তিনটে ঘণ্টা একসঙ্গেই ছিলুম—কেমন করে যে সময় কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলুম না।

ঠাকুর-পো, নারীর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করচ, কিন্তু কত গভীর, কি মর্ম্মদাহী সে দুঃখ তা কি কখনো উপলব্ধি করেচ? গৌরীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হতে লাগল, সে যেন তার বুকটা চিরে আমার সামনে ধরেচে— আমি যেন স্পষ্ট করে দেখলুম তার সমস্তটা যায়গা, লাঞ্ছনা আর নির্য্যাতনের নিষ্ঠুর খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি তখনই বুঝতে পারলুম, তার মুখখানি কেন সব সময়েই ছাই-এর মত সাদা হয়ে থাকে—কেনই বা তার ওষ্ঠের বর্ণ নীল আর কেনই বা থেকে থেকে তা কেঁপে ওঠে—তার বুকটা কেন যখন তখন ফুলে ওঠে, আর চোখেই বা অষ্টপ্রহর জল জমে থাকে কেন। সবই আমি এক সঙ্গে বুঝে ফেল্লুম। শুধু বৈধব্যের বেদনা নয় ঠাকুর-পো, তার মনুষ্যত্বের প্রতি নির্ম্মম অবিচার তাকে এমনি ধারা জীবনে-মরা করে রেখেচে।

এখানে এসে সে তার কোলের ছেলেটীকে যমের হাতে তুলে দিয়েচে। দুনিয়ায় এসে সে বেচারা কেবল তাচ্ছিল্যই পেয়েছিল, তাই যমের আগ্রহ দেখে, তার কাছে সুখে থাকবে মনে করেই, গৌরী তাকে দিয়ে ফেলে স্থির হয়েচে।

এতটুকু কোলের শিশু, তাই দুধ তার রোজই লাগত। গৌরী একবেলা দু গ্রাস যা মুখে দিত, তার ফলে শেষ এই সন্তানটির ক্ষিধে মিটাবার মত দুধ সে নিজে যোগাতে পারত না। সংসারের গো-দুগ্ধের যতটুকু অংশ সে পেত, তাও অতি সামান্য। শেষটায় তাও বন্ধ হয়ে গেল—বুড়ো ছেলেকে আদর করে দুধ খাওয়ালে তার অসুখ হবে, ভাতই তার পক্ষে প্রশস্ত খাদ্য। ভাইদের উপর তার যে কোনই দাবী নেই, তা গৌরী জানত, তাই চুপটি করেই থাকত। কিন্তু শিশুর শরীরে আহারের এই অনিয়ম সইবে কেন?—তার যকৃৎ নষ্ট হয়ে গেল। শিশুর রোগ যখন ক্রমেই বৃদ্ধিপেতে লাগল, তখন গৌরী একদিন অভিমান ছেড়ে বল্লে—"একটীবার ডাক্তার দেখালে হয় না?"

তার মধ্যমভ্রাতা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে জবাব দিলে—"অত বড়মানুষী আমাদের এখানে চলবে না; ছেলে মেয়ের অসুখে ডাক্তার কি করবে?"

মায়ের প্রাণ, তোমরা বোঝনা ঠাকুর পো, এতে কি করে ওঠে। পাতা লতা যে যা বলত, গৌরী তারই রস করে ছেলেকে খাওয়াত, ভাবত তাতেই ছেলে ভাল হয়ে উঠবে। তারই জন্য আবার লাঞ্ছনাও সইতে হোত।

তারপরের কথা, ঠাকুরপো, কাউকেও বলা যায় না। ছেলেটির যখন শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখনো গৌরী বল্লে—"দাদা, কি হবে?" সে প্রশ্নের কোন জবাবই পেলেনা। তারপর সবই ফুরিয়ে গেল।

এই সব দেখেশুনে আমরা যে কত অসহায়। তা না ভেবে থাকতে পারিনে। নারীর বৈধব্য কখন উপস্থিত হবে, তা কে বলতে পারে? আর স্বামীর মৃত্যুর পরই সংসারের সকলে তার সঙ্গে এমনধারা অমানুষিক ব্যবহার করলে পরিজনের শান্তির জন্য সে হৃদয় খালি করে স্নেহ বিলিয়ে দেবে কেন? আর কেনই বা অন্তরের ব্যাথা বুকে চেপে রেখে সে হাসিমুখে সকলের সেবা করবে?

সত্যি ঠাকুরপো, এইসব কথা যখন মনে করি, তখন তোমাদের প্রতি যে মমতা আছে, তা দূরে চলে যায়। কেন তোমাদের আপন মনে করব? এক মায়ের পেটের ভাই যদি এমনধারা পর হয়ে যায়, নাড়ীর টানই যদি এত সহজে ছিঁড়ে যায়, তা'হলে কেন সবার সুখ-সুবিধার জন্য আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত খেটে মরব? তোমরা খেতে দাও, পরতে দাও বলেই কি এত জোর? সে কি তোমরা অম্নিই দাও?

গৌরীর জীবনের একটি ঘটনা, যা তোমায় বল্লুম সেইটেই, একমাত্র ব্যথার কথা নয়; প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে কত অবিচারই সইতে হচ্চে। সে সব এমনি নির্ম্মম যে, গৌরীর দশবছরের ছেলেটিকেও ক্লিষ্ট করে ফেলে। রাত্রিকালে মাকে জড়িয়ে ধরে সেও ফুলে ফুলে কাঁদে। গৌরী তাকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে। মা আর ছেলের মিলিত উষ্ণ অশ্রুধারা কি একদিন গলিত গৈরিক প্রস্রবণের মত দেশ সমাজ সব পুড়িয়ে দেবে না?

নীহারের চিঠি পেয়েচি। সে লিখেচে, তার কোনই অসুবিধা হচ্চে না। কনক আর সে নাকি সারারাত গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আমরা ভাল আছি। তোমাদের খবর লিখো।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার—বৌদিদি।

(১১)

নরেশ,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখিনি। কনকের চিঠি চারপাঁচদিন হ'ল পেয়েচি। সে ভালই আছে তুমি অবশ্য তা জান।

কনকের চিঠিতে অনেক কথাই জানলুম যা এতদিন আমার অজ্ঞাত ছিল। নীহার যে কলকাতায় থেকে মোটেও আরাম পাচ্ছে না, তা সে নিজে আমায় কোনদিন জানায় নি; তবে তার কোথাও যে ব্যথা জমে উঠছিল, তার

চিঠি পড়ে আমি তা বুঝতে পারতুম, যদিও সে বেদনার কারণটা ঠিক ঠিক ধরতে পারিনি। কনক আমায় তা জানিয়েচে। চোখে আঙুল দিয়ে সে আমায় দেখিয়েচে যে, নীহারের প্রতি কি অবিচার আমি করচি।

তোমার মনে থাকতে পারে একদিন আমি বলেছিলুম, পাত্রী নির্ব্বাচনে সুবুদ্ধির পরিচয় তোমরা দাওনি। নীহারকে যে ভাবে আমার অভিভাবকেরা চালাতে চাইছেন, তাতে করে তাকে পীড়ন করাই হচ্চে; যদিও আদর যত্নের এতটুকুও ত্রুটি কিছু হচ্চে না। তাঁরা যে রকম বউ চান, তার জন্য কশিয়াং-এর কন্‌ভেণ্টে যাবার কোন প্রয়োজনই ত ছিল না। বাঙালীর ঘরে ঘরে অনেক মোমের পুতুল আছে, যা কিনতে দামত লাগেই না; অধিকন্তু মোটা হাতে দক্ষিণাও পাওয়া যায়। সেই রকম একটি খুঁজেপেতে নিয়ে এলে, অতি সহজেই সে সংসারের নিয়ম কানুনের সঙ্গে বনিয়ে চলে একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে উঠতে পারত।

শুধু গালি দিলে অথবা দুর্ব্যবহার করলেই যে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, তা নয়,—তার ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করলেই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষিতা মেয়েদের বধূর আসনে বসাতে যারা ইচ্ছুক, তাদের দেখতে হ'বে যাতে তাদের চিত্তবৃত্তি সম্যক বিকশিত হবার সুযোগ পায়, পরিবারের জমাখরচের খাতা লিখতে শিক্ষিতা বধূর কোন আবশ্যক নেই।

আমি কালই দাদাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েচি যে, নীহারকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই। এ নিয়ে বেশ একটা গোলযোগ বেধে উঠ্‌তে পারে; কিন্তু তাই বলে নীহারের জীবন আমি ব্যর্থ করে দিতে পারিনে।

আমি জানি তুমি আমার কাজের সমর্থন করবে না। বেশী একটু ছিদ্রান্বেষী যারা, তারা এর মাঝে নানা কদর্য্যভাবের আরোপ করতেও বিরত হবে না; কিন্তু এও আমি জানি যে বিবাহ বলি নয়, নতুন জীবনের সূত্রপাত। তাই জেনে বুঝে আমি নীহারের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইনে। সংসারের কাজ চলা অনেক পরের কথা আগে নীহারের বাঁচা চাই।

এখানে এসেও নীহার যদি আনন্দ না পায়, তাকে আমি সেইখানেই পাঠিয়ে দেব যেখানে গিয়ে সে আরাম পাবে, তার জীবনকে পূর্ণতর করে গড়তে সক্ষম হবে। তার সঙ্গ হতে বঞ্চিত হলে, ব্যথা আমার খুবই লাগবে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে বেদনা আমি সয়ে থাকতে পারব।

তুমি বলবে আমার এই সঙ্কল্প অত্যন্ত অস্বাভাবিক—কিন্তু যেখানে থেকে সে আনন্দ পাবে না জোর করে সেখানে আবদ্ধ রাখাই কি স্বাভাবিক?

• • • •

ওপরের ওই কথাগুলি লিখে ফেলে চুপটি করে খানিকটা সময় বসেছিলুম। কি ভাবছিলুম, জান? ভাবছিলুম তোমার সামাজিক অনুশাসনের শক্তির কথা। বাসরে কি প্রবল তার প্রতাপ! আমি যে তা একেবারে অগ্রাহ্য করতে চাই, তবুও আমার মাঝে এত সঙ্কোচ এনে দেয় যে, তা দূর করতে আমায় জোরের সঙ্গে উপরের কথাগুলো লিখতে হয়েচে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, আমি অন্যায় কাজ করতেই প্রবৃত্ত হয়েছি। যাক্ নীহারকে আমি এখানে আনবই।

বউদির সেই গৌরীদেবীর করুণ কাহিনী তোমায় আগে জানিয়েচি। সম্প্রতি বউদির একখানা চিঠি পেয়ে তাঁর অবস্থা বিশদভাবে জানতে পারলুম। তোমার সমাজের কি এই সব বিধবাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া ছাড়া? রয়েসয়ে কাজ করবার ছলে কি ঘুমিয়ে থাকাও প্রশংসনীয়?

তুমি বলবে গৌরী দেবীর ইতিহাস একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ওর ওপর এতটা জোর দেওয়া সঙ্গত নয়। আমি কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে মোটেই রাজী নই। আমি বলতে চাই, এরূপ অত্যাচার ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হ'চ্চে বলেই, 'ও কিছু নয়' বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। দাদা ওই কথা বলেই বউদিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বিধবাদের সম্বন্ধে কলেজে পড়বার সময়, তোমাতে আমাতে খুব আলোচনা হোত। তুমি বলতে, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে সমাজ এই কথাটাই আমাদের বুঝিয়ে অথবা শিখিয়ে দিতে চায় যে, দুনিয়ায় যৌন সম্বন্ধটাই সব চাইতে বড় নয়—ও সম্বন্ধ ঘুচে গেলেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে। বাংলার বিধবারা ওই সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করচে। জানিনা, এ মত তুমি এখনও পোষণ কর কিনা।

আমি কিন্তু আগের মত এখনও বলব যে, যৌন সম্বন্ধটা সব চাইতে বড় না হলেও—ওর শক্তি খুবই বড় এবং ওকে উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আত্মরক্ষা ও বংশ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রাণী মাত্রেরই আছে। মানুষ যে প্রাণী সে কথা অস্বীকার করা যাবে না—যদিও আমরা

প্রাণী কিনা, প্রাণের পরিচয় পাইনে বলে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা জড়ের সামিলই হয়ে পড়েচি, তাই আমরা মনে করতে পারি যে, পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নারীর প্রাণ-পদার্থটাও পাথরে পরিণত হয়—না হওয়াটাই অস্বাভাবিক, গুরুতর অপরাধ।

বাসনা-কামনা প্রভৃতি বর্জ্জন করতে শুধু বিধবাদেরই উপদেশ দাও কেন? তা'রা ত তোমাদের মতে অবলা—তাদের ত কেবল পরের গলগ্রহ করেই রেখেচ; এমন অবস্থায় সংযমে শক্তিশালিনী হয়ে, তারা তোমাদের কতটুকুই বা হিতসাধন করবে? আর নারীকে কি কাজ করবার অধিকার কিছু তোমরা দিয়েচ?

তোমরা, পুরুষেরা, যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত রয়েচে, তারা কেন সংযমে শক্তিমান হয়ে বিশ্ব-মানবের মুক্তিদান করতে যত্নবান হও না? তাহলে কাজ ত অনেক সহজ-সাধ্য হয়ে ওঠে।

তোমরা তা পার না এবং পার না'বলেই সংযমের সবটা বোঝা বিধবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় এড়িয়ে বসেচ—আর নিজেদের বেলায় বিবাহটা করেচ পুত্রার্থং।

একটা গল্প তোমায় বলিনি—আজ মনে পড়ে গেল। প্রথম চাকরী পেয়ে যখন লাহোরে আসছিলুম, সেই সময়ের কথা। তোমরা ত হাওড়া ষ্টেশনে আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলে। ট্রেণ ছেড়ে দিলে মনটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছিল—অমন যে তুর্গিনেভের গদ্য-কাব্য তাতেও মন বসছিল না। বইখানা হাতে করে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলুম। পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি ভদ্রলোকের কাশির আওয়াজে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে বাতাস পেয়ে তার লম্বা পাকা দাড়ি, তাকে ভারি বিব্রত করে তুলেচে। আমি ফিরতেই তিনি উড়ন্ত দাড়ী-গুচ্ছ বাঁ হাতে গুছিয়ে নিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, কোথায় যাবেন?" জবাব দিতেই তার প্রশ্নের বান ছুটল। শেষটায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বিবাহ হয়েছে?"

আমার একটু ভয় হোল। এতদিন ফাঁকি দিয়ে অবশেষে দেশ ছেড়ে যাবার পথে একটা ঘটক এসে তেড়ে ধরল! একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে আমি বল্লুম—"আপাততঃ ও দিকে খেয়াল নেই—বেশ আছি।"

ভদ্রলোকের চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠল। তিনি আমার ডানহাতের

পাণ্ডা ধরে খুব খানিকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বল্লেন—"এই ত চাই—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া জীবনে কি সিদ্ধিলাভ করা যায়?"

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি এমন একটি বক্তৃতা জুড়ে দিলেন, যা শুনলে তোমরা তাঁকে অতি সম্মানের সঙ্গে নিয়ে তোমাদের ধর্ম্মসভার আসনে বসাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতে।

গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে আমি কিছু খাবার কিনতে নেমে পড়লুম। ফিরে গিয়ে দেখি সেই ব্রহ্মচর্য্যের পাণ্ডাকে ঘিরে জনকত নতুন যাত্রী বসেছেন—তাঁর বক্তৃতা তখনো থামেনি। টিফিন ক্যারিয়্যারে খাবার গুলো পূরে রেখে আমি আবার যখন তুগিনেভ খুলে বসলুম, তখন ভদ্রলোকটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখিয়ে বল্লেন—"এই দেখচেন একজন কলেজের অধ্যাপক—এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নি এবং করবেনও না। এঁর মত সংযমী, ত্যাগী শত শত যুবক না হলে আমাদের দেশের দৈন্য ঘুচবে না—হিন্দুর সেই গৌরবের দিন আর কখনো ফিরে আসবে না।"

তিনি থামতেই আমি বল্লুম—"আপনি ভুল বুঝেচেন—বিয়ে কখনো করব না, এমন কথা ত আমি বলিনি।"

তবুও নিষ্কৃতি নেই। তিনি অগ্নি জবাব দিলেন—"তা কি আমি বুঝিনি? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, নইলে আপনার পূর্ব্বপুরুষদের যে পিণ্ডলোপ হবে। আপনার চরিত্রে এইটেই শিখবার বিষয় যে লালসার বশবর্ত্তী হয়ে আপনি বিবাহ করবেন না—করবেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

তাঁর বক্তৃতা সমানই চলতে লাগল। আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা যে আগাগোড়া ভুল তা আমি তাঁকে বোঝাবার জন্য দু'একবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু তা' তাঁর কাণেই পৌঁছিল না; অগত্যা আমি নিরস্ত হলুম।

তিনি অপর একটি ভদ্রলোককে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"মশাই, ত্রিশ বৎসর যাবত স্কুলে শিক্ষাদান করবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা সব সময়েই করেচি; কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব মশাই, কত ছেলে পাশ করে বেরিয়ে কত উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েচে—কিন্তু মানুষ হলো না একটিও! হবে কি করে মশাই?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।"

যাঁকে এ সব বলা হচ্চিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

"আজ্ঞে, রাণীগঞ্জে।"

"রাণীগঞ্জে কোথায় যাবেন বলুন ত ?" অপর একজনে জানতে চাইলেন।

"হরনাথ চাটুজ্জের বাড়ী।"

"বটে! তিনি আর আমি যে এক আফিসেই চাকরী করি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"আজ্ঞে আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেচি।"

"বটে, বটে!" রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি কিছুকাল চুপ করে থেকে বক্তা মহাশয়ের আপাদ মস্তক বার বার করে দেখতে লাগলেন। তারপর সহসা বলে ফেল্লেন—"আপনার এটি দ্বিতীয় পক্ষ না ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বলেন কি মশাই, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে এতটা বক্তৃতা করলেন আপনি!" পার্শ্বের আর একটি ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বল্লেন।

বক্তাটি তাঁর লম্বা দাড়ীর মধ্যে হস্তচালনা করতে করতে বল্লেন—"বলেচিইত মশাই, লালসার জন্য বিবাহ, আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে বিবাহ, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—"

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে রাণীগঞ্জের ভদ্রলোকটি বল্লেন -"কিন্তু শুনেচি মশাই, প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েও আপনার আছে ?"

"আজ্ঞে, দুটি কন্যার বিবাহ দিয়ে অব্যাহতি পেয়েচি। একটিমাত্র ছেলে, যদি কোন অমঙ্গল হয়, তা'হলে পূর্ব্বপুরুষদের পিণ্ডলোপ হবে না ? আপনারাই বিচার করুন, একটি মাত্র গুঁড়ো বইত নয় --তার ভরসায় কি থাকা যায় ?" সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি বইপড়ায় মন দিলুম। ট্রেণ কখন রাণীগঞ্জ পিছনে ফেলে এসেছিল, তা টেরও পেয়েছিলুম না।

তুমি ভাবচ তোমাকে চটাবার জন্যই আমি এই গল্প লিখলুম। তা কিন্তু মনে করো না—আমি নিজে দেখেচি, শুনেচি।

আশা করি ভাল আছ। তোমাদেরই—মোহিত।

(১২)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এভি,

ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা, এভি! স্বামী আমায় কি লজ্জায়ই না ফেলেচেন। তিনি তাঁর দাদাকে লিখেচেন যে আমাকে তিনি লাহোর নিয়ে যেত চান।

তুমি বলবে, বেশ করেচেন। তুমি বোঝনা, তোমাদের সমাজ অন্য ধরণের—আমাদের অভিভাবকেরা একে বিষম বেয়াদবী বলে মনে করেন। আমি আজ শ্বশুরের মুখের দিকে চাইতে পারচিনে।

এ সব অনর্থের মূল হচ্চে কনক—স্বামীর বন্ধু-পত্নী। এমন একটা কাজ করে ফেলেচে আমাকে না জানিয়ে। আগে বুঝতে পারলে আমি তাকে আমার অন্তরের ব্যথার কথা বলতুম না। আমার মোটেই মনে হয়নি যে, সে স্বামীকে জানাবে। আমার এখানে একা থাকতে কষ্ট হবে বলে, সে বর্দ্ধমান হতে এসেছিল। এখন দেখচি তার না আসাই ছিল ভাল। এর জন্য তাকে আমি সহজে ক্ষমা করতে পারচিনে। আজ সারাদিন তার সঙ্গে আমি কথা কইনি—কেবল একটু আগে রাগ করে তার ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছিলুম—এমন লাল হয়ে উঠেছিল যে, আমার ভয় হচ্ছিল পাছে আমার হাতশুদ্ধ রাঙিয়ে দেয়। সে কিন্তু তবুও আমার গলা জড়িয়েই দাঁড়িয়ে রইল। আর কঠোর হতে পারলুম না—বুকে চেপে ধরলুম। কিন্তু কি কাণ্ডই সে ঘটিয়েচে।

দিদিই বা শুনে কি মনে করবেন। সাত বছর পর একটি মাসের জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছেন, আর তাতেই এত সব। কনককে দিয়ে আমি চিঠি লিখিয়ে ছেড়েচি যে, এসব তারই দুষ্ট বুদ্ধির ফল—আমিও তাই লিখেচি।

আর কনকের-ই বা কি দোষ? সে আমায় খুব বেশী ভালবাসে বলেই না আমার ব্যথায় ব্যথিতা হয়েচে এবং তারই জন্য স্বামীকেও জানিয়েচে। সে কি করে বুঝবে যে, এতেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ওপর তাগিদ ওয়ারেণ্ট জারি করে বসবেন, তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্য। স্ত্রীটি যেন তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

এই দেখনা ব্যাপার! নারীর অধিকারের জন্য যারা মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাফিয়ে বেড়ায়, তারা নিজেরাই নারীর মর্য্যাদা বোঝে না। এদের ক বিশ্বাস করে, এদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চল্লে, শেষটায় কি ভয়ানক পরিণতি হবে বলত?

তোমার কথাই ঠিক, এভি! পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমাদের লাভ নেই। পুরুষের চোখ দিয়ে আমরা নিজেদের অভাব দেখতে চাইব না। আমাদের বুকের ব্যথা তারা কি করে জানবে, বুঝবে? আমাদের অন্তর দেবতারই আদেশে আমরা পরিচালিত হব।

আমি আজ স্বামীকে লিখে দিয়েচি যে, আমি লাহোর যাবনা। সঙ্কল্প করেচি, এখানে থেকেই, যে সব মেয়েরা প্রায় রোজই আমার কাছে আসে, তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করব। আমার শোবার ঘরটাকে একেবারে ক্লাসরুমের মত করে সাজিয়ে ফেলেচি—মেয়েরা এসে দেখে অবাক হয়ে যাবে।

বুড়ো পাইন গাছটার নব-যৌবন প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে সত্যিই বড় খুসী হয়েচি। আকাশে বাতাসে সে জীবনের আনন্দ-সংবাদ পেয়েছিল বলেইত নৈরাশ্যের জড়তাকে দূরে রাখতে পেরেছিল। আজ যে তরুণ-ব্রততীর সংস্পর্শে সে আনন্দে মেতে উঠেচে, তার কারণ হচ্ছে, বার্দ্ধক্যের ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছিলনা। জীবনের গূঢ় রহস্য ওর যেন জানা ছিল।

আমি ভাবি মানুষের সঙ্গে এদের কি আশ্চর্য্য পার্থক্য। মানুষ কেবল জড়তাকেই খুঁজে বেড়ায়, দুঃখ-দৈন্যকে বড় করে দেখে দেখে নিজেকেই ছোট করে ফেলে, মৃত্যুকে সর্ব্বদাই আসন্ন জেনে অতি সহজেই তাকে বরণ করে নেয়—অথচ এই মানুষই নাকি ভূমার পরিচয় পেয়েচে—বিশ্বের মূল সত্য উপলব্ধি করেচে।

আমি কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হতে দেখেচি, কত শীর্ণা স্রোতস্বিনীর বুকে তরঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেচি, ছিন্ন মেঘ-খণ্ডের চটুল নৃত্য-ভঙ্গিতে বিস্মিত মুগ্ধ হয়েচি—কিন্তু কখনো পক্ককেশ লোকের অধরে হাসির মাধুরী দেখিনি, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টিতে তেজের পরিচয় পাইনি, শুকনো বক্ষপঞ্জরের ভিতর জীবনের রাগিনী শুনিনি। পক্ষান্তরে উপলব্ধি করেচি, বাইরে বিরাট সাজ-সজ্জার ভিতরে দারুণ দৈন্য, মোহন আঁখি-তারকায় বেদনার ব্যঞ্জনা, স্ফীত বক্ষের মাঝে নৈরাশ্যের হাহারব।

তুমি যাই বল এভি, আমার বিশ্বাস, মানুষ প্রাণকে খুঁজে পায়নি। যদি পেত, তা' হলে এত সহজে ও-পদার্থকে তারা হারিয়ে বোসত না—ও-কে বেশ করে, আরামের সঙ্গে, ও-র সবটুকু আনন্দ নিংড়ে উপভোগ করে তবে ছাড়ত।

আমরা, মানুষেরা, কিছুতেই তা পারচিনে। আঘাতের ব্যথা ভুলতে আমাদের বড্ড বেশী সময় লাগে। অনেক সময় আঘাত-জনিত ক্ষতটাকে বাড়িয়ে তুলেই আমরা নিজেদের মৃত্যুকে কাছে টেনে আনি, আর মৃত্যু যতদিন না এসে পড়ে, ততদিন জীবনের আনন্দকে দূরে রাখবারই চেষ্টা করি। জীবনের এই নিরানন্দই আমাদের বুকের মাঝে নৈরাশ্য জমিয়ে তোলে—তাই অ-কাজ

যে যৌবন চলে যায় তাকে আর ফিরে পাইনে। জীবনে নব বসন্ত এসে আর কখনো আমাদের পুলকিত উন্মত্ত করে তোলেনা, অন্তরের শুকনো বুকে কোকিল দোয়েল সুরের ঢেউ খেলিয়ে দেয় না।

এ সব কথা যে আজই কেবল আমার মনে হচ্ছে, তা নয়—ছুটির দিনে নিস্তব্ধ দুপুরে জানালার ধারে বসে যখন বুড়ো পাইন গাছটা আর তার জাতি-গোষ্টিদের দিকে চেয়ে দেখতুম, তখন আমার কেবল এই-সব কথাই মনে হোত।

বাড়ীতে, শুনচি, আমাকে লাহোর পাঠাবার কথা নিয়ে খুবই আলোচনা চলচে। দেখি কি হয়! খুব লম্বা চিঠি দিয়ো। ইতি

তোমারই—নীহার।

নারায়ণের-পঞ্চপ্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

চতুর্থ অধ্যায়

(ত্রিবেণীর কথা)

১

সরস্বতী

হাসির আমার এ কি হল! সে এই মাস-খানেকের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? মা ভাবছেন, দিদিমা কাঁদছেন, এমন কি বোধ হচ্ছে যেন বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভাবছে যে এই সারা গ্রামখানার হাসিখানি এমন হয়ে একটা ছোট্ট ঘরের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন কি এই হতভাগিনী বাকশক্তিহীন মানুষটাও যে মূক দৃষ্টিতে জানাচ্ছে যে তার করুণাময়ী হঠাৎ তার প্রতি এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন? কেবল ঘরের কোণে বসে একটা ছবি নিয়েই ভাবছে, না হয় তুলি বুলুচ্ছে, না হয় হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ছবিখানাও দেখছি—একটী ভিখারীর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কত ফুল, কত শোভা, কত হীরে মাণিকের রাশি হেলা ফেলা করে সাজান। কিন্তু তার মাঝখানে গৈরিক বসনে ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন ভিখারী। এ যেন সেই তার পূর্ব্বের আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিখানার নতুন সংস্করণ। সেই বুদ্ধের ছবিখানা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, আর দেখতে পাই নে। কিন্তু তার স্থানে এ কার মূর্ত্তি সে আঁকছে। এ মুখখানার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য রয়েছে তাঁকে এমন সন্ন্যাসীর বেসে সাজিয়ে দেবার কি কারণ যে আছে তাও ত' খুঁজে পাই নি। প্রিয় বাবুর চেহারার মধ্যে কোন স্থানেও ত' সন্ন্যাসীর লক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। তবে আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় দূর হ'তে না হয়, আড়াল থেকে দেখিছি, তাই জোর করে বলতে পারি নে বটে, কিন্তু কৈ আঁর কাউকেও ত' এ রকমের কোনো কথা বলতে শুনিনি। তবে শুনিছি বটে ইনি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান লোক। তাই বলে এঁর মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাব কি করে হাসি দেখলে?

প্রিয়ব্রত বাবু যে খুব ভাল লোক তাত' সবারই মুখে শুনছি। শুনছি তিনি আসাতে গ্রামের শ্রী ফিরে গেছে। সারা দেশের লোক এঁর প্রশংসা করছে—সমস্ত গ্রামের হেন কাজ নেই যাতে নাকি এঁর হাত নেই। গ্রামের দুঃখী দরিদ্ররাও নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে এঁর সাহায্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করে নিচ্ছে। তবু কেউ ত' বলেনা যে ইনি সন্ন্যাসী। মা বলেন বটে, যে ম্যানেজার বাবু খুব ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী, স্বল্পভাষী, স্বল্পব্যয়ী মানুষ। বিষয় বুদ্ধিও শুনেছি তাঁর যথেষ্ট আছে—বিষয়ের আয়ও বেড়েছে। কিন্তু কেউ ত তাঁকে কৈ সন্ন্যাসী বলে না, বা সন্ন্যাসী বলে ভুল করে না? তবে সেই বিষয়ী মানুষটীর মধ্যে এই অদ্ভুত মেয়ে মানুষটী সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখতে পেলে?

সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী—কেবল দেখেছিলাম সেই এক দিন, আর দেখছি এই এতকাল পরে আমার ঘরের দ্বারেরই কাছে। জানি না আমার কি সৌভাগ্য যে আমাদের সেই কতদিনের হারাণো চাঁদ আবার আমারই অদৃষ্টে দয়া করে উদয় হয়েছেন, দয়া করে ধরা দিতে এসেছেন।

ধরা দিতে? হায় রে মেয়ে মানুষের প্রাণ! এ কথা কেমন্ করে, কোন্ সাহসে তুই বল্লি? কৈ তিনি ধরা দিলেন? সেই যেমন প্রথম ধরা দিতে এসে ধরা না দিয়ে সরে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করেই ত' আজও কাছে

এসে ধরা নিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন। এখন যে ইনি আরও দূরে—বহু দূরে কোন সপ্তর্ষি লোকের ধ্রুবতারার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আমার যোগী যে ধ্রুবলোক হতে নামতেই পারেন না। না—না—নেমে কাজ নেই। তুমি অমনি ধ্রুবলোকেই থাক, আমিও এই অধ্রুবের জগৎ হতে তোমার ঐ দুটী বিশাল কোমল নয়নের মধ্য দিয়ে আমার ধ্রুব ভক্তিকে সেই লোকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু হাসিই বা এ কি করে বসল? হাসি এ কোন্ অপরিচিতকে এনে আমাদের দুই বোনের মাঝখানে দাঁড় করালে। একে কে চায়? আমি? কৈ একদিনও ত' এঁর শুভাশুভ কোন কর্ম্মের দিকে ফিরে চাইবার কোনো অবসর পাই নি, তবে কেন আমার এত কাছে, আমার হাসির হাসিটুকুর অন্তরে এঁর স্থান হল? হাসি এ কি করে বসল?

তাকে মানা করবার জো নেই। মানা করলে বলে, 'আমার বাবা ক্রিশ্চান হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি ঘরে থেকেই ক্রিশ্চান। আমি তোমাদের এই সব বাজে লোকাচার মানি নে।' সে বাস্তবিকই কোন দিন কোন মিথ্যে সংকোচ রাখে নি, যখন যেখানে যাবার দরকার বোধ করেছে সেখানে গিয়েছে, যে কাজ করবার দরকার বোধ করেছে তাই করেছে। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি সে তার হাসির জোরে সমস্ত বাধাই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাকে কে ঠেকাবে? আমি? আমার সে সময় কৈ? ইচ্ছে কৈ? শক্তি কৈ? আমার সমস্ত শক্তিই যে এক জায়গায় আটকে গিয়ে শিবের জটায় গঙ্গার মত পাক খাচ্ছে। কোন্ ভগীরথ তাকে আরাধনা করে নামিয়ে আন্‌বে?

• • • • • • •

আজ প্রভাতে আমার সন্ন্যাসীর পাশে এ কাকে দেখে এলাম! এ কে—এ কে—এ কে গো! একে দেখলাম যেন আমার হোমাগ্নির পাশে শান্তিজলের কলসের মত চুপ করে শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! কে ইনি যাকে আমার সন্ন্যাসী এত আগ্রহে নিজের বুকের মধ্যেই টেনে নিচ্ছিলেন? কে তুমি এত দিন আপনাকে এমন ভাবে গোপন করে রেখেছ? তোমায় ত' চিনতে পারলাম না। তুমি আমাদের দাসত্ব করতে এসেছ, কিন্তু তোমার ঐ দাস ভাবের আবরণের মধ্যে যে মহাপ্রভুত্বের আভাস হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলক মারলে তা কি সত্য, না তাও একটা মিথ্যা আলেয়ার আলো? যদি ঐ

আলেয়া হয় তা হলে অভাগিনী হাসি মরেছে, আর যদি আলেয়া না হয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃ হয় তা হলে ? তা হলেও না জানি তার কি হবে ?

যা ভয় করছি, যদি তাই হয়; তা হলেও ত তুমি সহজলভ্য নও। হে অপরিচিত, হে আবৃত জ্যোতিঃ তোমার সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ ক'র, নইলে যে আমরা ভয়ে মরি। নইলে অভাগিনী হাসির হাসি যে আর দেখতে পাব না।

কথা কও—কথা কও! আজ আমার শুধু কথা শুনবার ইচ্ছে করছে—কথা কও! হে চিরমৌন, আর কত কাল এমনি ভাবে শুধু একটী কথার আশায় বসিয়ে রাখবে, কথা কও। এত কথার জগতে, এত কোলাহলের হাটে, শুধু সেই একটী কথাই কি কেবল শুনতে পাব না? আর সবই শুনতে পাব কেবল সে একটী কথা হ'তে তুমি আমায় বঞ্চিত রাখবে? প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হ'তে প্রভাত—এমনি করে কত রাত্রি, কত দিন কেটে গেল, কত কথা তুমি কইলে, কেবল সেই একটী কথা হ'তেই বঞ্চিত রাখলে! বঞ্চিত রাখবে বলেই কি আগে হ'তে এই বাক্যহারা মেয়েটীকে আমাদের মাঝে রেখে দিয়েছ? তাই সেই প্রথম দর্শনের দিনই তোমার চিরমৌন ভাষার প্রতিনিধি করে এই যাকে পাঠিয়েছ তাকে বুঝি কথা কহাতে পারলাম না।

কিন্তু আমিও ছাড়ব না, আমি একেও কথা কহাব। একেও একদিন তোমার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেখাব যে আমি কহাতে জানি, মৌনতার মধ্যে মুখরতার জন্ম দিতে পারি। চির স্তব্ধ আকাশেও ধ্বনি জাগাতে পারি। ব্যথা আমার কথা কইবে এবং সেই সঙ্গে তুমিও কইবে—নিশ্চয়ই কইবে। যে কথার জন্য আমি আমার জন্ম হ'তে প্রতীক্ষা করে আছি, যে কথার জন্য আমার জনক ঋষি সারা জীবন অপেক্ষা করে গেছেন, সে কথা যে চিরদিন অকথিত থাকবে এ হ'তেই পারে না। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাঁরই আশা আমার মধ্যে জলন্ত হয়ে জেগে আছে। সেই অমর আত্মার অমর আশা অমর সাফল্যকে টেনে আনবেই। আমি তার সূচনা দেখতে পেয়েছি।

* * * *

আমার 'ব্যথা' আমার হাসির ব্যথা, এই মুখর সংসারের মৌন মূক 'ব্যথা'ও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন তার মৌনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি জেগে উঠেছে। কেন উঠেছে তাও ধরতে পেরেছি, কারণ তার হাসি আর তাকে তেমন করে প্রাণভরা হাসি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছে না। কিন্তু তার

চোখে এত দিন পরে জল দেখতে আরম্ভ করিছি—সে কেঁদেছে। আমি তাকে ভাষা শেখাবার বিফল চেষ্টায় যতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সে ততই মৌন অশ্রুভরা চোখে তার হাসির জন্য মিনতি জানাতে আরম্ভ করেছে। যদি এই মৌন ভাষা স্ফুট হয় এই এত দিনকার চেষ্টার ফল দেখা দেয়, যদি সে হঠাৎ তার স্ফুট ভাষা খুঁজে পায়, তা হলে কি সে যার মৌনতার প্রতিনিধি, সে কথা কইবে না?

কিন্তু তুমি ত' কথা কইতে পার, তোমার বন্ধুর কাছে ত' দূর হ'তে দেখলাম কত কথাই না কইছ! কেবল আমিই বঞ্চিত থাকব? আমার কাছে কি কেবল শুষ্ক উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার নেই তোমার? যে কথা বলবার জন্য তোমার সমস্ত দেহ মন আত্মা ছট্‌ফট্ করছে—হ্যাঁ করছে, নিশ্চয় করছে—সেই কথাটাই কেবল বাদ থেকে যাবে? তুমি কি মনে করেছ আমার কেবল কাণ দুটোই আছে, চোখ নেই, মন নেই, আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই? আমি যে তোমার কতখানি দেখে নিয়েছি, তাই যে তুমি ধরতে পারছ না। তোমার যোগযুক্ত মন সেখানেই যুক্ত থাক, তোমার মনের মন যে কোথায় ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছে তা তোমার চোখে পড়ছে না, এইটেই আশ্চর্য্য!

কিন্তু আমার যোগীর এই ভোগী বন্ধুটিকে কেমন যেন একটু ভয় করছে। কি যে কথা হয় এঁদের মধ্যে তা যে কোন দিন সাহস করে আড়াল থেকে শুনতে পারলাম না! আড়াল থেকে শোনা! ছি ছি, তা কেমন করে পারব? তা যেদিন পারব সেদিন কি আর আমার সন্ন্যাসীর কাছে আমার চির-প্রার্থিত রঘুনাথজীর কাছে যেতে পারব না? না—না, তা পারব না। যদি চিরদিন এই দু'জনের পরিচয় গোপন থাকে, তবু তা পারব না।

কিন্তু এক একদিন ইচ্ছা হয় প্রিয়ব্রত বাবুর মার কাছ থেকে, আর যদি সম্ভব হয় অবিনাশ বাবু উকিলের কাছ থেকে এঁর পরিচয় আদায় করতে যাই। কিন্তু পারি না যে। কে যেন বাধা দেয়। তাই হাসির কাছেও এ কথা পাড়তে পারি না। লজ্জা করে—। লজ্জা! আমার আবার এ উৎপাত কোথা হতে জুটল! যে কোন দিন কোন লজ্জা ভয়ের ধার ধারেনি, তার আবার লজ্জা!

কিন্তু তবু সেই লজ্জাও ত' আমার মধ্যে লুকিয়ে এসেছিল। এতদিনকার অব্যবহারেও ত' সে মরে নি।

বুঝি কিছুই মরে না ; এই অমরতার জগতে কিছুই মরে না। কালে সবই ফুটে ওঠে, সময় হলে সবই আবার ফুলে পাতায় সজীব হয়ে ওঠে। ওরে মন ! ভয় নেই, সময়ের অপেক্ষা কর্, তোর সাধনাও সফল হবে। (ক্রমশঃ)

(উপাসনা, শ্রাবণ।)

তুমি

[শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।]

তুমি শান্তি আমার তাপিত পরাণে
শয়নে স্বপন সুখ।
তুমি হৃদয়-কুসুমে স্নিগ্ধ মধুর
অমিয়-সুরভি টুক ॥
তুমি মলয় আমার প্রখর নিদাঘে
মধুমাসে পিকবর।
তুমি তরুণ তপন প্রভাতে আমার
সন্ধ্যায় সুধাকর ॥
তুমি জ্যোছনা আমার আঁধার হৃদয়ে
অন্ধের হাতে নড়ি।
তুমি নিরাশ জীবনে আশাটী আমার
অকূল পাথারে তরী ॥
তুমি হৃদয় সাগরে লহরী আমার
বিষাদের মাঝে হাসি।
তুমি সুপ্ত জীবনে বাঁশরী আমার
নিয়ত জাগাও আসি' ॥
তুমি ক্লান্ত হৃদয়ে আরাম আমার
প্রেমের মধুর স্মৃতি।
তুমি উদাস জীবন-প্রান্তরে মোর
অন্তর-ভরা গীতি ॥

আগমনী

[রচনা—শ্রীকালিদাস রায়]

সুর ও স্বরলিপি

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ভৈরবী—জলদ্ একতালা

০ ১ ২´ ৩
II {দা র্সা র্সা । ণা র্সা ণা I দা ণা দা । পা দা পা ।
এ স মা ন ব নী হৃ দ য়া জ ন নী

০ ১ ২´ ৩
। মা জ্ঞা জ্ঞা । -ঋা সা সা I দা -ণা সা । সা -া -া ।
ম ণি ম ঞ্জু আ- কু ০ ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা সা সা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা মা । মা মা মা ।
হ র ষ ধা রা য় স র স ক রি য়া

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা মা পা । দা দা ণা I দা -ণা -র্সা । র্সা -া -া}II
এ স মা ব র ষ প ০ ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
{স সা II ণা সা সা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I মা মা মা । মা মা মা ।
(১) এ স শা র দ গ গ ন ম গ ন ক রি য়া
(৫) এ স প য় স্বি নী ০ র আ পী ন ভ রি য়া
(৯) এ স ন দ ন দী ভ রি মী ০ ন বৈ ভ বে
(১৩) এ স শি শু র আ ০ স্য হা ০ স্যে ভ রি য়া

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা মা পা । পা পা দা I মা -পা -দা । দা -া -া ।
(১ক) শু চি জ্যো ছ না র বা ঁ ০ নে ০ ০
(৫ক) ম ধু র গো র স র ০ ০ সে ০ ০
(৯ক) কান্ তা র ভ ০ রি কা ০ ০ শে ০ ০
(১৩ক) লা ০ স্যে আ ঙি না ভ ০ ০ রি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। দা দা র্সা । -া র্সা র্সা I দা দা ণা । ণা ণা ণ: ।
(২) ব ন প্রা ন্ ত রে হ রি ত অ রু ণ
(৬) নিঃ স্বে র ০ গৃ হ শ ০ স্যে ভ রি য়া
(১০) ত রু ল ০ তা ভ রি ফ ল গৌ র বে
(১৪) ন ব স্বা স্ থ্যে ভ রি য়া শী র্ণ অ ঙ্গ

^ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা জ্ঞা মা । মা ঋা মা I জ্ঞা -া -ঋা । সা -া } I
(২ক) ঘ ন ত রু ণি মা দা ০ ০ নে ০
(৬ক) বি শ্ব ০ ভ রি শ্বা ষ ০ ০ শে ০
(১০ক) ত ড়া গ ভ রি য়া হাঁ ০ ০ সে ০
(১৪ক) জী র্ণ জ ড় তা হ ০ ০ রি ০

০ ০ ০ ১ ২´ ৩
{ ম মা I জ্ঞা মা দা । দা ণা ণা I দা -ণা -র্সা । র্সা র্সা র্সা
(৩) এ স প্র ক টি য়া তা রা পু ০ ঞ্জ্ জ এ স
(৭) এ স পুষ্ প ভ রি য়া গ ০ ০ ন্ ধে চা রু
(১১) ভ রি শা লি সম্ প দে ক্ষে ০ ০ ০ ত্র স্নে হ
(১৫) মা গো বি ত রি অন্ ন- স্ত ০ ০ ০ ন্য ক র

০ ১ ২´ ৩ ০ ০
। র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । দা দা -া I মা -দা -ণর্সা । র্সা -া র্স র্সা
(৩ক) গুঞ্ জ নে ভ রি ০ কু ০ ০ঞ্ জ ০ কল
(৭ক) মঞ্ জু তা ম ক ০ র ০ ০ন্ দে ০ এস
(১১ক) ক রু ণা য় ভ ০ রি নে ০০ ত্র ০ এস
(১৫ক) সন্ তা ন গ ণে ০ ধ ০ ০০ ন্য ০ এস

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্সা র্সা র্সা ।
(৪) কু জ নে ভ রি য়া ন মে রু কু লা য়
(৮) হ্র দ স রো ব র ভ রি কো ক ন দে
(১২) মু খ রি ত ক রি গি রি কন্ দ র নি
(১৬) বি শ্ব স্ত রা ০ স ন্ তা প হ রা ০

০ ১ ২´ ৩
। মা ণা ণা । দা -া পা I মা -পা -দা । দা -া } II
(৪ক) রঞ্ জি য়া জ ০ ল ধ ০ ০ রে ০
(৮ক) কু মু দে ই ন্ দী ব ০ ০ রে ০
(১২ক) র্ ঝ র ঝ ০ র ঝ ০ ০ রে ০
(১৬ক) বঙ্ গে র ঘ ০ রে ঘ ০ ০ রে ০

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২০

চারুর এত ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে রাখুর দারিদ্র্য তাহাকে এমন জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল যে, চারুর সঙ্গে অতগুলা কথাবার্ত্তার পরেও তাহাকে রাখী অনুমান করিতে তাহার সাহস হইল না। চারু ফিরিয়া আসিলে, দেখিতে সে অবিকল রাখীর মত, কেবল এই কথা বলিবার জন্য আপনাকে রাখু সাহসী করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্য সত্যই চারু যদি রাখী হয়? এক রাত্রির দেখা-শুনায় একটা স্ত্রীলোকের এতই কি সে আপনার হইয়া গেল যে, তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপায়ন এত আগ্রহের সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সে ছুটিয়া আসিল? একবার সে মনে করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই ঐশ্বর্য্যময়ী যদি তার স্ত্রী রাখীই হয়?

সেই যুগ পূর্ব্বের বাল-দম্পতির ভিতরে যৌনসম্বন্ধ না থাকিলেও, সুতরাং সম্বন্ধের অপব্যবহারে পত্নীর উপর ঈর্ষার কোনও কারণ না থাকিলেও চারুকে রাখী মনে করিতে কেমন তার একটা কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য চারুর নিবেদিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক প্রীতিকর বোধ হইল।

যাহা বিশ্বাস করিবার নয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা। রাখু আবার সোফায় হেলান দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তার চিরনির্ম্মম দুরবস্থা নিঙাড়িয়া যেটুকু মধু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাতেই এমন তার তৃপ্তি আসিল যে, চারুর ঘরের সৌন্দর্য্য আর তার দৃষ্টিকে মধুরতায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তৃপ্তির গাঢ়তায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

"ওরে বিশে, আ মর্ এখনও পড়ে' পড়ে' ঘুমুচ্ছিস? সকাল হয়েছে, উঠে পড়্।"

রাখু এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঝির কথা তার কাণে না গেলে আরও

কতক্ষণ পরে যে তার নিদ্রা ভঙ্গ হইত, তার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। উঠিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল—রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।

তখন ঘরের দোর খুলিয়া বাহির না হইয়াই সে ডাকিল—

"চারু!"

চারুকে ডাকিতে ঝি আসিল। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—

"হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি গড়গড়ায় জল ফিরিয়ে তামাক ঠিক করে' রেখেছি।"

"চারু?"

"গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ—তখন বেশ ঘোর ছিল।"

বলিয়া সে গাড়ু হাতে লইয়া তার মুখ প্রক্ষালনের সাহায্য করিতে আসিল।

কঙ্কণগীতে রাত্রির স্বপ্নবৎ জাগরণটাকে ঘুমন্ত করিবার জন্য প্রভাতী আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রাখুকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল।

"আমাকে তুলে' দিলে না কেন?"

"দিদিমণি ঘুম ভাঙ্গাতে নিষেধ করে' গেছে।"

আলোকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাখুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঘুমিয়ে পড়াটা তার বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অন্য অন্য দিন অতি প্রত্যূষেই সে শয্যাত্যাগ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া একখানি নামাবলী গায়ে গঙ্গাজলেই সে তার নিত্যকর্ম্ম পূজাহ্নিক সারিয়া লয়, তারপর বাসায় আসিয়া সিক্ত বস্ত্র রক্ষা করিয়া যজমানদের বাড়ীতে পূজায় বাহির হয়। অত প্রাতঃকালে বাহির হইয়াও পূজা সারিয়া তার বাসায় ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়।

পূর্ব্বদিনে পূজার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাখু শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়াছিল। আজ ত আর সে ব্যক্তি তাহার অবর্ত্তমানে কাজ করিবে না। রাখু এইবারে আপনাকে বিপন্ন বোধ করিল।

"ঝি, তামাক খাবার দেরী সইবে না, ঐ দোরের কাছে আমি কাল কাপড় চাদর রেখেছি, এনে দাও—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"সেকি দিদিমণির ফেরবার অপেক্ষা করবেন না ?"

"অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই।"

"তা কি হয় ?"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ ? সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।"

"না ঝি, আমি এখনি যাব। তোমার দিদিমণি এলে বলো, পারি ত আমি আর একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কাপড়খানা এনে দাও।"

"তাইত, আমাকে যে তার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে, ঠাকুরমশাই।"

"থাকতে পারলে আমি থাকতুম ঝি, আমাকে পাঁচ যজমানের বাড়ী পুজো করতে হয়।"

ঝি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিতনেত্রে একবার রাখুর মুখের পানে চাহিল। এ ত ট্যানাপরা লক্ষপতি নয়—সত্য সত্যই গরীব ব্রাহ্মণ। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল—বুঝিল, সত্য সত্যই ঝড়ে বিপন্ন হইয়া নারায়ণ গতরাত্রে বেশ্যার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। উঠিয়া সে আর কোন কথা না কহিয়া রাখুর কাপড় আনিতে গেল।

"কই বাবাঠাকুর, কাপড় যে দেখতে পাচ্ছি না !"

তার কথায় প্রত্যয় না করিয়া রাখু নিজে বারান্দায় গিয়া দেখিল, কাপড় নাই। কাপড় খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে তার পরিধেয় ত দেখিলই না, যে গরদখানা সে ছাড়িয়াছিল, সেখানাও সে দেখিতে পাইল না।

"তাইত ঝি, আমি যে বিষম বিপদে পড়লুম।"

ঝি বলিল—"আপনি ততক্ষণ তামাক খান, আমি কাপড় খুঁজে দেখি।"

"তুমি গড়গড়া এই ঘরে এনে দাও।"

"কেন, ঐ ঘরে সোফার উপরে বসুন।"

তখন-পর্য্যন্ত-পাতা সেই গালিচার উপরে বসিয়া রাখু বলিল—

"না।"

ঝি তামাক দিয়া কাপড় খুঁজিতে গেল। চারিদিক খুঁজিয়া যখন উপর নীচে কোথাও সে দেখিতে পাইল না, তখন কলতলায় শেষ অনুসন্ধানে সে দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণের সেই মলিন বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া

আছে। তুলিয়া পরীক্ষা করিতে সে দেখিল—দিদিমণির অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন তাহাতে পূর্ণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। সে-কাপড় সে ব্রাহ্মণের কাছে আনিতে সাহস করিল না। রাখুর কাছে ফিরিয়া ঝি মিথ্যা বলিল—

"কাপড় পেলুম না। দিদিমণি অন্ধকারে মাড়িয়েছিল বলে' গঙ্গায় বোধ হয় কাচতে নিয়ে গেছে।"

রাখু প্রমাদ গণিল। একবার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চাহিল। দেখিবা-মাত্রই বুঝিল, রাত্রিকালের দীপালোকে অন্যমনস্কের চোখে কাপড়ের সৌন্দর্য্য সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এ কাপড় পরিয়া কেমন করিয়া সে পথে বাহির হইবে? শুধু-পায়ে-পথ-চলা বামুনের 'এই কি-জানি-কত-টাকা মূল্যের বিচিত্র পরিধেয় দেখিয়া যদি পথের মাঝে কেহ তাহাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করে! যদি এ চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসার কথা তার মনে উঠে নাই। মনে মনে সারা পথ চলিয়া পথের শেষে বাসার কাছে যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি সে যেন দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বাসার সঙ্গীসকল এমন কি গৃহস্বামী পর্য্যন্ত তাহার চলিবার পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তার এই বিচিত্র পাড়-ওয়ালা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আছে। বাড়ীর গিন্নী বাহিরে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বৌগুলা কপাটের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছে।

সে সকল চাহনির ভিতরে কত প্রশ্ন, প্রতি প্রশ্নের ভিতরে কত রহস্য, প্রতি রহস্যের মাথায় চড়িয়া কত বিদ্রূপের হাসি! সেগুলা স্থানটাকে যেন এক বিষাক্ত কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত যজমানদের শুনাইবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িতেছে।

চিন্তার প্রহারেই রাখু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"ঝি আমাকে যে একখানা কাপড় দিতে হবে?"

"কি রকম কাপড়?"

"থান হ'লেই ভাল হয়।"

"মাসী থাকলে থান কাপড় মিলতে পারতো। তা পোড়া মাসী যে গুরুকেও বিশ্বাস করে না। সে সমস্ত কাপড় সিন্দুকে পূরে চলে গেছে।"

"তোমার কাছেও কি আমার পরবার মত একখানা কাপড় নেই?"

"আমার ব্যবহার করা কাপড় তোমাকে কেমন করে দেবো ঠাকুর-মশাই?"

রাখু সেই পট্টবস্ত্র পরিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ির দিকে দুইপদ যাইতেই ঝি বলিল—

"একান্তই যদি তোমার না গেলে চলবে না, তবে আর একটু দাঁড়াও। আমি আর একবার খুঁজে দেখি। কলতলায় কাদামাখা একখানি কাপড় দেখেছি।"

বলিয়া সে আবার নীচে চলিয়া গেল এবং রাখুর কাপড় চাদর যথাসম্ভব জল-কাচা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"তুমি আমাকে বাঁচালে ঝি।"

বলিয়া ঝিকে কাপড় দিবার অবসর না দিয়া নিজেই তাহার হাত হইতে বস্ত্র যেন কাড়িয়া লইল।

"তুমি ত বাঁচলে ঠাকুর, আমাকে যেন গাল খাইয়ে মেরে ফেলোনা। কখন আবার আসবে বল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আবার যেমনি রাখু ভিখারী-বেশী হইল, তখন সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতে ঝিকে বলিল:—

"এখানে আর কি আমার আসা উচিত গা?"

ঝি দেখিল, দিদিমনির দেওয়া সেই দামী বেনারসী, ব্রাহ্মণের গায়ে জড়ান ময়লা কাপড় চাদরের পায়ে পড়িয়া যেন অতি দীনভাবে তাদের কাছে পবিত্রতা ভিক্ষা করিতেছে। সে বলিল—

"যদি ধর্ম্ম বজায় রাখতে চাও বাবা, তা' হলে তোমায় আর আসতে বলতে পারি না।"

"ঠিক বলেছ মা, এদিকে ত আসবই না—শুধু তাই নয়, এ কলকাতাতেও আর থাকবো না।"

"আবাগী পূর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যি করেছিল।"

বলিয়া ঝি রাখুর চরণে আবার প্রণত হইল।

স্বপ্নাবৃত ঐশ্বর্য্যের বোঝা মন হইতে ফেলিয়া আবার রাখু পথে তার চির-সুহৃৎ দারিদ্র্যের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসায় ফিরিয়া চলিল।

২১

সারা পথের ভিতর আর কেহ কারুর সঙ্গে কথা কহিল না। অবগুণ্ঠনবতী চারু অগ্রে, আর পূর্ব্বমত তাহারই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তার গুরু পশ্চাতে। তাঁর

গৃহ-প্রবেশের সাহায্য করিতে চারু যখন অবগুণ্ঠন ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল তখন গোঁসাইজী বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা এই সময় বলা কর্ত্তব্য বলে' বলে রাখি।"

"বলুন।"

"শুনে বুঝে তার উত্তর দাও।"

গোঁসাইজীর কথার গুরুগাম্ভীর্য্যে চারু কোন কথা কহিতে পারিল না।

"চুপ্ করে রইলে কেন সরস্বতী।"

"বলুন।"

"সেই বেশ্যাটা গঙ্গায় ডুবে মরেছে, মনে কর।—মনে করেছ।"

"করেছি।"

"তা হ'লে তার স্বামীর কি হবে না হবে, সে আবাগী আর জানতে আসছে না, কি বল? চুপ্ করলে চলবে না, শীঘ্র বল, গলি দিয়ে লোকজন চলতে আরম্ভ করেছে, এরপর কথা কবার আর সুবিধা হবে না।"

"বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্‌লে চল্‌বে না?"

"না, বললে তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব।"

গোঁসাইজীর কথা কোথায় গিয়া কি ভাবে দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিয়া যা'হোক একটা উত্তর দেওয়ার মত করিয়া চারু বলিল—

"যখন মরে গেছে, তখন সে আবাগী আর কেমন করে জানতে আসবে!"

"তা'হলে সেই নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বামুন যদি সেই বেশ্যাটার খুনের দায়ে বাধা পড়ে, তাকে কে রক্ষা করবে সরস্বতী?"

"ভগবান।"

"বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সত্যি সত্যি, কোমরটায় মন্দ লাগেনিরে!"

চারু প্রথমে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের সাহায্য করিল। পরে নিজে প্রবেশ করিল। বুঝিল, বুঝি জগতের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লুকাইতে সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেছে। মনে করিতেই তাহার মাথাটা কেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া গেল। সে দোরের উপর উঠিয়াই গুরুর দেহের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, একহস্তে চারুকে ধরিয়া অন্য হস্তে

বহির্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তারপর চারু তাঁহাকে আবার ঘরে লইয়া যাইতে যেমন তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল, অমনি সে গুরুর মুখ হইতে শুনিল কি করুণামাখা কোমল স্বর!—

"হাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের ভার নেওয়াটা কি তোর ভাল লাগছে না?"

"ওকথা আর বলবেন না বাবা, বল্‌লে আমি মরে যাব।"

"তাই বল, আমার শেষ বয়সের যষ্ঠি, তোর কথা শুনে আশ্বাস পাই।" বলিয়াই গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন "দামোদর, আরে মর— এখনও ঘুমুচ্ছিস্ নাকি—দামু!"

ভৃত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র বাড়ীর ভিতর হইতে গোঁসাই-গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আরও অনেক কথা ব্রাহ্মণী বলিতে যাইতেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাঁর আর বলা হইল না।

"সঙ্গে মেয়েটি কে?"

"কাছে এসে দেখো।"

"কে গো, চারু? তুই এমন সময় কোথা থেকে উপস্থিত হলি?"

গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া চারু গুরুপত্নীর পদতলে প্রণত হইল। গোঁসাই-গিন্নি চারুকে সে সময়ে দেখিয়াই যে বিস্মিত হইলেন, এমন নহে। তাহার নীরবতা, তাহার মুখ চেখের ভাব বিশেষতঃ পশ্চাতে অবনত মস্তকে চারুর পানে চোখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান স্বামীর কেমন এক রকম নূতন-তর মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এমন একটা গভীর বিস্ময় তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, যে যদ্যপি গোঁসাইজী ভৃত্য দামুকে আবার ডাকিয়া স্থানের নীরবতা না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না।

"দামোদর কি বাড়ীতে নেই গিন্নি?"

"থাকলে কি সে উত্তর দিত না। তিনটে দোর হাট করা খোলা, অথচ তুমি নেই, সে ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমিও এতক্ষণ পথের পানে চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"ভালই হয়েছে, এখন তুমি আমি ছাড়া আর এখানে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। মেয়েটাকে চিন্‌তে পারছ ব্রাহ্মণী?"

"আমার চোখে ছানি পড়েছে না ভীমরতি হয়েছে—আজ এমন দুর্য্যোগে, এমন অসময়ে ওঁর কাছে কি জন্য এসেছিলি ভাই চারু ?"

"ভুল করে ফেল্লে ব্রাহ্মণী, ও চারু নয়।"

চারু এখন দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা স্বামীর এ কথার পর থতমত খাওয়ার মত চারুর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে চারুকে বলিলেন—

"কি গো মা, তুই কি চারু ?"

চারু গোঁসাই-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গোঁসাইজীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—

"সেই পাপিষ্ঠা বেশ্যা আজ গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আমি তাকে তুলতে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কন্যারত্নটী কুড়িয়ে পেয়েছি। কাঠামো দেখে ভয় পেয়ো না। আচার্য্য গোস্বামীর কুলবধূ। তোমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্মরণ কর। তিনি কাঠামো দেখে ভয় পান নি জাতির নীচতা দেখে ভীত হন নি, সমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, যে লক্ষণযুক্ত রত্ন দেখেছিলেন, সেখান থেকেই তাকে তুলে এনে নিজের পরিবারভুক্ত করেছিলেন। চারু নয়, গঙ্গার ভিতর থেকে সেই মরা অভাগীর মূর্ত্তি ধরে মা-সরস্বতী কুলে উঠেছে। উঠেছে কন্যা হতে,—তোমাকে আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ চারুর চিবুক ধরিয়া পত্নীর দিকে তার মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"নাও চুমো খেয়ে মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ কন্যা স্বামীর কথার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আবরণের অর্থ বুঝিতে ত পারিলেনই না, চারুকে লইয়া কি যে করিবেন, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল তাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া গোঁসাইজী বলিলেন—

"নিতে সঙ্কোচ হচ্চে ব্রাহ্মণী ?"

"না না, সত্যই কি চারু—"

"চারু নয় গো, সরস্বতী"

"সত্যই কি মা সরস্বতী, তুই বুড়ো-বুড়ীর ঘর আলো করে থাকতে এসেছিস্ ?"

"আমাকে থাকতে দেবে মা ?"

চারুর চিবুক করস্পর্শে চুম্বিত করিয়া দুটী হাতে তাহাকে বেড়িয়া গঙ্গা-নারায়ণ-পত্নী তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

ঘরে লইয়া যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা চারুর মুখ হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন, তখন তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"এস মা, তোমার ঘরে যেখানে যা আছে, সব বুঝে পড়ে নেবে এসো। বুড়ো তোমাকে সরস্বতী বল্‌লে কেন, আমি বলবো গঙ্গা। আমাকে মা বলে ডাকতে উথলে আমার কোলে এসেছে?"

এক মুহূর্ত্তে একটা বার বছর ধরে ভুল করা মেয়ে এক সাধুদম্পতীর কৃপায় তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

নারায়ণের নিকষমণি।

ইরাণী উপকথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

বাংলা সাহিত্যে একখানা আসল সৃষ্টি, খাঁটি প্রতিভার দান। সুরেশ-চন্দ্রের এক একটি গল্প, এক একটি সজীব ভাবমূর্ত্তি—চলনের চাতুর্য্যে, বলনের বৈদগ্ধ্যে, একটা অনাস্বাদিতের ব্যঞ্জনায় তাহা ভরপুর। সুরেশচন্দ্র সেই একজন শিল্পী যিনি তাঁর যাদুবিদ্যায় আমাদিগকে যেন আবার ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন বহুদিনের হারান অথচ গোপনে নিত্য অনুভূত একটা জগতের মাঝে, আমরা পাই এমন একটা জগৎ যাহা শৈশবের জগতের মত তরুণ সবুজ কল্পনাময়, হাস্যময়, সেই সাথেই আবার যাহার মধ্যে মিশিয়া আছে কি একটা সত্যিকার জ্ঞানের নিরেট জগৎ, প্রৌঢ়ত্বের দৃঢ় উপলব্ধ তত্ত্বরাজ্য।

মানুষ আজকাল যেমন স্থূলচক্ষু হইয়াছে, এমন বোধ হয় সে কোন দিনই ছিল না। তাহার শিল্পে সাহিত্যে তাই দেখিতে পাই বেশীর ভাগ বাহিরের জীবনের কথা, সাধারণ ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট জগতের কথা। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, ব্যবহারের জগতের মধ্যে যে সব শক্তির বা সত্যের খেলা চলিয়াছে হুবহু তাহাকে ফলাইয়া বা কল্পনায় তাহাকে রঙাইয়া দেখাই বহু শিল্পীর ধর্ম্ম হইয়াছে। এই ঘোর বাস্তবিকতা স্বতই কেন আমাদের প্রয়োজনের বা লাভের বস্তু হউক

না, প্রাণ সময়ে সময়ে সত্যই ইহাতে হাঁপাইয়া উঠে। আমরা চাই আলোর হাসির অপ্রয়োজনের অসম্ভবের কথা। কিন্তু নিছক রূপকথার যে সহজ ছেলেমানুষী তাহাতে বাস্তবিকই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে না, এমন কঠিন যুক্তির যুগে আমাদের মনের ছাঁচে সে রকম সৃষ্টি ধরা পড়িবেই না। তাছাড়া রূপকথা বা উপকথার গল্প—আরব্যউপন্যাস হউক আর ঠাকুরমার গল্প হউক—তলাইয়া দেখিলে, বাস্তবিকতারই রূপান্তর মাত্র, বাস্তবিকতাকে একটু টানিয়া বাড়াইয়া বলা মাত্র।

সুরেশচন্দ্র তত্ত্বের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া একটা তৃতীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিয়াছেন একটা কামলোকের চিত্র, মানুষ যেখানে মানুষই আছে কিন্তু এই স্থূলদেহের খোলস ফেলিয়া দিয়া আছে নিবিড় গোপন মৌলিক কতকগুলি আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা লইয়া, ইহাদের অবাধ লীলা ও চরিতার্থতা, অন্ততঃ চরিতার্থতার সম্ভাবনা লইয়া। ইহা একটা সূক্ষ্ম জগৎ, বাস্তব অবাস্তবের কঠিন ব্যবধান যেখানে নাই—সূক্ষ্মের ভাবের শক্তি যেখানে স্থূল উপকরণ লইয়া যথেচ্ছ খেলিতে পারে—ছবির মানুষে যে প্রাণশক্তি নিথর জমাট তাহাই আর এক প্রাণের টানে দুলিয়া উঠিতে পারে, ছবির মানুষ জীবন্ত মানুষকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে (ইরাণী উপকথা), অন্তরে আমার যে মানুষ ভাবে মূর্ত্ত, ভাবের শক্তিতে বাহিরেও তাহা ভিন্ন মানুষকে ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে (একটি অসম্ভব গল্প)। মানুষের কামলোকের মুক্তসত্তা, পার্থিবলোকের বদ্ধ রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে পড়িয়া কেমন ব্যহত হইতেছে, ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পাড়িতেছে না, এই নিবিড় দ্বন্দ্ব বা ট্রাজেডিটিও আমাদের শিল্পী কেমন করুণ অথচ কোমল মৃদুল অবলেপে—আঁকিয়া দিয়াছেন (একটি সত্য গল্প, একটি আষাঢ়ে গল্প)। এই সূক্ষ্ম কামলোকেরই একটা নিছক তত্ত্ব ইহলোকের আবরণে আবেষ্টনে মুড়িয়া, রূপকে ঢালিয়া তিনি দিয়াছেন তাঁহার "ছোট উপকথায়।"

জড়ের কঠিনের নিয়মের সত্যকে ভাঙ্গিয়া যিনি নীচের টানা স্রোতের মুক্তগতির খোঁজ পাইয়াছেন, যাঁহার অনুভবে জাগিয়াছে মিলের যতি অপেক্ষা ছন্দের সুর, তাঁহার মধ্যে পাইব যে একটা অনির্দ্দেশ্যের রেশ, শেষ-না-হওয়ার জের তাহাও খুব স্বাভাবিক। অন্তরীক্ষবাসী শিল্পীর দৃষ্টি যেন আরও উপরে কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাই সুরেশচন্দ্রের প্রত্যেক আখ্যায়িকা আমাদিগকে লইয়া ছাড়িয়া দেয় এমন একটি যায়গায় যেখানে গল্প শেষ

হইলেও কথা শেষ হয় নাই। "সমুদ্রের ডাকে" মানুষের এই রকম একটি কামনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, যাহা লক্ষ্যহীন অর্থাৎ কামনাহীন কামনা, অহেতুক কামনা—কাম লোকের চরম কথা; মানুষের মানবীয় কামনা যেখানে নাই, বিশ্বসৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গীভূত হইয়া যাওয়াই যেখানে মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা।

আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত খুবই পরিচিত। অতীন্দ্রিয় আত্মার কথাও যথেষ্ট জানি। কিন্তু সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, আমাদিগকে জানাইয়াছেন একটা অন্তর্ব্বর্ত্তী লোকের তথ্য, একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব (psychic sensibility)। সুরেশ চন্দ্রের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে উঠিয়াছে পাশ্চাত্যের একজন শিল্পীর কথা। Oscar Wideএর The House of Pomegranates, The Picture of Dorian Grey প্রাণের অনুরূপ ধাত,দৃষ্টির অনুরূপ ভঙ্গীই দেখাইয়াছে। শুধু তাই নয়, রচনা-প্রণালীর সম্বন্ধেও একটা সাদৃশ্য যে পাওয়া যায় না তাহা নয়; যাহাকে বলে jewelled style ফরাসী সাহিত্যের যাহা অতি সুলভ ও সহজ বস্তু, ইংরাজীতে তাহা চমৎকার ভাবে দিয়াছেন Oscar Wilde—বাংলায় সুরেশ চন্দ্র সেই ভঙ্গীমায় দেখাইয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব।

বীরবলের টিপ্পনী।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কৃত—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। প্রিণ্টার ও প্রকাশক সুরেশ চন্দ্র মজুমদার—দাম আট আনা।

সেদিন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" নাম দিয়ে এক বক্তৃতা পড়েছেন—বক্তৃতাটা কতকটা রাজনীতির আর কতকটা চিরন্তন রীতির। ঐ বক্তৃতায় কবি বাঙালীকে কতকগুলো ছাপ ছাপ কথা শুনিয়েছেন। ঐ বক্তৃতার দিন চারি পর এক বন্ধুর মুখে ওর একটা টিপ্পনী শোনা গেল। টিপ্পনীর ভাষা হচ্ছে—কবি মানুষ কবিতা নিয়ে থাকুন রাজ-নীতিতে তার কথা বলার কি প্রয়োজন—আর তার ভাব হচ্ছে কবি বা সাহিত্যিকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অনধিকার চর্চ্চা করা।

আমাদের কিন্তু ধারণা উল্টো। সাহিত্যিক্যের অধিকার কলম চালানো। এবং তা কোন্ বিষয়ের ওপর তার কোন সীমা নেই। প্রাচীন মিশরের "মমি" থেকে আরম্ভ করে আধুনিক Mount Everest এর expedition পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে সাহিত্যিকের কথা বলবার অধিকার আছে। এ দুয়ের মধ্যে অবশ্য রাজনীতি সমাজনীতি বাদ পড়ে না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার মর্জ্জির উপরে এবং সে কথায় যদি ভাব ও রস থাকে তবে তা সাহিত্য হবে আর তা যদি না থাকে তবে তা waste paper besketএ যাবে। দেশের লোকে তা শোনে শুনুক না শোনে না শুনুক। তাই বলে সাহিত্যিকের কলমকে পাঠকরা ধরে রাখ্‌তে পারে না—কেন না সাহিত্যিকের মনটা ও মর্জ্জিটা তার নিজস্ব জিনিস।

ওপরে এত কথা বলবার মানে "বীরবলের টিপ্পনী" হচ্ছে অধিকাংশই আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর টীকা ও ভাষ্য, স্থানে স্থানে

অবশ্য নূতন সূত্রও আছে—অথচ প্রমথবাবুর নাম আমরা কোন রাজনৈতিক আড্ডার খাতায়ই দেখ্‌তে পাই নে। তবুও যে আমরা এ বই খানিকে অনধিকার চর্চ্চা বল্‌ছি নে তার কারণ আমাদের ঐ উপরিউক্ত মনোভাব। আর প্রমথবাবু যে একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে অন্ততঃ সাহিত্যিকদের মহলে দু'মত নেই।

বীরবলের লিখবার ষ্টাইল বাংলা সাহিত্যে একটা একেবারে নতুন জিনিস। বীরবলের কথায় সায় না দিলেও তাঁর লেখায় যে একটা রস আছে তা কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য নিতান্ত অরসিকের সম্বন্ধে আলাদা কথা। বীরবল দেশের মডারেটে ও extremistদের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—"যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত করুণরসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য বীররসাত্মক। এত হবারই কথা, কেন না মডারেটরা উদ্ধারের সেরা উপায় বের করেছেন ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremistরা সেরা উপায় স্থির করেছেন ব্যুরোক্রাসিকে, গালাগালি করা।" উপরের ঐ কথার ভঙ্গী দেখে কেউ স্থির না করেন যে বীরবল একজন পলিটিক্যাল নাস্তিক। আসলে তাঁর আস্তিক্য দু'দিকেই। কেননা ওর পরেই বলছেন—"পলিটিক্সএ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে" তবে তিনি যে কথাটা বল্‌তে চান্ সেটা হচ্ছে এই যে "নাকি-করুণ ও খেঁকি-বীর এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে।"

বীরবলের লেখার একটা বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে ঠাট্টা করতে করতে দু'ঠাট্টার মাঝখান দিয়ে কতগুলো সত্য কথা বলে নেওয়া। এ বইখানাতেও তার প্রচুর প্রমান আছে। সাহিত্য ও পলিটিক্সের বিচার করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। * * *। এবং * * যে ক্ষেত্রে প্রথমটীর যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টীর তত প্রভাব।"

রাজনৈতিক হৈচৈতে যে সব ভিতরের কথা চাপা পড়ে যায় ভিতরের সেই সব অনেক কথা এই টিপ্পনীতে টেনে বের করা হয়েছে—কোথাও রহস্যের আবরণে কোথাও বা সহজ সোজা ইঙ্গিতে। যিনিই এটা হাতে নেবেন তিনিই দেখবেন যে এই সওয়া শ' পৃষ্টার বইখানি বিদ্রূপ ও কৌতুক, satire ও সত্য কথা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতায় মিলে একটা পরম উপভোগের সামাগ্রী হয়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাস এ বই যিনি পড়বেন তাঁর মূল্য ও মজুরি দু'ই পুষিয়ে যাবে। হাতে ফাউ স্বরূপ থেকে যাবে দেশের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয়।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]   [কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল।

বর্ত্তমান সমস্যা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

জগৎটা যে বড়ই খাপছাড়া—out of joints হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে আজকাল বোধ হয় আর দুই মত নাই। কোথাকার কি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খিল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, সব গোলমাল এলোমেলো অবস্থায়। মানুষের জীবন কোন দিনই একেবারে নির্দ্দোষ ছিল কি না সন্দেহ, অনেক স্থানেই হয়ত জোড়াতালি চাপাচুপি রফারফি ছিল; তবুও মোটের উপর একটা বেশ দৃঢ় বাঁধন নিবিড় শৃঙ্খলা পাওয়া যাইত। কিন্তু এমন স্পষ্ট বেসুরা বেতালা অবস্থায় মানুষ বোধ হয় এই প্রথম পড়িয়াছে। সুখ সে হয়ত কোন দিনই পায় নাই, আজ কিন্তু সে স্বস্তিকে পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে অ-ধাতস্থ লোকের (unstable mind বা neurotics) সাদা কথায়, পাগলের—ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এমন কোন দিনই ছিল না। শেষ পগলামীর যুগ গিয়াছে, ইউরোপে ফরাশী বিপ্লবের যুগ। কিন্তু তখন বায়ুদেবতার কৃপা হইয়াছিল বিশেষভাবে ফরাশী দেশের উপর—আজ কাল সমস্ত জগৎ ভরিয়া তাহার ওলট-পালট চলিতেছে।

বলা যাইতে পারে, নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার এই হইতেছে পূর্ব্বাভাস। কিন্তু তাই মনে করিয়া ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। গাছ বা পাথর বা পশু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মানুষের ধর্ম্ম হইতেছে সজ্ঞানে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করা—

শুদ্ধ করিতে হইবে চিত্তকে। অর্থাৎ আদর্শকে, সত্যকে, মঙ্গলকে শুধু বুঝিলে চলিবে না, স্বীকার করিলে চলিবে না; তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে—তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রেমের রসে সত্যকে যতদিন অভিসিক্ত করা হয় নাই, আনন্দে যতদিন আদর্শ সজীব সবুজ হইয়া উঠে নাই, ততদিন সে সত্য সে আদর্শ সুন্দর হয় নাই, স্বভাবের মুখ ফিরাইতে পারে নাই, জীবন গতির মধ্যে নূতন টাঁন বহাইতে পারে নাই। বুঝিয়াছি যাহা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে; মস্তিষ্কে যাহা নীরস, চিত্তে তাহাকে সরস করিয়া ধরিতে হইবে নতুবা তাহা কার্যোপযোগী হইবে না, নতুবা পরিশেষে দেখিব—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে!

এখানেও তবুও শেষ নয়। মনের ভাব প্রথমে দরকার, তারপর মনের ভাবকে চিত্তের ভাবুকতায় পরিণত করিতে হইবে, তবুও কিন্তু সত্য স্থির জাগ্রত নিরেট অটুট হইয়া দেখা দেয় না। আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে—চিত্তের পরে প্রাণে অথবা ঠিক করিয়া বলিতে গেলে শরীর-ঘেঁষা প্রাণের স্তরে পৌঁছিতে হইবে। জগতে কত আন্দোলন—movement হইয়াছে, ধর্ম্মের আন্দোলন, সমাজের আন্দোলন; কিন্তু কিছুই ত তেমন স্থায়ী হয় নাই। মনের ভাব বা চিন্তামাত্র লইয়া নয়, চিত্তের (ও প্রাণের উপরের স্তরের) আবেগ লইয়াই ত কত মহান্ আদর্শ জগতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে; কোনটা একেবারে বিফল হয় নাই, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নবজীবনের পলিমাটি ফেলিয়া গিয়াছে, সত্য কথা; কিন্তু প্রয়াসের তুলনায় ফল, আশার তুলনায় লাভ, উচ্ছ্বাসের তুলনায় বস্তু কতটুকু পাওয়া গিয়াছে? লোকে যে জগতের মানব জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু হইতে পারে না, আস্তিক হইতে পারে না, তাহার কারণই এইখানে।

বস্তুতঃ জগতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে কোন শক্তি, পরিণামে কাহার জয় অবধারিত? প্রকৃতিং যান্তিভূতানি—এই প্রকৃতির অন্য নাম প্রাণের ধর্ম্ম। চিত্ত হইতেছে অসীম সজীব, সকল জিনিষের বীজ সেখানে, সকল জিনিষের রস সেখানে। কিন্তু জিনিষ যে বিশেষ রূপ পাইতেছে, যে নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছে চলিতেছে, যে ভঙ্গীতে কার্য্যে ফলিত হইতেছে তাহা সব দিতেছে প্রাণের শক্তি। হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপগভবম্। চিত্ত রঙ্

দিতে: পারে কিন্তু আকার দিতেছে প্রাণ। চিত্তের সংস্কারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সংস্কারের মূলে রহিয়াছে যে আদি মৌলিকশক্তি তাহা প্রাণের শক্তি। সত্যকে বুঝিবার সত্যকে ভালবাসিবার আগে সত্যকে পাওয়া চাই। কোথায় সত্য? মানুষের কাছে নিবিড়তম নিকটতম সত্যতম সত্য হইতেছে প্রাণের সত্য। প্রাণের প্রকৃতির যে প্রতিমা তাহার উপরই মানুষ অনুরক্ত, মানুষ তাহাকেই ভাল বুঝে, কার্য্যে অন্ততঃ তাহাকেই ফলাইয়া চলে।

প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেহ অস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং
স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি।

ইউরোপীয় চিন্তা জগতেও আজ কাল এই প্রাণের কথাটাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তর্কবুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব, ভাবালুতার পঙ্গুত্ব দেখিয়া সেখানকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন :আসল সত্য হইতেছে Vital plane এর সত্য Physico-biological laws—সৃষ্টির মধ্যে বিবর্ত্তন, মানুষের মধ্যে রূপান্তর চলিতেছে এই প্রাণের ধর্ম্মকে ধরিয়া, ঘিরিয়া। এই ধর্ম্ম অটুট অব্যর্থ, ইহাকে কাটাইয়া চলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ, মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে ইহারই নিয়ম অনুসারে। মানুষের হৃদয়, মানুষের মন এই বস্তুটিরই ফুল লতা পাতা, এখানে যে সব প্রেরণা আছে তাহাদেরই সার্থকতার বহু বিচিত্র উপায়; এই সত্যটির সহিত মনের হৃদয়ের যে কল্পনার যে অনুরাগের যত সঙ্গতি তাঁহারাই তত শক্তিমান, তত ফলপ্রদ আর যে সব জিনিষ ইহার সম্পর্ক-বিরহিত বা ইহার পরিপন্থী তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের স্থূল শরীরটিও এই প্রাণেরই বাহন, প্রাণের ধর্ম্মের ফল বা পরিণতি, জাগ্রত মূর্ত্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিও গড়িয়া উঠিয়াছে সেই প্রাণেরই ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের যে মৌলিক প্রকৃতি তাহাই চরিতার্থতার জন্য। সমাজ যে একটা বিশেষ রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, মানুষ যে একটা বিশেষ ধরণে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে একটা বিশেষ প্রণালীতে আদান প্রদান চলিতেছে—এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের, প্রকৃতির প্রাণ শক্তির প্রয়োজন বা দাবি অনুসারে।

সুতরাং পৃথিবীতে স্বর্গ বানাইব, সমাজকে নন্দনে আর মানুষকে নন্দনের পারিজাতে পরিণত করিব অথবা এই রকম আরও যে কত কত utopia বা স্বপ্নের রাজ্য মানুষের মনে ও চিত্তে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে,

বাস্তব হইতে পারে একমাত্র তখনই যখন মানুষের প্রাণে তদনুযায়ী রূপান্তর ঘটিয়াছে বা ঘটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব?

সমস্যার ব্যাসকূট প্রাণের রূপান্তর। কারণ, সকল রূপান্তরের, বিশেষতঃ স্থুল বাস্তব ভৌতিক রূপান্তরের কেন্দ্র হইতেছে এই প্রাণশক্তি। প্রাণে একরকম গ্রন্থী পড়িয়াছে, তাই জগতের সমাজের মানুষের চেহারা এই রকম হইয়াছে; চেহারা আর একরকম করিতে হইলে এই গ্রন্থী খুলিয়া আর রকম গ্রন্থী দিতে হইবে। কিন্তু প্রাণের ত যথা ইচ্ছা রূপ দেওয়া যাইতে পারে না, যেমনটি ভাল লাগে যেমনটি পছন্দ হয় তেমন করিয়া প্রাণকে ঢালাই করিতে পারি না—প্রাণ যে চলিয়াছে নিজের তোড়ে নিজের জোরে; দু দিন হয়ত তাহাকে এখানে ওখানে বাঁধা দিয়া রাখিতে পারি, খাল কাটিয়া এদিক ওদিক করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ভরা বর্ষার কীর্ত্তিনাশার মত সে একদিন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া আপন পথ করিয়া লইয়া চলিবে, তাহার ত কোন্ সন্দেহই নাই।

তাই ত অনেক মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, অনেক ধর্ম্মও শিক্ষা দিয়াছে, জগতের সমস্ত মানুষের বা সমাজের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইহজগতের নিয়ম অনুসারেই ইহজগৎ চিরকাল চলিবে। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থাৎ নিয়ম বদলানের চেষ্টা নয়, নিয়মের অতীত হইয়া চলিয়া যাওয়া। বহুর, রূপের, সম্বন্ধের খেলা যেখানে সেখানেই হইয়াছে প্রাণের, মায়ার, অবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—এ সকলের শেষ ঐকান্তিক নিবৃত্তি যেখানে সেই শান্ত এক অদ্বৈত সত্তায় নির্ব্বাণ লাভ করাই মানুষের বিদ্যা-সিদ্ধি, পরম পুরুষার্থ। জগৎকে স্বর্গ বানান যায় না, যদি চাও স্বর্গে উঠিয়া যাইতে পার।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আশার কথাও আছে। মানুষের মনে, চিত্তে যে সব সোণার স্বপ্ন ফলিয়া উঠে, যুগে যুগে উঠিতেছে ও মানুষ বার বার বিফল হইয়াও চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে—প্রাণের মধ্যে যদি ইহার কোনই শিকড় না থাকিবে, তবে তাহা আদৌ গজাইয়া উঠে কেন? মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ঐ অসম্ভবের জন্যই ক্রমাগত চলিতে চাহিতেছে কেন? শুধু তাই নয়, এমন মহাপুরুষও অনেক আছেন যাঁহাদের কণ্ঠে শুনিতে পাই সত্যের অটুট বারতা—

বেদাহমেতৎ পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা আপন সত্যদৃষ্টি সত্যসৃষ্টির উপর ভর করিয়া, নির্ভয়ে বলিতে

পরিয়াছেন যে প্রাণের তামসরূপের পশ্চাতে আছে একটা দিব্যরূপ, এই তামস-রূপকে সরাইয়া বাস্তব জীবনে সেই দিব্যরূপকে ফলাইয়া ধরা যায় ; প্রাণের-রূপান্তর দুঃসাধ্য ক্ষুরস্য ধারাইব নিশিতা দুরত্যয়া—হইলেও, একান্ত অসাধ্য নয়।

প্রাণের রূপান্তর অসম্ভব বোধ হইয়াছে এই জন্য যে প্রাণকে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি মনের ও চিত্ত বেগের ধারায়, বুদ্ধির ও নীতির নিয়ম প্রাণের উপর চাপাইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আধারের, অন্তঃকরণের, এ পারের সকল স্তরের কেন্দ্র হইতেছে প্রাণশক্তি ; এ পারের কোন শক্তিই প্রাণশক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, নৈতিক বৃত্তিকে, ভাবুকতার বৃত্তিকে সমস্তই প্রাণময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব আজ না হউক কাল স্বীকার করিতে হইবে—আজও স্বীকার করিতেছে তবে গৌণভাবে, ভিন্ন রকমে। প্রাণময় পুরুষের প্রভু কে, ঈশ্বর কে ? কাহার নিকট এই অসুর আত্ম বলিদান করিতে পারে ? এমন কোন ধর্ম্ম আছে কি না, যাহার নিকট প্রাণের ধর্ম্ম হার মানে—এজন্য নয় যে সেখানে প্রাণ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, কিন্তু এই জন্য যে প্রাণ সেখানে পায় গভীরতর প্রাণ, প্রাণের ধর্ম্ম সেখানে আরও একটা উদারতর ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায় ?

এক দিকে নিশ্চল ভেদাভেদ রহিত সত্তা—একংসৎ—অক্ষর ব্রহ্ম, ও আর এক দিকে এই চঞ্চল ভেদাত্মক প্রাণময় জগৎ। এই উভয়ের মাঝখানে আছে একটা সত্যের শুধু সত্যের বা সৎএর প্রতিষ্ঠান নয়, সত্যের ও ঋতের অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের, চিন্ময় শক্তির বৃহৎ লোক—ইহার নাম উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞানময় লোক ; এখানেই আছে ধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মের প্রকৃত বিধান, প্রকৃতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। প্রাণময়পুরুষ মনোময় ও অন্নময় পুরুষকে লইয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরই একটা বিকৃত স্বভাব ফলাইতেছে ; প্রাণময় পুরুষ নিজের ধর্ম্ম অনুসারে চলিতেছে, অজ্ঞানের বশে আপন অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়া অস্বীকার করিয়াই যেন চলিতেছে, কিন্তু তবুও প্রভুর শক্তি সে অহরহ অনুভব করিতেছে। উপরের, ওপারের এই যে সত্য ধর্ম্ম তাহা প্রাণে পূর্ণ প্রকটিত হইতে পারে, প্রাণ যদি শান্ত হইয়া তাহাকে আসিতে পথ দেয়, তাহার ভঙ্গী অনুসারে চলিবার প্রণতি তাহার থাকে। এই অধ্যাত্ম-পুরুষের চিন্ময় তপোময় ধর্ম্মই একমাত্র প্রাণের ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করিতে পারে, মানুষের মনকে চিত্তকে দেহকে একটা নূতন কাঠাম দিতে পারে, স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্তন

করিয়া সমাজের মূর্ত্তিও অন্য রকম করিয়া দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্ত্তন, এই এক রূপান্তর ছাড়া আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়া গড়িতে বা চালাইতে পারা যায় না।

আজ যে মনুষ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রাণে—মনে, চিত্তে দেহে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ঐ উপরের লোক হইতে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অবতরণের চাপ। মানুষের সমস্যা আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করিবার সাধনা।

লীলা

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

বসে আছি আপন মনে
স্তব্ধ বিজন হৃদয়-তীরে
তোমারি তরঙ্গ এসে
সেথায় পরশ করে ধীরে!
তরী তোমার দুলে দুলে
নেচে বেড়ায় কূলে কূলে ;
গানটি তোমার উঠে জাগি
আমারি বুক চিরে চিরে!

উদয়-রবির প্রথম কিরণ
আজি আমার পড়লো মাথে
উঠলো হেসে বসুন্ধরা
ওগো, তারি সাথে সাথে!
এম্‌নি প্রেমে এম্‌নি গানে
বন্ধু, তোমার আলোর বানে
উজল কোরে তুলো আমার
বিদায়-দিনের সন্ধ্যাটিরে!

সমাজসংস্কারের ভূমিকা

(শ্রীঅশ্রুমান দাশগুপ্ত)

আজকাল আমরা সকলেই বুঝিতে পেরেছি যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ক্রমশঃই জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জটিল সমাজের গ্রন্থিগুলি মোচন করে সমাজকে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হ'লে যতটা চেষ্টা করা ও যত্ন লওয়া দরকার ততটা আমরা করছি কিনা বিশেষ সন্দেহ। সমাজের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখতে হ'লে যে সমস্যা গুলি আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেগুলিকে সত্যের আলোতে পরীক্ষা করে যথাযথ সমাধান করতে হবে। নচেৎ সমাজের অশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী যে সমাজসৌধ এতদিনের সাধনার ফলে গড়ে তোলা হয়েছে তার পতন একেবারে অনিবার্য্য।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে "চয়ন" বিভাগে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয়ের "স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামে প্রবন্ধটী পড়্‌লেই উপলব্ধি হবে যে আজ কোন্ সমস্যাটা আমাদের প্রবল হয়ে পড়েছে। বাংলার ২৩টী জেলার অধিবাসীর জন্মমৃত্যুহারের যে তালিকা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যাবে বাঙ্গালীকে যে "Dying race" বলা হয় সে একটুও অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুর হার জন্মের হারের চাইতে এ ভাবে বেড়ে চললে, কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থাটার "ভাল'র দিকে পরিবর্ত্তন না ঘটলে বাংলা শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হবে। কি উপায়ে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা করা যায় এইটাই আজ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এপ্রকারেরই একটা অবস্থা সমস্ত জাতীয় জীবনে এসে পড়েছিল, আর আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটীর মত একটা সমস্যা বিপুল আন্দোলন ও প্রভূত গবেষণার সৃষ্টি করেছিল। কি উপায়ে একটা জাতি এই বিশ্বব্যাপী জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষা করে উন্নতির পথে ধাবমান হতে পারে—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে তখনকার বড় বড় দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ আলোচনার ফলেই দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরাজীতে একে Eugenics বলা হয়। ইংলণ্ডে **Sir Francis Galton** এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

করিয়া সমাজের মূর্ত্তিও অন্য রকম করিয়া দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্ত্তন, এই এক রূপান্তর ছাড়া আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়া গড়িতে বা চালাইতে পারা যায় না।

আজ যে মনুষ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রাণে—মনে, চিত্তে দেহে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ঐ উপরের লোক হইতে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অবতরণের চাপ। মানুষের সমস্যা আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করিবার সাধনা।

লীলা

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

বসে আছি আপন মনে
স্তব্ধ বিজন হৃদয়-তীরে
তোমারি তরঙ্গ এসে
সেথায় পরশ করে ধীরে!
তরী তোমার দুলে দুলে
নেচে বেড়ায় কূলে কূলে;
গানটি তোমার উঠে জাগি
আমারি বুক চিরে চিরে!

উদয়-রবির প্রথম কিরণ
আজি আমার পড়লো মাথে
উঠলো হেসে বসুন্ধরা
ওগো, তারি সাথে সাথে!
এম্‌নি প্রেমে এম্‌নি গানে
বন্ধু, তোমার আলোর বানে
উজল কোরে তুলো আমার
বিদায়-দিনের সন্ধ্যাটিরে!

সমাজসংস্কারের ভূমিকা

(শ্রীঅশ্রুমান দাশগুপ্ত)

আজকাল আমরা সকলেই বুঝিতে পেরেছি যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ক্রমশঃই জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জটিল সমাজের গ্রন্থিগুলি মোচন করে সমাজকে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হ'লে যতটা চেষ্টা করা ও যত্ন লওয়া দরকার ততটা আমরা করছি কিনা বিশেষ সন্দেহ। সমাজের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখতে হ'লে যে সমস্যা গুলি আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেগুলিকে সত্যের আলোতে পরীক্ষা করে যথাযথ সমাধান করতে হবে। নচেৎ সমাজের অশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী যে সমাজসৌধ এতদিনের সাধনার ফলে গড়ে তোলা হয়েছে তার পতন একেবারে অনিবার্য্য।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে "চয়ন" বিভাগে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয়ের "স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামে প্রবন্ধটী পড়লেই উপলব্ধি হবে যে আজ কোন্ সমস্যাটা আমাদের প্রবল হয়ে পড়েছে। বাংলার ২৩টী জেলার অধিবাসীর জন্মমৃত্যুহারের যে তালিকা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যাবে বাঙ্গালীকে যে "Dying race" বলা হয় সে একটুও অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুর হার জন্মের হারের চাইতে এ ভাবে বেড়ে চললে, কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থাটার "ভাল'র দিকে পরিবর্ত্তন না ঘটলে বাংলা শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হবে। কি উপায়ে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা করা যায় এইটাই আজ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এপ্রকারেরই একটা অবস্থা সমস্ত জাতীয় জীবনে এসে পড়েছিল, আর আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটীর মত একটা সমস্যা বিপুল আন্দোলন ও প্রভূত গবেষণার সৃষ্টি করেছিল। কি উপায়ে একটা জাতি এই বিশ্বব্যাপী জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষা করে উন্নতির পথে ধাবমান হতে পারে—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে তখনকার বড় বড় দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ আলোচনার ফলেই দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরাজীতে একে Eugenics বলা হয়। ইংলণ্ডে **Sir Francis Galton** এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

বর্ত্তমান যুগে জীবনযুদ্ধটা অত্যন্ত সঙ্কটময় ও ভীষণ হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির পক্ষে কিম্বা জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করে অগ্রসর হওয়া কতটা কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ সে অনুভব করতে কিম্বা এবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে, আমরা কেহই বাদ পড়ি নাই। এ বিশাল জগৎজোড়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে জাতির কোন্ সম্পত্তিটা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হবে এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জেগে উঠে। এর উত্তর পণ্ডিত Ruskin' এর ভাষায় পাই "There is no wealth but life" জনবলই জাতির একমাত্র সম্পত্তি। তবেই বর্ত্তমান যুগে একটা জাতির জয়ী হতে হলে তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আর সব চাইতে বেশী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরূপ সম্পত্তি একটা স্থায়ী রকমের "ব্যাঙ্ক" থাকা চাইই। কি উপায় অবলম্বন করলে পর একটা জাতিতে অধিক সংখ্যক কার্য্যদক্ষ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ সন্তানের উৎপত্তি ও রক্ষা হতে পারে সেই উপায় নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বান্বেষণ Eugenist দের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী জাতির—বর্ত্তমান অবস্থায় এই "সুপ্রজনন" বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া খুবই দরকার—কেন না আমাদের যে জন সম্পত্তির "ব্যাঙ্ক" ছিল সেখান থেকে ক্রমাগত ব্যয়ের উৎসবই চলছে, জমার ঘরে একটা কাণা কড়িও পড়ে নাই। মিথ্যা লজ্জার থেকে এড়াতে না পেরে এই কল্যাণকর নববিজ্ঞানটীর আলোচনার আবশ্যকতা বোধ হয় আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। এই প্রাণঘাতিনী লজ্জা আমাদের ছাড়্তেই হবে—কারণ বেঁচে থাকা ত আমাদের চাইই এইটীই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এমন কি নীতির দিক হতেও।

তারপর এই বিশিষ্ট কারণের সঙ্গে আরও কতকগুলি ছোট খাট রকমের কারণ জড়িত আছে যার জন্য এবিষয়ের আলোচনা খুব আবশ্যক বলে মনে হয়। গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে ভীষণ "অর্থসঙ্কট" ও "অন্নসমস্যা" এসে পড়েছে। এই সমস্যার সমাধান আমরা নানাজনে নানাভাবে করছি। জাতীয় শিল্প বিস্তার, চাকরীর মোহ ত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন প্রভৃতি উপায়ে এই অন্নকষ্ট ও অর্থাভাব দূর হইতে পারে মহাত্মা প্রফুল্লচন্দ্র এ কথা আমাদের বরাবর বলে আস্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশের যুবক সমাজ 'মহাত্মা রায়"এর প্রদর্শিত সু-পথটী নানাবাধাবিঘ্ন সঙ্কুল ও আয়াসসাধ্য মনে করে গ্রহণ করতে পারছেন না। বিভিন্ন উপায়ে এই প্রশ্নের সমাধানে আজ তারা প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্ত্তমান আর্থিক অনাটনকালে "বিবাহ না করা" কিম্বা কোন উপায়ে বংশ

বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয় তাদের মধ্যে একটা মস্ত আলোচনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এগুলি আমার মনগড়া কথা নয় একটু চেষ্টা করলেই এর সত্যতার প্রমাণ সকলেই পেতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলব না যতটুকু বলেছি ততটুকু বলবার তাৎপর্য্য এই যে, আজ যে বিষয়টার অবতারণা আমি করতে যাচ্ছি তাকে কেহ যেন অনাবশ্যক বলে উড়িয়ে না দেন।

আমার এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বলতে বিবাহ-সংস্কার। সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই নারী ও পুরুষের যৌন সম্মিলনের ফলেই মুখ্যভাবে ব্যক্তির ও গৌণতঃ জাতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শাস্ত্রকার বলে গেছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পাশ্চাত্য দেশের সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেছেন "The function of marriage is to maintain the species"। সংসারে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সমাজস্থিতির জন্যই স্বামী-স্ত্রীরূপে পুরুষ ও নারীজাতির যৌন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের আর্ষ উক্তির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতদের উক্তির বেশ সঙ্গতি আছে। একটা কথা এখানে মনে স্বভাবতঃই জেগে উঠে যে আমাদের বিবাহসংস্কারের মধ্যে এই কি সম্পূর্ণ সত্য? সত্যকে পূর্ণভাবে পেতে হলে আমাদের কর্ত্তব্য ও ভাবের সমস্ত দুয়ারগুলি খুলে তাকে ধ্যান করতে হবে, তা না হলে আমরা সত্যের সাক্ষাৎ লাভ পাব না, আর যদিই বা পাই তবে হয় সে আংশিক সত্য কিম্বা সত্যের বিকৃতমূর্ত্তি। মানুষের কর্ত্তব্য ধারা অনেক; তার মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রধান দুইটী মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, যার উদ্দেশ্য আত্মচরিতার্থতা (Self-realisation) আর সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—যার উদ্দেশ্য সমাজের কিম্বা মানবজাতির কল্যাণসাধন। কোন কার্য্যকে বিচার করতে হলে কিম্বা প্রকৃত কর্ত্তব্য অবধারণ করতে হলে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুই দিক হতে তাকে দেখতে হবে। উপরের উদ্ধৃত দুইটী বচনকে বিচারের এই মাপদণ্ডে পরীক্ষা করলেই তাদের দোষগুণ ধরতে পারা যাবে। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজাসৃষ্টি, এ কথাটা-সমাজের কল্যাণের দিক হতে সত্য হলেও ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে আত্মচরিতার্থতার পক্ষে এ সংস্কারটার উপযোগিতা কত সে খবর আমাদের না দেওয়াতে অর্দ্ধেক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরের দুইটী বাক্যই সমাজতত্ত্ববিদের বাক্য। সমাজতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব আমাদের জীবনের সকল

ব্যাপারকেই সমাজের পক্ষ হতে বা জীবদেহের দিক হতে বিচার করে, তাই তাদের প্রচারিত কথা একটা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না কেবল Half truths হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্ ভুলে যান যে, মানুষের পক্ষে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে যার কেন্দ্র "আমিতে" সংস্থিত। জীবতত্ত্ববিদ্‌ও ভুলে যান যে মানুষের দেহাতিরিক্ত একটা পদার্থ আছে যাকে বলে "মন"। অপর পক্ষে আর একদল লোক আছেন যাঁরা "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" (Individualism) পক্ষপাতী। তাঁরা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে ভিন্ন করে দেখতে চেষ্টা করেন—ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অনভিলাষ, ভালবাসা কিম্বা ঘৃণা, সুখ কিম্বা দুঃখ ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত সত্য মনে করেন এবং সমাজের কল্যাণ চিন্তা মনে স্থান দিয়ে ব্যক্তিত্বের গৌরবকে ক্ষুন্ন করতে চান না। এদের প্রচারিত সত্যও Half-truth.

এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্বন্ধে কিছু বলব। ইউরোপে কিছু কাল পূর্ব্ব হ'তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ চলেছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতায়। এতদিন পর্য্যন্ত যে বিবাহ বন্ধন একটী নারী ও একটী পুরুষকে পরস্পর পরস্পরের সহচরভাবে একাগ্রতায় সমপ্রাণতায় সম্মিলিত করে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত সেই বিবাহ-সংস্কারই আজকাল তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যের ও চিন্তার একমুখীনতার সৃষ্টি করতে পারছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্লাবনে জাতি ও সমাজের সঙ্গে—ব্যক্তির সম্বন্ধে মিলন-ক্ষেত্র আর চোখে পড়ছে না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয় কি না, আর কি প্রকারে এই দাম্পত্য সম্বন্ধকে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে আত্মচরিতার্থতা আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, এর যাথার্থ অবধারণের জন্য পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম-মন্দিরে, রঙ্গমঞ্চে, মাসিক পত্রিকায়, উপন্যাসে আলোচনার প্রবাহ চলেছে। আমাদের দেশেও নারী জাতির ব্যক্তিত্ববোধের চিহ্ন আর নানাপ্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটা উদ্যম ও আয়োজন আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। তবে কি না এই ভাবটা যতটা ব্যাপকরূপে ও শক্তির সঙ্গে ও-দেশে জেগে উঠছে আমাদের দেশে ততটা হয় নাই। এখনও হয় নাই বলে যে কোনও দিন হবে না এমন ধারণা করাটা কিন্তু আমাদের ভুল হবে। এই যে ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত

চারিদিকে একটা সংস্কার ও আচারের প্রাকার তুলে ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের বিশিষ্টতা রক্ষা করে এসেছিল সে প্রাকার ত অনেক দিন হ'ল ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। এই কয়েক বছরের মধ্যেই পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্মের ঢেউ আমাদের জীবনের আদর্শের মূলে এত জোরে এসে আপতিত হয়েছে যে, আমরা কেহ কেহ এক নবযুগের আগমন আশায় আবাহন-গীতি-মুখর হয়ে উঠেছি। আবার কেহ কেহ সনাতন সমাজের উপর দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয় দেখবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম আত্মপ্রকাশের উৎকট প্রাবল্যে ও উত্তেজনায় আমাদের দেশেও যে দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হ'তে পারে এ আশঙ্কা বোধ হয় অন্যায় ও অমূলক হবে না। এই আশঙ্কার জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তি হিসাবে আত্মচরিতার্থতার আদর্শ ও সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার আদর্শ এই দুই আদর্শের সমঞ্জসাভূত এক নূতন শাশ্বত আদর্শের উপর দাম্পত্য-বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়াসী হয়েছি।

পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপে এ যুগটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। বর্ত্তমান ইউ-রোপীয় সাহিত্যের মূল সুরটী যে এই হবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। তাই আজকাল সমাজতত্ত্ববিদের সঙ্গে সাহিত্যিকের একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এ বিবাদের মূলে উভয়েরই সত্যকে লাভ করবার পূর্ণ যাথার্থ দৃষ্টির অভাব; কেহই পূর্ণ সত্যটীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারেন নাই, সত্যের একদিককার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত-ফলে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের যে তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট হয়েছে সে তত্ত্বগুলিই এখন দেখা যাক্।

আজকাল আমাদের দেশী সাহিত্য সমালোচনাক্ষেত্রে ইবসেনের নাম প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই নরওয়েদেশীয় বিখ্যাত নাট্যকার তার সুপ্রসিদ্ধ "A Doll's House" নামে নাটকে দাম্পত্যবন্ধনকে সাহিত্যের আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি প্রচার করলেন—"যে স্বামী স্ত্রীর কর্ম্মজীবনের পরিধি প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা ও ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন সহ্য করতে পারবেন না ও নানা প্রকারে তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা প্রতিহত করতে প্রয়াসী হবেন, সেই স্বামীকে পরিত্যাগ করবার অধিকার ন্যায়ত স্ত্রীর আছেই।"

ইবসেন স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিবশতঃ এ কথা বললে পর

তার প্রত্যুত্তর এসেছিল পুরুষজাতির পক্ষ হতে, Scandinaviaর খ্যাতনামা Strindberg এর নাটক হতে "বিবাহবন্ধন পুরুষজাতির পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের দ্বারা পুরুষের পুরুষোচিত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। নারীজাতি তার সুখের জন্য পুরুষকে আপনার দাসে রূপান্তরিত করে আর পুরুষ নারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়ে আত্মসঙ্কোচ করতে বাধ্য হয়।"

সুপ্রসিদ্ধ বার্ণর্ড শ তাঁর Man and Superman নাটকে Strindbergএর মতেরই পোষকতা করেছেন। ইবসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই সময়ের অনেক নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বিবাহের সাফল্য ও বিফলতা মাপ করতে বসেছিলেন স্বামীস্ত্রীর মিলনজনিত সুখানুভূতির মানদণ্ডে।

Ibsen নারীর পক্ষেই বলুন আর Strindberg পুরুষের পক্ষেই বলুন তাদের শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উৎকট স্বানুভূতি। সত্য দ্রষ্টার স্থির ও সৌম্যমূর্ত্তি তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না, যা পাই সে শুধু সুতীব্র উত্তেজনা বা বিদ্রোহের রূঢ় বল।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত প্রচারে ইংলণ্ডসমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কি ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে উঠেছে যেমন ঘরে তেমনি বাইরে H. G. Wells এর Ann Veronica উপন্যাস খানায় তার একটা উজ্জ্বল চিত্র আমরা দেখতে পাই।

"সংসারে উন্নতি করবার নারীর একটী মাত্র পথ সে শুধু এই পুরুষ-জাতটাকে তুষ্ট করে। পুরুষরাও ভেবে বসে আছেন জগতে যে নারীর সৃষ্টি হয়েছে সে শুধু তাদের সুখের জন্য। মাতৃত্বই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।"

উপন্যাস খানা সম্পূর্ণ নারী ও পুরুষের প্রবল দ্বন্দ্বের কথায় পরিপূর্ণ। নারীর বিদ্রোহ-ধ্বনিতে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-বাক্যে মুখরিত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানবের অন্তর্গূঢ় বেদনার অপার চিত্তবিক্ষোভের চিত্র, জ্ঞানের গভীর আলোকপাতে সে চিত্র, চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠে নাই। জীবনের ধ্রুবসত্যের দিকে চোখ রেখে এঁরা চলেন নাই তাই জীবনের বৈষম্য-বিরোধগুলি নিয়েই এদের কারবার চালাতে হয়েছে। "ঋষি টলষ্টয়" এর সঙ্গে তুলনা করলেই একথাগুলি অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ রুষজাতীয় জীবনের পক্ষে এক নূতন প্রভাত

এক নূতন চিন্তার জাগরণের অরুণিমায়, পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উন্মত্ত চীৎকার-ধ্বনির মধ্যে জাতির নবজীবন লাভ ব্যক্ত হয়েছিল। Herzen, Ogaryof প্রভৃতি এই বিদ্রোহ উৎসবের পুরোহিত হয়ে অজ্ঞানতা ও সমাজের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। প্রথমেই পুরাতন আদর্শ ও ভাবকে তাঁরা ভ্রমাত্মক ও কুসংস্কারজাত বলে ঘোষণা করলেন। অন্যান্য সংস্কারগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধেও সন্দেহ এসে উপস্থিত হল। ফ্রান্সে George Sandএর প্রথম বয়সে লিখিত উপন্যাসগুলির মত নারীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নিয়ে রুস সাহিত্যে অনেক উপন্যাস লেখা চলতে লাগল। বিপ্লববাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, চারিদিকে এই যে পুঞ্জীয়মান অন্যায় ও অত্যাচার সমাজের প্রথার দোহাই দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে, একে দূর করতে হলে আরও বেশী রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক। এই ভাব থেকেই তখন দেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পুরুষ ও নারীর কি সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারেই সমান অধিকার ও যৌন-সম্মিলনের কতকটা অবাধ গতি প্রচারিত হতে আরম্ভ হল। অন্যান্য সকল দেশের মত এই যৌন সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের আবর্ত্তে পড়ে রুসের অনেক মঙ্গলময় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গিয়েছিল। যৌন ব্যাপারে যে স্বাধীনতা এই নব্যতন্ত্রীরা দাবী করছিলেন, সে স্বাধীনতাকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে, ব্যবহারিক জীবনে তাকে কি ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায় সে তাঁরা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। Tolstoi তখন দর্শকভাবে ব্যাপারটা দেখছিলেন আর এই স্বাধীনতা যে ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হবে এ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। মানব জাতির মঙ্গলকামী ঋষি প্রচার করলেন "যে দিন আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রকৃতি পশুধর্ম্মটাকে দূর করে দিতে পারবে, সে দিনই আমাদের যথার্থ-স্বাধীনতা লাভ হবে। প্রত্যেক মানুষকেই ভাল করে বুঝ্তে হবে তার জীবনে কর্ম্ম ও চিন্তার পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবার পথ কোথায়— দাম্পত্য জীবনে না কৌমার্য্য ব্রতে? বিবাহিত কি অবিবাহিত সকল জীবনেরই পরিণতি পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শটাকে লাভ করা (The ideal of perfect purity)।

অনেকেই বলে থাকেন যে টলষ্টয় বিবাহ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন আর তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে জাতি শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে। একথা সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৮৫ খৃঃ What then we must do নামে তাঁর যে বইখানা

প্রকাশিত হয় তার শেষভাগে তিনি নারীজাতির নিকট এই আবেদন জানান যে তাঁরা যেন সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের কষ্ট সহ্য করতে ভীত না হন। ১৮৯০ খৃঃ প্রকাশিত Kreutzer Sonata নামে উপন্যাস খানিতে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফল পবিত্রতার সুমহান্ আদর্শ পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র কর্ম্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ লোক সমাজে উপস্থিত করেন। কৌমার্য্য ব্রতই সকল লোকের অবলম্বনীয় এমন কথা তিনি বলেন নাই, কৌমার্য্য জীবন যাপন জীবনের আদর্শ নয়, আদর্শ প্রাপ্তির একটা পথ মাত্র। প্রাপ্তিটাই সত্য, উপায় চিরকালই উপায়, সত্যকে ছেড়ে সত্যপ্রাপ্তির একটা উপায়কে যথার্থ বলে আঁকড়িয়ে ধরবার জন্যই মধ্যযুগে (madiwal period) রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকেরা এতটা অধঃপতিত হয়েছিল; মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ব্যভিচারজাত সহস্র সহস্র শিশুর অস্থিতে মঠ কণ্টকিত হয়েছিল টলষ্টয় এ সম্বন্ধেই অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে পবিত্র কৌমার্য্য জীবন যাপন খুব কম লোকেরই সাধ্যায়ত্ত, বিবাহ সংস্কারের পথ ধরেই সাধারণ লোককে পবিত্রতার আদর্শটা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষের পক্ষে এ পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় জেনেও যে এই আদর্শটা তিনি সমাজের সাম'ন দাঁড় করিয়েছিলেন তার কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ এমন একটা সত্য হবে যেটা দেশ ও কাল-ধর্ম্মের অতীত, যেটা সময়ের কুহেলিজালে উজ্জ্বলতা না হারিয়ে ধ্রুবতারার মত মানুষকে গন্তব্যের পথে ইঙ্গিত করবে।

টলষ্টয়ের এ উপদেশটি ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় উচ্চারিত হলেও সমাজের মূল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নাই। স্থির, শান্ত, গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি জীবনের মধ্যে একটা মহান আদর্শ ধরতে পেরেছেন জীবনকে একটা প্রকাণ্ড নৈতিক ক্ষেত্রের উপর সংস্থাপিত করেছেন। এই খানেই টলষ্টয়ের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা। এই খানেই টলষ্টয় সত্যদ্রষ্টা।

এই জগতে যাঁরা সত্যদ্রষ্টা বলে বরণীয় হয়েছেন যাঁদের শিক্ষা বিশ্বমানবের কল্যাণকল্পে উচ্চারিত হয়েছে তাঁরা সকলেই জীবনকে এক বিশাল সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সকল ব্যাপারই তাঁরা সত্যের আলোকে দেখতে চেষ্টা করতেন। তাঁরা সাধনার ফলেই হউক কিম্বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলেই হউক সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করবার একটা বিশিষ্ট শক্তি সম্পদে ধনী ছিলেন, একে ইংরাজীতে Idealism ও বাংলায় "অধ্যাত্ম দৃষ্টি" বলা যায়। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি না থাকলে পর সত্যানুসন্ধিৎসুর সত্যলাভ হয়

না, শিল্পীর চেষ্টা চরম সাফল্যে সুন্দর ও সার্থক হয় না সাহিত্যিকের সৃষ্টি বস্তু-হীন ছায়ায় কিম্বা প্রাণহীন দেহে পর্য্যবসিত হয়।

বিবাহসংস্কারকে এই Idealismএর আলোকে বা আধ্যাত্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে হবে তবেই আমরা এর অন্তর্নিহিত সত্যের সাক্ষাৎ পাব। যারা বলেছেন যে বিবাহের সার্থকতা মাপতে হবে স্বামী স্ত্রীর মিলন জাত সুখানুভূতির তুলাদণ্ডে তাদের এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা প্রথমেই যেটা পেয়েছিলেন সেটাকেই চরম বলে মেনে নিয়েছেন তাকে ছাড়িয়ে অতিক্রম করে যাবার শক্তি তাঁদের হয় না তাই তাঁদের এই আদর্শচ্যুতি। এই কার্য্যে আমি সুখ পাই অতএব এ আমার করণীয়, এই কর্ম্মে আমার দুঃখ অতএব ত্যাজ্য, এ হল পশুর Philosophy আর পশুর ethics, আর মানুষের হলেও সে অতি আদিম যুগের, যখন মানব আর পশুতে বেশী তফাৎ ছিল না, যখন সুখ-লালসাই মানবের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক ছিল। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একটা নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হল যেটা আমাদের কর্ত্তব্য বোধ। এই নূতন জ্ঞানটা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সুখবোধের সঙ্গে এর তফাৎ এই সুখ সম্পূর্ণ "ব্যক্তিগত" বর্ত্তমান ও অস্থায়ী কিন্তু কর্ত্তব্য বোধের ইতিহাসটা অনেক বড়-এটা ব্যক্তিগত হয়েও সমষ্টির, বর্ত্তমান হলেও অতীতের সঙ্গে সংবদ্ধ, ও ভবিষ্যতে দৃষ্টি-প্রসারী, অস্থায়ী হলেও চিরন্তনের ধারা। দাম্পত্যবন্ধনকে এই কর্ত্তব্য বোধের ভূমির উপর গড়ে তোলা যায় বটে কিন্তু তাতে করেও—হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের চিরকালের বিরোধের শান্তি হবে না এই ভয়। আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে, সুখ হতে এই যে কর্ত্তব্যে এসে উপস্থিত হয়েছি এইটাই আমাদের খুব বড় লাভ—তবুও এখানে থামলে চলবে না। জীবনের সকল কাজেই সুখ ও দুঃখ জড়িত আছে—এ থাকবেই যতদিন আমাদের অহংজ্ঞান থাকবে (Ego) কিন্তু থাকলেও এ আমাদের Immediate নয়, গৌণ।

বিবাহসংস্কারটাকে Idealismএর আলোকপাতে দেখতে হবে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান যুগের একজন শক্তিমতী নারী Eugenist Allen Key তার ব্যবহারিক জ্ঞান ও অধ্যাত্মদৃষ্টির মিলনে একটা প্রকাণ্ড সত্যের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে স্থাপন করতে পেরেছেন। ১৯১১ সালে ডাক্তার হ্যাভেলক ইলিস্ লিখিত একটী অবতরণিকা যুক্ত হয়ে এঁর "Love and marriage" নামে গ্রন্থখানি ইংরাজিভাষায় প্রকাশিত হয়।

এই "প্রেম ও পরিণয়" পুস্তকখানায় Allen Key প্রচার করলেন প্রেমই যৌনসম্বন্ধের নৈতিক ভিত্তি, অতএব বিবাহসংস্কারের মূলের কথা। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষের হৃদয়টাকে অবহেলা করা হয়। Allen Key প্রেমকেই পরিণয়ের মূলভিত্তি নির্দ্দেশ করলেও এই প্রেমের মধ্যেই তিনি কর্ত্তব্যবোধেরও ইঙ্গিত করেছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানই তার প্রেমের ভিতর সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে আমরা প্রেম ও কর্ত্তব্য এই দুইএর সম্মিলনক্ষেত্র বলতে পারি। এই প্রেমের ধর্ম্মকে তিনি নাম দিয়েছেন Religion of life। এই ধর্ম্মাচরণে সমাজের মঙ্গল ও ব্যক্তির আত্মচরিতার্থতা এই দুই আদর্শের সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভব হয়। বিবাহসংস্কার দ্বারা মানবজীবনকে পবিত্র সুন্দর, মহৎ ও সুখী করেই প্রেমের সার্থকতালাভ হবে আর বিশ্বমানবের হিতের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য সন্তানজনন পালন ও শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ বিকশিত হয়ে উঠবে। Allen Keyর প্রেম কেবল যৌন সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা নয়; এ হল "Complete expression of the Community between two Personalities চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় (প্রবাসী আষাঢ়, মহিলামজলিস্) "দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস পরিপূরক সম্মিলন।" এই প্রেমের দুইটী দিক আছে psychological (মনের দিক) ও physiological (দৈহিক); একেবারে ইন্দ্রিয় সংযোগ বিরহিত বিশিষ্ট মনোবৃত্তি (Plaonic) নয়—কিম্বা কেবল ইন্দ্রিয়সম্ভোগ সংস্পৃষ্টও (Sensual) নয়—এ এমন একটা ভাব যেখানে George Sand এর কথায়, neither the Soul betrays the sense nor the senses the soul, "ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মা প্রতারিত হয় না বা আত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়ও বঞ্চিত হয় না।" (চারুবাবুর অনুবাদ) তবেই দেখতে পাচ্ছি যে Allenkeyর এই প্রেম কেবলমাত্র একটা বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি নয়, এই মনোবৃত্তির আংশিকলীলা যা কতকগুলি কার্য্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয় সে গুলিও এর অন্তর্গত। এর সঙ্গে আরও একটা ভাব আছে যাকে বিপিনবাবু বলেছেন "আদি রস" (নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৪)—যে রসের বশে ভালবাসার ধর্ম্ম "আত্মদান, আত্মসাৎ, আত্মবিস্তৃতি ও আত্মবিস্মৃতি" প্রভৃতি একাত্মতালাভের প্রয়াস যৌনসঙ্গমে ও প্রজাসৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করে। তবেই প্রেমের ত্রিধারায়—আনন্দলাভের প্রয়াসে যৌনলীলায় সন্তানজননে, কর্ত্তব্যের ধর্ম্মে তার পালন ও শিক্ষাদান

প্রভৃতি কর্ম্মে আর ভালবাসায় (Allen Keyর প্রেম হতে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য)। আত্মজীবনে সত্য ও সুন্দরের সম্মিলন সাধনে, একটী মানবের ভাব ও কর্ম্মজীবনের পূর্ণপরিণতি, আত্মচরিতার্থতা ও সমাজের কল্যাণ সম্পাদন এই দুই আদর্শের বিকাশ সংঘটিত হয়।

এলেন কীর বিবাহসংস্কারের এই প্রেমের আদর্শ বাস্তবিকই ঐ সংস্কার সম্বন্ধে যথার্থ আদর্শ—আর এ যে একটা বিশাল অধ্যাত্মদৃষ্টি ও নৈতিকজ্ঞানের ফল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রেমধর্ম্মের উপর বিবাহসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে নিশ্চয়ই চিন্তার দিক হতে, সেইটা আমরা বিশেষ করে উপলব্ধি করব,—যখন কিনা এই তত্ত্বের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান চিন্তাবীর Henri Bergsonর Creative Evolution তত্ত্বটীর সুসামঞ্জস্য অনুধাবন করতে পারব। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ Darwin এর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হতে Bergsonএর চেতনার অন্তর্নিহিত স্বতঃপ্রসারিণী শক্তির লীলা পর্য্যন্ত সমগ্র তত্ত্বটী প্রকাশ করবার স্থান এ নয়, কেননা এত বড় একটা চিন্তার প্রবাহ অনুসরণ অল্পসময়ে ও অল্পকথায় একেবারেই অসম্ভব। তবে প্রাণের সঙ্গে মনের অথবা চেতনার একত্বকে প্রতিপন্ন সত্য বলে গ্রহণ করে আমরা প্রাণজগতে জীবের ক্রমিক বিকাশের পর্য্যায়ের সঙ্গে মনোজগতে চেতনার বিকাশধারাকে এক অখণ্ড করে দেখে অভিব্যক্তিবাদে প্রেমের যথার্থস্থান অবধারণ করব মনে করেছি।

Darwinএর অভিব্যক্তিবাদ কেবল মাত্র জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের ক্রমিক পরিণতির ধারাটা তিনি স্বীয় তত্ত্বদ্বারা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই—এ হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ। তাঁর মতানুসারে আদিম amœba হতে বর্ত্তমান মানবদেহ পর্য্যন্ত সমস্তই এক উপদানে গঠিত। একই জীবকোষ (Germ cell) সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মনের (Mind) উৎপত্তি নির্ণয় করতে এসে Darwin বললেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবকোষের নিয়ত অসংযত ভাবে নানারূপে প্রকাশ ফলে (Chance Variations) মস্তিষ্কের সৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে মন অথবা চেতনার উদ্ভব সম্ভাবিত হয়েছে। এই মত সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে, যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই কোন না কোন রূপে মনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, চেতনা অভিব্যক্তির স্তর নির্ব্বিশেষে সকল জীবকোষের মধ্যেই কিছু না কিছু সংক্রামিত হয়েছেই। দ্বিতীয়তঃ—

জীবকোষের নানারূপে আপনাকে প্রকাশ পরম্পরা স্বীকার করে এই ঘটনাকে মস্তিষ্ক ও মনের উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ ধরলে মানুষের ইতিহাস একেবারে একটা "Chapter of accidents" হয়ে পড়ে।

Bergson প্রচার করলেন যে, অভিব্যক্তিবাদ জীবন ও মন এই দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ বিশ্বে জীবন ও চেতনা একই তত্ত্ব। এই চেতনাই ক্রমাগত নিজকে অতিক্রম করে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র। চেতনার সেই অন্তর্নিহিত শক্তিই Bergsonর Elan Vital ও কবি Shelleyর "The one Spirit's plastic stress" (Adonais) জীবকোষকে নানারূপ পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে মানবদেহ ও মানব মনে বহন করে এনেছে। সৃষ্টির প্রেরণার মূলেই চেতনা অথবা মন, জীবকোষ উপকরণ মাত্র। চেতনার বিকাশের ধারা তিনটী "Vegetable torpor (জড়স্বভাবত্ব) Instinct (সংস্কার) আর Intelligence (বুদ্ধি)। এই চেতনাই নিজের ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে অবশেষে মানব মনে Intelligence রূপে বিকসিত হয়ে উঠেছে।

এখন প্রেমের বিকাশ-তত্ত্ব। বর্ত্তমান কালের একদল দার্শনিক নীট্‌সে ও তাঁর শিষ্যবর্গ প্রেম ও অন্যান্য কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে দৌর্ব্বল্য আর অবনতির কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। নীট্‌সে Darwin এর শিষ্য Darwin এর Natural selection তত্ত্বটীর একটা দিক মাত্র উপলব্ধি করে তিনি যে এক ভুল সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃতির যৌনলীলার মাধুর্য্য ও প্রজারক্ষার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তিনি একেবারেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু প্রকৃতির ধ্বংসকারিণী শক্তি ("Nature red in tooth and clow") আর সেই শক্তির অনন্ত বিনাশলীলা। যে Natural selectionএর তত্ত্বের জোরে নীটসে জগৎ থেকে সকল রূপ ও সকল মধুরতা লোপ করে দিয়ে এক ভীষণ হিংসা কামক্রোধ প্রভৃতির কুৎসিততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই তত্ত্বকেই অবলম্বন করে জীবতত্ত্বের (Biology) সাহায্যে আমরা বিশ্বময় সৃষ্টি ও স্থিতি ব্যাপারে এক বিশাল নীতি ("organic morality") ও প্রেমের অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রত্যক্ষ করব।

জীব জগতের প্রজনন ও জীব-শিশু রক্ষণ ব্যাপারটা একটু মনের সঙ্গে দেখলে পরেই আমরা জানতে পারি যে বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে বেয়ে

জীব যতই স্তর হতে উচ্চ স্তরান্তরে উন্নীত হচ্চে ততই জীবশিশুর আপনা হতে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাটী কমে যায় ; এই ভাবেই মানবশিশুর নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অক্ষমতা যত অধিক ও দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন আর কোন জীবশিশুতেই লক্ষিত হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে এই যে স্তর ভেদে জীব-শিশুদের রক্ষার জন্য একটা সুন্দর সুবিহিত ব্যবস্থা আছে, এই দেখেই সেখানে "organic morality" জৈবিক নীতি নামে একটা শক্তির ক্রিয়া স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। অসহায় মানব শিশু যে রক্ষা পায়, তার নিশ্চয়ই একটা "Survival value", আছে। পিতৃমাতৃস্নেহ ভালবাসা ও যত্ন এই গুলিই শিশুকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সহায়তা করে থাকে। এই প্রেমই মানবশিশুর Survival value। এ ভাবে জীবকোষের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ স্তরের সঙ্গে প্রাণী জগতে প্রেম বিকাশের স্তরটাও সমান পদক্ষেপে চলেছে।

জীবিত থাকাই জীবনের ধর্ম্ম — এর চেতনার—সৃজনীশক্তির প্রেরণায় জীবন ক্রমশঃই এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরে উন্নত হবার প্রয়াসী। জীবনের এই গতি ও সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, তার থেকেই প্রেমের উৎপত্তি। অভি-ব্যক্তিবাদে প্রেমের স্থান কোথায়—নীচের কয়েকটী কথায় তা বুঝতে পারা যাবে "No love, no intellect ; No morals, no man" ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি Shellyর নাম করেছি। একজন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বলেছেন যে শেলী গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে Bergsonএর অভি-ব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) তত্ত্বটা পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিখ্যাত Adonais কাব্যের কবি গেয়েছেন :—

"The one Spirit's plastic stress sweeps through the dull, dense world, compelling there.

All new successions to the forms they wear." Bergsonএর Elan Vital বা চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণা ও Shelleyর Plastic stress একই শক্তি ; Bergson যেমন চেতনার এই প্রেরণাকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলেছেন, তেমনি Shelley এই plastic stressকেই রূপপর্য্যায়ের প্রেরক-শক্তি বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতিতে বা "জীবন দেবতায়" যেমন Darwin প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদীর তত্ত্বগুলি নানাভাবের আলো ছায়াপাতে ইসারা ও ইঙ্গিতে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি Bergsonর তত্ত্বটাও Shelleyর উপরের উদ্ধৃত লাইন কয়টীতে কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

শেলী প্রেমের কবি। বিশ্বের অন্তঃস্তলে যে প্রেমরাশি সদা সঞ্চিত আর নানানরূপে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের মধ্য দিয়ে যে প্রেম স্বতঃই নিত্য উৎসারিত, সেই প্রেম তাহার কাব্যে রসসুষমায় প্রতিভাত হয়েছে। শেলীর The one spirit হ'ল প্রেম ধর্ম্ম। আর আমরা পূর্ব্বেই বলেছি অভিব্যক্তিবাদের প্রেম Elan Vitalএরই বিকাশ। মানবস্তরে এসে এই চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণাশক্তি Elan Vital প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে দাম্পত্যপ্রেমে ও রক্ষণকার্য্যে পিতৃমাতৃ স্নেহে অভিব্যক্ত হয়েছে। Bergsonর নিম্নলিখিত কথাগুলি হতে উপরের তত্ত্বটীর একটা ইঙ্গিত যেন আমরা পেতে পারি বলে মনে হয়।

"At times, however,in a fleeting vision the invisible breath that bears them (the things or individuals) is materialised before our eyes. We have this sudden illumination before certain forms of maternal love so striking and in most animals so touching, observable in the solicitude of the plant for the seed. This love, in which some have seen the mystery of life may possibly deliver us life's secret."

বিংশ শতাব্দীর একটা প্রকাণ্ড গৌরবের জিনিষ এই অভিব্যক্তিবাদ Bergsonর Creative Evolution। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিবাহ সংস্কারের প্রেমের আদর্শ তত্ত্বটীর সঙ্গতি কি প্রকারে দেখান যেতে পারে তার একটা চিন্তার সূত্র আমরা এখন খুঁজে পেয়েছি বোধ হয়। এখন নরনারীর সম্মুখে একটা মহান্ আদর্শ স্থাপন করে সমাজ ও ব্যক্তিকে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" উপলব্ধি করবার প্রকৃত সহায়তা করেছেন যে এই মহীয়সী নারী (Allen Key) তাঁকে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সৌজাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ শেষ করলাম।

মুক্তি-গাথা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

কোটি বন্ধনের মাঝে খেলায়ে চাতুরী,
ওগো চিরশিশু, তুমি খেল লুকোচুরী
এ ভুবনে নিশিদিন ; ফেলি যবনিকা
তারি পরে কাটি মিথ্যা বন্ধনের লিখা
আমারে ছলিতে চাও ; করি মোক্ষকামী
করিবারে চাও দূর মোরে অন্তর্যামী
তোমার সান্নিধ্য হ'তে ; তুমি নিশিদিন
যেথায় খেলিছ সুখে বিরামবিহীন
মাখি ধূলিরাশি দেহে, বিক্ষুব্ধ ব্যথায়
সুখে দুখে আনন্দেতে আমিও সেথায়
খেলিবারে চাই প্রভু—তব সৃষ্টিমাঝে
মোর আশেপাশে মোর ক্ষুদ্রতম কাজে
লক্ষ স্থানে তুমি যেগো আছ ধরা দিয়া।
সে কথা কেমনে আমি যাব পাশরিয়া !

২

তোমার অজ্ঞাতে আমি করিনিত কিছু
তাই যেন মনে রয় ; মরীচিকা পিছু
ছুটিয়াছি সে ত প্রভু, তোমারি ইঙ্গিতে।
সকলি ভরেছ তুমি তোমারি সঙ্গীতে,
তাইত বুঝেছি কিছু শ্রেয় প্রেয় নাই
এ নিখিল বিশ্বে মোর ; যেই দিকে চাই
তোমার ভঙ্গিমাখানি এমনি দুর্ব্বার
ফুটি উঠে ধীরে ধীরে নয়নে আমার
সব অন্তরালে ; তাই বিজনে নির্জ্জনে
পাতিনি আসন তব ; সব সৃষ্টি সনে

তোমারে সহস্র করি সহস্র মুরতি
জীবন-মন্দিরে মোর চাহিছ আরতি
তোমার সে রূপ হতে বঞ্চিতে আমায়
নাহি সাধ, তাই আমি আছি এ ধরায়।

৩

বন্ধনের মাঝে কভু বন্ধ নহি আমি
সেই শিক্ষা যেন মোরে দিও অন্তর্য্যামী
জন্ম হতে জন্মান্তরে, তব বিশ্বমেলা
যেন মোর জীবনেতে তুলি চিরখেলা
রাখে মোরে চিরশিশু করি ; বিশ্বমাঝে
সকলি তোমার, গুপ্ত রহি সব কাজে
ফুটায়ে রেখেছ এই বিশ্বের কমল
তাই এ ভুবনে সব হরষ বিহ্বল।
আমি ত চাহিনা মোর আঁখিদুটি মুদি'
ইন্দ্রিয়ের অন্তরের বাতায়ন রুধি
বিশ্বের আলোক এই ঢাকিয়া আঁধারে
মিথ্যার মাঝার দিয়া লভিতে তোমারে ;
সত্যময় প্রভু তুমি তব এ ভুবন
তারি রূপ ধরি করে গৌরব সৃজন।

৪

তোমারে দেখেছি কবে কোন্ তরুতলে,
কোন্ স্রোতস্বিনী তীরে কৌমুদীর গায়,
প্রাবৃট পরশ তৃপ্ত মঞ্জু তৃণদলে
সিন্ধুর তরঙ্গমাঝে দক্ষিণের বায়।
তোমারে পেয়েছি মোর দুখ অশ্রুজালে
তোমারে ছুঁয়েছে মোর সুখান্বিত গান,
তোমারে হেরেছি আমি উষার আড়ালে,
আবার সন্ধ্যার মাঝে রক্তিম বয়ান।
তুমি উঠেছিলে হাসি যবে এ ধরায়
আমি এসেছিনু নামি ; রয়েছ গোপন

আমার মরণ মাঝে ; উষায় সন্ধ্যায়
প্রতি পল হেরিতেছি তোমার স্বপন।
আমার কামনা মাঝে তব তৃপ্তি জাগে,
আমি ভালবাসি ধরা তব অনুরাগে।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

(শেষ দফা)

(১)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এভি,

তপ্তখোলা হতে লাফিয়ে একেবারে জ্বলন্ত চুল্লীর মাঝে এসে পড়েচি, এভি ! ভালোত কিছুই লাগেনা। তুমি ভাবচ, বড়ই অদ্ভুত এ কথা—একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব। তা'হবে। আমিও কখনো শুনিনি। স্বামীর সঙ্গ নারীকে সুখ দিতে পারেনা···আর এমন যে স্বামী ! কিন্তু সত্যই বলচি ভাই, আমার এখানে আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। যতদিন দিদি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে ছিলেন, ততদিন বেশ আরামেই কেটেচে। দিনগুলো কেমন করে, কোথা দিয়ে চলে গিয়ে যে দুটো মাস অতীতের কোলে মিলিয়ে দিয়ে গেল, তা' টেরও পেলুম না। দশদিন হল তাঁরা চলে গিয়েছেন; এ বাড়ীর সকল আনন্দ, সমস্ত আকর্ষণ একেবারে নষ্ট করে।

উঃ এই কর্ম্মবিহীন দিনগুলোর কি বুকজাতা বোঝা ! কিছুতেই তা ঠেলে ফেলা যায় না। একেবারে শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেচে। কলকাতায় থাকতে যে সব কাজের অভিযোগ করেচি, এখন সেই সব কাজ করতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।

স্বামীত খেয়ে উঠে কলেজে বেরিয়ে যান। বারান্দার উপর যতক্ষণ দেখা যায়, তাঁর দিকে চেয়ে থাকি—তারপর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি। ঝিটা এসে

তার ভাঙা হিন্দীতে যখন খাবার জন্য তাগিদ সুরু করে দেয়, তখন বিরক্ত হয়ে উঠে যাই। খাওয়া হলে আবার সেই শুয়ে থাকা।

কলকাতায় বই পড়বার ফুরসুত্ পেতুম না, কিন্তু এখানে এসে সেগুলো স্পর্শ করতেও ইচ্ছে হয় না। কখনো যদি বা একখানা টেনে নিয়ে বসেচি—ধৈর্য্যধরে দু-এক পাতার বেশী পড়তে পারিনি। এই বই আর এখন হাত দিয়ে ছুঁইনা। গ্লাসকেসের ভিতর হতে সেগুলো তাদের সোনালু চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে··· ··· তা' যেন আরও অসহ্য! আমি তাই কাঁচের ওপরকার ধুলো ঝেড়েও ফেলিনে।

স্বামী ফিরে এলে কতটা সময় বেশ কাটে—তারপরই কিন্তু সেই এক ঘেয়ে ব্যাপার। একদিন তিনি বল্লেন—"সমস্তটা দিন বন্দিনীর মত এমনধারা আবদ্ধ থাকলে শেষটায় একটা অসুখ করবে।"

আমি জবাব দিলুম—"কাল থেকে তা' হলে মাঠেই চরতে যাব।"

"তা কেন? আমার সহযোগী অধ্যাপকরা সকলেই বিবাহিত, তাদের বাড়ীগুলো ঘুরে বেড়াতে পার"—বলে তিনি আমার দিকে চাইলেন।

শুনে আমার গা জলে গেল। আমি বল্লুম—"তোমার বন্ধুপত্নীরা আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নন। একথা বুঝতে পেরেও বেহায়ার মত তাদের গায়ে পড়ে আলাপ করতে হবে? সে আমি পারব না।"

"না, না—তা আমি বলচিনে" বলে তিনি আমার হাত দুখানি তার মুঠোর ভিতর চেপে ধরলেন, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"কিন্তু তোমার এই একঘেয়ে জীবনে কি করে বৈচিত্র্য আনা যাবে।" আমি এখানে আনন্দ পাচ্ছিনে বলে বেদনায় তিনি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তার মুখ চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমাকে খুসি হতেই হবে! ·····কেন পারবনা? এর চাইতে বেশী সুখ-সম্ভার ক'জনার ভাগ্যে জোটে?

আমি তাঁর কাঁধের উপর দু'খানি হাত রেখে বল্লুম—"একটা কিছু খেলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না?"

আমার মুখে এই প্রস্তাব শুনে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা তখনই যেন ঘুচে গেল। তিনি হেসে বল্লেন—"খাসা হয়, কিন্তু কি খেলার ব্যবস্থা করব?"

"টেনিস বেশ চলবে।"

"আমি যে জানিনে" ব'লে তিনি হেসে ফেল্লেন।

'দু-দিনেই তোমায় আমি পাকা খেলোয়াড় করে ছেড়ে দেবো।" এক

সপ্তাহের মধ্যেই খেলার জায়গা এবং সব সরঞ্জাম ঠিক হয়ে গেল। লেখাপড়ায় কৃতিত্ব লাভ করলেও স্বামী কিন্তু খেলাটাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারলেন না। দিনকত বেশ আমোদেই কাটালুম। খেলার পর শরীরটা গরম হয়ে উঠলে দুজনা বরাবর রাস্তায় বেড়িয়ে একেবারে রাবীর তীরে গিয়ে ফুলবোনা ঘাসের কার্পেটের উপর বসে আকাশের গায়ে আর রাবীর জলে আলো আঁধারের খেলা দেখতুম।

একদিন ফেরবার পথে আমি বল্লুম—"চল, তোমার কোন বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

"না, তার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কথাই সত্যি—আমাদের তাঁরা পছন্দ করেন না। বন্ধুরা আমার মাঝে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েচেন। অধ্যাপক মহলে আমাদের টেনিস খেলা নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তোমায় খুব লজ্জা পেতে হয়েচে, না?"

"সত্যই নীহার, দেশের শিক্ষিত লোকেদের ওরূপ ব্যবহার, লজ্জা হবারই কথা। তুমি নিজে বুঝতে পারচ কি না জানিনা, আমি কিন্তু লক্ষ্য করেচি যে, এই একমাসের নিয়মিত পরিশ্রমে তোমার শরীর অনেকটা ভাল হয়েচে। আমি নিজে কোনদিন শারীরিক পরিশ্রম করিনি, কোনরকম খেলাতে কখনই মন দিইনি। তাই হয়ত চলবার বেলায় মাজাটা আমার নুয়ে পড়ত; এখন কিন্তু চলতে আমার কষ্ট হয় না মোটেই"—বলে প্রমাণ দেবার জন্যই যেন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

সত্যই খেলার ঝোঁকে সারাটা দুপুর মত্ত হয়ে থাকতুম। কখন স্বামী আসবেন, কখন খেলা সুরু হবে—আর কখনই বা রাবীর তীরে মুক্ত আকাশের তলে গিয়ে বসব—এই সবই ভাবতুম। তিনিও কলেজ থেকে ফিরে এসেই বেয়ারাকে খেলায় আয়োজন করতে আদেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করে নিতেন এবং জলখাবার ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য দু'তিন খানা করে লুচি একসঙ্গে মুখে গুঁজে দিতেন—আর চা-এর বাটিটা এক চুমুকেই খালি করে ফেলতেন। আমি একা একা হেসে আকুল হতুম—একেবারে ছেলে মানুষটি।

খেলার দিকে আমার খুব ঝোঁক হবার একটা কারণ এই ছিল যে, আমি রোজই জিততুম। আমি খুব মুরুব্বিয়ানা চালে তাঁকে উৎসাহ দিতুম আর

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পরাজয় মেনে নিতুম; কিন্তু তিনিও ক্রমে নিজের কৌশলে জয়লাভ করতে লাগলেন—সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়োগেও আমি আর তাঁকে পরাজিত করতে পারতুম না। সেইটেই একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। একদিন বল্লুম—"আর ভাল লাগে না—খেলাও একঘেয়ে হয়ে গেছে।" স্বামীর মুখে আবার বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সপ্তাহ কেটে গেল একেবারে বিনাকাজে। একদিন সকালে এসে চাকরটা বাজারের টাকা চাইলে। আমি বল্লুম—"চ', আমিও যাব।" সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তাকে ধমকে বল্লুম—"নীচে যা, আমি আসচি।" স্বামী পড়ার ঘরে হয়ত নোট লিখছিলেন—আমার কথা শুনতে পেয়ে বল্লেন—"কোথায় যাচ্ছ?"

"চল আজ বাজার করে আসি! কি ছাই ভস্ম সব কিনে আনে, পয়সাও যায় অথচ খাওয়া ভাল হয় না।"

"বেশত, চলনা" বলে তিনি বেয়ারাকে গাড়ী ডাকতে আদেশ করলেন। আমি বল্লুম "গাড়ী কি হবে; হেঁটেই যাব।"

"সে-যে-অনেক দূর।"

"রাবীর চাইতে ত নয়।" খেলা ছেড়ে দিয়ে অবধি আর রাবীর তীরে বেড়াতে যাইনি। নীচে নেমে এসে, খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম ঘাসগুলো লম্বা হয়ে উঠেচে। বেয়ারাকে ডেকে বল্লুম "ঘাস কেটে মাঠ ঠিক কর।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ আবার খেলতে হবে না কি?"

আমি বল্লুম—"হুঁ।"

কিছুদিনের জন্য খেলা আর বাজারে যাওয়া, দৈনন্দিন কাজেই পরিণত হোল।

কিন্তু এত করেও যখন মনটাকে নিরানন্দের জড়তা হতে মুক্ত রাখতে পারলুম না, তখন সব-ই ছেড়ে দিলুম। আজ খেলার মাঠের ঘাস গুলো আধ হাত লম্বা হয়ে বেড়ে উঠছে, চাকর তার বাজার চুরি বাড়িয়ে দিয়েচে—স্বামীর মুখে আবার বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেচে। আর আমিও একেবারে জড় হয়ে গেছি। স্বামী আমায় প্রফুল্ল রাখবার জন্য কতরকম চেষ্টা করচেন—কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, রাশি রাশি সুপাঠ্য বই। এত আদর, এত ভাল বাসা...... আমার বুক ফেটে কান্নাপায়, এভি—প্রাণ আমার শুকিয়ে মরে গেছে।

এমন কেন হোল, এভি! একি বিবাহের পরিণাম......? কিন্তু বিবাহ ত

আমার চিত্তের স্বাধীনতা হরণ করে নি,স্বামীত দাবীর জোর একটিবারও আমার ওপর চালাতে চান নি···? এখানে যে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও, বলতে পার এভি, তবুও আমার অন্তরে এমন দৈন্য, এমন অশান্তি কেন বেড়ে উঠছে?

তোমারই—নীহার।

(২)

প্রিয়তমে,

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, তোমার চিঠি পড়্চি—দু'তিনবার নীচের নামটা ভাল করে দেখে নিলুম। সত্যি করেই লিখেচ?···পরিহাস করনি ত? তোমার চিঠি যে হৃদয়-গলা-কান্নার-সুরের মত এসে আমার বুক ফুলিয়ে দিচ্চে।

সত্যিই জীবন তোমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে হচ্ছে?··· কেন? কিসের অভাব তোমার···? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচিনে!

তোমার এ-অবস্থা বিবাহেরই ফল কি-না জানতে চেয়েচ। ও-ব্যাপারের সঙ্গে আমার যে পরিচয় নেই। না, না—তা নয়। ও ধারণা ভুল—আগাগোড়া সব ভুল। এ-সিদ্ধান্তে কেমন করে উপনীত হলুম, শুনবে?

দেওয়ালে টাঙান তোমার ফটোগ্রাফ খানা যেমন স্পষ্ট দেখচি, তেমনি তোমার হৃদয়-খানি আমি দেখতে পাচ্চি আমার হাতে রেশমে-বাধা তোমার লেখা পত্র-গুচ্ছের পাতায় পাতায়।

কি তোমার হয়েচে? কিছু-ইত না···তোমাকে যে অনেক কিছু করতে হবে। বাংলার মেয়েদের যে মুক্তির বাণী শোনাতে চায়, তাকে এত অল্পে, এমন তুচ্ছ ব্যাপারে বিচলিত হলে চলবে কেন?

একটা ক্ষণিক অবসাদ এসেচে বইত নয়। অচিরেই তা অপসারিত হবে। আমরা ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু ঢেউ গুণেই সময় কাটিয়ে দিচ্চি—তুমিই যে নারীর বাত্যালোড়িত কর্ম্ম-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েচ তোমার কৌশলে, নৈপুণ্যে ও সাফল্যে যে ভয়-ত্রস্তা, সতত-সঙ্কুচিতা নারী-চিত্তে শক্তি এনে দেবে। কিছু হচ্চে না বলে তুমি আক্ষেপ করচ, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার করা-কাজের ভিতরকার সত্যটুকু মানুষের মনে অঙ্কিত হয়ে উঠচে—তাকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না।

টেনিস খেলা,বাজার করা প্রভৃতির মূল্য সেখানে বেশী নেই,যেখানে সকলেই ও-সব করে থাকে; অথবা ও-সব কিছু না করলেই যে জীবনের কিছু পাওয়া

যায় না, তাও নয়। তোমার সমাজের নারীরা যে ওই করেই মুক্ত হবে, তাও আমি বলচিনে। তবুও তোমার টেনিস খেলা, বাজার করা আমি প্রশংসা না করে এই জন্যই থাকতে পারচিনে যে, তোমার সমাজ ও-গুলিকে মস্তবড় অপকর্ম্ম বলে ঘোষণা করেচে—তবুও তুমি সে-গুলো করতে দ্বিধা বোধ করচ না। যতখানি শক্তি অন্তরে সংগ্রহ করে তুমি সে-গুলি অনুষ্ঠিত করচ, সেই শক্তিকেই আমি পূজা করি। ওই শক্তিই তোমাকে বল দেবে সকল রকম বন্ধন ছিঁড়তে, সমস্ত অবিচার দূর করতে।' এ হচ্চে শুধু ভাবের দিক হতে তোমার কাজকে সমর্থন করা—শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হতেও ওর মূল্য তোমাদের কাছে বড় কম নয়।

তোমাদের কাজগুলো যদি এই-দিক হতে ভেবে দেখ, তা'হলে কিছু করচিনে বলে অনুতপ্ত হতে হবে না। ভবিষ্যত-জাতি গড়বার কতবড় একটা দায়িত্ব ভগবান নারীকে দান করেচেন, সমাজ তা'হতে তাকে বঞ্চিত রাখবে?

জীবনের বৈচিত্র্য মানে এ নয় যে, তাকে তারই জন্য সারাদিন ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে হবে। প্রাণকে এমন ধারা তৈরি করা চাই, যাতে করে চারিদিক হইতে আনন্দ কুড়িয়ে নিজের ভাণ্ডার সব সময় সে পূর্ণ রাখতে পারে। পাইন গাছটা সম্বন্ধে একদিন তুমিই না এই কথা বলেছিলে?

কল্পনায় একটা অশান্তির জাল বুনে নিয়ে মাকড়সার মত তার মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রেখে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি মানুষের মনে কেন আসবে, ভাই? ভগবানের কৃপায় এমন কিছু দুর্দ্দান্ত অভাব তোমায় পীড়ন করচে না, যার ফলে তোমার জীবনের আনন্দ এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। অসঙ্কোচে তাই-ই করে যাও, যা সত্যরূপে তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ইতি

তোমারই—এভি।

(৩)

স্নেহের ঠাকুর পো,

কি যে লিখেচ, ভাল করে বুঝতে পারলুম না। জানই ত আমি মূর্খ—আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই বুঝি না। নীহারের চিঠিরও ওই একই ভাব। তোমাদের দুটিকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়েচি। নীহারের বুকে কিসের ব্যথা

জমে উঠেচে? তার কারণই বা কি? তুমি কি এখনো তাকে কেবল নারীর কর্ত্তব্যই শেখাচ্ছ?

শুনলুম তাকে দিয়ে না-কি টেনিস খেলাচ্ছ, হাট-বাজার করাচ্ছ। সেগুলোও কি নারীর কর্ত্তব্য? যাক্। যাতে তোমরা সুখ পাও তাই-ই কর, আমি তাতেই খুসী।—কিন্তু ব্যথার কথা কেন? কিসের অভাব তোমাদের? টাকা কড়িতে যদি না কুলোয় লিখো, পাঠিয়ে দেব। নীহার ছেলেমেয়েদের একজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেচে—সে না-কি আর একা থাকতে পারচে না। মিণ্টি ত শুনেই নেচে বেড়াচ্ছে, সে লাহোর যাবেই—আর খোকাও বাহানা ধরেচে। লোক পেলে আমি ওদের দু'জনকেই পাঠিয়ে দেব।

ভাল কথা, গৌরীর একখানা চিঠি পেয়েচি। তার ওখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠচে; অথচ মাথা রাখবার দ্বিতীয় স্থানটুকু নেই। বেচারা কি যে করবে! এ যে বেঁধে মারা! সে লিখেচে—"দিনরাত এই তাচ্ছিল্য সয়ে নির্য্যাতন ভোগ করে আমি থাকতে পারতুম সবই অগ্রাহ্য করে, যদি না ছেলেমেয়েগুলো এত কষ্ট পেত। নিজের আমার কিসের দুঃখ? আমার সবই তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। মানুষ যে এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে—তা আগে কখনো ভাবিনি।"

"এর জন্য দোষ দেব কাকে? বাংলায় আমি একা এমন নই—হাজার হাজার রয়েচে। তারা অনেকেই আমার চাইতেও বেশী যন্ত্রণা পাচ্ছে···কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই মেনে বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রাখচে।"

"আমি কিন্তু অদৃষ্টের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে শান্তি পাইনে। আমার অন্তরে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেচে। সে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমার এ অবস্থার জন্য মানুষই বেশী দায়ী; আর সে মানুষ হচ্চে আমারই আত্মীয় স্বজন সকলে। তারা সবাই মিলে যে অস্বাভাবিক নিয়ম করেচে, তাই ত আজ বাধা দিচ্ছে আমাকে এই অনল কুণ্ডের বাইরে ছুটে যেতে। কি চমৎকার বিধান এই-সব মানুষদের। বেঁধে মারবে, ক্ষতস্থানে নূন ছিটিয়ে দেবে, তবুও ছেড়ে দেবে না!"

"ফরিদপুর থাকতে একদিন দেখেছিলুম যে কতগুলি সাঁওতাল মাটি কেটে রাস্তা বাঁধছিল—তাদের দলে মেয়ে লোকও অনেক ছিল। মেয়েরা সন্তানদের কাপড় দিয়ে বেঁধে পিঠে করে নিয়েই মাটি টানচে। স্বামীকে তাই দেখিয়ে আমি বল্লুম—'আহা, কি কষ্ট বেচারীদের।'

তিনি উত্তর করলেন—"চমৎকার পদ্ধতি। নারীকে এরা একেবারে অসহায়া করে রাখে না। দু'মুঠো অন্নের জন্ম ওই মেয়েদের আর পরের গলগ্রহ থাকতে হবে না।"

"সে-দিন সে কথা শুনে হেসেছিলুম, কিন্তু আজ সত্যিই ভাবচি প্রকৃত সুখী তারাই। ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আমরাও খাটি—তবুও ত কিছু করে উঠতে পারিনে। এরা যদি আমায় পীড়ন না করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিত, তা' হলেও যেন বাঁচতুম। কোনরকমে 'হয়ত সন্তান ক'টিকে খাইয়ে বাঁচাতে পারতুম।"

"ছেলে মেয়ে ক'টি একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। শুধু যে খাদ্যের অভাবে তাদের দেহ অপুষ্ট থেকে যাচ্চে, তা' নয়—যে অত্যাচার সইচে, যে রকম জঘন্য প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকতে হচ্চে, তাতে করে তাদের মনের দৈন্যও বেড়ে উঠচে। এ অবস্থায় থাকতে হলে এদের একটিও মানুষ হবে না! সমস্ত দুঃখ কষ্টের চাইতে সেই চিন্তাই আমায় বেশী ক্লিষ্ট করে ফেলেচে।"

এমন আরো কত কি সে লিখেচে। নরেশের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো, তার জন্য কিছু করা যায় কিনা। আমরা ভাল আছি। তোমাদের বিশদ খবর জানিয়ো। ইতি।

তোমার—বৌদি।

(৪)

স্নেহের মোহিত,

চিঠি লিখে লিখে জবাব না পেয়ে কনক কিন্তু নীহারের ওপর ভারি চটে গেছে। সেই রাগের ঝাল ঝাড়বার জন্য, তোমার কাছেও চিঠি লেখা সে ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু তুমি আমায় যে চিঠিগুলো লেখ, তার প্রত্যেকখানি না পড়ে সে থাকতে পারে না—আর তাতে তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের সব কথা জেনে সে বেচারা ম্রিয়মান হয়ে পড়েচে। অবসর সময়ে কেবল তোমাদের কথা বলে আমায় শুদ্ধ ব্যস্ত করে তুলেচে।

ওদিকে আবার কলকাতা হতে তোমার বউদি, কনকের মারফত, একটা কিছু উপায় বাৎলে দিতে আমায় বারবার অনুরোধ করচেন। তাঁর বিশ্বাস, তোমার সুখ-দুঃখের সোণার আর রূপোর কাঠি দুটো আমার হাতের সামনেই রয়েচে—একটু কষ্ট করে সে দুটোকে যায়গা মাফিক বসিয়ে দিতে পারলেই তোমাকে সুখী করতে পারি!

বাস্তবপক্ষে তোমাদের অবস্থাটা বাইরের দিক হতে আমাদের কাছে বড়ই শঙ্কাজনক বলে মনে হচ্চে। তোমার চিঠিগুলি পড়ে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েচি—কিন্তু মগজে কিছুই যোগায় না।

তোমায় আগে একবার লিখেছিলাম যে, কর্ম্মের একটা উদ্দাম প্রেরণা দেশের তরুণ-তরুণীদের বুকে চাঞ্চল্য এনে দিয়েচে। তার ফলে জীবনের কোন অবস্থার মাঝেই তারা আজ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না! ছাত্র ছাত্রীরা পড়বার শ্লোক আওড়াতে বসে, তার মাঝে জীবনের নতুন রাগিণীর আলাপ শুনতে না পেয়ে, তোতার মত মুখস্থ করেই যাচ্ছে—যুবক যুবতী তাদের আরব্ধ কাজের মাঝে আনন্দের লেশমাত্র অস্তিত্ব দেখতে না পেয়ে, পেটের দায়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাজ চালাচ্ছে। পড়ার অবসরে, কাজের ফাঁকে হঠাৎ যখন তাদের অন্তরের আনন্দ সঙ্গীত বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে রিণ রিণিয়ে বেজে ওঠে, তখন-ই তারা বই ছুঁড়ে ফেলে, কাজের বোঝা ঠেলে রেখে মুক্ত হয়ে ছুটে যেতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। দু'চার জন করেও তাই—কোনদিকে না তাকিয়ে একেবারে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সবাই কিছু তা পারে না—দো-টানার ভিতর পড়ে জীবনের আনন্দকে একেবারে হারিয়ে বসে।

এদের জীবন সার্থক করতে হলে এদের পড়বার ও করবার এমন বিষয় নির্ব্বাচন করতে হবে, যার বোঝা হবে হাল্কা আর যার সঙ্গে মাখা থাকবে তাদের জীবনের আনন্দ।

নীহার যে দো-টানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে, তাতে করে তার মনের কাদা সব তলিয়ে যাবে—আর মাতৃত্বের স্বর্ণ সরোজ শতদল মেলে ফুটে উঠে সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার দেহমন মাতিয়ে দেবে। এমনি একটা পরিবর্ত্তন যতদিন না তার ওপর কাজ করচে, ততদিন সবাই মিলে চেষ্টা করেও তাকে সুখের সন্ধান বলে দিতে পারবে না।

ভাল কথা। তোমাদের গৌরীদেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছেন। আমাদের এখানে নতুন ধরণের একটা বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েচে—আমিই তার সম্পাদক। একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হওয়ায় আমি তোমার বউদিকে লিখি যে, গৌরীদেবী সে কাজ গ্রহণ করবেন কি না! জবাব স্বরূপ গৌরীদেবীর আবেদন এসে হাজির হল। আমরা তাকেই নিয়োগ করলাম। তিনি তার ভাইদের মতের বিরুদ্ধেই এ কাজ গ্রহণ করচেন। এখানে তার থাকবার ব্যবস্থা ইস্কুল হতেই করা হয়েচে,

আর মাইনেও আপাততঃ চল্লিশ টাকা স্থির হয়েচে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি একরকম মন্দ থাকবেন না। কনকের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েচে—তিনিও তার "দিদি"। কাজেই মাঝ থেকে আমিও খানিকটা অপ্রত্যাশিত স্নেহ কুড়িয়ে পাচ্ছি—সে জিনিষটা বড়ই উপভোগ্য।

গৌরীদেবীর এই নতুন জীবনে লক্ষ্য করে দেখবার অনেক কিছুই আমি পেয়েচি। হিন্দু বিধবা গৃহকোণেই অভ্যস্থা—নতুন সমাজে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাজে ব্রতী হয়ে একটা সঙ্কোচে আড়ষ্ট থাকবেন, এইরূপ আশঙ্কাই করেছিলাম; কিন্তু তাঁর সহজ সপ্রতিভ ভাব দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েচি। তাঁর প্রতি যত লোকের যেমন অবিচার এতদিন অবাধে চলে এসেচে, তেমন অনেক ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায় না—অথচ দীর্ঘ দিনের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার তাঁকে জীবনে-মরা করতে পারে নি। হাসিমুখে কর্ত্তব্য কাজ করে প্রাণভরা তৃপ্তিলাভে তুষ্ট হচ্চেন—প্রগলভতা বা কোনরকম আতিশয্য তাঁর কাছেও ঘেঁসতে পারচে না।

হাঁ, আর একটা কথা। তুমি অনেকবার অনুযোগ দিয়েচ যে, কনকের কথা চিঠিতে আমি কিছুই লিখিনি। আমায় কিন্তু মনে হয় তার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তার চাইতে কিছু কম তুমি জান না। একটা কথা শুধু অসঙ্কোচে আমি বলতে পারি যে, পরস্পরকে আশ্রয় করে আমরা দু'টি প্রাণী বেশ আরামেই আছি। আর সে আরামের নেশা আমাদের দু'জনাকে এমনই মশগুল করে রেখেচে যে, একটি দিনের তরেও আমরা পরখ করে দেখতে প্রবৃত্ত হইনি আমাদের স্বাভাবিক অধিকার কোথাও খর্ব্ব হয়েচে কি-না।

বাংলার তরুণীরা সব কনকের মত হলে বাঙালীর দুঃখ ঘুচবে কি-না বলতে পারিনে—তবে কনককে অন্যরকম করে গড়তে চাইলে তার জীবনটাকে যে নষ্ট করে দেওয়া হবে সেটা নিশ্চিত। কেমন আছ লিখো। ইতি।

তোমারই

নরেশ।

সমাপ্ত।

দুর্গোৎসব

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

কোথা হ'তে আজ, নিখিল ভাসাল
এ নব হরষ বরষা !
যৌবন ভরা শ্যামলা প্রকৃতি
সে প্লাবনে যেন বিবশা !
আজি, একি এ মহান্ দৃশ্য,
কার গুণ গাথা গাহে বিশ্ব,
পূর্ণাতটিনী আজি গো কাহার
চরণ পরশ-সরসা !
কাহারে পূজিতে অর্ঘ্য সাজায়ে
পূজারিণী-ধরা বিবশা !
অনলে ওই যে আপনা সঁপিয়া
অগুরু বিলায় সুরভি,
কাহার কণ্ঠে মাল্য হইতে
ঝরিছে গরবী করবী !
আজ, কুসুমে নব সুগন্ধ
মর, ভুবনে একি আনন্দ !
বন্দনা রচে মধুর ছন্দে
ওগো মা ! তোমারি সুকবি
দিকে দিকে আজ নব জাগরণ
ধূপ ধুমে নব সুরভি !
মাগো, শিহরে পুলকে কদম্ব মরি !
স্মরিয়া ও পদ লাবণি !
অশ্রুতে ভাসি' শিরীষ শেফালি
নীরবে চুমিছে অবনী !
একি এ দীপ্তি আকাশে,
তোর, আগমনী বাজে বাতাসে,

কোন্ অপ্সরী খুলিল গো তরী
আজিকে সলিল বিলাসে ?
কি মন্ত্রে আজি জাগিয়া ভারত
চাহিছে ব্যাকুল চাহনি !
নিখিল ভাসাল মাগো, তোরি রাঙা
পদ নখ-কণ-লাবণি !

মায়াবাদ ও অদ্বৈত তত্ত্ব।

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন কর ভাস্কের নারায়ণে আমার সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমার ভ্রান্তি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমি আমার কথার সমর্থন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছি। আর সকলকে সে সুখের ভাগী করিতে হইলে তলাইয়া বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বিচারগৃহের প্রবেশ দ্বারে এক গাদা fallacyতে আমি ঠেকিয়া পড়িলাম। সেগুলি সরাইতে হইবে।

প্রথম, Argumentum ad populum আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির উপর ত দেশের লোক হাড়ে চটিয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের মতটা প্রচলিত শিক্ষার কুফল বলিয়া প্রচার করিয়া দিলে অতি সুলভে যে একটা এক তরফা ডিক্রি নির্ব্বিচারে বা অবিচারে পাওয়া যায় উপেন্দ্রবাবু এ প্রলোভনটা সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তা তিনি যতই সাধনভজনশীল ত্যাগী ও জড়বুদ্ধিবিহীন হউন না কেন। বিচারের শেষে কথাগুলি বলিলে না হয় একটা সার্থকতা পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রথমেই ইহার অবতারণা পাঠকবর্গকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। উপেন্দ্রবাবু ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বভাণ্ডারকে এত শূন্যগর্ভ মনে করিলেন কেন যে বিশেষ কোন অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ না করিলেই আর কিছু গ্রহণ করিবার থাকিত না ? শঙ্করের মায়াবাদ কি সে ভাণ্ডারের শতরত্নের একটী রত্ন নহে ? দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্ব

হইতেই সেই ভাণ্ডারে মায়াবাদের শত প্রতিবাদ সঞ্চিত হইয়া নাই কি? বঙ্গদেশ মায়াবাদ ধার করিয়াছিল। মায়াবাদের জন্মস্থানে ইহার তীব্র প্রতিবাদাত্মকবাদ সকল পাশাপাশি বিবাদ করিতেছে নাকি? সমালোচক মহাশয় কি খবর রাখেন যে দাক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর জল স্পর্শ করে না! যাঁহারা বলিয়াছিলেন "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" তাঁহাদের মাথাও কি ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল? উপেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই বাঙ্গালাতেই সাতদিন বেদান্তের মায়াবাদী ব্যাখ্যা করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া সার্ব্বভৌম যখন বলিলেন,

"তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি॥

ইহার উত্তরে প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।

তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।

তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সংশয়চ্ছেদিবাক্যে চৈতন্যদেব উত্তর দিলেন,

"জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।

মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥"

তারপর আরও আছে—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।

অতএব **কল্পনা** করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥" (চৈঃ চঃ)

আমরাই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা শব্দটাকে বড় করিয়া দিলাম। আশা করি উপেন্দ্রবাবুও বোধ হয় এখন আর সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে তাঁর 'নেতি' শাস্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিলেই তাহা জড়বাদীর ধারণামাত্র হয়, অথবা চৈতন্যদেবও পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রচ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও যে মানুষ শ্রদ্ধাহীন হয় না তার প্রমাণ ত উপেন্দ্রবাবু নিজেই। তবে এ স্ববিরোধ তিনি করিলেন কেন? আমারও বিশ্বাস ও বন্ধুরাও তাই বলিয়া দিলেন যে, তিনি কোন অ-ইংরাজী টোলের অধ্যাপক নন। অথবা অনুমানেরও প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বর্ত্তমান। তিনি বিলাতে আপিল করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজীপড়ো হইলেই যে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়, তিনি নিজেই তাঁর সেকথার প্রতিবাদ!

দ্বিতীয় fallacy এ ই বিলাত আপিল। আমি এ কথা বলিনা, যে আমাদের আলোচনায় স্বমতপোষক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি আমরা ব্যবহার করিব না! কিন্তু এ আপিল তা নয়। ইহা স্বমতের স্বপক্ষি বিলাতীপণ্ডিতের প্রশংসাপত্র। যুক্তি নয়। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর একখানা সার্টিফিকেটের জায়গায় যদি আমি পাঁচখানা নিন্দাপত্র প্রকাশ করি, তাহলে কি তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিবেন? তা যখন নয়, তখন ইহার নাম দিলাম আমি বিলাত আপিল fallacy। এক শ্রেণীর পাঠকের অজ্ঞতাকে আলোচনা বাণিজ্যের মূল ধন করা হয় বলিয়া ইহাকে Argumentum ad ignoratim বলাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে ফল ফলিয়াছে বিপরীত। তিনি স্বমত পোষক বলিয়া মোক্ষমূলের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নজির তাঁহারই বিরুদ্ধ পক্ষ স্থাপন করিতেছে। তৃতীয় fallacy হইয়াছে সুতরাং সোজাসুজি Ignoratio elenchi. আমি "জড়বুদ্ধি" বশতঃ বুঝিতেই পারিলাম না উপেন্দ্রবাবু এ উক্তি উদ্ধার করিলেন কেন? * পণ্ডিত প্রবর মোক্ষমূলের প্রশংসা করিয়াছেন The true Vedanta Philosophy'র বেদান্ত ফিলসফি মাত্রেরই নয়। আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যদেব নিজেকে বেদান্তবাদী বলিয়াও শঙ্কর বেদান্তকে নাস্তিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনটা True vedanta? একটা অবশ্যই false. কোনটা true, তা পণ্ডিতবর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যে বেদান্তে Subject ও object এর সমন্বয় আছে। 'কার্য্যকারণ' এবং 'অহং ইদং' এর একত্ব আছে। সমালোচক মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই যে মোক্ষমূল'র যাহাকে বলেন True Vedanta তাহা তাঁহার মায়াবাদ বিধ্বংসী। এই জন্যই ত বলিয়াছি ignoratio clenchi. মোক্ষমূলর স্তুতি বা করিলেন কার গ্রহণ বা করে কে? সে কালের সেই শীতলাবাহীরও এই ভ্রম ঘটিয়াছিল। শঙ্কর বেদান্তে Subject সৎ object অসৎ। অহং' এর স্থাপনা আছে, ইদং নিরাকৃত। মায়াবাদের ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন কারণও নহেন। একটা হাঁ, একটা 'না'; অথবা দুইটাই না একত্র যোগ করিলে একটা tremendous' শূন্য পাওয়া যাইবে না কি? Synthesis হল উত্তম। সাধে কি শ্রীচৈতন্যমায়াবাদকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়াছেন। তবে সে কথা পরে। আচার্য্য

---

* It (The true Vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous Synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect of the "I" and the "It" উপেন্দ্র বাবুধৃত মোক্ষমূলর বচনের কিয়দংশ।

শঙ্কর আরম্ভও করিয়াছেন **একে** লইয়া শেষও করিয়াছেন **একে**, দুই কোথায় যে Synthesis হইবে? তাঁর উপর Synthesis আরোপ করিতে গেলে তাঁর সেই মোহনীয় বুদ্ধিমত্তার উপর যে একটা tremendous কটাক্ষ করা হয় তাকি উপেন্দ্রবাবু একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই? তবে তিনি নিজে যে একটা সমন্বয় গড়িয়াছেন তাহা কতটা তাঁর নিজেরই মতের সঙ্গে সুসঙ্গত ও যুক্তিসহ তাহা যথাস্থানে বিচার করা যাইবে। চতুর্থ fallacy তাঁর তিনি এক জায়গায় ধমক দিয়া বলিয়াছেন, জগন্মান্য ঋষিদিগের কথা না মানিয়া অবিদ্যার দাস তোমার কথা মানিব? আমি যেন এরূপ ধৃষ্টতার কাজ বাস্তবিকই করিয়াছি। যাহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আমি তাঁহাদের উপরে আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিতেছি এই ভাব শ্রোতৃবর্গের মনে উদ্রেক করিয়া দিতে পারিলে সহজেই যে আমার উপর তাঁর জয়লাভের আশা আছে এই অভিসন্ধি তাঁর "বিদ্যার" ঠ্যালা খাইয়া মনের এক কোণে যাইয়া লুক্কায়িত যে নাই, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না; উপেন্দ্রবাবু মনে রাখিবেন, এ দেশের বামাচারী তান্ত্রিক-গণও উপনিষদের ঋষির দোহাই দিয়াই আপনাদের অনাচরগুলি চালাইয়া দিয়াছিল। উপনিষদ্ ত বেওয়ারিশ মাল। এ দেশের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় সকলে একই শ্লোককে আপনাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বা কু-ব্যাখ্যা করিয়া চিরদিন শ্রুতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের হুবহু দ্বৈতবাদ পক্ষীয় ব্যাখ্যাও বহুদিন হইল চলিয়া আসিতেছে। সকল সম্প্রদায় ইহাকে মহাবাক্যও বলে না ("তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য'—চৈঃ চঃ) মায়াবাদীর ব্যাখ্যাই কি সকলে স্বীকার করে? চৈতন্যদেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন—

> "মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা!
> অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
> প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
> শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
> ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
> স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥ (চৈঃ চঃ)

এখন উপেন্দ্র বাবু বুঝুন, তিনি যে ভাষ্যাঞ্জন স্পর্শে রাহু মুক্ত করিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখার বাক্যচ্ছটা বিস্তার করিয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই ভাষ্যকে সূর্য্যেরও

আবরক মনে করেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন যুক্তি ছাড়িয়া authorityর উপর নির্ভর একান্ত নিরাপদ নহে। তিনি যে "সচ্চিদানন্দ" শব্দের তিন অংশে একার্থ আরোপ করিয়া স্বমত ভেদও নিরসন করতঃ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বৈষ্ণব বেদান্ত কিন্তু সেই স্থানে তিনে এক, একে তিন, রূপ দ্বৈতাদ্বৈত প্রমাণ করেন—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ (চৈঃ চঃ)

সুতরাং উপনিষদ্‌কে স্বমতোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই হইবে, সে ব্যাখা যুক্তিযুক্ত কি না তাহাই প্রধানভাবে দেখিতে হইবে। কেবল যে প্রাচীনেরাই মায়াবাদী ব্যাখ্যা স্বকপোল কল্পিত বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তা নয়। নবীনেরাও এই অপবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ, যাঁহার শ্রৌতশাস্ত্রে প্রবেশ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং যাহার কোন দর্শনটোলের বিশেষ মতামতের বিপক্ষতা বা পক্ষপাতিতা করিবার কোন গরজ বা বালাইও নাই, জুলাই মাসের Modern Reviewতে "Jivatman in the Brahma Sutras" এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন,— "If primality and finality be attirbuted to the Sutras, Sankara's Commentary will, we admit, appear in some places as forced and artificial. But if the Upanishads be accepted as primal and final, we must, in many places, charge Badrayana and Sankara (both ?) with misrepresentations. The Vaishnava Theologians could not accept the absolute monism of the Upanishads and so had to depend upon Badrayana. If he did not suit them they would fall back upon some other resources. সুতরাং বেওয়ারীশ মাল উপনিষদ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যখন এমনি কাড়াকাড়ি (Scramble) তখন প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রুতি বাক্যের ধমক্ আজ কালকার দিনে কতটা সময়োপযোগী তা বলা কঠিন। তবে ধমক্

দিবার যোগ্যতা উপেন্দ্র বাবুর কত এবং আমার প্রতি ধমকটা কিরূপ ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত তা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমালোচনা অতি অপ্রীতিকর কার্য্য, তা যদি আবার কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তির সমালোচনা হয়। প্রাচীন কালের যাহাদের স্মৃতি মানুষ ধরিয়া রাখিয়াছে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ-নাস্তিকতা দলনের জন্য। একদিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্য অন্যদিকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ—এ 'দু'এর সঙ্গে বিবাদে, অদ্বৈত তত্ত্বের উপর যে বিশেষ জোর (Emphasis) দিতে হইয়াছিল, অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই ঝোঁকটাকে ধরিয়া রাখিতে গেলে জগদ্বিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ মুখে চলিতে হয়। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যে আসনে বসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই আসনেই বসাইয়া রাখিলে তাঁহার মধ্য হইতে জীবন বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার কাষ্ঠমূর্ত্তির পূজা করা হইবে। মৃত গ্রহণ করে না, যেমন তেমনই থাকে। না হয় নষ্ট হইয়া যায়। জীবিতই গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। সে নূতন গ্রহণ করিয়া আবেষ্টনের উপযোগী হয় ও দিন দিন বড় হইয়া উঠে। আমরা মধ্যযুগে যাইয়া শঙ্করের পূজা করিব কেন? তাঁর দর্শনের উপর নূতন রং ফলাইয়া যুগোপযোগী করিতে পারি না কি? তাহাতেই উহার প্রাণের পরিচয় পাইব। নতুবা পুরাতন পুতুল কেহ গ্রহণ করিবে না। তবে এ কথাও ঠিক্ এই বিংশ শতাব্দীতেও দশম শতাব্দীর লোক বিচরণ করিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের পরিবর্ত্তনে নূতন তত্ত্বের (Data) আবির্ভাব হয়। তাহা স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে systemএর নাই তাহা মৃত, জীবন্ত মানুষ বেশী দিন তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে Rationalismএর সঙ্গে বিবাদ করিতে যাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এক রকম Agnosticismএর আশ্রয় লইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই Rationalismকেই আত্মরক্ষার বর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাই বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর খৃষ্টান পাদ্রী এখন নাই তা কে সাহস করিয়া বলিবে? মহাত্মা গান্ধী বলেন, শঙ্কর ও চৈতন্য উভয়েরই প্রভাব দেশের উপর অসীম। অথচ একজন আর এক জনকে বলিয়াছেন নাস্তিক। শুষ্ক তান্ত্রিক আচারে দেশ যখন মরুভূমি, ভক্তির বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া দিল, আত্মা তৃপ্ত হইল। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহা চাই; পাইলাম।

অন্য কোনদিকের বিচার উঠিল না—সে দিকে দৃষ্টি এখনও যে পড়ে নাই অবস্থার বিবর্ত্তনে নূতন সমস্যার আবির্ভাবে আমরা যে ঐ-টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দেশের লোক যখন না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, খাইতে পাইবে সে আশাও করিতে পারিতেছে না, তখন মহাত্মা বলিলেন—আমার অনুসরণ কর, খাইতে পাইবে। অমনি সে কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল, কোথায় যাইতেছে ভাবিলও না। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, ও-ডাক কাণেও পৌছিবে না। তখনকার কাজ সে সময়কার জন্যই অক্ষয় হইয়া রহিল। যুগ পরিবর্ত্তনে মানুষের মনে যে আকাজ্ক্ষা আসে, তার যে নূতন অভাব উপস্থিত হয় তদনুসারে প্রয়োজন হইলে ডাকের উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই বদ্‌লাইতে না পারিলে সাড়া চিরদিনই মিলিবে না। বুদ্ধের ডাকে একদিন যে সাড়া মিলিয়াছিল, আজ তা আছে কি? মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে nationalismএর ডাকে য়ুরোপের জাতি সকল মাতিয়া উঠিত আজ তাহাতে ভাটা ধরিয়াছে। তাই বলিয়া এ সকলের কি স্থায়ী মূল্য নাই? আছে যদি ইহাদিগকে নবতর উচ্চতর synthesisএর অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পার। মানুষ তার মতের অনেক উপরে উঠিতে পারে। আমরা আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি বটে কিন্তু আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ যে অপরিশোধ্য, যাহা ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ আর করিব না। মাত্র এই কথা বলিয়া বিচার প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লই যে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও অপেক্ষায় পশ্চাৎ পদ তাহা স্বীকার করি না, অন্ধভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা মনে করি না, অশ্রদ্ধাই মনে করি। তবে যদি ভাষার ধরণে (styleএ) কোন দোষ ঘটিয়া থাকে তবে করযোড়ে পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—মানুষ আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উপেন্দ্র বাবু বিগত ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার একটী অতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ—শঙ্কর ও স্পিনোজা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিচার করিবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সারিয়াছেন। সুতরাং টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে পাঁচটি পূর্ব্ব পক্ষ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে।

(১) অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ যে পরস্পর বিরুদ্ধ সে কথার উত্তর উপেন্দ্র-

বাবুই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নয়, কিন্তু আবরণী বীজশক্তি—তাঁহার এই স্বীকারোক্তি অদ্বৈততত্ত্ব বিনাশ করিতেছে। মায়ার যখন সত্তা আছে, সে সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হইলে স্বগতভেদ আসে, বাহিরে হইলে দ্বৈত হয় ও ব্রহ্মের অসত্ত্বে ব্যাঘাত ঘটায়। এই মাত্র বলিলেন, মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নহে। সে নিশ্বাস শেষ না হইতেই সুর ধরিলেন, উহা 'সৎ' নহে। আবার সে নিশ্বাসও পড়িল না, বলিয়া উঠিলেন, "সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্বার্য্য মায়াশক্তি।" শক্তি শব্দদ্বারা বাচ্যা যখন তখন 'অনির্ব্বাচ্যা'ও 'অসৎ', না হইয়াই যায় না? এমন না হইলে কি দর্শন শাস্ত্র গড়া যায়? একবার বাগ্‌বাজারের সুরষিকেরা তর্ক বিতর্কর পর মীমাংসা করিয়াছিল, "মাছেরা কি গরু না যে জলে আগুন লাগ্‌লে তারা গাছে উঠবে?" উপেন্দ্রবাবু বলেন, অনাদি "মায়ার অন্ত আছে বলিয়া তাহা সৎ নহে। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না।" সমালোচক মহাশয় নিজের যুক্তিটিও তলাইয়া দেখেন নাই। এই যুক্তিটিতে অনাদিকাল হইতে 'অন্ত' না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াকে 'সৎ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং যতদিন না 'অন্ত' হয় ততদিন ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বকে ব্যাহত করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। কোন সময়ে তার 'অন্ত' হইবে—এই উক্তিই প্রমাণ করিতেছে যে মায়া আছে অর্থাৎ 'সৎ'। যা নাই তার সম্বন্ধে সে অনন্ত নয় এই কথা খাটে না। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করিতেছ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয় নশ্বর। চৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন—"জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়।" এ সত্তা ব্যবহারিক বলিতে পারিবে না। কেন না ব্যবহারিক ভাবে সংসারবৃক্ষের 'অন্ত' নাই। লক্ষ লক্ষ অমুক্ত জীবের জন্য মায়াশক্তির কার্য্য অনন্ত কাল চলিবে। তাই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন, "এযোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" কথাটা আরও একটু বিশদ্ করিয়া বলি।—ব্যবহারিক সত্তার 'অন্ত' নাই, মায়ার 'অন্ত' আছে; সুতরাং মায়া ব্যবহারিক সত্তা নহে। মায়া হয় ব্যবহারিক, না হয় পারমার্থিক; কিন্তু মায়া ব্যবহারিক নয়, সুতরাং মায়া পারমার্থিক। ইহাকেই বলে, উল্টা সমঝ্‌লি, রাম! বলি, যার অস্তিত্বই নাই তা লইয়া এত বিব্রত কেন? মুখে যতই বলা হউক না কেন যে এই জগৎব্যাখ্যা কেবল ভ্রান্ত জীবের জন্য, পরমার্থতঃ কিছু নয়। কিন্তু পরমার্থতত্ত্বও ত জীবই জানিতে চায়। তাই, তার জ্ঞানের কাছে যা সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয় তাকে মিথ্যা বলিলে, থাকে

বল পরমার্থ সত্য তার সত্যতার প্রমাণ করিবে কিসের জোরে? তারও দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—সে abstract হয়ে যাবে। সুতরাং জগৎকে একেবারে নাস্তির উপর বসান চলিল না। অথচ একদিক্ রাখ্‌তে গেলে অন্যদিক্ থাকে না। সুতরাং পর পর সৎ ও অসৎ বলিতে বলিতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া চলিতে হইতেছে। এ বিপদ যে উপেন্দ্র বাবুর নিজের তা নয়। আচার্য্য শঙ্করকেই বাধ্য হইয়া মায়া সম্বন্ধে নানাস্থানে নানামত দিতে হইয়াছে। (ক) সৎ কি অসৎ তাহা নিরুপন করা যায় না (মুঃ ভাঃ ১।৪।৩ ; ২।১।১৪) (খ) ইহা নিত্য নিবৃত্তা (নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় ভাষ্য, ৯ম খণ্ড) (গ) সা চ মায়া ন বিদ্যতে (গৌরপাদীয় কারিকার ভাষ্য, ৬।৫৮) এই দুর্দ্দৈবের কারণ যা সকল Dogmatic Philosophyতেই ঘটিয়াছে। জ্ঞানের জন্য ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই চাই। শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই এই দুইকে দুই স্বতন্ত্র কোটিতে স্থাপন করিলেন। এই দুইএর সামঞ্জস্য ছাড়া জ্ঞানতৃপ্ত হয় না। অথচ দুইটীকে দুই প্রকৃতি দিয়া ভাগ করা হইয়াছে—সামঞ্জস্য চলে না। তাই ধর পাকড়। ডেকার্টেরও তাই হইয়াছিল। হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা আসিল, Spinoza এক করিলেন, কিন্তু কত খুঁৎ রহিয়া গেল। প্রচীন Neo-platonistগণ এই ব্যবধান দুর করিবার জন্য Emanationএর পর Emanation বাহির করিলেন, ব্যবধান গেল না। স্ববিরোধের উপর স্ববিরোধই কেবল পুঞ্জীকৃত হইল। আমাদেরও বাসুদেব, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, বাহির হইলেন, কিন্তু ব্যবধান ঘুঁচিয়াছে কি? উপেন্দ্র বাবুও হালে পাণি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বসে পড়ে নাকে কাঁদিয়া দার্শনিক জগতের বালানাং ক্রন্দনং বলম্—বলেছেন, একটা অবোধ্য অনিবার্য্য মায়া না হ'লে কিছু বুঝা যায় না—সমন্বয় হয় না। খুব বুঝাতে এসেছেন কিন্তু! সমন্বয় কিসের? উপেন্দ্র বাবু না এই একটুখানি পূর্ব্বে 'নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি' এই প্রশ্নের সম্ভাবনাতেই হেসে একেবারে কুটপাট্ হয়েছিলেন! তিনি না বলেছেন, এরূপ সম্বন্ধের প্রশ্ন "বন্ধ্যার পুত্রবত্তা" প্রভৃতির ন্যায় হাস্য জনক! তবে কোন্ মুখে বলিলেন 'ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের (ব্যবহারিক?) সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য।" যেন মায়াবাদ ছাড়া জগতে আর দর্শন শাস্ত্র রচিত হয় নাই! কে বলিয়াছিল, আগে ব্রহ্মকে সৎ ও জগৎকে অসৎ বলিয়া আরম্ভ কর এবং পরে তাদের সামঞ্জস্যের জন্য একটা গোঁজামিল

খুঁজিয়া হয়রাণ হও—এ যে স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা! সমন্বয় কি একটা সম্বন্ধ নয়, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন ছাড়া কি সমন্বয় সম্ভব? তবে, যে সম্বন্ধের নামেই হেসে গড়াগড়ি, সেই সম্বন্ধের জন্য এখন এত দৌড়াদৌড়ি কেন? না হইলেই হবে না। এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া উপেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হেসে ছিলেন? কেন না, ইহার মধ্যে স্ববিরোধের একান্ত ভাব! ইহারই নাম দর্শনশাস্ত্র, ইহারই নাম ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের মর্ম্মান্তর্হিতার পরিচয়। পরিচয় আছে কিন্তু আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত দুই বস্তুর মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয়কারী তৃতীয় বস্তুর Tertium quid চাই যাহাকে উভয়ের গুণান্বিত হইতে হইবে, অথচ উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। 'এপার' 'ওপার'এর সমন্বয়কারী সেতুকে উভয় পারব্যাপীই হইতে হয়! সুতরাং মায়া সদসদাত্মিকা কেন তা নিতান্তই অবোধ্য নয়। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বাধা খাড়া করিয়া তাহার যখন নিদর্শন দরকার হইল তখন খৃষ্টীয় শাস্ত্র একাধারে দেবমানবধর্ম্মী পুত্রের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়কারী যে দুইএর অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ তাহা আদিতে স্পষ্ট না হইলেও logical consequence রূপে পরে শ্রেষ্ঠ হইয়াই দাঁড়ায়। তাই, আজ যীশু ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করিয়া সৃষ্টির জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমাদের দেশেও ত ঠিক তাহাই হইল! শঙ্কর শিষ্য সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যাঁহাকে জানিলে সকল ভয় দূর হয় সেই ব্রহ্ম কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত (তৈঃ বাঃ, ২।৬৯—৭২) আর মায়াবাদী পৌরাণিক—তার হাতে মায়া নানারূপে নানা আকারে সকলের উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন, মহাব্রহ্মও তার বাচ্চা। "ছিল হাতি হ'ল তুল কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।" জগৎকে ছাঁটিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিতে গেলে পরিণাম ফল ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না।

(২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? বহু হইতে এককে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা সত্য সত্যই abstract এক। ও বহু আপেক্ষিক সত্য। বহুর ধারণাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে এক শূন্যে পরিণত হয়। উপেন্দ্র বাবু ত আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি কি? তিনি কি 'নেতি নেতি' পথে 'বিষয় জগতের 'সর্ব্ব' নিঃশেষ করিয়া দেখিয়াছেন পরিণামে কি পাওয়া যায়? আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, এ পথে যুগে যুগে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিণাম যাহা হইয়াছে উপেন্দ্র বাবুরও তাহাই হইবে—পূর্ণচন্দ্র মিলিবে না,

মিলিকে অমাবশ্যার অন্ধকার। এত জোর করিয়া বলিতেছি এই জন্য যে অজ্ঞাতসারে 'তিনি প্রতিপক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁরই সায় পাইয়াছি। তিনি বলেন, তত্ত্বতঃ জগতের সত্তা নাই, ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত সর্ব্বব্যাপীসত্তা। জিজ্ঞাস্য এই জগতের যদি সত্তা না থাকে তবে জগৎব্যাপীর সত্তাটা থাকে কি ব্যাপিয়া? 'সর্ব্ব'র যে পথে গতি সর্ব্বব্যাপীকেও সেই পথে মহাপ্রস্থান করিতে হয়, নান্য পন্থা। সর্ব্ব যদি মিথ্যা হয় সর্ব্বব্যাপী সত্য হইবেন কোন লজিক্ অনুসারে। সকল abstract thinking এরই পরিণতি এই, উপেন্দ্রবাবুর একার দোষ নয়। শঙ্করোত্তর মায়াবাদে মায়াবাদের যা logical consequence) 'সচ্চিদানন্দ' শূন্যে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য নাস্তিকতার অপবাদ দিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মায়াবাদের যে নিন্দা তাহা ভিত্তিহীন নহে। "Vision of the one in the many" ইহাতেই একের মূল্য। এই দৃষ্টিই জগৎ আজ সকল বিভাগে খুঁজিতেছে—শূন্যগর্ভ একের দৃষ্টি নহে। বহুকে 'নস্যাৎ' করিলে একের কোন মূল্য থাকে না—এক তখন হয় শূন্য। বহুকে অস্বীকার করিয়া উপেন্দ্রবাবু তাঁর একেকে শূন্যই করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে খাইবার জন্য ভক্ত একটী বাধাকপি দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী একটী একটী পাতা ফেলিয়া দিয়া 'নেতি' মার্গে কপি খুঁজিয়া হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন 'কপি মিলা নেই! মায়াবাদীও সন্ন্যাসী। বাস্তবিক, এই abstraction আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ।

(৩) আমি বলিয়াছি মায়াবাদে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জগতের অস্ত কারণ "আছে কি না, এ প্রশ্ন আমার সঙ্গে বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। যদিও আমার মতই তিনি পুনঃ পুনঃ সমর্থন করিয়াছেন তবুও শেষকালে যে আবার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিভ্রাটের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য irrational? হাঁ কি না বিচার করিতে যাইয়া উপেন্দ্রবাবু নিজেই ত হাঁল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেরূপ হতাশভাবে বলিয়াছেন "সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য" তাহার অর্থ কি এই নহে যে ওটা কিছু বুঝা যায় না তাই দিয়া আর কিছু বুঝাইতে যাওয়াটা কি খুবই Rational? যা নিজে সৎ কি অসৎ তাই বুঝা যায় না সেই Principle দিয়া জগৎ সৎ কি

অসৎ তাহার সত্তা বুঝাইতে যাওয়া কেবল Irrational তাহা নহে, আজগুবীও বটে! তাঁর এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যুক্তি বলে না বুঝাইয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না এমন তত্ত্ব কি আছে? আমি যদি বলি, ব্রহ্ম এক নির্বিশেষ স্বগত-ভেদ-হীন সত্তা হইয়াও এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন ইহাতে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হইল। আমি বলি "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির অসাধ্য কি আছে?" "আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ অন্যের বেলায় ভাত" বলিলে চলিবে কেন? নিজেই অনির্ব্বাচ্য নাম দিয়াছেন তার পর বলছেন অনির্ব্বাচ্য যখন তখন ত অবোধ্য বটেই। Question begging epithetটা একটা যুক্তি নয়! কে বলেছিল অনির্ব্বাচ্য মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে? উপেন্দ্রবাবু বলেন, মানুষের বোধ শক্তি ঐ রকমই করে! জিজ্ঞাসা করি, এই বহুনিন্দিত মানববুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধি ধার মিলে কি যাহা দিয়া দর্শনশাস্ত্র গড়িতে হইবে? মুনি ঋষি হইতে চুণাপুঁঠি আমরা পর্য্যন্ত সকলকেই এই দুর্বৃত্ত বোধশক্তিটার উপরই নির্ভর করিতে হয়। মানববুদ্ধির নিন্দা "যে ডালে বাসা সেই ডাল কাটার" লজিক্। শেষে যদিও তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন অবোধ্য বলিতে চাও আপত্তি নাই কিন্তু কোট বজায় রাখিবার জন্য সমাধান করিলেন অতএব মায়াবাদ irra-tional নয়! কি যুক্তি বলে? "জুতা মেরেছে মেরেছে কিন্তু অপমান ত করে নাই" ইতি ন্যায়াৎ বোধ হয়।

(৫) সাধন ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয়? আমি বলিয়াছি, মানুষ যখন কিছু ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে—তখন কিরূপে বলিবে যে সে ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম জানে সেই ব্রহ্ম এই ত যুক্তি? যখন জানে নাই, জানিবার জন্য প্রয়াস করিতেছে মাত্র—তার এই সাধন ভজন কি প্রমাণ করিতেছে না যে সে ব্রহ্ম নয়? আমার এই মহাপাপের জন্য আমার ঘাড়ে উপনিষদের ঋষিদিগকে চাপাইয়া দিয়া আমাকে নরকে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জান না "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইহা ঋষিবাক্য? অবিদ্যার দাস, তুমি তা জান্‌বে কি করে? ও হরি! আমি কখন বল্লাম ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না? আমি না বলেছি যে ত্যাগ করে সে ব্রহ্ম নয়। উপেনবাবু গড়েছেন এক tremendous ignoratio elenchi. "এখান থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলাগাছে, হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাপ"! মনে, পড়ছে এইরূপ এক বিপত্তির

সম্মুখীন হইয়াই আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"অহোহনুমান কৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্ত্তিকবলীবর্দ্দৈঃ"।

আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম মাঝখানে মায়ার স্বপ্ন, এটা যে আমার স্বকপোল কল্পিত নয় তা উপেন্দ্র বাবু নিজেই নানা শাস্ত্র হতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। যুক্তিও যে কম দিয়েছেন তা নয়। আচার্য্যশঙ্কর ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" এই কঠশ্রুতির ভাষ্যে আরম্ভ করিয়াছেন ব্রহ্ম লইয়াই। কিন্তু সংসার বৃক্ষটা যার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কবিত্ব বর্ণনা আছে তাহা অবিদ্যা বীজ প্রভব। বিদ্যার আবির্ভাবে বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিলাইয়া যায়। পরে যদি শূন্য না থাকে তবে ব্রহ্ম ছাড়া আর কি থাকিবে? লাভ ক্ষতি কার কিছু নয়। মায়াবাদী বলিবেন, জীবের মুক্তি। মুক্তি ত হয় বিদ্যার আবির্ভাবে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে বিদ্যা আসিবে না—পরমাত্মাপি সংসারমায়া ন সংস্পৃশ্যতে। অবিদ্যা দ্বারাও বিদ্যা লাভ হয় না। উপেন্দ্র বাবু বলেন শ্রুতিবাক্যের শ্রবণ মনন কর। পূর্ব্বোক্ত কঠভাষ্যে আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া রাখিয়াছেন, শ্রুতিও ঐ সংসার বৃক্ষের পত্র—শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় বিদ্যোপদেশ পলাশঃ—সুতরাং অবিদ্যার ফল। মায়াবাদের দিক্ হইতে সে পত্র চর্ব্বণে কি ফল হইবে? দাঁড়াইতেছে, যে মুক্ত নয় তার আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রই যে কেবল অবিদ্যার দাস তাহা নহে, উপনিষদের ঋষিরাও সুতরাং অবিদ্যার উপরে নহেন। উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়েই অবিদ্যার অধিকারে। অবিদ্যা অতিক্রম না করিলে অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া জানিবার উপায় নাই। অতিক্রম করিলে ত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-ব্রহ্ম—যেখানে বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ নাই। সেখান হইতেও কোন উপদেশ আসিবে না, সুতরাং যেখানে আছেন সেই-খানেই থাকুন। বুঝিলেন উপেন্দ্র বাবু, a Consistent Mayavad must be speechless!

এখন উপেন্দ্র বাবুর চিন্তার ধারার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করি। একস্থানে বলিয়াছেন সুখদুঃখাদি দেহ ধর্ম্ম অসৎ অমার্জ্জিত বুদ্ধি স্থূলদর্শীরাই দেহ ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিকে সত্য বলিয়া জানে। কিন্তু শেষ করিয়াছেন, "মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কি নিদারুণভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।" মায়াকে অলীক তিনিই বলিয়াছেন, আবার সে জন্য

আক্ষেপও তিনিই করিতেছেন। সুখ দুঃখকে তিনিই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আবার তিনিই তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই abnormal Psychologyওয়ালারা বলেন Mental Dissociations. উপেন্দ্র বাবু কার উপর গোসা করে এ নিদারুণ সত্যটা একেবারে বাইরে নিয়ে এলেন? আশা করি ইহা আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল ভক্ষণ হেতু বদহজমির উদ্গার নহে। আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, পাছে Psychopathology আসিয়া পড়ে। অতদূর যাব না। যদি উপেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ করেন—সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্—তবে আবার পাঠকের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিব। এখন বিদায়।

বিচারক

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে,
খুঁজে সারা হ'তাম না মা,
বাইরে তুমি গেলে।
ধুলো ঝেড়ে মুছিয়ে নিয়ে
জামা কাপড় পরিয়ে দিয়ে,
অমন ক'রে দুধ গিলিয়ে
দিতাম নাক ঠেলে,
আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে।

(২)

তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো-বালির ঘরে,
মালুই, সরা, চিতের পাতা
এনে দিতাম ক'রে।

বিষ্টি ধরে কচুর পাতায়
আন্‌তে দিতাম ভিজে মাথায়,
উঠতে দিতাম গাছের শাখায়
খেলার খাবার তরে,
তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো বালির ঘরে।

(৩)

দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে,
যেতাম না মা আন্‌তে টেনে
কোলের মাঝে নিয়ে।
চুমো খেয়ে হাত বুলায়ে
দিতাম না'ক তোমার গায়ে
দিতাম না ঘুম তোমার কায়ে
ঘুমপাড়ানী দিয়ে,
দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে।

(৪)

তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে
কেঁদে সারা হ'তাম না মা,
তুলসী-তলায় প'ড়ে।
হ'ত নাক মানত করি
সাধাসাধি ওষুধ ধরি
ব'লে দিতাম,—পালাও হরি,
আমি খোকায় ধ'রে,
তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে।

সুখের ঘর গড়া

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

দয়াময়ীর বাজারে পৌঁছিলে ভবানীর পাল্কী নামানো হইল। এইখানে সহযাত্রী বন্ধুদের সহিত মিলিত হইবার কথা কিন্তু এখানে আসিয়া ভবানী শুনিলেন বাজারের লোকেদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছে। দুই চারিজন ইতিমধ্যে মারাও গিয়াছে। এই বাজারের মালিক ভবানীপ্রসাদের খুড়া; একজন কর্ম্মচারী এখানে তোলা (টোল্) আদায় করিবার জন্য মোতায়েন থাকিত। তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভবানী শুনিলেন যে সে ব্যাচারীও ঐ রোগে আক্রান্ত। শুনিয়া ভবানী বড় কাতর হইলেন। বিশ্রাম করা বন্ধ রাখিয়া তাহাকে দেখিতে চলিলেন; বেহারাদের ডাক দিলেন।

সভয়ে বলিল "না হুজুর রোগ বড় খারাপ গিয়ে কাজনি—আপনি বাড়ী যান আমি না হয় খোঁজ নিয়ে যাচ্ছি"। ভবানী বলিলেন তোমার প্রাণের ভয় হয় তুমি থাক আমার কাজে কথায় প্রতিবাদ করনা—"

আর কোন কথা না বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

পূর্ব্বকথানুসারে বিজয় ও পঞ্চু দয়াময়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবানীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া উভয়ে ভাবিল হয় ভবানী চলিয়া গিয়াছে না হয় আসিয়া পৌঁছে নাই। ঘাটের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল এক বাবু পাল্কী চাপিয়া উত্তর মুখে গিয়াছে। সিদ্ধান্ত করিল পায়ের যন্ত্রণা বশতঃ ভবানী বোধ হয় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে আর অপেক্ষা না করিয়া—গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিজয়দের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে পথ সেই পথ দিয়া আরো আধপোয়া আন্দাজ রাস্তা দূরে তর্কসিদ্ধান্তের বাটী। বাড়ীর কাছে আসিয়া বিজয় পঞ্চুকে বলিল—"আমাদের এখানে একটু বসে জিরিয়ে তারপর বাড়ী গেলে হয় না?" পঞ্চু এটিকেট অনুমোদিত মিথ্যা বিনয় বা কৃত্রিম ওজর এ সবের বড় ধার ধারিত না; সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষে বলিল "সেটা আর এত অসম্ভব কি? বেশতো চলুন।" উভয়ে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল। তখন বেলা এগারটা। রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। বিজয় পঞ্চুকে বসাইবার জন্য একটা আসন আনিতে বাড়ীতে ঢুকিল।

বিজয় মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া পঙ্কুর কথা বলিল— মা বলিলেন "তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগে? তা বাইরে বসালি কেন? ঘরে নিয়ে আয় না?" বিজয় বাহিরে গেল। যজ্ঞেশ্বরী ছেলে ও বন্ধুর জন্যে জল খাবার সাজাইতে বসিলেন। কিরণ মাকে সাহায্য করিতে গেল। নলিনী ও তরু কলিকাতা হইতে আনিত দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিয়া গেল। খানিক পরে নলিনী আসিয়া বিজয়কে চুপি চুপি বলিল "পঙ্কু দাদাকে নিয়ে এস বাড়ীর ভিতরে।" পঙ্কু বলিল "মাপ করবেন বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবেন না- যা হয় এখানেই আসুন—মেয়েদের মধ্যে বসে আড়ষ্ট হয়ে চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে জলযোগ করা—মাপ্ করবেন মশাই উৎকণ্ঠার সময় ঘাব্ড়ে যাব—এখানেই আসুন—"। বিজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া নলিনীকে বলিল "তোতে আর তরুতে দুজনের জলখাবার নিয়ে আয় আমরা যাব না "।

তরু নলিনী জলখাবার আনিয়া ধরিয়া দিল। কিন্তু যাকে বলে "যায়গা করে জলখাবার দেওয়া" তা হইল না দেখিয়া বিজয় দুইবোনকে ডাকিয়া বলিলেন "বোকা মেয়েরা এই বুঝি গেরস্থ বিদ্যে শেখা হচ্চে, যায়গা না করে খাবার ধরে দিলি যে? আচ্ছা, বুদ্ধি! যা নলি আসন আন্গে" বলিতে বলিতে বি য় নিজেও ছুটীয়া বাড়ীর ভিতর গেল; তরুকে বলিয়া গেল দাঁড়া হাতে করে; মাটীতে নামাসনি, আসছি—"।

একে অপরিচিত যুবা, তাতে আবার দাদার বন্ধু, তার উপর সেথা তৃতীয় ব্যক্তিও কেহ নাই, দাদার আদেশ যতক্ষণ না সে আসে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; তরু লজ্জায় কাট হইয়া গেল; বেচারী পাথরের মুর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া মুহূর্ত্তকে যুগের মাপে মাপিতে লাগিল। পাথরের মুর্ত্তির একটা রক্ষা, তা লজ্জায় লাল হয় না আর ঘামেনা; তরু কিন্তু লজ্জায় রাঙ্গিতে ও ঘামে ভিজিতে লাগিল। পঙ্কু ব্যাটা ছেলে, সদা সপ্রতিভ; তার উপর বয়স দোষ যাকে বলে রোম্যানটিক্ সে তরুর দিকে সভ্যভাবে তাকাইয়া এক নজর দেখিয়া লইল; দেখিল খাসা সুগঠনা একটি সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু ভারি শঙ্কটেই পাড়িয়াছে ব্যাচারী। পঙ্কু স্বভাবতঃই রহস্য প্রিয়; তরুর এই কঠিন অবস্থার কমিক্ দিকটা তার নজরে পড়িল; শুইয়াছিল উঠিয়া হাসি চাপিয়া বলিল "দাদাতো তোমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলে গেছে দেখছি রাখ তুমি ওইখানে নামিয়ে, আচ্ছা শাস্তিতো বটে!" এমনি ভাবে সম্বোধিত হইয়া তরু চমকাইয়া অনিচ্ছা স্বত্বে একবার পঙ্কুর দিকে চাহিয়া তখনি চোখ ফিরাইয়া লইল; পঙ্কুর সমবেদনার উক্তির ফলে তরু আরও লাল হইয়া উঠিল, আর নাকের ডগা ও চোখের কোল আরো ঘামিয়া উঠিল

সে একবার দাদার পথের দিকে তাকাইল। পর মুহূর্ত্তেই নলিনী একটা আসন আনিয়া সেইখানে পাতিয়া দিল ; নলিনী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ; পঞ্চুকে সে চেনে, এবং পঞ্চুদা বলিয়া ডাকে, তার সম্মুখে তরুকে তদবস্থায় দেখিয়া সেও হাসিয়া বলিল 'কিলো এখনো ধরে দাঁড়িয়ে আছিস্ ?'

পঞ্চু হাসিয়া বলিল—"বা ধরে থাক্‌বে না তো কি ? ছেড়ে দেবে ? তা হলে যে সব পড়ে যাবে রে—"। পাথরের তরু সত্যিই তো পাথরের নয়,—সরস উত্তর শুনিয়া সে ফিক্ করিয়া, হাসিয়া জল খাবার নামাইয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া একেবারে পড়বি তো পড় দিদির ঘাড়ে ! কিরণ চমকাইয়া গিয়া বলিল "কিলো হল কি ? জুজু নাকি ?" "দূর্—যাও—জানিনি" বলিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া বসিল। পঞ্চু বিজয়ের বিলম্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল 'হ্যাঁ নলি তোর দাদা কোথা ?'

ন। দাদা ডাব কাটছে।

প। ও মেয়েটী বিজয় বাবুর বোন্ ? ও কে তো দেখিনি ? নাম কি ?

ন। হ্যাঁ,-ওর নাম তরু-এই তো ছয় সাত মাস হলো ওরা এসেছে। বিজয় মুখ কাটা দুটা ডাব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দেরী হয়ে গেছে বলিয়া পঞ্চুকে ডাব একটা আগাইয়া দিল।

এমন সময় বাহিরে রাস্তার উপর পাল্কী বেহারার শব্দ হইল। নলিনী পাল্কী বেহারার শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল ; কাদের বউ বা বর একটা কিছু আসিতেছে এই সে ভাবিয়া ছিল। তরুকেও একটা জোরে ডাক দিল "তরিদি বউ দেখবি আয়—" তরু বাহিরে দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল। দুই বোনে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বউ দেখিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিল। পঞ্চু বলিল "বোধ হয় ভবানী আসছে—" সম্ভব ভাবিয়া বিজয় বাহিরে গেল। সত্যই ভবানী। পাল্কীর ভিতর হইতে বিজয়কে দেখিয়া ভবানী পাল্কী থামাইয়া নামিয়া পড়িল। দুই ভগ্নীতে বউ বা বরের কোনটার একটাও নয় দেখিয়া, হতাশ হইল। ভাবে বুঝিল দাদারই আর একজন বন্ধু। তরু নলীর হাত ধরিয়া টানিয়া অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেল। নলিনীর কৌতূহল বেশী, সে নবাগতকে চিনিল। জমিদারের ভাইপো তাদের বাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া নলিনী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ সেটা যে একেবারেই অসম্ভব ঘটনা।

নলিনীর বিস্ময় ও সম্ভ্রম পূর্ণ অপলক চাহনি দেখিয়া তরু ভাবিল নবাগত

কেউ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন, সে নলিনীর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল— 'উনি কে নলি ?'

ন। তোর বর তরি দি—!

তরু। যা তুই ভারি অসভ্য—

ন। আচ্ছা না, না, তোর নয় আমার—

তরু। (হাসিয়া) বটে! দাঁড়া দিদিকে কাকীমাকে বলছি—

ন। না ভাই বলিস্‌নি তোকেই দেবো!

তরু। যাঃ তোরা ভারি অসভ্য-পাড়া গেঁয়ে কি না—

ন। (হাসিয়া) সহুরেরা বুঝি জলখাবার দিতে গিয়ে বর যোগাড় করে—

তরু। (সভয়ে) না ভাই তুমি বড় অসভ্য, ছিঃ, দাঁড়াও দিদিকে বল্‌ছি—

ন। না ভাই না ভাই! তা হলে আ-আ-আড়ি—

বিজয় ডাকিল 'নলি' 'তরু'। ডাক শুনিয়া দুই বোনে ছুটিয়া বাহির দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। বৈটকখানার ঘরের কাছে আসিয়া নলিনী বলিল "কেন দাদা ?—" "আর একটা আসন নিয়ে আয়—"। নলিনী চলিয়া গেল।

ভবানীকে বিজয় হাত ধরিয়া বসাইতে গেল।

ভ। ছোঁবেন না আমাকে ?

বি। কেন ?

প। অস্পৃশ্য হলে কি করে হে ?

ভ। কলেরা রুগী ছুঁয়ে আসছি—

উভয়ে। সে কি ? কোথা ?

ভবানী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বিজয় শুনিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। আর জেদ না করিয়া বলিল 'তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ডাবটা খান ?'

ভ। না এখন খাওয়াই উচিত নয়—স্নান করে কাপড় ছেড়ে তবে ওসব—

প। পায়ের ব্যথাটা কেমন ?

ভ। তেমনি; কমেছে একটু—আসি তবে বিজয় বাবু—এখন আলাপ হয়েছে রোজ আস্‌বো।

বি। আমিই যাব; আপনাকে আস্‌তে হবে কেন ?

প। (বিজয়কে) কেন মশাই ? জমিদারের শ্রীচরণ কি হাঁটে না ?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না—না তার জন্যে নয়—"তবে—"

প। তবে কিনা শ্রীচরণ এখন ব্যথা পীড়িত।

তিনজনেই হাসিল। ভবানী বিলম্ব না করিয়া পাল্কীতে গিয়া উঠিবে এমন সময় বিজয় বলিল একটা অনুরোধ আছে রাখবেন ?

ভ। কি শুনি না এত সকাতর নিবেদন কেন ?

বি। দু জনকেই এ অনুরোধ।

প। ব্যাপার তাহলে গুরুতর! কি মশাই ?

বি। কাল মধ্যাহ্নে আপনাদের দুজনের গরীবের বাড়ীতে নেমন্তন্ন; আমার খুড়তুতো বোনের ভাত কাল—

প। বেশতো অতি উত্তম! ব্রাহ্মণ বটু ফলারের নেমন্তন্ন পেলে স্বর্গের লোভ ছাড়তে পারে—

ভ। বেশতো ভালইতো আজ খেতে পারলাম না, কাল এসে খাবো—

এই বলিয়া ভবানী যাত্রা করিল। পঙ্কুও জলখাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে গিয়া বলিল—

বি। মা তোমাকে আর কাকাকে না বলে একটা কাজ করেছি—

মা। কি করেছ ?

বি। জমীদারের ভাইপো ভবানী বাবু আর সিদ্ধান্ত মশাইএর ভাগ্নে পঙ্কু বাবুকে কাল খেতে নেমন্তন্ন করিছি।

মা। তাই ভাল! তা বেশ করেছ এর জন্য আর এত কাতরতা কেন ? তা জমীদারের ছেলে এ বাড়ী আসবে ?

বি। কেন ? তিনি তেমন লোক নন্। ভারি অমায়িক নিরহঙ্কার—

মা। তার জন্যে নয়—

বি। তবে—

মা। পরে সব কথা বলবো এখন নেয়ে খাবি দাবি চল্।

বিজয় স্নানাহার করিয়া মা কাকী ও ভগিনীদের সহিত আলাপ করিতে বসিল কথোপকথনের ছলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিল—"আমি যে আবার ওই জমীদারেরই ভাইপোকে নেমন্তন্ন করলাম ?" কিরণ বলিল—"তিনিওতো জানেন না ব্যাপার সব, বাড়ীতে নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন শুনলে হয়তো আর আসবেন না—"। বিজয়ের মা বলিল,—"না আসবার তো কারণ দেখিনি, এতো বন্ধুতে বন্ধুতে মিতালীর নেমন্তন্ন, সামাজিক নয়!" সদু বলিল।—"তা হলেও সামাজিকের দিনে তো—তবে একটা কথা দিদি শুনিছি ছেলেটী মানুষ নাকি বড় ভাল—জমীদারের ভাইপো, ওই পর্য্যন্ত

কোনো হাঙ্গাম হুর্জ্জুতে নেই, খাসা ছেলে! কতলোক এই দলাদলিতে তাকে জড়াতে চেয়েছে, কিন্তু গাঁয় একটা কিছু গোল বেঁধেছেতো অমনি কলকাতা চলে যায়—"। বিজয় বলিল আমিও এই এক আধ ঘণ্টার আলাপে যা পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয় এ ভদ্রলোকের হাতে যখন জমীদারী পড়বে তখন গাঁয়ের ভাগ্যি বদ্‌লে যাবে—"। সদু চাপা স্বরে বলিল—"যদি পড়ে ।" সকলেই কথা শুনিয়া উৎসুক নেত্রে সদুর মুখের দিকে তাকাইল—সদু বুঝিল এসব কথার উল্লেখ করাটা ভাল হয় নাই। সে আর কোন কথা কহিল না। বিজয় জেদ ধরিল শুনিবে। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন সদু কোন কারণে সে কথার আলোচনা পছন্দ করেনা, কাজেই বুদ্ধি করিয়া কথা ঘুরাইয়া দিলেন। বলিলেন "তুই এসেছিস্ বাবা, একটু যেন ভরসা পেলাম; কাজটায় হাত দিয়ে অবধি আথান্তরে পড়িছি তোমার কাকাতো ভয়েই সারা, গাঁয়ের জমীদার দল যদি তাঁকে এক ঘরে করে—শুনছি বাউনরা নাকি জোট বেঁধেছে খেতে আসবেনা।" বিজয় দমিয়া গিয়া বলিল "তুমিই কেন এ ঝন্‌ঝাট্ বাঁধাতে গেলে মা—"। মা বলিল "ঝন্‌ঝাট আবার কি? আমি আমার দেওরঝির ভাত দিচ্ছি, বাউন খাওয়াচ্ছি কে করে না তা?" বিজয় বলিল—"মেয়েছেলের আবার ভাত কেন?" বলিয়া হাসিয়া খুড়ীর দিকে তাকাইল খুড়ীর মনের ভাব বুঝিতে। খুড়ী বলিল "সত্যি বাবা দিদির সব আলাদা কাণ্ড"। যজ্ঞেশ্বরী কৃত্রিম কোপে বলিলেন "কেন গা ছেলে? মেয়ে ছেলে ছেলে নয় না? তোরাই কুলের প্রদীপ ওরা বুঝি—" বিজয় বলিল "মহাজন মা মহাজন ওই দেখনা দুটী মহাজন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন" বলিয়া নলিনী ও তরুর দিকে সহাস্যে তাকাইল। যজ্ঞেশ্বরী দুই কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইয়া বলিলেন "হোক্! তোর কি? তোরও যখন মহাজন আস্‌বে ঘরে তখন দেখবি মহাজনের মূল্য কত!" মা জ্যাঠাইমার স্নেহসিক্ত আদরে দুই বোন মুখ টিপিয়া হাসিল।

কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজয় বাড়ীর বাহির হইবে এমন সময় পঙ্কু আসিয়া তাহাকে ডাক দিল উভয় বন্ধুতে তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইল। মতলব ছিল ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করা। পথে বিজয়ের মুখে পঙ্কুও সব কথা শুনিয়া বলিল "তাতে কি? গ্রামের ও নিত্যক্রিয়া এতে করে আমাদের বন্ধু সম্মিলনে কোন বাধা নাই"। বিজয় ভরসা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। উভয়ে তখন জমীদার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বরাত্রিতে যজ্ঞেশ্বরীর চিত্ত একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল। একটা সামান্য সাধারণ অথচ বড় সাধের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা যে অকারণে এমন অশান্তির হেতু হইয়া উঠিবে যজ্ঞেশ্বরী তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোথা হইতে তুচ্ছ একটা খুঁৎ ধরিয়া গ্রামের মাতব্বর মুরুব্বীরা যে তাঁর সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে বসিল, এবং কেনই বা বসিল, এর নিগূঢ় মর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরীর মনে ও সহজ সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়িল না। হাজার হউক মেয়ে মানুষ, গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে; তাহাদের পরম বল বাড়ীর পুরুষরা; যজ্ঞেশ্বরী তাঁহার ভীরু দুর্ব্বলহৃদয় দেবরটির নিকট সে সাহায্যের ভরসা করিতে পারিলেন না; তার উপর কথার বলে খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলা সত্ত্বেও খোঁড়ার পা খানাতে পড়ে; যজ্ঞেশ্বরী গ্রামের হালচাল জানিয়া খুবই সাবধানে চলিতেছিলেন তবু এই এক আসন্ন বিভ্রাট! সেদিন অপরাহ্নে তর্কসিদ্ধান্তের নিকট আন্তরিক উৎসাহ ও আশ্বাস পাইয়া তবু কতকটা তাঁর ভরসা জাগিয়াছিল। কেবল একটা কথাই তাহাকে বেঁধা কাঁটার মত অস্বস্তি দিতে লাগিল—সে হইতেছে দেবরের সপরিবারে গৃহত্যাগ কল্পনা। কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া এই নিরুপদ্রব দেবর গো-বেচারাটি গার্হস্থ্য অশান্তিতে পড়িবে এই তার বিষম ভাবনা অথচ কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াও তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও উৎসব বন্ধ করা যায় না। সাত পাঁচ ভাবিয়া এবং রাত পোহাইলে শুভকাজটি নির্ব্বিবাদে যাতে সমাধা হয় ঠাকুরের কাছে এই নিবেদন জানাইয়া যজ্ঞেশ্বরী চোখ বুজিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পরম উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিলেন। সখের অন্নপ্রাশন হইলেও হিন্দুর নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান এমন ভাবে জড়িত যে কোনোনা কোনো ভাবে দেবার্চ্চনা না করিলে কোন সংস্কার ক্রিয়াই বিধিবিহিত হয় না। অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ নামে একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুমাত্রকেই করিতে হয়। এ বাড়ীর কুলপুরোহিত মাণিক চাটুয্যে। এজন্য তাহাকে সময়ে খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক মাণিকরাম যজমান বাড়ীতে যথা সময়ে উপস্থিত হইল না দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বড় ভাবিত হইলেন। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিল; খুকীর মুখে ভাত না দিলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর্ব্ব আরম্ভ হইবে না। ব্রাহ্মণরা আসিবে না বলিয়া ভয় দেখাইলেও দু চার জনও যদি আসে এবং

ফলার ভোজনে বিলম্ব দেখিয়া গোলমাল বাঁধায় এই ভয়ে যজ্ঞেশ্বরী বিজয়কে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা বিজু, বাউন তো এল না, একবার দেখ্না চাটুয্যে মশাইকে—যদি তিনি বাড়ী না থাকেন তবে সিদ্ধান্ত মশাইয়ের কাছে গিয়ে একটা বিহিত করে আয়—"। বিজয় বিলম্ব না করিয়া বরাবর তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ী আগেই গেল; পথে খুড়ার সঙ্গে দেখা হইল; ভোলানাথ শুনিল বিজয় পুরোহিতের সন্ধানে যাইতেছে। সে বলিল—"এইমাত্র মাণিক দা'র সঙ্গে দেখা হল, সে জমীদার বাড়ী কি কাজে গেল; বল্লে ঘণ্টা দুই দেরী হবে—"। বিজয় চটিয়া গিয়া বলিল—"দু ঘণ্টা অপেক্ষা মানুষ করতে পারে? খুকীটার যে পিত্তি বেরিয়ে যাবে? তার পেটে একটু দুধ পড়েনি শুধু মাই খেয়ে আছে—মা কাকীমার যেমন কীর্ত্তি কচি ছেলের ওপর ধর্ম্ম ফলাচ্ছেন্! আমি সিদ্ধান্ত মশাইকে ডেকে আনিগে।" পুরুতকে পুরুতের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গোলমালকে আরো জটীলতর-ভাবে পাকাইয়া তোলার যে সম্ভাবনা বেশী তা ভোলানাথ বুঝিল ও ভাইপোকে বুঝাইল। বিজয় কোন কেয়ার না করিয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ ভাজ ও ভাইপোর এইসব একগুঁয়েপনায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া "যা ইচ্ছে করগে সব" বলিয়া বিরক্তভাবে বাড়ী ফিরিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বিজয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল পাশের কুটারী হইতে একটী কিশোরী কোমলকণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত শিবস্তোত্রধ্বনি শুনিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণের ছন্দ বোধে এবং ললিত কণ্ঠের মাধুর্য্যে বিজয় মোহিত হইয়া স্থিরভাবে শুনিতে লাগিল। হঠাৎ ছন্দ কাটিয়া গেল, সঙ্গে একটা পরিচিত যুবা-পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। শেষোক্ত কণ্ঠস্বর বালিকার উচ্চারণ শুধরাইয়া দিতেছে—"ম—হেশ মীশ—" ইত্যাদি বালিকাও তদনুকরণে হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রায় পুনরুচ্চারণ করিল—।

বিজয় তখন ভরসা পাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—"পঙ্কু বাবু আছেন।" পঙ্কু ও উমা দুজনেই থামিয়া গেল। পঙ্কু বিজয়ের কণ্ঠ চিনিয়া আগাইয়া আসিল—উমা—পালাইতে উদ্যত। পঙ্কু তাহাকে থাম্ যাস্নি বলিয়া নিরস্ত করিয়া বিজয়কে সম্বর্দ্ধনা করিল—"পঙ্কু বাবু নেই কেহ পঙ্কু ভট্চাজ্জি আছেন বটে—তার পর অসময়ে কি মনে করে বন্ধু?" বিজয় ঘরে ঢুকিল। উমা অপরিচিত যুবাকে দেখিয়া পলাইতে উদ্যত পঙ্কু ডাকিয়া বলিল—'যাচ্ছিস্ যে অসভ্য মেয়ে।'

তিরস্কার শুনিয়া সে সভয়ে সলজ্জ চাহনি মাটীতে বদ্ধ করিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় হাসিয়া বলিল—"কি হচ্ছিল? ওই বোন নাকি?

পঞ্চু। মাষ্টারী মশাই মাষ্টারী—সে দিন একটা শিবস্তোত্র শিখিয়ে গেছি আজ তাকে ভুলে পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছে—যিশুভজার স্কুলে পড়ে এই হয়েছে। অপরিচিত যুবাপুরুষের কাছে নিজের অকর্ম্মণ্যতার নিন্দাঘটিত তিরস্কারে উমা যেন নিবিয়া গেল। লজ্জায় তার অলক্তাভ কপোল ও কর্ণমুল লাল হইয়া উঠিল—সে ঘামিতে লাগিল।

বিজয়। কেন মশাই নিন্দে করছেন—যতটুকু আবৃত্তি শুনিছি তা অতি চমৎকার লাগ্‌লো, আমি এমন মধুর কণ্ঠ আর উচ্চারণ শুদ্ধ মেয়েছেলের মুখে শুনিনি—তা সত্য বল্‌ছি।

যে অপরিচিত এমন করিয়া প্রশংসা করে এত অকৃত্রিম আবেগে, তাকে প্রশংসিত ব্যক্তি না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রশংসাকারী যদি অজানা সুদর্শন যুবাপুরুষ হয় আর প্রশংসিত যদি কুমারী কিশোরী হয় তবুও না। উমা তার অচঞ্চল দেহ যষ্টিটাকে স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া শুধু কালো বাঁকা চোখের চঞ্চল তারকা দুটীকে অপাঙ্গে ফিরাইয়া নিমেষের তরে বিজয়কে দেখিয়া লইল। বিজয়ও মুগ্ধনেত্রে তাহাকে সম্ভ্রম সহকারে দেখিতেছিল। উমাকে চল্‌তি মতে সুন্দরী বলা যায় না কেন না তার রং দুধে আল্‌তাও ছিল না, গড়নও অপ্সরা কিন্নরীর মত নিখুঁৎ ছিল না, তবু যা ছিল তাহার উপর নেশার চোখের রং পড়িলে তাকে সুন্দরী না বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। স্নানান্তে সে একটা চেলির কাপড় পরিয়া, কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া, কপালে চন্দনের টিপ পরিয়া ফুলের সাজি হাতে শিব পূজা করিতে যাইতেছিল এমন সময় পঞ্চুর পরীক্ষা! "কেমন শিবস্তোত্র মুখস্থ হয়েছে দেখি!" হাঙ্গাম বটে! ঠিক এই বেশে এই অবস্থায় যখন শুচি দেহ সজ্জাকে লজ্জা দিয়া তাহার ভিতরের গুণপনা স্তোত্র আবৃত্তির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে বিজয় তাহাকে দেখিল। এই রকম একটা শুভলগ্নে কিশোর কিশোরীর দৃষ্টি বিনিময় হইলেই হৃদয় বিনিময় হয়—তা রূপ দু'জনের যেমনি হোক—এই লগ্ন উপস্থিত না হইলেও অপর্য্যাপ্ত দেহ সৌন্দর্য্য বা চিত্ত মাধুর্য্য কোন মতেই দ্রষ্টার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না।

বিজয় বলিল—"ওকে ছেড়ে দেন না?—"

প। না:—একবার আমাদের দুজনের সামনে ও আবৃত্তি করুক তারপর ছুটী—

বি। কেন বিড়ম্বনা আর? না হয় একটু ভুল হ'ল—

প। না মশাই! শিবস্তোত্র ভুল উচ্চারণ হলে ভারি বিপদ—বিশেষ আইবুড়ো মেয়ে—

যুগপৎ বিজয় ও উমার দৃষ্টি পঞ্চুর মুখের উপর পড়িল। পঞ্চু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল—"বিপদ কি জানেন—শিব চট্‌লে ওর শিবের মত বুড়ো বর ঘটিয়ে দিতে পারে—।' বলিয়া পঞ্চু মৃদু হাস্য করিল।

বিজয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"শিব এমন কুকীর্ত্তি করবেন কেন?

প। বলা যায় কি মশাই! ভাং সিদ্ধি খেকো মেজাজ—নিজেই তো ওই কাজ করে বসেছিলেন!

বি। হ্যাঁ, এক উমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল—এ উমার ভাগ্যে—না সে ভয় নেই, দেবতাদের দিন গিয়েছে—"

এর পর কোনো মেয়ের এমনি ভাবে ওইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব? পাথরের মেয়ে হইলেও ছুটিয়া পলায়। গুরুবাক্য অমান্য মান্য বোধাবোধ কিছুতেই থাকে না—

বাড়ীর ভিতর উমাকে সেভাবে ছুটিতে দেখিয়া তাহার মাসী জিজ্ঞাসা করিল—কিলা উমি অমন করে ছুটছিস্ যে?" উমা কতকটা আপনমনে কতকটা উত্তরচ্ছলে বলিল—'দাদা কি দুষ্ট মাসীমা—' বলিয়া দুষ্টামির হেতু বা প্রকার ব্যাখ্যা না করিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিল।

উমার পলায়ন দেখিয়া বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সে ভাব চাপিয়া বলিল—"খাসা মেয়েটীর গলার স্বর আর উচ্চারণ বোধ—"। পঞ্চু সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল—"তারপর কি মনে করে বলুন তো?" বিজয় তাহার আগমন হেতু জানাইল। পঞ্চু শুনিয়া বলিল—"তার আর কি বেশতো চলুন না?" অন্য সময় হইলে পঞ্চু হয়তো ওজর আপত্তি করিয়া ইতস্ততঃ করিত কিন্তু সে দিনের সেই তরুণী দর্শনের মোহ তাহাকে টানিয়া আনিল। পথে আসিতে আসিতে পঞ্চু এ ও তা কত কথাই কহিতে লাগিল। বিজয় মধ্যে মধ্যে স্থানে অস্থানে 'হুঁ' 'হাঁ' 'না' বলিয়া উত্তর সারিয়া দিল। পঞ্চু বন্ধুর আলাপকুণ্ঠার হেতু হয়তো আন্দাজ করিয়াছিল।

পঞ্চুকে লইয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিল এবং মাকে ডাকিয়া বলিল—

"এই নাও মা, এক আনাড়ী পুরুৎঠাকুর এনে হাজির তো করলাম—"। যজ্ঞেশ্বরী বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এইত ঠিকই এনেছিস্—আনাড়ী কেন ? হ্যাঁ বাবা পূজা করতে জাননা ?" পঞ্চু বলিল "জানি বৈকি মা ? তবে চালকলা বাঁধতে এখনো তৈরি হয়ে উঠিনি।" বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তরু ও নলিনীও আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাহারা ভাবিয়াছিল দাদা কাকে না কাকে ধরিয়া আনিয়াছে। পঞ্চুকে দেখিয়া তরু লজ্জাকুণ্ঠিত হইয়া পলাইয়া গেল।

পঞ্চু পূজায় বসিল। যজ্ঞেশ্বরী আয়োজন উপকরণ পুষ্প চন্দন প্রভৃতি সব দেখাইয়া দিয়া তরুকে ডাকিয়া বলিলেন—"তরি এই খানে থাক্ তোরা যা দরকার হয় যোগাড় করে দিবি—তরু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "আমি তো কিছু জানিনি মা—"। মা বলিল "শিখতে হবে না ওসব ? কেবল ফ্যাসন করে চুল বাঁধা আর সুতো পশমের ছান্দ করাই শিখবি ?" সদু বলিল "থাক্‌না দিদি নলি যাগ না!" যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"না ওকেই যেতে হবে, বুড়ো ধেড়ে মেয়ে সব বিবিয়ানাই শিখতে মজবুৎ হবে ?" তরু আর কি করিবে ? মাকে সে চেনে, বিনা বাক্য ব্যয়ে নলির হাতটায় একটা টান দিয়া দুজনে গিয়া ঘরে ঢুকিল। নলিনী পঞ্চুকে দেখিয়াছে, স্বগ্রামবাসীতো বটেই, তাছাড়া এক পাড়ারই বাসিন্দা, শৈশব হইতে তাহাকে দেখিতেছে, তার লজ্জা করিবার কোনো হেতু নাই ; করিলওনা ; সে বেশ সপ্রতিভভাবে কথা কহিতে লাগিল। তরু একটা কাজের অছিলা করিয়া একপাশে সঙ্কুচিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। একেবারে নির্ব্বাক। পঞ্চু পূজায় বসিল। দুই একবার তাহার প্রবল লোভ হইয়াছিল সেদিনের সেই নীরবভাষিনী লজ্জাকুঞ্চিতা কিশোরীটিকে আর একবার দেখে। প্রথম দিন সে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দু একটা রহস্য রঙ্গ করিয়াছিল। আজ আর তাহা পারিল না। বেশ বুঝিল তার একটা ভাবান্তর হইয়াছে। ঠাকুর পূজা করিতে আসিয়া এরূপ ভাবান্তরের পরিচয় দিতে তার বড় লজ্জা বোধ হইল। তবু মানুষের মন, প্রকৃতি প্রবলা ; সে একটা দরকারী দ্রব্যের অছিলা করিয়া দুই বোনকে ডাকিয়া বলিল দুর্ব্বা চন্দন কই নলিনী ? দুই জনেই চাহিল। তরু চোখে চোখ পড়িতেই চোখ নামাইয়া লইল। নলি বলিল—"বা পঞ্চু দা সুমুখেই রয়েছে দেখতে পাওনি ?" দেখিতে পায় নাই বা দেখে নাই একথা যে মিথ্যা তা পঞ্চু জানিত তবু নিজের চোখের দোষ না মানিয়া সে বলিল ও হরি! এই বুঝি দুর্ব্বা এ যে ঘাস! নলিনী বলিল

তরকারিদি তুলেছে আমি জানিনি। তরু ভারি মুস্কিলে পড়িল। দূর্ব্বা ও ঘাস যে একজাতিয় তৃণ নয়,উহাদের মধ্যে একটা ভেদ আছে এ সে জানিত না; জানিবেই বা কি করিয়া? সে নিজের অজ্ঞতা ও অপটুতার আভাষ এমনি করিয়া ওই ব্যক্তিটীর কাছ হইতে পাইয়া ভারি অপ্রস্তুত হইল। নলিনী তার সে অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিয়া নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে বলিল "তুমি থামো পঞ্চুদা আমি এনে দিচ্ছি ভাল দুর্ব্বো।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল; তরুও সেই ওজরে তার সঙ্গে পলাইয়া লজ্জা বাঁচাইবার মতলবে উঠিয়া যেমনি যাইবে অমনি তার অঞ্চলের বাতাসে ঘৃত প্রদীপ নিবিয়া গেল। পঞ্চু লক্ষ্য করিতেছিল সে বলিল "বেশ দীপ নিবিয়ে দিলে?" বিড়ম্বনা আর কাকে বলে? ব্যাচারী যেন কাঁঠালের আঠায় জড়াইয়া গেল। সে দেশালাই লইয়া দীপ জ্বালিতে বসিল। দীপ জ্বালিয়া কম্পিত অঙ্গুলি যোগে সলিতাটা অকারণে উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চু তখন চোখ বুজিয়া ন্যাস করিতেছিল। তরু অপাঙ্গে তাহাকে মুদিত নয়ন দেখিয়া উঠিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নলিনী দুর্ব্বা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "এই নাও দুর্ব্বো কত নেবে পঞ্চু দা।" পঞ্চুদার ধ্যান ভাঙ্গিল চোখ মেলিয়া দেখিল দীপ ধারিণীর নিস্ক্রান্তা, দুর্ব্বাদায়িনী প্রবিষ্টা। কোনো মতে সে পূজা সারিয়া উঠিল। বিগ্রহশিলার অন্তরস্থ চিন্ময়রূপী সর্ব্বজ্ঞ এই দুইটি প্রভাত শিশিরের মত ফুল্ল ও পবিত্র তরুণ হৃদয়ের মধ্যে নিজের অনন্তলীলার প্রথমোন্মেষ দেখিয়া হাসিয়া প্রসন্নচিত্তে পঞ্চুর পূজা লইলেন। তারপর নান্দী মুখের হাঙ্গাম সারিয়া পঞ্চু বাহির হইয়া আসিল। রিক্ত হস্তে তাকে ঘরে ফিরিতে প্রস্তুত দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"ও কি নৈবিদ্য উপকরণ ও সব নিয়ে যাও বাবা—?" পঞ্চু বলিল—"না মা ওতে আমার অধিকার নেই। মাণিক কাকা ও সব নিয়ে যাবেন বা সেখানেই পাঠিয়ে দেবেন। এসব তাঁরই প্রাপ্য।" যজ্ঞেশ্বরী ও সদু তখন প্রণাম করিয়া দক্ষিণা দিতে গেল। পঞ্চু লাফাইয়া সরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও কি করছেন সর্ব্বনাশ! কি মহাপাতক! আপনি মার বয়সী আমি ছেলের মত করছেন কি আপনারা!" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন "সে অন্য সময়, এ সময় তুমি পুরোহিত দেবতার পূজারী তোমার এখন ব্রহ্মার মান।" "না খুড়ীমা ওসব বুঝিনি রেখে দেন শাস্ত্র মাস্ত্র অত বাড়াবাড়ীতে নেই—মহাভারত—!" এই বলিয়া সে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া যজ্ঞেশ্বরীর পায়ের

ধুলা লইয়া ছুটিয়া পালাইবে এমন সময় দেখে মাণিকরাম স্বয়ং উপস্থিত। তার মুখে চোখে ও ঠোঁটের কোনে বিরক্তির আভাষ। মাণিক চাপা ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "পূজো করলে বাবাজী তুমি আর আমি নেবো চালকলা ? তা কি হয় হে—"।

প। তোমার প্রাপ্য তুমি নেবে ; আমি তো এ বাড়ীর পুরুৎ নই, তোমার বিলম্ব দেখে এঁরা ব্যস্ত হন তাই কাজ সেরে দিয়ে গেলাম। বাউনে বাউনের সাহায্য করে না কি ? খুড়োর বুঝি ভয় হয়েছে আমরা যজমান ভাঙ্গালাম ?

মা। ভাঙ্গালেই হেলো বাবাজী! তোমরা হলে কালেজে পড়া পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়ের ভাগ্নে আর আমরা টুলো বাউন! আমাদের কাজকর্ম্মে কি আর যজমানের মন উঠবে ?

পঙ্কু প্রত্যুত্তর না দিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

মাণিক একটু এদিক্ ওদিক তাকাইয়া ভোলানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা হলে ভোলা দা—তবে কি তর্কসিদ্ধান্ত মশাই এবার হতে এ বাড়ীর যজমানি আরম্ভ কল্লেন ?" ভোলার উত্তর দিবার আগেই যজ্ঞেশ্বরী সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"কাকে কি বলছ ঠাকুর ? অতবড় একজন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কি দায় দুঃখে আমার বাড়ী যজমানি করতে আস্‌বেন ? চালকলা কুড়োবার ব্যবসাদার আলাদা ধাতের—।" যজ্ঞেশ্বরীর দেখিয়া শুনিয়া মেজাজ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মাণিক মুখের মত উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—'না মন্দ বিভ্রাট নয়—"।

ভোলানাথ দূরে বসিয়া নূতন হুঁকার জল সংস্কার করিতেছিল—মুখ না ফিরাইয়া বলিল 'জানি এই রকমটা হবে।' যজ্ঞেশ্বরী শুনিয়া বলিলেন "কি হবে জান্‌তে ?" "এই আমার ছান্দ—" বলিয়া একটু চুপ করিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—"জানিইতো, মেয়েমানুষের আন্ বলতে টান্ সয় না—একেতো বাউনরা রেগে আছে একটা অছিলে পেলে হয়—যাগ্ কথায় কাজনি—" বলিয়া সে রান্না বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ভোলানাথ ভোর হইতেই বিমনা হইয়া আছে। পাছে কথা কাটা-কাটিতে কার্য্য বিভ্রাট ঘটে সেই ভয়ে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। মনে মনে কেবল নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, কেন এ নোংরা কাজে হাত দিতে গেলেন। লজ্জাও হইল এ সময় হঠাৎ উষ্ণ মেজাজের পরিচয় দিয়া ফেলিলেন।

ক্রমশঃ

হারা-মণি

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী ?
কে রে ও তুই কে রে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে :–
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?
কোন্ জননীর দুলালরে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছল্ ছল্ কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া সারাখনই
উছ্‌লে যেন পিছল ননী রে !
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে !
বুক জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,—
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দলে এলি পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন থম্‌কে দাঁড়ালি ?
এমন চম্‌কে আমায় চমক লাগালি ?
এই কিরে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির, গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!
এ-সুর যেন বড়ই চেনা, এ-স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয়না মনে রে,—
না চিনেই আজ তোকে চিনি আমারি সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়েছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে !
দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়েনা তার কিছু ?
সেই অবধি যাদু কত শত জনম ধরে
দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' রে

আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে
দেখা দিলি আজ্‌কে ভোরে রে!
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু-খানি রে!
পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের ফাঁদ পেতেছি যে!
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা স্নেহে হঠাৎ জাগালি,
আহা গৃহ-হারা বাছা আমার রে!
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ?
ওরে আজ্‌কে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান তাইকি টাঙালি?
হে মোর স্নেহের কাঙালী!!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রসঙ্গত; কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায়?

রুসিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব? স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর যদি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"

জেলার বলিলেন—"এ কথা বোধ হয় জান যে ছয় মাস অন্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একখানি করিয়া রিপোর্ট যায়। তোমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে মতামত প্রকাশ কর তিনি সেগুলি নোট করিয়া রাখেন, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। চারিদিকে যেরূপ হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ যদি হারে, ত ল্যাঠা চুকিয়া গেল; আর যদি জয়ী হয় ত আনন্দের প্রথম ধাক্কায় তোমাদের ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইংরেজ রাজত্বটা যে কি, তাহা আমি আইরিশ, সুতরাং ভাল করিয়া বুঝি। জেলখানার ভিতর সব সময় পেটের কথা মুখে আনিয়া লাভ নাই।"

ভাবিয়া দেখিলাম, কথাগুলো ত ঠিক। জেলখানাটা ঠিক বক্তৃতা দিবার জায়গা নয়। শত্রুর মুখ হইতেও উপদেশ শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য; সুতরাং জিহ্বাটা সেই সময় হইতে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া ফেলিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জার্ম্মাণী যে কি ভীষণ রকম পাজি তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। আমরাও এক বাক্যে জার্ম্মাণীর পাজিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, মরিবার পর জার্ম্মাণী নিশ্চয় নরকে যাইবে। দেবলোকে ইংরাজের পার্শ্বে স্থান পাইবার তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজচরিত্রে একটা কেমন সঙ্কীর্ণতা আছে—সে কোন জিনিষের নিজের দিক ছাড়া পরের দিক সহজে দেখিতে পায় না। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যে চিরদিনই ইংরেজের আশ্রয়েই থাকিতে চায়, এ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য ইংরেজের প্রাণ একেবারে লালায়িত! ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে আদর্শ শাসনযন্ত্রের খুব কাছাকাছি এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিশ্বাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের শেষ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না! যুদ্ধের সময় ত বেচারা প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিলেন, কয়েদীর খরচ কমাইয়া সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিলেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর নিজের একমাত্র শিশু কন্যাকে বিলাতে রাখিয়া আসিবার জন্য যখন ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন তখন ছুটী আর মিলিল না! আবেদনের পর আবেদনের যখন কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"All governments are bad. I am an anarchist" শেষে চটিয়া গিয়া তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"The gods of Simla

are "incorrigible"। কিছুদিন পূর্ব্বে মণ্টেগু সাহেবের রিফম্ বিলের খসড়ায় যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একেবারে সর্ব্বময় প্রভু করিয়া খাড়া করা হইয়াছিল, তখন ঐ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টই একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তাহাতে কোন দোষ হইবে না। The government of India are sensible people." নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

যাক্—এ দিকে যুদ্ধ ত শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পর আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বৎসর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বৎসর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই না কি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

এ পর্য্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৮ সালে যাহারা সিপাহি বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ার গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে মরিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

ক্রমে জর্ম্মণীর সহিত সন্ধিপত্র-স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডের বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদি ত ছাড়িল না। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর হইতেই দিন গণনা আরম্ভ করা গিয়াছে; দিন গণিতে গণিতে সপ্তাহ, সপ্তাহ গণিতে গণিতে মাস, ক্রমে মাস গণিতে গণিতে বৎসর ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বিড়ালের

ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল না। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে বিজয় উৎসব হইবে সুতরাং মনের কোণে একটু আশাও রহিয়া গেল।

ভারতে যখন বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল তখন মনটা ছট্‌ফট করিতে আরম্ভ করিল—খবর বুঝি এই আসে, এই আসে! শেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খবরও একদিন আসিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদের আফিসে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে সরকার বাহাদুর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে বৎসরে একমাস করিয়া মাফ দিয়াছেন।—ব্যোম ভোলানাথ! এত দিনের আশা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

তখন দেখিলাম যে পোর্ট ব্লেয়ারে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই যদি করিতে হয় ত ভূতের বেগার আর খেটে মরি কেন? চিফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাম যে সমস্ত মাফ লইয়া যখন আমাদের ১৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তখন সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জেলের কাজকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সে আবেদন পত্র যে চিফ কমিশনারের দপ্তরে গিয়া কোথায় ধামা চাপা পড়িয়া গেল তাহার আর কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

এই সময় জেল কমিটি পোর্টব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের আলিপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল সে রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া স্ফূর্ত্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"একটু স্থির হও, দাদারা; এ বাড়ীতে ফলার করতে এসে না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই; আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই দিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ২৬ জন জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ী বাজিতেছে। জেলের বাহির হইয়াই শিখেরা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা গুরুজী কি ফতে।" তাহার পর গান আরম্ভ হইল!—

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেশ গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে—"

(হে পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে তুমি ধন্য!)

আজ আবার চটক দিয়া বাজ শিকার করিবার দিন আসিয়াছে তাই ঐ সঙ্গীতের তালে তালে আমাদের প্রাণও নাচিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম— "হে ভারতের ভাবী গুরু, হে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ, সমুদ্র পার হইতে তোমার দীন ভক্তের প্রণাম গ্রহণ কর।"

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্টব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। Wordsworthএর কবিতা মনে পড়িল—

"What man has made of man."

জাহাজ তিন দিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে আগে ছুটিয়াছে। ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহনা! আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌছিবে!

নাঃ—জাহাজ ত কৈ ডুবিল না! এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলীশ প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলিপুরের জেলের দিকে চলিল।

আবার আলিপুরের জেল—কিন্তু সে চেহারা আর নাই! আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে গেল। আমাদের কাছে যা কিছু জিনিষ পত্র ছিল প্রহরীরা আসিয়া তাহা বুঝিয়া লইল। বড় বিশেষ কিছু ছিলও না। পোর্টব্লেয়ার হইতে আসিবার সময় বইটই সমস্ত নূতন

নূতন ছেলেদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম দেশে ফিরিয়া আর মা সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা হইবে না। চুপ করিয়া শুধু দুটি ভাত খাইব আর পড়িয়া থাকিব।

ঘণ্টা খানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে, আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো, একবার ছেড়ে ত দাও।"

সে রাত্রে হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়ী নাই; তখন সেখান হইতে ফিরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র সে রাত্রে সেইখানেই রহিয়া গেল আর আমি চন্দননগরে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম রাত ১০॥০ টার সময় হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিব।

কিন্তু বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামবাজারে শ্বশুর বাড়ী—ভাবিলাম সেইখানে গিয়া রাতটা কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ। দুই চারিবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দের দেখা দিল। আজ বার বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি! সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত নাই! অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনও দেখাদেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই, বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে, রওনা হইলাম। বার বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই, সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলী দেখিয়া রাস্তায় এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বসিল—কোথা হইতে আসিতেছি কোথায় যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মনে হইল সত্য কথা বলিয়া দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী; তাহা হইলে আর কিছু না হোক, থানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ভাবিলাম আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্য কথা বলিতে গিয়া ত বার বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম। শেষে বলিলাম—"আমি কালীঘাট হইতে আসিতেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" কন্‌ষ্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলি পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উড়ে?" বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"হাঁ"। তখন তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে একটা দীর্ঘ সেলাম দিয়া আবার রওনা হইলাম। সেই রাত্রে রাত একটার সময় গাড়ী চড়িয়া যখন শ্যামনগরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া যখন নিজেদের পাড়ার ঘাটে আসিয়া নামিলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা; রাস্তা-ঘাট একেবারে জনশূন্য; টিম টিম করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জানালায় ধাক্কা মারিয়া ভায়াদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা জানালা খুলিয়া গেল আর ভিতর হইতে হর্ষোদ্বেগ-চঞ্চল একটা সুপরিচিত বামা-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"তুমি কে?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জানালা খুলিয়া মা ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এ-কথা বিশ্বাস করিতে যেন কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। এক পাল ছেলে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আমার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কারা এরা? ইহাদের কাহাকেও যে চিনি না। একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"এই

আপনার ছেলে।" যাহাকে দেড় বৎসরের রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ তের বৎসরের হইয়াছে।

আবার নূতন করিয়া সংসারের খেলা-ঘর পাতিয়া বসিলাম।

ওগো খেয়াপারের কর্ণধার! এবার কোন্ কূলে পাড়ি দিবে?

স্বরাজ

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

প্রাণের মাঝে যে প্রেম জাগে ফুরায় না তা ফুরায় না;
চোখেই শুধু যে প্রেম জ্বালা জুড়ায় না তা জুড়ায় না।
সবার সুখে যে সুখ শোভে শেষ নাই তার মরণেও,
নিজের যে সুখ, অলীকতায় হারায় মেঘের [illegible]রণেও।
সবার লাগি বিলায় যে ধন বিভব যে তার অফুরণ,
নিজের তরে রাখলে পরে অভাব চিরই অপূরণ।
আপন জনেই বাস্‌লে ভালো মৃত্যু আসে অনৃত,
ভুবনকে যে বাসে ভালো প্রিয় যে তার অমৃত।
ছড়িয়ে দে'ভাই, ছড়িয়ে দে'ভাই, নিজের ব'লে রাখিস্‌নে,
কাঙ্গাল হ'য়ে হ'না রাজা,—স্ব—রাজকে আর ডাকিস্‌নে!!

আইরিস জাতি-শিল্পীর একজন

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

"The Nation & The Athenæum" কাগজের যে মাসের সংখ্যায় আয়র্লণ্ডের "টলষ্টয়", কবি ও দেশনেতা জর্জ্জ রাসেলের (George Russell) জীবন-কথা বেরিয়েছে। আইরিশ জাতির জীবনবেদ যে কয়জন বাণীর বরপুত্র মিলে উদ্ধার করেচেন কবি জর্জ্জ রাসেল তার একজন। তিনি (A,E.) এ, ই এই ছদ্ম নামে কবিতা লিখে মরা আয়র্লণ্ডে জীবনের সাড়া ও আইরিশ কাল্‌চারের লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। "He belongs to no party ; he is not a leader of revolt ; he has no political follwing."—"এ, ইর কোন নিজের দল নাই ; তিনি যে কোন, বিশেষ বিপ্লবের নেতা তা নন ; তাঁর পেছনে তাঁর মতে সায় দেবার পঙ্গপালও নেই।" অথচ আজ আয়র্লণ্ডের জাগরণের দিনে এ, ইকে ভক্তি না করে এমন মানুষ ওদেশে নেই বললেই হয়,—"Just because he is so far removed from all extremes, except the extremes of passionate love for his couutry and persistent reasonableness about it ; "মতের ও দলাদলির কচকচি থেকে এমনতর মুক্ত মানুষ বলেই তাঁর ওপর দেশবাসীর এত শ্রদ্ধা, তিনি অসীম দেশপ্রেমের আধার হয়েও বুদ্ধিতে কতই না ধীর, কতই না সাবধানী"।

জর্জ্জ রাসেল বক্তৃতা দিয়ে হট্টগোল বাধাবার ধার বড় একটা ধারেন না, কিন্তু ডাবলিনে মার্কিন ধর্ম্মঘটের সময়ে তাঁর একটি বক্তৃতায়ই দেশ টলে উঠেছিল। রাসেল কবি, চিত্রশিল্পী, ভাবুক অথচ পাকা অর্থনীতিবিৎ ও কাজের মানুষ। আইরিশ জীবনের গভীর সত্য তলিয়ে দেখে তাঁর ছবিতে কবিতায় এই আত্মহারা জাতীর আত্মধন ও আত্মবল খুঁজে পেয়েছেন ও তাঁরই স্পর্শে আয়র্লণ্ড আজ অজেয়। শুধু কি তাই ? কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এই কবি-কর্ম্মী সমস্ত দেশ জুড়ে দুধ মাখম ক্ষীর নবনীর ব্যবসায় (creameries) গড়ে তুলে অন্নহীন চাষার ঘরে শ্রী ফিরিয়েছিলেন, তার ফলে দেশের যে শ্রীবৃদ্ধি, যে শক্তিলাভ ঘটেছিল তা' সমস্তটা বিপ্লব যুগ ধরে পুলিশ ও পল্টন লেলিয়ে ইংরাজরাজ ভেঙে ভেঙেও নিঃশেষ করে উঠতে পারেনি। আপন জীবনে সত্যদর্শন ও কর্ম্মপটুতা এক আধারে অপূর্ব্ব

অনুপমতায় ফুটিয়ে এই অসাধারণ মানুষ দেখিয়েছেন, যে, কবি ও কর্ম্মী একই আধারে কি করে হয়, ইংরাজ সাহিত্যিক John Masefield বলেন মানুষ দুই রকমের আছে, শক্তির মানুষ ও আনন্দের মানুষ "capable of energy and those capable of ecstasy. But to A. E. belongs the joy of both. By energy he has sought to save his country; by ecstasy he continually saves himself" এ, ই নিজে আনন্দ ও শক্তির সমান আধার; তার অন্তরের শক্তিতে তিনি দেশকে মৃত্যুথেকে বাঁচিয়েছেন এবং সেই অন্তরের আনন্দ ধারায় স্নান করে তিনি নিজে অমর।

এ. ইর আকৃতি দেখেই বোঝা যায় তাঁর শক্তি বহুমুখী, সে আধারে যেন সবই সম্ভব। সেই দীর্ঘচ্ছদ দেহ শ্মশ্রু ও কেশে ঢাকা প্রকাণ্ড মাথা, সমস্ত দেহখানির গাম্ভীর্য্য ও সংযম, সে নীল আকর্ণ চক্ষের তেজ ও করুণা, সব কিছু যেন কেবলি এই কথাই বুঝিয়ে দেয়, যে, এ মানুষে অনেক বিপরীত ব্যাপারই কেমন করে যেন সামঞ্জস্য পেয়েছে; এ মানুষ যেন রুদ্রের তেজ ও দেবতার করুণায় গড়া। আয়র্লণ্ডে গত ছয় মাসের ব্রিটিশ অত্যাচারের সম্বন্ধে টাইম্‌স্ কাগজে তাঁর পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে অর্থনীতির কি গভীর জ্ঞান, কত ক্রোধ অথচ কত সহিষ্ণুতা মাখান! যখন ডাবলিন, কর্ক, লিমারিক, গ্যালওয়ে, ট্রলিতে পুলিশ ও পল্টনের পৈশাচিক উৎপীড়নে ইংরাজের মাথাও হেঁট হয়েছিল, তখন এ, ই শান্ত ধৈর্য্যে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাঝে এমন কোন দেব অংশ লুকান আছে যা'তে আঘাত দিলে সে আধারেও দয়া ধর্ম্ম জাগে; মানুষে সেই দেবতা খুঁজে বার করাই হলো আসল কাজ।" সেই পাশব উৎপীড়নের কাল-সন্ধ্যায় যে মানুষ এমন কথা ভাবতে ও বলতে পারে সে আবার বিপ্লববাদী! জর্জ্জ রাসেল আলষ্টারম্যান; কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং আলষ্টারকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখায় তার উত্তরে এই তিনি লেখেন, "তুমি এই দেশের সম্বন্ধে মুর্খ, আর আমার সারা জীবন দিয়ে আমি আলষ্টারকে চিনি, এবং তাই থেকে আমি বলছি তুমি তোমার প্রতিভার এই অপব্যবহারে আয়র্লণ্ডের বিশেষ ক্ষতি করতে প্রয়াস পেয়েছ। পথে মারামারি দেখে যেমন গুণ্ডা পক্ষাপক্ষ বিচার না করে শুধু গুণ্ডামীর উত্তেজনার লোভে একটা যাহোক দলে যোগ দেয়, তোমারও এ ব্যবহার ঠিক সেই রকম। জগত তোমার কথা শোনে, আর, তুমি কিনা জগতের কানে বিষাক্ত অজ্ঞানের বাণী ঢেলে দিলে! ভগবান তোমার হাতে বাণীর হাতের বীণা তুলে দিয়েছিলেন, তুমি সে বীণা চিরদিন শক্তের

পক্ষ হয়ে দুর্ব্বলের অহিতে বাজিয়েছ। তুমি আপন শক্তি দিয়ে তাকেই ব্যথায় জর্জ্জর করেছ, যে জগতে দুঃখী ও দুর্ব্বল কিন্তু ভগবান যার বল ও ভরসা, তুমি আঘাত করেছ করুণা, সত্য, স্থায় ও স্বর্গের বিরুদ্ধে; তাই ভগবানও তাঁর দিব্য দর্শনের জ্যোতি তোমার হৃদয় থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাই তোমার এ কবিতা তুচ্ছ পয়ারে সংবাদপত্রে খেলা কথা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। তোমার কবির আসন ভগবানের আদেশে ঘুচে গেছে।"

এ, ইর প্রকৃতিতে শক্তি ও আনন্দের খেলা যেন ছায়াবাজির মতই ঘুরে ফিরে হয়। Imaginations and Reveries নামে তাঁর নতুন বইখানির ভূমিকায় রাসেল এই কথাই নিজে বলেছেন, "কলা শিল্পের আনন্দে ডুবে থেকেও আমি যেন সুখ পাইনি। কিসে যেন আমায় ভাঙা আইরিস জীবন গড়ে তুলতে জোর করে সেই কাজে টেনে নিয়ে গেছে। যতক্ষণ না আইরিশদের সঙ্গে জুটে আয়র্লণ্ডের জীবন নতুন করে গড়তে কাজে না নেমেছি ততক্ষণ আমার বিবেক জ্ঞান যেন আমায় এই প্রেরণা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রেখেছিল, ক্রমাগত এই পথেই ঠেলেছিল। এই দেশের মাটিতে আমার জন্ম, তাইতে আমায় দেশ প্রেমিক করেছে; কিন্তু যে পরমসত্বা ভগবানের অংশ এই দেহে বর্ত্তমান সে ক্রমাগতই বুকের মাঝে যেন বলেছে, অনন্তের রাজনীতিই তোমার জীবনবেদ, সকল জাতির মানুষ যার সন্তান সেই বিশ্বরাজ তোমার রাজা। কোন একটা আন্দোলন জাগাতে গেলে গোঁড়া না হয়ে উপায় নেই। আমার প্রকৃতিতে শক্তিই গড়েছে কিন্তু জ্ঞান কালাপাহাড় হয়ে যেন ক্রমাগত ভেঙেছে।"

জর্জ্জ রাসেলের এই "Imaginations & Reveries" ১৯১৮ সাল অবধি গত পঁচিশ বৎসরের আইরিশ জীবনের অন্তর ও বাহিরের ইতিহাস। "We are shown once more the material value of those poets, scholars, essayists who began to iufuse a new spirit into their nation about thirty years ago—the men who rescued old history and legend,the founders of the Gaoelic League, the creators of the Irish Drama, the singers of lyrics most beautiful in the world, and the originators of Sinn Fein." এই বইখানি পড়লে চোখের সামনে আবার যেন দেখতে পাই তাঁদেরই, যে কবি ও চিন্তাশীল লেখকেরা ত্রিশ বছর আগে এই মরা আইরিশ জাতির মধ্যে জীবন সঞ্চার কর

ছিলেন, যাঁরা লুপ্ত আইরিশ ইতিহাস ও পুরাণ পুনরুদ্ধারের হেতুই জীবন-ব্রত করেছিলেন, যাঁরা গেলিক লিগের প্রতিষ্ঠাতা ও সিনফিনের মূল।

আইরিশ দেশমাতার অন্তরের মহিমা দেখাতে গিয়ে, রাসেল স্তুতিও করেছেন, আবার দেশের মেকি লেখকদের নিন্দারও ত্রুটী করেন নি। কৃষি-যৌথ কারবারে দেশকে শ্রীবৃদ্ধিতে বড় করেও এ কবিপ্রাণ যেন সুখ পায়নি— "I hate to hear of stagnant societies who think because they have made butter well that they have crowned their parochial generation with a halo of glory." "পূর্ণ জীবনে পঙ্গুর মত এই সব কৃষি সমবায় সমিতি ভাল মাখম তৈয়ারী করেই যখন ভাবে যে গ্রাম্য জীবন তারা যশের আলোয় সার্থক করেছে, তখন আমার মনে ঘৃণার উদয় হয়।" জর্জ্জ রাসেল এ কথা বলতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড়; বিধাতা একটি গাছের মাঝে কত রূপ কত রস কত বর্ণগন্ধের ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বকবির প্রাণ তাই গড়ে যদি সুখ পেত তা'হলে এ বসুধা এমন অনুপম করে তুলতো কে বল দেখি? সেই অমৃতত্বের আস্বাদ বুক ভরে পেয়ে জর্জ্জ রাসেল কর্ম্ম করেও কর্ম্মের অতীত। তাই তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "the end of life is not comfort, but devine being". "জীবনের অর্থ ঐহিক সুখ নয়, ভাগবত সত্ত্বাই জীবন।"

মহানৃত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়]

সতীর মরণে ব্যথিত ভুবন,
স্তম্ভিত মহাকাল,
ম্লান হ'য়ে গেল সুদূর আকাশে
রবির কিরণজাল।
স্পর্শ-সুভগ বাতাস ভরিল
ভৈরব কালানলে,
মূর্চ্ছিত-তনু দিগ্‌বধূগণ
পড়িল সাগর-জলে।

২

লক্ষ্য বিহীন রবি শশি তারা
মরণ-বিষাণ-গানে,
ছুটে উচ্ছল অতল-সলিল
তাণ্ডব সেই তানে;
পাণ্ডুর নভে ছুটে ধূমকেতু—
বজ্রের বিভীষিকা,
ধরণীর গায় কে মাখালে, হায়,
শোণিতের ললাটিকা!

৩

বিদ্যুত-হাসি ধ্বংস-আহবে
ফুটিছে ভীষণ হয়ে,
ত্রিভুবন বুঝি ভেঙ্গে খসে পড়ে
পাতাল-গর্ভে গিয়ে!
বাসুকীর ঘুম ভাঙ্গিল আজি কি,
তাই কি নৃত্য আজ?
টুটিল আজি কি প্রকৃতির চির
শান্ত মধুর সাজ?

৪

গগন পবন ভরিয়া উঠিল
প্রলয়ের 'হাহা'-রবে,
ভূতপ্রেত আর দানব যক্ষ
যোগ দেয় সে আহবে।
বিশ্বভুবন শৃঙ্খলা-হারা,—
কোথা বিষ্ণুর জ্ঞান!—
সতীর মরণে ভেঙ্গেছে আজিকে
মহেশের মহাধ্যান!

৫

তাই বুঝি সেই ধ্যান-প্রশান্ত
দুইটী নয়ন দিয়া
তাপসীর তাপ-গৈরিক-জ্বালা
বেয়ে চলে ফাটি হিয়া?
চারু জটাভার স্রস্ত শিথিল;
কোথায় বাঘের ছাল!
কোথা সে তৃপ্ত দুখের গর্ব্ব
ফণী-বিভূষণ-মাল?

৬

ত্রিশূল-শিখরে চারু সতীদেহ—
মধুমালতীর মালা,
পাষাণ ফাটিয়া ধারা হয়ে ছুটে
মহেশের মহাজ্বালা।
ক্ষেপা নটেশের প্রতিপাদক্ষেপে
সারা ত্রিভুবন কাঁপে,
প্রলয়ের কোলে ডুবিবে সকলি
দক্ষের মহাপাপে!

৭

তাথৈ তাথৈ প্রলয়োঙ্কারে
রুদ্র-বিনাশ-বাণী,

স্বরগ-দুয়ারে স্তব্ধ দেবতা
করে সবে কানাকানি।
শক্তি যে ছিল ধ্যানের আসনে
জীবনের নিঃশ্বাস,—
বিচ্ছেদে তার ব্যর্থ সকলি—
কোথা মিলে আশ্বাস?

৮

ধ্যানের সঙ্গে মিশেছিল কি সে
শান্তি-আশীষ সম?
ভুবনে ভুবনে ছিল কি ভরিয়া
তরুণ স্বপ্ন কম?
নয়নে ছিল কি অমৃত-বর্ত্তি
হৃদয়ের রসায়ন,
শ্মশানচারীর সংসার-দেবী—
দেবতার উপায়ন?

৯

ত্রিলোচন শিব হে মহাজ্ঞান!
ফুরাল শ্মশান-লীলা?
শেষ হল তব দুঃখ-সাধন—
জীবনের প্রেম-খেলা
জীর্ণ গলিত শব দেহ—তবু
বেঁধেছ বুকের মাঝে,
নৃত্য-দোদুল অঙ্গে অঙ্গে
ঘোর উল্লাস রাজে!

১০

প্রেম বিনা বুঝি জ্ঞান নাই, ওগো,
জ্ঞানের অভাবে লয়?
তাই কি জাগালে সতীর মরণে
ধ্বংসের মহাভয়?

একপল যারে ছাড়োনি জীবনে
মরণেও তারে নিয়ে—
উদার বিশ্বে ছুটিয়া চলিলে
ধ্বংসের গান গেয়ে ?

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

যমুনা

হ্যাঁ—ভারী চালাকী, না ?—জগৎশুদ্ধ লোকের বুদ্ধি আছে কেবল আমারই নেই—না ? আমি মোটে হাসি, আর সবাই দেব দেবী, ঋষি মহর্ষি ছাই ভস্ম কত কি ! আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় কারুরই সমিহ করার দরকার নেই, লজ্জা করার দরকার নেই, যা ইচ্ছে বল্লেই হ'ল, যেমন করে ইচ্ছে হুকুম করলেই হল। আর আমি হইছি খেঁকী কুকুর, কাজও নেই অবসরও নেই। কেবল তু করে ডাকলেই ছুটে যাব। 'এঁর খোজ নাও,' 'ঐ কাজটা করবার জন্য হুকুম নিয়ে এস,' 'এই ব্যাপারে যাতে এষ্টেট থেকে টাকা বেরোয় তার জন্য দয়া করে বল'—আমি বুঝি তোমার আর সংসারের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার ? না আমি তা নই।

কেন তা হব ? আমি চিরদিন স্বাধীন, কেন আমি তোমার ছলভরা হুকুম মেনে চলব ? দেখাও যেন কতই পরের হুকুমে চলছ, পরের দরকারে খাটছ, কিন্তু আমি তোমার মুখের কাপড় উঠিয়ে দেখে নিয়েছি—তা তুমি যতই তোমার ফটোই গোপন কর, আর যতই চাপকান চোগা লাগিয়ে আর্দ্দালি সেজে বেড়াও। আমি তোমায় চিনিছি মশায় চিনিছি। ও সব চালাকী আর যার কাছে হয় কর গিয়ে, আমার কাছে ওসব চলবে না।

আমি ত' আর কোনো রকম চশমা চোখে দিয়ে বসে নেই, যে কাছে কিছুই দেখতে পাব না, শুধু দূরের দিকে চেয়ে দূর দেখবার আশায় বসে থাকব—আর নিকটের যা কিছু হাত ফসকে পালিয়ে যাবে ? ও গো মশায় তা হবে না—আমার কাছে তা হবে না। আমি ধর্ম্ম মানিনে, কর্ম্ম মানিনে, শাস্ত্র মানিনে, মন্ত্র মানিনে। আমি শুধু মানি এই আমার বাইরের চোখ

দুটোকে আর আমার অন্তরের চোখকে। এই তিনটেতে যা ধরা পড়বে তাই আমার কাছে সত্য, বাদ বাকি সমস্তই মিথ্যে মায়া ভোজবাজী।

ঐ যে দিদির সন্ন্যাসী ম'শায় আজ কতদিন হতে নাসাগ্র বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, মনে করছেন যে ওঁর ঐ চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে ইদিক-উদিক নড়ছে, এ বুঝি কেউ দেখতে পায়নি! হায় রে বোকা মানুষগুলো! বিশেষতঃ ঐ সব একাগ্র মানুষগুলো! ওরা যতই একাগ্র ওরা ততই যে বোকা—ততই যে স্বচ্ছ, এটা ওরাই সবচেয়ে কম জানে। ঐ যে আমার দিদিটী যিনি মনে করেছিলেন যে পরীক্ষা না করে কাউকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে, স্থান দেবেন না, তিনি যে আজ একাগ্র বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীকেই আশ্রয় করেছেন, এটাই ওঁর চোখে পড়ছে না। এমনি অন্ধ এই সব যোগী মানুষগুলো!

কিন্তু সবারই যোগ ভাঙছে! আমি ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি সবাই বিয়োগের মধ্যে দিয়ে গুণে পৌঁছুচ্ছেন এবং শেষে ভাগে পৌঁছে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিতে পথ পাবেন না, এও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর তুমি—তুমি যে কেঁচে গণ্ডূস্ করতে এসেছ, তুমি মনে করেছ যে বুঝি তোমার অন্তরের সন্ন্যাসীটা বুঝি তোমায় ছেড়েছে—তোমার বৈরাগ্যের ভূত বুঝি তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে? নামেনি মশায় নামেনি—

কিন্তু সেইটেই ত' দুঃখ! কেন সে ভূত ছাড়ছে না তোমায়? কি চাও তুমি? কাকে চাও তুমি? কি মহা সত্য তোমার কাছে এখনো অপ্রকাশিত আছে? ওগো তোমার মনের ঝুলির মধ্যে এখনো কোন মহাভিক্ষা এ সংসার এ জগৎ দেয় নি? যে সত্যের লোভে তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কৃচ্ছ বৈরাগ্য সব ছেড়ে দাসত্বের মিথ্যাকে অবলম্বন করেছ? সে কথা কি বলবে না—কখনো বলবে না, কাউকে বলবে না?

কিন্তু না বললেও ত' আমি ছাড়ব না। আমিও তোমারই চার পাশে ভ্রমরের মত ঘুরব; দেখি তোমার মুদিত মন-পদ্মের গোপন মধুটুকু চুরী করতে পারি কিনা। আমিও ছাড়ব না, এমনি করে আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার মনের দ্বারে আঘাত ক'রব। দেখি সে দুয়ার কতদিন বন্ধ থাকে।

* * *

ব্যথাকে দেখিনে বলে, পিসীমা আমায় বকছিলেন, কিন্তু ব্যথাকে নিয়ে দিদিত' দেখছি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা হলে আর আমার দরকার কি? সংসারের কাজ? সেও ত' বেশ চলছে, কৈ কারুর পাতে কিছু পড়ে নষ্টও হচ্চে নাত'—আর কেউ কিছু পেলেনা বলে কান্নাকাটিও ত' করছে না। যে সত্য-সত্যই কান্নাকাটী করছে, সে যদি তার এই ছাব্বিশ বছরের একটানা দুর্ভিক্ষ দুদিনের জন্যে মেটাবার চেষ্টা করে, তা হলেই এত কথা উঠবে? সংসারের এ কেমন বিচার!

না আমি এতদিন ধরে পেরেছি—আর যদি না পারি? তাতে তোমাদের এত কলরব কেন উঠবে? পাঁচজন কাণাকানি করছে? করুক গে, কবে সে কাণাকানিতে তোমরা কাণ দিয়েছ? তোমরা যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত একটা সংসার গড়ে তুলেছ, এই যে তোমাদের ভারতছাড়া এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ছাড়া বাড়ীটা, এই মনু-যাজ্ঞবল্কের দেশের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছ এর জন্য কার মুখের দিকে তোমরা চেয়েছ? কবে চেয়েছ? কখন না।—তবে এই বাড়ীরই একজন হয়ে আমিই বা কার মুখ চেয়ে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখব?

না—তোমরা যখন কোনো নিয়ম মান নি, তখন আমিই বা মানব কেন? তোমরা যখন একটা ছায়ার পেছনে ছুটছ, তখন আমিই বা ছুটব না কেন?

ছায়া! মিথ্যে! মরীচিকা! হোক মরীচিকা তবু আমি যাব। সেই দিকেই যাব।

মিথ্যে নয় এ সংসারে কোন্‌টা? সারা সংসারই যে মায়ার পেছনে ছুটছে। আমিই কেবল চুপ করে থাকব? এ কেমন বিচার তোমাদের?

মিথ্যে নয় গো ম'শায়রা মিথ্যে নয়। এ যদি মিথ্যে হয় তা হলে গাছে ফুল ফোটাও মিথ্যে, আকাশে চাঁদ ওঠাও মিথ্যে, প্রভাতে সূর্য্য ওঠাও মিথ্যে, জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সবই মিথ্যে।

মনে মনে সবাই জানে—কিছুই মিথ্যে নয়, তবু জোর করে বলবে মিথ্যে—মায়া—ভেল্কি—ভেজিবাজী। এই মিথ্যের ধুয়োটাকে কোন্ মিথ্যেবাদী জগতে এনেছিল? তাকে যদি হাতের গোড়ায় পেতাম তা হলে তার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, এই মিথ্যের আঘাতটা কেমন লাগছে?

* * *

কিন্তু তোমার আবার এ কি নূতন হুজুগ উঠল? তুমিও আবার কাজ-কর্ম্ম ফেলে মাঝে মাঝে ঐ মিথ্যের রাজা সন্ন্যাসীজীটার কাছে ধন্না দিতে আরম্ভ করলে কেন? আমার যে ভয় করছে।

ভয়? হ্যাঁ ভয় বৈ কি। নিজের কাছে গোপন করে দরকার কি? হ্যাঁ আমার ভয় করছে। তুমি অমন করে আজ আমার ঐ বুদ্ধদেবের ছবিখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি দেখছিলে ঐ অপটু হাতের অসম্পূর্ণ শিল্পটার মধ্যে? তোমার ঐ অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো আজ অমন মরার মত আমার দিকে চাইলে কেন? আজ কেন কোনো আদেশ আমি পেলাম না? কেন আজ তোমার কথার মধ্যে তোমাকে পেলাম না! কোন্ দূর বন-বনান্তরে তুমি আজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছ? তোমায় যে আজ কিছুতেই সেখান থেকে তুলে আনতে পারলাম না? কেন পারলাম না? কি আমাতে আজ ছিল না? কোন্ বস্তুর অভাবে আজ তোমায় আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না? কি নেই আমাতে, তুমি যদি অমনি করে মুখ ফেরাও তা হলে সমস্ত জগৎ যে মুখ ফেরাবে—তা হলে কি নিয়ে থাকবো? আমি যে এখন সব হারিয়ে বসে আছি! শুধু একটী আশায় আমি যে সব আশা ত্যাগ করেছি। এখন মুখ ফেরাও—উঃ! না, তা যে ভাবতেও পারি নে!

* * *

আমি ত' আশা করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দিদি যেদিন সব ছেড়ে আশা-কেই আশ্রয় করলে, সেইদিন হ'তে আমি সব ধরে আশাকেই ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুমিই ত আশাকে জাগিয়ে দিয়েছ প্রভু! ওগো আমার না চেয়ে পাওয়া ধন, ওগো আমার অকালের মেঘ, আজ যদি তুমি আবার আকাশে মিলিয়ে যাও, তাহ'লে কি করে বাঁচব? না—না—তা পারব না, আমি তা পারব না। তোমায় ফিরতেই হবে। তুমি যখন এসেছ, যখন এ জীবনাকাশে আপনি এসে উদয় হয়েছ, তখন তুমি আমারই। তোমায় আর আমি গোপন হতে দেব না, কিছুতেই নয়। আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে তোমায় আমার আকাশে বেঁধে রাখব। একবিন্দু জলও যদি ঐ মেঘ হতে না পড়ে যদি ক্রমাগত বিদ্যুৎ আর গর্জ্জনই শুনতে হয়, যদি বজ্রাঘাতও নেমে আসে, তবু এ মেঘ আর মিলুতে পাবে না। এ মেঘকে আমি আমার সমস্ত কেকা দিয়ে সমস্ত কলাপের বিস্তার করে, সমস্ত কদম্ব ফুটিয়ে ধরে রাখবই রাখব।

* * * *

কিন্তু এত যে জোর করে কাল ঐ কথাগুলো লিখিছি এ জোর আমার থাকছে কৈ? মনে হচ্ছে যেন কোন অজানা দিক্ হতে কেমনধারা যেন হাওয়া বইছে। আমার মেঘমালাও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নয়নে যে গভীর ছায়া দেখে এলাম, এ ছায়া কিসের? কার এ ছায়া? এ ছায়া কোথায় ছিল এতদিন?

কি জানি কোথায় ছিল—কিন্তু ছায়া যে জেগে উঠেছে, বাতাস যে লেগেছে আমার মেঘে! কোন্ দিগন্ত হ'তে অজানা আলো এসে আমার মেঘকে রাঙিয়ে তুলছে, দুলিয়ে তুলছে, ফুলিয়ে তুলছে? কিন্তু বর্ষণ হবে কোন্ দিকে, কোন উষর দেশে, কোন মরুপ্রান্তরে? কদম বনের ঘনপাতার ওপরে না শুকনো নদীর বালুর চরে? কোথায় এ মেঘ সরে চল্ল!

মন যে আমার কেঁপে উঠ্ছে—দূরে কি আবার চাতক ডাকছে নাকি? কোথায় গেল আমার কেকা, কোথায় আমার কলাপ! আনো—আনো—সব আন—বাদ্য আন, নৃত্য আন, আন গান, আন ফুল, আন হাসি, আন বাঁশী যা কিছু আছে সব আন—মেঘকে আমার বাঁধতেই হবে। [উপাসনা, ভাদ্র]।

নারায়ণের-নিকষ মণি

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার—শ্রীরাধানাথ কাবাসী প্রণীত—১ম খণ্ড—৯৬০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২।০ টাকা। ইহা দ্বারা বৈষ্ণব জগতের একটী অভাব দূরীকৃত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এরূপ ধরণের পুস্তক আর একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা গ্রন্থকারের এক অভিনব সৃষ্টি। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব গণের ভজন সাধনোপযোগী নিত্য পাঠ্য,নিত্য স্মরনীয় ও নিত্য কীর্ত্তণীয় অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই পুস্তক বটতলা বা অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় ভ্রম পরিপূর্ণ নহে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। তিনি বিপুল পরিশ্রম করিয়া পূজ্যপাদ মহাজনগণের গ্রন্থ সমূহ হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়া একত্রীভূত করিয়াছেন। প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, মনঃশিক্ষা পাষণ্ড দলন, সূচক, পাণ্ডব গীতা, রাসগীতা, জন্মোপবাস ব্রত কথা, রাসপঞ্চা-ধ্যায়ী, বহু সংখ্যক অষ্টক স্তোত্র, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র, দোঁহাবলী, বৈষ্ণবাভিধান ইত্যাদি অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান হিতসাধন মণ্ডলী, খাজুকুড়িয়া, ২৪ পরগণা ও বল্লভ এণ্ড কোং ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আর্ত্ত

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভগবান ভগবান !
আর্ত্ত পীড়িত দুর্ব্বল ভীত—
দুঃস্থরে কর ত্রাণ ;
কণ্টক বনে বঞ্চক মনে
লয়ে যায় বারে বার,
গ্লানি আর গ্লানি ঘরে তুলে আনি
কঙ্কর ভারে ভার ;
বুকে তুঁষ জ্বালি, গায়ে মাখি কালি
চরণে ক্ষতের রেখা,
চরণ চলে না, নয়ন গলে না
একি ভাগ্যের লেখা !
মোহ-মদিরায় প্রাণ যায় যায়
তবুও দীর্ণ প্রাণ,
বুক চিরে চিরে, চিৎকারি ফিরে
জাগায় জীর্ণ জ্ঞান !

ভগবান ভগবান !
পারিনাক আর বহিতে এ ভার
জীবনের অবসান ;
পলে পলে মরি অন্তর ভরি
উঠে মরণের ব্যথা,
কেমনে ভুলিব চরণে দলিব
গত জীবনের কথা ?
কালানল সম মনানল মম
তুলি লেলিহান শিখা,
ললাটে আমার লিখিল হাজার
মসি-কলঙ্ক লিখা ;

কার মুখ চাব সান্ত্বনা পাব
কে এমন গরীয়ান,
পরশে তাহার জীবন আমার
ফিরে পাবে হত মান ?

ভগবান ভগবান !
কোথা পথ আছে শুধু আগে প্যাছে
গর্জ্জিছে অপমান !
আঁধার আঁধার পথ দেখা ভার
স্বন স্বন বহে বায়ু,—
নীরবতা মাঝে বড় বুকে বাজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে স্নায়ু,
প্রতি পায় পায় কঙ্কর ঘায়
রক্তের ধারা ছোটে ;
পায়ের তলায় মাটি সরে যায়,
দুর্ব্বল দেহ লোটে।
আপনার হাতে রজনী ও প্রাতে
হলাহল করি পান
কেবল যাতনা নাহি সান্ত্বনা
গেল—জ্বলে গেল প্রাণ।

ভগবান ভগবান !
আজি চাহি তব দুর্জ্জয় নব
ভৈরব অবদান ;
এস সম্মুখে দাও এই বুকে
তব অস্ত্রের জ্বালা,
তোমার গলার ওই ফণিহার
কার কণ্ঠের মালা,
শেষ করি মোর যন্ত্রণা ঘোর
সারা জীবনের গ্লানি,

তোমার হাতের দিবস রাতের
বেদনারে বড় মানি !
দাও দাও বুকে সব হাসিমুখে
তব বজ্রের দান
চাহি নিষ্ঠুর, এই ভয়াতুর
জীবনের অবসান।
ভগবান,—ভগবান !

জিউজিৎসু

[শ্রীহেম সেন]

অনেকেই জানতে চাচ্চেন "জিউজিৎসুটা" কি? ইহা একটা জাপানী বিদ্যা। আড়াই হাজার বছরের অধিক কাল থেকে জাপানে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়ে আস্‌চে।

জিউজিৎসুর উদ্দেশ্য শরীরকে সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে, আকস্মিক অথবা অন্য রকমের লৌকিক বিপদ আপদে আত্মরক্ষার এমন কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া, যাতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায়ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহারই শক্তি এবং স্বাভাবিক বা ইচ্ছাকৃত অঙ্গসঞ্চালনের এবং শরীরের ভারকেন্দ্রের চ্যুতির উপর অতি সামান্য শক্তি কৌশল প্রয়োগ করিয়া, এমন অবস্থায় লইয়া যাওয়া, যেখানে বা যে অবস্থায়, সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে, কিছু করবার শক্তি তার আদৌ থাক্‌বে না। জিউজিৎসুর অনেক কৌশল এম্‌নি দেখ্‌তে কিছুই নয়, মনে হয় বুঝি একজন নিজে ইচ্ছা করেই অন্যের কাছে ধরা দিয়ে থাকে, এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে, ইচ্ছা করেই নট নড়ন্ চড়ন্ হয়ে থাকে। কিন্তু একবার পরখ করেই বোঝা যাবে যে ঐ অবস্থায় কেহ স্বইচ্ছায় যেতে চায় না; এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে পড়্‌লে কিরকম ভীষণ অকর্ম্মণ্য দশা হয় তাও আর আয়াস করে বুঝ্‌তে হয় না। কখনও একেবারে কোণ ঠাসা অবস্থায় পড়লেও এমনি অদ্ভুত কৌশল অনায়াসে প্রয়োগ করে শক্তিশালী আক্রমণকারীকে এমনই নিঃশক্তি ও অভিভূত করা চলে, যে ফল দেখে বাস্তবিকই নিজেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

কুস্তী সকলে শিখতে পারে না। কুস্তী শিখতে ভাল স্বাস্থ্য এবং যথেষ্ট শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। তা'ছাড়া সকলের পক্ষে, কুস্তীটা উপযোগীও নয়। কুস্তীতে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম হয়। যেখানে সেখানে তা শেখাও যায় না। জিউজিৎস্থতে কখনও গুরুতর পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই, বিশেষ বিশেষ খাদ্য পেয়েরও প্রয়োজন হয় না। জিউজিৎসু কুস্তী নয়।

জিউজিৎসু দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকেরাও অল্পায়াসে শিখতে পারেন। শরীরটাকে জিউজিৎসু শিক্ষার উপযোগী করবার জন্য যে প্রাথমিক ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে তাহা শরীরের পক্ষে মহোপকারী। এই ব্যায়াম প্রণালী সর্ব্বত্র অভ্যাস করা চলে। শিশু হইতে বয়স্ক পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ সবাই ইহা অভ্যাস করিয়া, শরীরকে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিবে। ইহা ভিতরে ভিতরে এমনই একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয় যে কখনও আলস্য জন্মিতে পারে না। আলস্যকে আমরা সাধারণতঃ, একটা স্বভাবদোষ বলে ধরে নিলেও উহা যথার্থতঃ শারীরিক রোগ বিশেষ। ঐ প্রাথমিক ব্যায়াম প্রণালীটার অভ্যাসে শরীরের সকল মাংসপেশী, স্নায়ু এবং সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকল সুস্থ ও সবল হয়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বলে, অর্শ ও অজীর্ণদোষমূলক নানা রোগ এবং সকল রকমের স্নায়বিক বিকারজনিত রোগের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা অভ্যাস আরম্ভ করে কয়েক দিনের মধ্যে শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। এই ব্যায়ামাভ্যাসেও আনন্দ আছে।

আমাদের জাতকে ভিতরে বাহিরে সুস্থ, সবল ও প্রবল করে তুলতে জিউজিৎসুও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আমাদের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, শিশু সকলেরই ইহা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে বা বিদ্যামন্দিরে এই নির্দ্দোষ, আনন্দদায়ক, মহোপকারী, সহজ ব্যায়াম প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

জিউজিৎসু অভ্যাস করতে কোন যন্ত্রপাতি বা উপকরণের আবশ্যক হয় না কিন্তু শরীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের দরকার হয়।

জাপানে স্কুল সমূহে প্রত্যেক বালক বালিকাকে জিউ জিৎসু শেখান হয়। জাপানে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেককে জিউ-জিৎসু শিখতে হয়। বর্ত্তমান জাপান-সম্রাট যখন যুবরাজ, তখন তাঁকেও সাধারণ ব্যায়ামাগারে জিউ জিৎসু শিখতে হয়েছিল। মোটের উপর, জাপানীদের মত এমন সুস্থ আর কোন্ জাত? আর কোন্ জাতের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বিকার জনিত রোগ এত বিরল?

ইহার মূল কারণ জিউ জিৎস্থ শিক্ষা। (Jiu-Jitsu) জিউ-জিৎস্থ ভাল করে শিখ্‌তে অন্ততঃ চারি বৎসর সময় লাগে। তবে অল্পকালের মধ্যেই (যেমন তিন চারি মাসে) বাছিয়া বাছিয়া অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি তত্ত্ব শিখাইয়া দেওয়া যায় যাহাতে নিয়মিত অভ্যাসে যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে।

শুধু হাতের ভিন্ন আর দুই রকম জিউ-জিৎস্থ আছে, সচরাচর সেগুলির কোন প্রয়োজন হইবে না।

শুধু হাতেরটাই শ্রেষ্ঠ। জিউ-জিৎস্থ এমনই অদ্ভুত একটি বিদ্যা যে ইহার সম্বন্ধে সকল কথা পত্রে লেখা অসম্ভব!

অমর্কের বিদায়।

[শ্রীঅমর্ক]

দৈত্যপতি আমায় দিয়ে
　　চলবেনা এ পাঠশালা।
থাকলো পড়ে’ বেত্র রজ্জু
　　থাকলো তোমার আটচালা।
　খালি পড়ে’ থাকবে কেন!
　সমারোহে এবার যেন
খুলে দিও তায় শিশুপাল-
　　বধ নাটকের নাটশালা।
যে নাম শুনে শ্রবণ রুধে
　　দারুণ ক্রোধে কাঁপতে থাকো
সে মধুর নাম গলা টিপে
　　বন্ধ করতে পারব নাকো।
　কেবল আপন তোষামোদী
　শুনতে এত ব্যাকুল যদি
দেশের যত ভাট জুটিয়ে
　　না হয় খোলো ভাটশালা॥

অহংকারে মত্ত তুমি
ভাবছ নিজে অমর বুঝি,
বিশ্বে তারই নেইক মরণ
এক হরিনাম যাহার পুঁজি।
রুদ্রদেবের প্রখর নখর
ছিঁড়বে ভোগায়তন জঠর
সুরকি হয়ে উড়বে তোমার
বালাখানা আট-তালা।

শিল্প ও স্বদেশী *

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

স্বদেশী যুগে স্বদেশীয় শিল্পের মর্য্যাদা ও শিল্পের আদর্শ আমরা ঠিক বুঝি নাই স্বদেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ প্রকৃত দেশের অন্তরাত্মা সচেতন হয়েছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে দেশে শিল্পীও গড়ে উঠছে। তাই বড় আশা হয়, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মোহ নিদ্রা সত্য সত্যই টুটেছে, আমরা আবার লুপ্ত রত্নের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছি। আমাদের হৃদয় এবার যথার্থ পথের সন্ধান পেয়েছে, তাই আর সেদিনকার সে অগ্নিময়ী জ্বালা নেই, তৎপরিবর্ত্তে আছে শান্ত, সুদৃঢ়, নির্ভীক কর্ত্তব্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ! যদি আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা পৃথিবীবক্ষঃ হ'তে অপসারিত হয়, তাহলে ঐ প্রজ্জ্বলিত আলোকস্তম্ভই মনে হয় পুনরায় নবীন সভ্যতার পথ প্রদর্শক হবে।

দীর্ঘ শতাব্দীর অবহেলায় আমরা যা হারিয়েছি তা কেবল ভারতের শিল্পই

---

* কুমার স্বামীর Art & Swadeshi শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত। লেখক।

নয়, ভারতের শিল্পী পর্য্যন্ত ইহাই আমাদের Double loss both physical and spiritual (Havell)। যে ভারত শতবর্ষ পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল, আজ সেই ভারত হতশ্রী। ভারতের শিল্প অবহেলায় নষ্ট প্রায় হয়েছে। প্রধাণতঃ আমাদেরই আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে আমাদেরই মোহাবিষ্টতার ফলে। সস্তা বলে ভারতীয় জিনিষ বাজারে চালাবার চেষ্টা ভারতবর্ষ কোনদিন করেনি। ভারতের মস্‌লিন, ভারতের সামগ্রী যেদিন রোমে যেত সেদিন তার আদর ছিল সৌন্দর্য্যেরই জন্য, সস্তা বলে নয়। মুসলমান দিগ্বিজয়ী বীরগণ ভারত লুণ্ঠন করে ভারতের শিল্পই নিয়ে যায়নি, ভারতের শিল্পীও স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিল। সস্তার (cheapness) পরিবর্ত্তে সুন্দর বলে (Beautiful) সব সামগ্রী দেওয়া নেওয়ার করার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে হবে। সস্তাই কোন দ্রব্যের একমাত্র গুণ নয়! আমাদের মনে রাখতে হবে Industry without art is Brutality,—প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কোন ভারতবাসী একথা যেন কোনদিন না ভুলে যায়। সুন্দর কি? চক্‌চকে যা, ক্ষণভঙ্গুর যা, তা সুন্দর নয়—সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নেই যার, সেই ওরূপ সৌন্দর্য্যে ভোলে—কাঁচের বাসনের কারুকার্য্য খাগড়াই বাসনের কারুকার্য্যের সমতুল্য হয় না। যার প্রকৃত সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অভাব সে আবার ফ্যাসান্" বলে যা তা অনুকরণ করে, এখানে বিচার বুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব ; বিলাতী অথবা তাহার অনুকরণে দেশী 'এসেন্স' উচ্চমূল্যে ব্যবহার করা চলে, অথচ আতর ব্যবহার করা চলে না! সুন্দর কি? দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারোপযোগী, হিতকারী এবং যা আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃত খাপ খায়, তাই সুন্দর। মূল্যের তারতম্য কোন দ্রব্যের একমাত্র দোষগুণের পরিচায়ক নয়। স্বদেশীয় শিল্পোন্নতি স্বদেশবাসীর পূর্ণসহানুভূতি ও যত্নে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। যাঁরা স্বদেশীর শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে 'সস্তা হওয়া চাই বলে এখনও ওজর আপত্তি তোলেন ও ক্ষমতার অভাবে শিল্পের উন্নতি করতে পারেন না বলেন, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য তাঁরা ক্ষমতা অর্জ্জনের কতটুকু চেষ্টা করেন আর কেনই বা কলেজী পড়া ও কেরানীবৃত্তি করবার মোহ ছাড়তে পারেন না?

শত বর্ষ আমরা কেবল স্বদেশী বর্জ্জন ও বিদেশী গ্রহণের মন্ত্রে যে দীক্ষা গ্রহণ করেছি সে বিষবৃক্ষের বিষফল একেবারে ত্যাগ করতে পারব কেন? মানুষ চোখ মেলে আজ যে কাজ করে বসে, কাল চোখ বুজে তা ভোলবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, কর্ম্মফল একদিন না একদিন পূর্ণ হয়ে দুঃখের মহা-

জনের মত তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুজে নেবে! আমরাও উনবিংশ শতাব্দীর মোহভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের ব্রত গ্রহণ করে ছিলাম—কিন্তু সহসা স্বদেশী ব্রতের মর্ম্ম দেশবাসী উপলব্ধি করতে না পারায় (অথবা দেশের sentimentalism টুকু চতুর ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে ভাঙিয়ে নেবার ফলে)। "স্বদেশী" নাম নিয়ে এলুমিনিয়মের বাসন' থেকে মিলের কাপড় পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রস্তুত করতে যত "লিমিটেড কোম্পানী' হয়েছে ততই তার সেয়ার কিন্‌তে দেশের লোক সঞ্চিত অর্থ অকাতরে ঢেলে দিয়েছে—ঐ বিদেশীরই মত ফ্যাক্টরী করে, দেশের দরিদ্রকে ক্রীতদাস wage-slavs করে প্রচুর ডিভিডেণ্ট লাভ করবার উদ্দেশ্যই তার মূল প্রেরণা ছিল এবং এখনও যে নাই একথা বলা চলে না। এর নাম যদি 'স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ' হয় আর নির্ব্বিচারে 'বিদেশী সভ্যতা' গ্রহণ যদি 'বিদেশী বর্জ্জন' হয়, তবে আমাদের Boycott এর আন্দোলন যথার্থই হাস্যকর এবং সে "স্বদেশীর" দীক্ষা গ্রহণ বিফল হয়েছে। এলুমিনিয়মের ব্যবসায়ীর উচ্চ ডিভিডেণ্ট লাভ দেখে আর স্বদেশী মিলের উন্নতি দেখে যদি স্বদেশীর উন্নতি বুঝতে হয়, তাহ'লে সে উন্নতিতে আমাদের হৃদয় আরও হীন হয়ে পড়েছে এবং সেই ভাবে স্বদেশীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং সেই জন্যই মনে হয়, যে কারণেই হ'ক দেশের যতগুলি যৌথ কারবার ফেল্ হয়েছে সেগুলি দেশের মাটীতে কোনমতে টিকে থাকৃতে না পারাতেই বিনষ্ট হয়েছে—তাহাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের জনসাধারণ দরিদ্র ও মৃতকল্প হলেও ইউরোপীয় ফ্যাক্টরীর অনুকরণে আজও ক্রীতদাস হয়ে ওঠেনি। তারা মানুষ, মানুষের ডাকে আবার সাড়া দিয়েছে, চাবুকের শাসন তারা গ্রাহ্য করেনি।

আমরা তো কোন দিন বৃহৎ ভাবে চেষ্টা করিনি স্বদেশের তাঁতির উন্নতি কেমন করে হয়, কাঁসার বাসন ব্যবসায়ীর জাত-ব্যবসায় কেমন করে রক্ষা হয়; নির্ব্বিচারে 'বিদেশী গ্রহণের' ফলে আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে, তাই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও হারিয়ে বসেছি—দেশে আর শিশুর খাদ্য গোদুগ্ধ মেলে না, শিশিভরা 'মেলিনস্ ফুড্' উচ্চমূল্যে কিন্‌তে হয়; উচ্চমূল্যে বসন-ভূষণ সবই কিন্‌তে হয়—নইলে 'ভদ্রস্থতা' রক্ষা হয় না। প্রতিকারের প্রশ্ন উঠ্‌লে তাঁরা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন আর প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের কথায় তাঁরা উপহাস করেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে এমন কি 'নির্ব্বিচারে'

স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ভাল নয় অর্থাৎ আমাদের যেটুকু গ্রহণ ও বর্জ্জনের ক্ষমতা সেইটুকু বিচার করে নিতে হবে। নির্ব্বিচারে 'স্বদেশী স্বদেশী' করে একটা উন্মাদনায় মেতে স্বদেশীর উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে। 'মিলের' পরিবর্ত্তে চরকা ও তাঁত যদি গত পনর বৎসর ধরে চল্‌ত, আমাদের বস্ত্রাভাব নিশ্চয়ই ঘুচত। আমাদের বস্ত্রাভাবই পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে এমন নয়, আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে; তাই আজ যাঁরা বক্তৃতার তোড়ে মুখে বলেন, "বিলিতী কাপড় পরা অপেক্ষা উলঙ্গ থাকা ভাল" তার উত্তরে তাঁদের স্বয়ং সে ত্যাগের আদর্শটুকু প্রদর্শন করতে বলি না, আমার এই আক্ষেপ হয় "দেশের সে মনের জোর আজ কোথায়?"

স্বদেশীর জোয়ার-ভাটা আমাদের জীবন-নদীতে এমন বার বার আসবে; কিন্তু এবার এ ভাবের জোয়ারে তর্ক করে বিচার করে নৌকা ভাসাতে হবে। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌লেও নিস্তার নেই কর্ম্ম করতে হবে; কিন্তু তার পূর্ব্বে পথের সন্ধান সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

অতএব আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করতে হবে। "No lovely things can be produced in conditions that are themselves unlovely." আমাদের বর্ত্তমান সব নগর Birmingham কি Parisএর suburb বলে নাকি অনেকের ধারণা হয়; সুতরাং এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে যাহাতে বারাণসী অথবা যে কোন পবিত্র হিন্দু নগরীর আদর্শে পুনরায় ভারতীয় নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না হ'তে একটী ডেপুটেশন ভারতবর্ষে এসেছিল—তারা চায় শিক্ষিত ভারতবর্ষকে সে দেশে নিয়ে যেতে; সেই ডাক পেয়ে শত শত ইংরাজ শিক্ষিত যুবক স্বদেশ ছেড়ে সে দেশে যাবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আবেদন করেছেন। তাতে East and Westএর মিলন হয়েছে বলে যাঁরা উৎফুল্ল হতে চান, তাঁদের 'কবির স্বপ্ন' ভাঙ্‌তে আমি ইচ্ছুক নই। আমাদের একটা আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব এতে প্রকাশ হয়ে পড়ছে নাকি? কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের মধ্যে নূতন নূতন Settlement গড়বার ডাক পড়লে আমরা প্রকৃত পথের সন্ধান পাব। যে ভুলে বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তার শিল্প-বাণিজ্য হারিয়েছে, ভারতবর্ষের শিল্পী তার সাধনা, অধ্যবসায় ভুলেছে, সেই ভুল আবার বিংশ শতাব্দীতেও আমরা করব কি? আমরা স্বহস্তে পূর্ব্বপুরুষদের সযত্নে রোপিত বিষবৃক্ষের

ফল পেড়ে সেই বীজ কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পুনরায় রোপণ করে যাব? অতীত ভারতকে আদর্শ করে তার জ্ঞানবিকাশের ঐশ্বর্য্য যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েও আমরা আজ হারিয়ে বসে আছি, তাই পুনরুদ্ধার করবার উপায় ভবিষ্যৎ ভারতকে আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে যেতে হবে। জগৎকে নিমন্ত্রণ করবে ভবিষ্যৎ ভারত; বর্ত্তমান ভারত একমুঠা অন্নের কাঙাল, একখণ্ড বস্ত্রের অভাবে লজ্জাহীনা—অতিথি সৎকার ভারত করতে জানে কি না, হৃদয়বান অতিথি বদ্ধদ্বার দেখেই আশা করি বুঝতে পারবেন। 'ভুখা ভারতের' বিশ্বের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা প্রলাপ মাত্র; যদি তা অস্বীকার কর, বল, 'বিশ্বকে দেবার ভারতের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে,' তা হ'লে স্পষ্ট করে বল কি আছে? বিশ্বের বিরুদ্ধে ভারত আজ বিদ্রোহ করবে, এক লাঞ্ছিত প্রাচীন জাতি কেন তার সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যার লব্ধ 'মৃত সঞ্জীবনী' জগৎকে ঘরে ডেকে এনে অতিথি 'সৎকার' বলে বিলিয়ে দেবে? কোন্ অধিকারে তারা উপনিষদ নিতে আসবে? সেখানে তো তাদের Lewis gun, rifleএর অধিকার নেই! তবে সমস্ত ভারত অতিথিকে কি প্রত্যাখ্যান করবে? ভারতের কবি কি সমস্ত ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন? তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত আকাশতলে অতিথিসৎকার করুন—ভারতকে আর নূতন লাঞ্ছনা যেন না দেন!

আমাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার জন্য দায়ী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও আমাদের আত্মশক্তির উপর অনাস্থা, অতএব আমাদের শিক্ষা নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে হবে; আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মোহ যতদিন থাকবে আমাদের শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন ততদিন অসম্ভব থাকবে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ইতিহাস বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাসের ফল। সমাজের যে অবস্থায় তা সম্ভব হয়েছিল সে অবস্থা সত্য সত্যই আর নাই। কিন্তু ফ্যাক্টরী গড়ে এদেশে শিল্পোন্নতি করা চলবে না, গত পনর বৎসরের যৌথ-কারবারের ইতিহাস তার অন্যতম কারণ। এযুগে কেমন করে নূতন ভারতীয় নাগরিক জীবন ও সামাজিক গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠিত করা যায়, আমাদের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সাধনার বিষয়—'স্বরাজ বা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন সেই নব জীবনকে রক্ষা করবারই বাহিরের উপায় মাত্র। প্রথমটা আমাদের যতটা চিন্তার বিষয় দ্বিতীয়টা তত নয়, তার কারণ প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা প্রথমটা লাভ করব দ্বিতীয়টা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা আপনা আপনি আসবে।

নূতন নাগরিক সভ্যতা গড়তে ভারতীয় শিল্পীর ডাক প্রথমেই পড়বে। সেই নূতন সৃষ্টির অন্তরালে যে শিক্ষা সমস্ত জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে সে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে হ'বে ভারতীয় শিল্পের প্রাণের কথা ; সেই নষ্ট শিল্প উদ্ধারের জন্য বীরের মত সাধক চাই—দুর্গম পথ, ধীরে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হতে হবে। শতাব্দী পরে ভবিষ্যৎ ভারতে যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হ'বে তা দেখ্‌তে ভারতের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে কিন্তু সেই মুক্ত মন্দিরদ্বারে অতিথি হবে। উৎসবের সেই দিন। সে কর্ম্মের সফলতা প্রাপ্তির আশা আমাদের জীবিত কালে বর্ত্তমান ভারতকে ত্যাগ করতে হবে। কর্ম্মের পথে আমরা দলে দলে অগ্রসর হ'লে কর্ম্মফল ভগবৎকৃপায় আস্‌বেই আসবে।

আমাদের শিল্পের প্রাণের কথা কি ? আমাদের সভ্যতার বিকাশ ও প্রচার যুগে যুগে, স্বদেশে ও দেশান্তরে ঐ শিল্পের ভিতর দিয়ে ঘটেছিল। শিল্পজ্ঞানই সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং শিল্পের অভাবে সৌন্দর্য্যহীন মানুষের জীবন দিনে দিনে শুকিয়ে যায়—ভারতবর্ষের মত মহাদেশে একটা মহাজাতির জীবন এমনই করে একটি শতাব্দীতে শিল্প-সৌন্দর্য্য হারিয়ে শুকিয়ে গেছে। সর্ব্বাগ্রে সেই মুমূর্ষপ্রাণে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উন্মেষ হওয়া চাই। ভারতীয় শিল্পের অন্বেষণের পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পীর অন্বেষণ আবশ্যক। স্বজাতীয় শিল্পের যত্নের অভাবে আজও তারা বিজাতীয় শিল্পের চর্চ্চা নিয়ে আছে অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের কৃষিকর্ম্মাদি অবলম্বন করে বেঁচে আছে। অতএব নূতন ব্রতী যারা তাদের ঐ ভারতের যে সব শিল্পী আজও জীবিত, যারা বরোদা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যেও পাশ্চাত্য অনুন্নত শিল্পের অনুকরণে হিন্দুরাজার নগরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে অথবা অন্য উপায়ে কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে সেই সব শিল্পীকে ডাক দিতে হবে ; লুপ্তপ্রায় ভারতের গৌরব সেই উন্নত শিল্পের পুনর্গঠন করতে এই সব পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকৃষ্ট শিল্পের কেন্দ্র অসুন্দর সহরগুলি হ'তে স্থানান্তরে সরে যাওয়া চাই। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিল্প ঐরূপ নূতন কেন্দ্রে সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্থাপিত না হ'লে সে শিক্ষার ফলও সুন্দর হবে না। সেই দিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মত একাধিক বিজ্ঞানমন্দির এই অসুন্দর নগরের পরিবর্ত্তে 'সুন্দর' নগরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নব নব শিল্পী ও সাধকের পথ নির্দ্দেশ করবে। কবির 'বর্ষামঙ্গল' সেই সুন্দরের মধ্যে যথার্থ সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সভ্যতা আমাদেরই আশ্রয় করে আজ বলদৃপ্ত হয়েছে, সেই সভ্যতা আমাদের সহযোগীতা হারিয়ে inferior environment-এর

মধ্যে ক্রমশঃ একটা শতবর্ষব্যাপীকালের মুর্শিদাবাদের মত সমস্ত বাণিজ্যগৌরব নিয়ে অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ যুগে East and Westএর অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হ'ক বা না হ'ক, সে আমাদের বড় চিন্তা নয়। এণ্ড্রুজ সাহেব সেতার বাজান কিনা আর রবিবাবু হারমনিয়ম বাজান কিনা সেটা এযুগের বড় স্মরণীয় ঘটনা নয়। আমাদের চিন্তা এই, আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যের আরাধনা অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় শিল্পগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা—মানুষকে শুধু 'lever of art হ'লে চল্‌বে না, 'art of living'ও শিখতে হবে। বাঁচার মত বেঁচে থাকতে হ'লে জীবনের মাঝে সৌন্দর্য্যের সাধনা চাই। মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে শিখ্‌লে, তার অপর কোন শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা জানিনা।

আমাদের জীবিতকালে যে কর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতে হবে তা পূর্ণ করতে যুগযুগের সঞ্চিত বিশাল চিন্তা, অসম্ভব স্বপ্ন ও বিজ্ঞের উপেক্ষিত Sentimentalism নিয়ে বহু artist বহু শিল্পী চাই; সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ভারতীয় কল্পনা সৌন্দর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের এই নূতন সাধনা, নূতন চিন্তা, নূতন স্বপ্নসৃষ্টির অন্তরালে যে আদর্শ নিয়ে কর্ম্মমন্দির রচিত হবে, কত যুগযুগান্ত পরে ঐ কল্পনার সৌন্দর্য্য নব নব আদর্শে রূপান্তরিত হয়ে শত শত অজন্তা, সহস্র সহস্র তাজমহল, লক্ষ লক্ষ সাধক-শিল্পী ভারতবর্ষে আকার গড়ে তুলবে। ভারতবর্ষ সেদিন আবার যথার্থ সৌন্দর্য্যের সাধক হয়ে "সোনার ভারত" বলে জগদ্বিদিত হবে।